রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮১

উপদেষ্টা পরিষদ :
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রী প্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনাবলীর সকল খণ্ডের আলোকচিত্র
শ্রীযোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৫১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ হইতে আর. রায় কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	
পঞ্চপুত্তলী	...	১
সংকেত	...	১৩৫
মণি বৌদি	...	২৪৭
পৌষ-লক্ষ্মী	...	৩৪৭
ভূতপুরাণ	...	৩৬৯

ভূমিকা

ইংরেজী 'প্যাসন' শব্দটির কোন ঠিকমতো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, যা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্যটা বোঝা যায়। মানে 'প্যাসন' বললেই যে ধরনের মনোভাব বা চিত্তাবেগের ছবি আমাদের মনে ভাসে—তার উপযুক্ত কোন শব্দ অভিধানে আজও পাই নি। 'চলন্তিকা'র পরিভাষা এ শব্দটি এড়িয়ে গেছেন। বেণীমাধব গাঙ্গুলীর অভিধানে আছে—'ভোগ বা যন্ত্রণা' 'ভাব' 'ইচ্ছাদ্বেষাদির আতিশয্য' 'অত্যাসক্তি' 'অনুরাগ'। এর কোন একটায় কি ঠিক জিনিসটা বোঝা যায়? অন্তত আমাদের মন ভরে না। বরং তীব্র চিত্তাবেগ বা আবেগযন্ত্রণা বললে কতকটা কাছাকাছি যায়।

অতএব সোজাসুজি প্যাসন শব্দটা ব্যবহার করাই ভাল।

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেম ছিল যথেষ্ট কিন্তু এই প্যাসনটা ছিল না। দু'একজন শক্তিমান লোক চিত্তের এই বিশেষ অবস্থা একটু আধটু স্পর্শ করেছেন কিন্তু পুরোপুরি জোর দেন নি। এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া। বঙ্কিম সাহিত্যের সর্বস্তরেই অগ্রণী, এবং আজও অগ্রগণ্য—মানবচরিত্রের এত বড় একটা দিক সম্পূর্ণ অবহেলা করবেন তা সম্ভব নয়। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' 'রাজসিংহ' 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি বইয়ে একটু আধটু প্যাসনের পরিচয় আমরা পেয়েছি—পূর্ণ প্রকাশ আছে পরিণত বয়সের রচনা 'সীতারামে'। সীতারামের যে অস্থির ও আপাত-দুর্বোধ্য আচরণ আমরা দেখি শ্রীর জন্য—সেইটাই প্যাসন।

বর্তমানে ইউরোপীয়—বিশেষ আমেরিকান কথাসাহিত্যে যে তীব্র দৈহিক-ভোগলালসার চিত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, অনেক সময় অপ্রয়োজনে, গল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবেও—যার প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা বাংলাসাহিত্যের তরুণ লেখকদেরও বিচলিত ও লুব্ধ করেছে—তাও এক ধরনের প্যাসন, কিন্তু মনে হয় শব্দটির মূল অর্থে নয়। তবে সে বস্তুটি কি?…আমার বিদ্যাবুদ্ধি সামান্য কিন্তু আমার মনে হয় এ প্রশ্নের উত্তর পাঠকরা ঐ সীতারাম বইখানিতেই পাবেন।

তারপর কিন্তু দীর্ঘকাল এই মানসিক বিশেষ অবস্থার দেখা পাই নি আমরা। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' ও 'চরিত্রহীনে' একটু—এক ঝলক মাত্র দেখা পাওয়া যায়। চরিত্রহীনের কিরণময়ীর যে মূল ছাঁচ, রবীন্দ্রনাথের সেই বিনোদিনী চরিত্রেও কিছুটা পাওয়া যায়। কিন্তু রবি বা চন্দ্র কেউই এ চিত্তগুণ (না চিত্তাবস্থা?) নিয়ে বেশী মাথা ঘামান নি। বিভূতিভূষণের তো কথাই নেই। তাঁর প্রেমের প্রকাশ স্নিগ্ধ, ক্লেদশূন্য। দৈহিক আসক্তি এমন কি দুরভিসন্ধিও বেশী দূর নিয়ে যেতে পারে নি তাঁকে। 'কেদাররাজা'য় তিনি কুপল্লীতে গিয়েছেন, তবু সেখানকার মালিন্য স্পর্শ করে নি তাঁকে। একমাত্র 'অথৈজল'-এই প্যাসনের কিছুটা আভাস আছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাহিনীটি অসমাপ্ত।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে খাদ্যাভাবে গৃহস্থঘরের মেয়েদের কুলটাবৃত্তি গ্রহণ নিয়ে অনেকেই গল্প লিখেছেন—ভিক্ত, অতি কটুস্বাদ কাহিনীরও অভাব নেই বাংলাসাহিত্যে—লিখেছেন বিভূতি-

তার ইতিহাস শেষ হয়ে যায় নি—সেখান থেকে উন্মূলিত হয়ে মহাজনের হাটে এসে পড়েছে, বৃহত্তর পৃথিবীর চেহারা দেখেছে। বীরভূম এর নায়কের জন্ম ও সংক্ষেপে উল্লিখিত বাল্য-জীবনের পটভূমি হলেও—তার জীবন ও চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে প্রায় ভারত জুড়ে। কলকাতা, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী এই চারটি বিখ্যাত শহরেই বেশির ভাগ দিন কেটেছে তার; বাংলা দেশেও নবদ্বীপ ও চন্দননগর—সভ্যতা সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত দুটি শহরে তার কৈশোর কেটেছে, যৌবন ফুটেছে, তার শিল্পীসত্তা বিকশিত হয়েছে।

হ্যাঁ—মূলত মলিন শিল্পীই। মৃৎশিল্পী। মাটির মূর্তি মাটির পুতুল গড়া তার সাধনা নয়—তার প্যাসন। তার জীবন।

কিন্তু তবু, এটুকু বললে কিছুই বলা হয় না প্রায়। এ লোকটির মধ্যে দুটি প্যাসন পাশা-পাশি চলেছে, দুটিই সমান প্রবল। রক্তমাংসের পুতুল আর মাটির পুতুল—এ দুইই চাই তার—এই দুটি বস্তু সম্বন্ধেই তার প্রবল প্রচণ্ড চিত্তাবেগ। আবার তাও যেন ঠিক না। মাটির মূর্তি গড়ে নিখুঁত, পরমাসুন্দরী মেয়ে নিয়ে ঘর করে, তবু তার তৃপ্তি হয় না কেন? তবুও সে অশান্তি বিক্ষুব্ধ কেন? কেন তা সে নিজেও জানে না। 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম / কস্তুরীমৃগসম।...বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম / ফিরে মরীচিকাসম / বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে বক্ষে ফিরিয়া পাই না। / যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' ঠিক এই মনোভাবই মলিনের। তাই কোথাও তার ঘর বাঁধা হয় না—কোথাও কারও মধ্যেই তার জীবন পূর্ণতার তৃপ্তিলাভ করে না। তার মধ্যে যে প্রবল সৃজনীশক্তি রুদ্ধ নির্ঝরের মতো পাষাণে মাথা কুটছে—প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়ার জন্য—সে কখন তার পথ পেল সার্থকতা লাভ করল তা সে জানে না। তাই তার 'অন্য কোথা, অন্য কিছু' এই ধরনের পিপাসা, তার অশান্ত চঞ্চলতা কখনই তৃপ্ত শান্ত হয় না।

আসলে সুন্দরী নারী আর সুন্দর পুতুল তার কাছে সমার্থক। যে শিল্পী মাটির পুতুলকে জীবন্ত করতে চায়—জীবন্ত মেয়েকে সে পুতুলের মতোই দেখে, সেই রকম ভাবতে ভাল লাগে তার। তাদের মধ্যে অন্য নারীসুলভ আচরণ পরিণতি তার বরদাস্ত হয় না, ওদের কান্না সহ্য করতে পারে না। তাই তাকে দিয়ে ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ হলেও মন ভরে না, প্রেমের শান্তি পায় না। খোঁজেও না সে, এ জিনিস যে আছে, এ জিনিস যে মানুষের জীবনে কাম্য সেটা বুঝল সে অনেক পরে। তেমনি মন ভরে না তার সৃষ্ট নারীপুত্তলীতেও—আরও সুন্দর আরও নিখুঁত আরও জীবন্ত করে তুলতে চায়। আরও ভাল কিছু, যা বিধাতা গড়েন নি, বিশ্বকর্মাও না। তাই শিল্পীর ক্ষুধা কিছুতেই মেটে না—না পুতুলে না মানুষে। আসলে বোধ হয় সে এমন একটা কিছু চায় যা একাধারে পুতুলও বটে মানুষও বটে—ভগবানের হাতে-গড়া পুতুল, শিল্পীর হাতে-গড়া মানুষ।

এই নায়ক—মলিন দাস, স্বয়ং-সৃষ্ট মলিন রায় এক আশ্চর্য মানুষ। এই প্রচণ্ড শিল্পী-মানস রূপবন্ত করতে এই মানুষ কল্পনারই প্রয়োজন ছিল। অবশ্য শিল্পীমানস বলতে আমরা যা বুঝি এ তা নয়। সে শিল্পীও নয়। এ অশিক্ষিত। এর জন্মেও অশুদ্ধতা। পাঁকেই জন্ম

—তা আগেই বলেছি। পঙ্কজিনী বহুবল্লভা। সে দুটো বিয়ের হিসেব ধরে, তার মধ্যে শেষের মানুষের মৃত্যুর তারিখ আর শেষ সন্তানের জন্মের মধ্যে অনেক দিনের ব্যবধান। এ হিসাবের কথা সবাই জানে, তারা হাসে, ওকে দিয়ে এই মিথ্যা বলিয়ে মজা দেখে। তা নয়, 'যৌবনে বহু পরিচর্চা করি' মলিনকে পেয়েছিল সে, কার সন্তান তা বোধ করি সেও জানত না। নাম রেখেছিল মণীন্দ্র, তা হোল মলিন্দ, তা ভেঙে মলিন। সেই মলিন নামটাই থেকে গেছে।

যৌবন যেতে পঙ্কজিনীকে ঝিয়ের কাজ ধরতে হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু যে দেহ-বেসাতি না করে তাও না। তবে তাতে পেট চলে না। পঙ্কজিনীর ঝোঁকটা এই দিকে বলেই মেয়ে মনোরমাকে সদরে পাঠিয়ে নাম-লেখানো বেশ্যা করে দিয়েছে। বড় ছেলেও চাকরের কাজ করে। মলিন কিছুই করে না। লেখাপড়াও শেখে না, কাজকর্মও না।

এই জন্ম, এই পরিবেশ, এই বাল্যজীবন।

এই সব ঘরে অশিক্ষিত ছেলেরা যেমন সংসর্গে মেশে, গাছে গাছে ঘোরে, ডাংগুলি খেলে, অল্পবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে খিস্তি ও মারামারি করে দিন কাটায়, মলিনও ঠিক সেই ভাবেই দিন কাটাত।—তার শিল্পানুরাগ, সৃষ্টিকামনা সহজাত। এদিকে তার শিক্ষা কিছু নেই, আছে একটা অশিক্ষিত পটুত্ব।

পঙ্কজিনী রূপসী নয়, তার অন্য দুটি সন্তানও কালো এবং চলনসই চেহারার। কিন্তু মলিন সুন্দর। 'গৌরবর্ণ বললে ঠিক বলা হয় না, গায়ের রঙ্ কাঁচা সোনার মতো; নাক বাঁশির মতো; চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু আশ্চর্যরকমের উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।' ছিপছিপে দীর্ঘায়ত চেহারা—লোকের দৃষ্টি ও স্নেহ আকর্ষণ করে সহজেই। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী যোগেশ পালেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আরও লক্ষ্য করেছিলেন তিনি—মূর্তির গঠন সম্বন্ধে ওর তন্ময়তা, স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে একাগ্রভাবে তাকিয়ে থাকা—এই বিশেষ শিল্প সম্বন্ধে ওর এই ধরনের সাধকসুলভ আকর্ষণ দেখে। কিন্তু পরবর্তী কালের মানসিক অস্থিরতা ওর তখন থেকেই প্রকাশ পেয়েছে।—'হঠাৎ ছেলেটা রূঢ় হয়ে উঠল।...ওর চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল, বললে—ওরা আমাকে যা-তা বলে। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে।...বলতে বলতে যেন ক্ষেপে গেল সেই শান্ত নিরীহ ছেলেটি। একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে সেটাকে মাটির উপর ছুঁড়ে মেরে আ-আ শব্দে একটা অবরুদ্ধ জান্তব চিৎকার করে উঠল। যারা তাকে বিঁধিয়ে কথা বলে তাদের আঘাত করতে না পেরেই যে ওর সেই বিক্ষোভ তা কিন্তু প্রকাশ হতে বাকী রইল না।'

পুকুরে পাওয়া ভগ্নদেবীমূর্তির টুকরো পরীর মূর্তিটা নিয়ে পালাবার সময় প্রচণ্ড মার খেয়েও সে স্থির হয়ে রইল, নিষ্পলক শুষ্ক চোখে বেদনার ছায়া ফুটল না—সেও পরবর্তী মানুষটারই পূর্বাভাস।

মলিন তখনই অপর পুতুল দেখে দেখে পুতুল গড়ত। কেষ্টনগরের কারিগর যোগেশ পাল দেখে প্রশংসা করলেন। শিল্পী শিল্পীকে চিনতেও ভুল করলেন না—স্বীকৃতি হিসেবে সঙ্গে

করে কেষ্টনগর নিয়ে যেতে চাইলেন। এতদিনের অন্ধ পাষাণকারায় শিল্পীসত্তার নির্ঝর মাথা কুটছিল বাইরের পৃথিবীতে আসার জন্যে, সে এবার পথ দেখতে পেলে।

অবশ্য যোগেশ পালের কাছে যাওয়া তার হ'ল না। পঙ্কজিনীর হিংস্র মূর্তি দেখে বোধ হয় ভয় পেলেন তিনি। কিন্তু তাকে ধরে রাখতে পারল না ওর মা। ওর তখন—'কী গান গেয়েছে পাখী এসেছে রবির কর'। সে পালিয়ে নবদ্বীপে গিয়ে আর এক বিখ্যাত মৃৎশিল্পীর কাছে গিয়ে নিজের স্থান করে নিলে। তিনিও চিনতে ভুল করেন নি, ওর অনুরাগ ও একাগ্রতা দেখে খুশী হয়েই আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিলেন। মলিন দাস এখানেই মলিন রায় হ'ল।

কৈশোর থেকে প্রথম যৌবন। দেহ সুগঠিত হল, মনও তার স্ব-রূপে বিকশিত হবে তার আর আশ্চর্য কি। কিন্তু শিল্পীর সে যৌবনসচেতনতা তার মতো করেই প্রকাশ পায়। ভুবন পালের হাতে-গড়া নিখুঁত একটি সুন্দরী ষোড়শী মেয়ের মূর্তি দেখতে দেখতে সে তাকে চুম্বন না করে থাকতে পারে না। ভুবন পালের ছেলের হাতে ধরা পড়ে আবারও দৈহিক লাঞ্ছনার শেষ থাকে না, তাকে সে আশ্রয় ত্যাগ করতে হয়।

এইবার তার শিক্ষা-দীক্ষা পরিবেশ মতোই জীবন শুরু হ'ল। মদ খেতে শিখল। মেয়ে-মানুষ প্রয়োজন হ'ল। সেজন্যে মারপিট গুণ্ডামিও করতে হ'ল কিছু কিছু। কায়িক পরিশ্রমের ফলে তার সুন্দর দেহ সুগঠিত হয়েছে, বহু মেয়ের কামনার বস্তু হয়ে উঠেছে। বহ্নিশিখার দিকে পতঙ্গমের মতো তারা ছুটে আসে। কিন্তু নারী সম্ভোগ সম্বন্ধে তার বীতস্পৃহা না থাকলেও সেটা তার কাছে প্রথম বা প্রধান নয়। তার সৃষ্টি এর থেকে অনেক বড়। তাই সে মাতালও হয় না, লম্পটও হয় না। অর্থাৎ অশিক্ষিত ইতর সংসর্গের যা দোষ তা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ভাসিয়ে তাকে নিয়ে যায় তার মনের অস্থিরতা, তার বিপুল শক্তির প্যাসন, যা শেষ পর্যন্তও যেন নিজের উপযুক্ত বিকাশপথ পায় না। তাই টিয়ার মতো সুন্দরী মেয়েতেও তার মন ভরে না। 'এহো বাহ্য' বলে সহজেই তাকে বিদায় দেয়।

বহু স্থান ঘোরে মলিন রায়। বহু মেয়ে আসে। সম্মান ও স্বীকৃতি অনেক পায়। মন ভরে না। মন ভরে না তার। কলকাতায় এসে বাসা ও কারখানা করে। সেই টিয়ারই হাবা-গোবা ভাইটাকে সঙ্গে এনেছে, সে তার সঙ্গী, সহকারী, ভৃত্য—এবং মাঝে মাঝে অকারণ রুদ্ধরোষ মেটাবার একটা সর্বংসহ মূক পাত্র। এইখানে আর একটি মেয়ে এল জীবনে। তার চেয়ে উচ্চস্তরের। টিয়াদের শ্রেণী নয়। ভদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা মেয়ে, সামান্য কিছু শিক্ষিতও, উপার্জনের জন্যে হাতের কাজ শিখতে এসেছিল, সেলাইয়ের কাজ, বোনার কাজ। মলিন তখন নারী কল্যাণ আশ্রমে মাটির মূর্তি গড়া শেখাচ্ছে। তার কাজ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল মায়া। মলিনের মনে হ'ল সে একেই চেয়েছিল এত দিন। সে চাইল মাটির কাজ শেখাতে, মায়া প্রথমটা অস্বীকার করলেও ওর রূপেই আকৃষ্ট হ'ল, কিম্বা গুণে। তার পর যা স্বাভাবিক তাই হ'ল। মলিনের হাতে তখন কিছু টাকা জমেছে, সে কালীঘাটে গিয়ে গোপনে মায়াকে বিবাহ করে পাটনায় চলে গেল।

ভাল কারিগরের কখনই অন্নের অভাব হয় না। মলিনেরও হয় নি। এখানেও হ'ল

না। সম্মানও পেল। সুখেই জীবন কাটাবার কথা। কিন্তু সেই অস্থিরতা। মায়া গর্ভবতী হতেই অকস্মাৎ মলিনের মন বিরূপ হয়ে উঠল। বোধ করি সুন্দরী নারীর দেহের বিকৃতি শিল্পী-মন সইতে পারল না। সে মায়াকে ছেড়ে পালাল। কিন্তু ছেড়ে গিয়ে বুঝল, এবার—এই প্রথম তার মন বাঁধা পড়েছে। দেহ ছাড়াও মেয়েদের কিছু আছে, যা এতকাল অন্য মেয়ে বোঝাতে পারে নি, দিতে পারে নি তাকে, মায়া দিয়েছে।

দীর্ঘকাল পরে তাই আবারও ফিরতে হ'ল কলকাতায়। ততদিনে মায়ার একটি মেয়ে হয়েছে। ওর ভাই গিয়ে পাটনা থেকে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মায়া এখানে সুখে ছিল না। ধিক্কার লাঞ্ছনা তো ছিলই—মলিন যে ব্রাহ্মণ নয়, জাতিগোত্রহীন অন্ত্যজ, সে কথাটা জানা-জানি হয়ে গিয়েছিল—তা ছাড়াও তার দুঃখের একটি প্রবল কারণ ঘটেছিল। এই পরিচয় নিয়েই বোনের নামে টিটকিরি দিয়েছিল মায়ার ছোটদার এক বন্ধু—ছোটদা ছনে তাকে ছুরি মারে, ফলে ছনের ফাঁসি হয়। বাগবাজারের তরুণ ছেলেরা এটা ক্ষমা করে নি। মলিন ফিরতে সে সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবারও সেই প্রচণ্ড মারধোর। মলিনকে বাঁচাল মায়ার বড়দা, তার সাহায্যে পালিয়ে আসতে পারল কিন্তু মায়াকে আনতে পারল না। ফড়িং সংবাদ আনল, ওর বৌদি বলে দিয়েছে, যেমন করেই হোক রাত এগারোটার পর বার করে দেবে মায়াকে, মলিন যেন অন্নপূর্ণা ঘাটে অপেক্ষা করে।

অপেক্ষা করেছিল মলিন কিন্তু মায়া আসে নি। মায়া বিশ্বাস করেছিল মলিন ব্রাহ্মণ, তাদের যথার্থ বিয়ে হয়েছে, সে ব্যভিচারিণী নয়। আজ মলিনের যে লাঞ্ছনা হ'ল সে নিতান্তই অকারণে, তার বাবারই দোষে, তিনি মিথ্যা রটনা না করলে এটা হ'ত না ভাইয়েরও ফাঁসি হ'ত না। এই কল্পিত অপরাধের গ্লানি নিয়ে সে আর স্বামীর কাছে যেতে রাজী হ'ল না, আত্মহত্যা করল।

মলিন এ সংবাদ পেল না—কারণ মায়ার বৌদি কথাটা চেপে গিয়েছিলেন। সে ধরে নিল মায়া আসে নি। সে আর অপেক্ষা করল না। আবারও ভাসল। এবার লক্ষ্ণৌ, সেখানে বাইজীর মেয়ে হামিদন্নেসাকে পেল। টিয়ার কিশোরী মূর্তি। কিন্তু শান্তি পেল না। অস্থিরতা গেল না। এবার বুঝল যে মায়া ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো তার জীবনে আসে নি। প্রেম বা ভালোবাসা এসব কিছু না বুঝলেও মোদ্দা কথাটা বুঝতে পারল যে মায়া তার জীবনে অপরিহার্য। ঝড়তুফানে ভগ্ন ক্লিষ্ট এই জীবনতরীর সে-ই নিরাপদ বন্দর। তার জীবন এই আশ্রয় ও অবলম্বনই চেয়েছে সারা জীবন ধরে। শুধু কী চেয়েছে—সেটাই বোঝে নি।

লাম্পট্যের চূড়ান্ত করল। মাতাল হবারও চেষ্টা করে দেখল। ধূমকেতুর মতো ঘুরে বেড়াল সারা ভারতবর্ষ, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ করল কিন্তু না পেল শান্তি না পেল তার জীবন-সাধনাকে ফিরে। সেদিন রাত্রে অন্নপূর্ণার ঘাটে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখে মায়া মনে করে তার পিছনে পিছনে গিয়েছিল—সেই ছায়াটাই এখন তাকে পেয়ে বসেছে। মায়া যে সে মায়া নেই, বেঁচে থাকলেও এতদিনে প্রৌঢ়া হয়ে গেছে জানে সে, তবু সেই ছায়ায় মায়াতেই তাকে আবার কলকাতায় ফিরতে হ'ল। তাকে আর কেউ চিনতে পারল না বাগবাজারে—

অনায়াসেই খবর পেল মায়া আত্মহত্যা করেছে। তার বাবা মরেছে, দাদা অমল কোথায় গেছে তা কেউ জানে না।

ভগ্ন মন ভগ্ন দেহ নিয়ে আবারও পুতুলের বেসাতি সাজিয়ে বসতে হয় তাকে, শুধু কোন-মতে জীবনধারণের জন্যেই। আবারও আগেকার দিন ফিরে পেতে পারত—তার শিল্পকর্ম ও প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে—কিন্তু মন চাইল না। উচ্চাশা আর অস্থিরতা দুটোই বুঝি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবার, তাই বুঝি ভগবানের দয়া হ'ল। শান্তি এল কন্যার বেশ ধরে। কক্ষচ্যুত গ্রহ আবার নিজের কক্ষপথ খুঁজে পেল, ভবঘুরে হতভাগা পেল তার শেষ জীবনের আশ্রয়। এতকালের দাবদাহ চোখের জলে নিভল।

এই মেয়ের মধ্যেই সে দেখতে পেল সেই মানুষ-পুতুলকে যার স্রষ্টা শুধু ভগবান নন, সে নিজেও যাকে সৃষ্টি করেছে। এই মেয়েই তার সমস্ত অস্থির চিত্তাবর্তনের শান্তস্থির কেন্দ্রবিন্দু—তার প্যাসনের পঞ্চতপার যজ্ঞানলোদ্ভূত যাজ্ঞসেনী।—এ কথা মলিন রায় হয়তো বোঝে নি, মলিনা রায়ও হয়তো কোনদিন জানতে পারে নি। বুঝেছিলেন তারাশঙ্কর নিজে, আর বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন রসগ্রাহী পাঠককে।

এই স্বল্পপরিসরে অল্পসময়ে এই বিচিত্র উপন্যাসের বিচিত্রতর চরিত্রের সব পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যা বলা উচিত ছিল তা হয়ত সব বলা হ'ল না। 'পঞ্চপুত্তলী' নিঃসন্দেহে বাংলা কথাসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ—এটুকুও ঠিক বুঝিয়ে দিতে পারা গেল কিনা জানি না। না হলে সে আমার অক্ষমতা। সান্ত্বনা এই—বই তো রইলই, পাঠকরা ভূমিকার ত্রুটিগুলো নিজেদের রসবোধ ও চিন্তাশক্তি দিয়ে পূর্ণ করে নিতে পারবেন।

২

'সংকেত' তারাশংকরের শ্রেষ্ঠ বইগুলির অন্যতম এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না। তবু তাঁর বৈশিষ্ট্যের অভাবও নেই এর মধ্যে। প্রথম তো চরিত্রই। নায়ক নারান গোসাঁই—যার মুখ দিয়েই গল্পটা বলানো হয়েছে, যে কিন্তু 'আমি' বলে বলছি না, নিজের উল্লেখ করতে গেলে কখনো বলছে 'নারান' কখনো বলছে 'গোসাঁই', যার চোখ দুটো সর্বদা রক্তের ডেলার মতো দেখায়, যার মাথার মধ্যে অহরহ তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকে।

এমন ভাগ্যতাড়িত মানুষ পৃথিবীতে বহু আছে, যারা জন্মাবধি ভাগ্যের কাছে মার খায়। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে' কথার কথা। যাদের জীবনে ভাগ্যের চাকা কখনই ঘোরে না, সুখের দিকটা আসে না, দুঃখেই স্থির হয়ে থাকে, তাদের সংখ্যা কম নয়। নারান এই দলেরই একজন। মা-বাপ-মরা ছেলে—বোনের কাছে এসে উঠল। তার জমিজমা যথেষ্ট ছিল, মানে একজনের পক্ষে যথেষ্ট—ভগ্নীপতি তার লেখাপড়া বন্ধ করে তাকে দিয়ে চাকরের মতো খাটাতে লাগল এবং ভেতরে ভেতরে তার জমিগুলি বিক্রী করে টাকাটা আত্মসাৎ করতে

লাগল। শেষে বিদ্রোহী হয়ে একদিন তহশীলদারকে আক্রমণ করতে যেতেও তার প্রতি রুষ্ট হ'ল, ফলে একবস্ত্রেই বেরিয়ে যেতে হ'ল সেখান থেকে। গিয়ে উঠল পৈতৃক বাড়িতে। সে বাড়ি তখন ভাঙা, দরজা-জানালাও নেই। গ্রামের একটি অব্রাহ্মণ পরিবার তার আশ্রয় স্বরূপ হ'ল। তাদেরই আনুকূল্যে একখানা ঘর করে নিয়ে সেখানে বাস শুরু করলে। নিজের অক্লান্ত দৈহিক পরিশ্রমেই ঘর বসবাসযোগ্য হ'ল ; সেই পরিশ্রমেই চাষবাস শুরু করল, অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করতে।

জমি সামান্য, তবু হয়ত তাতেই চলে যেত। হয়ত একদিন বিয়ে-থা করে সংসার পাতাও অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু তা হ'ল না, বেটেরা পূজোর দিন বিধাতাপুরুষ অন্য কথা লিখেছিলেন তার কপালে।

নারান ভাগ্যতাড়িত বলেই চিরবিদ্রোহী। অন্যায় করছে কেউ, বা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করছে—তা কে জানে জলার হাঁস, কে জানে মানুষ—এ দেখলেই তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠত। ভদ্রভাবে শান্তজীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছে বার বার এই কারণেই। চিরদিনই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেছে, নিজের অবস্থা বা শক্তি বিবেচনা না করেই—প্রতিকার করতে পারে নি সব সময় ; সেই জ্বালা পুঞ্জীভূত হতে হতে মানুষটাই যেন মূর্তিমান অগ্নি হয়ে উঠেছে। সেই অগ্নিই তার চোখ দুটোর রক্তবর্ণে, সেই অগ্নিই তার মাথার তীব্র যন্ত্রণায়। একবার মাত্র, ভূতনাথবাবুকে খুন করার সন্দেহে ধরা পড়ে হাজতবাস করার সময়—কিছুদিনের জন্যে তার চোখ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, মাথার যন্ত্রণা কমেছিল।

নারান ভাগ্যের হাতে চিরদিনই মার খেয়েছে। শুধু যে জমিদার, তার মিথ্যাবাদী পাপসহচর কর্মচারী বা রাজজামাতা ভূতনাথবাবুর কাছে তা নয়—যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে জেল খাটাই সার হয়েছে, জীবনের শান্ত স্বাভাবিক পথ থেকে সরে আসতে হয়েছে, গ্রামের দরিদ্র লোকেরা ভয়ে তাকে সাহায্য বা সমর্থন করা ছেড়ে দিয়েছে যে জন্যে—অন্য দিক দিয়েও তীব্রতর আঘাত পেতে হয়েছে তাকে। মাসীর ভাসুরঝি নিরু তার একমাত্র প্রেমাস্পদ, অবশ্য যদি সে অস্ফুট মনোভাব, অব্যক্ত পিপাসাকে প্রেম নাম দেওয়া যায়। সে ভাগ্যের রূপ ধরেই এসেছে ওর জীবনে। নারান যখন বালক তখন একবার মাত্রই নিরুকে দেখেছিল সে, উঁচুদিকে চেয়ে দেখার মতো করে। নিরু বয়সে আরও ছোট কিন্তু সে কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে পড়ে, গ্রামের লোকদের স্থূল রসিকতা পরিহাস, সংকীর্ণ দৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষাহীন পঙ্গল জীবন তার সহ্য হয় নি, এদের উপেক্ষা করে অপমান করে চলে গিয়েছিল সে নারানের দিদির দেশ থেকে। তখনই তাকে দেখে চমৎকৃত, মুগ্ধ হয়েছিল নারান, তার বেশী কোন অন্তরঙ্গ মনোভাব গড়ে ওঠার সুযোগ হয় নি। তবু ভুলতেও পারে নি নিরুকে। ভাগ্যচক্রে অনেক দিন পরে আশ্রয়-সম্বলহীনা সেই নিরুকেই এসে উঠতে হয়েছিল সম্পর্কের সামান্য সূত্র ধরে খুড়ির বোনঝি, অর্থাৎ নারানের দিদির বাড়ি। হয়ত তার মনেও একটা ক্ষীণ আশা ছিল নারানকে দেখতে পাবে—কিন্তু সে আশা মেটে নি। তখন নারানের দিদি গত, ভায়ে

বীরু বালক, সেই সংসারেরই হাল ধরতে হয়েছিল নিরুকে, প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী নারানের ভগ্নীপতিকে বিয়ে করে। নারান যখন এল তখন নিরুর বিধবা হতে দেরি নেই। সেই বিধবা ও ভাগ্নে বীরেনকে নিয়ে গিয়ে তুলতে হ'ল নিজের কাছেই। নিরুকে পেল না, দুর্নামটা সার হ'ল। নিরুর অপমানের শোধ তুলতেই ভূতনাথকে খুন করা—আর সে খুনের দায়ে সন্দেহের কারণে সে যখন হাজতে সেই সময়ই বীরেন মারা গেল ধনুষ্টঙ্কারে, নিরু হ'ল নিরুদ্দেশ। বহুদিন পরে আর একবার মাত্র নিরুর দেখা পেয়েছিল—তার মৃত্যুশয্যায়।

ব্যর্থ জীবন ঠিকই, কিন্তু নারান কখনও সে ব্যর্থতার কাছে, ভাগ্যের কাছে মাথা নোয়ায় নি। সেদিক দিয়ে সে পুরুষসিংহ। সহ্য করেছে চিরদিন, চিরদিনই অন্যায়ের সামনে রুখে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সত্য কথা, কিন্তু ভেঙে শুয়ে পড়ে নি। আগেই বলেছি, তারাশঙ্করের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য—চরিত্রচিত্রণের আশ্চর্য ক্ষমতা আর জীবন সম্বন্ধে সত্য—অতি সত্য—নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা—দুটোই এ বইতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

৩

'মণি বউদি' বইখানি তারাশংকরের অপেক্ষাকৃত কম সমাদৃত এ কথা বললে ঠিক বলা হয় না, কম জ্ঞাত—less known বলাই বোধ হয় উচিত। যতদূর মনে পড়ছে, ওঁর দেখা চরিত্রের কাহিনী হিসেবেই কোন সাময়িক পত্রে বেরিয়েছিল; উপন্যাস আকারে বেরোবার পরও তেমন প্রচার হয় নি। সেটা দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, যতটা তাঁর—তার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের—মানে পাঠকদের।

কারণ এটি আকারে ছোট হলেও এতে তারাশঙ্করের শক্তি ও প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট।

এর লেখার ধরন বা বুনুনিটাও একটু নতুন। এর নায়ক একরকম তারাশঙ্কর স্বয়ং। না, 'আমি' নামধারী কাহিনীপ্রবক্তা নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামে, স্বপরিচয়ে এখানে গল্প বলেছেন, এর মধ্যে তাঁর জীবনের সত্য ইতিহাসও আছে অনেকখানি, অনেকগুলো সত্য ঘটনা। অর্থাৎ হয়ত মণি বউদি নামটা বদলালেও এই আশ্চর্য ভদ্রমহিলা যে ওঁর আত্মীয়ের মধ্যেই পড়েন তাতে পাঠকদের কোন সন্দেহ থাকে না। সেদিক দিয়ে এ গল্প লেখা কোন অতলস্পর্শী খাদের পাশের সংকীর্ণ পথ দিয়ে সন্তর্পণে চলার মতোই—একটু হিসাবে ভুল হলেই বিশেষ অপ্রীতিকর ফলাফলের সম্মুখীন হতে হবে।

এর নায়িকা অবশ্যই মণি বউদি, যাঁর সামনের দুটি দাঁত একটু উঁচু হওয়া সত্ত্বেও যিনি সুন্দরী পদবাচ্যা, যাঁর যৌন আকর্ষণ অপরিসীম। এই মণি বউদি সতী কি স্বৈরিণী, তাঁর জীবন মেঘমুক্ত আকাশের মতো নির্মল কি মিথ্যা ছলনার নিকষ কালো মেঘে ঢাকা—তা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাঠককে বুঝতে দেন নি লেখক, হয়ত শেষ পর্যন্তও একটু সন্দেহ থেকে গেছে। বিশেষ ঐ কিশোর বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী ভৃত্যটি—যে শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রতি অনুরক্ত, ক্রীতদাসের মতোই বাধ্য, যার প্রতি মণি বউদিরও অনুগ্রহের অন্ত নেই—তার সম্বন্ধে একটা

সন্দেহ তো থেকে যায়ই। সম্ভবত লেখকেরও ছিল, আত্মীয়া বলেই সেটা খুলে বলতে পারেন নি।

অভিনবত্বের দিক দিয়ে মণি বউদির স্বামী, লেখকের বিবাহসূত্রে আত্মীয়, শ্যালক অমৃত-দাদা কিন্তু মণি বউদির কাছাকাছি যেতে পারেন নি। এ চরিত্র আমাদের বহু পরিচিত। প্রথম বয়সে আদর্শবাদী দেশসেবক, স্বাধীনতাসংগ্রামী—পরবর্তী জীবনে টাকার স্বাদ পেয়ে —বাঘ যেমন নররক্তের স্বাদ পেলে নররক্তের জন্যই পাগল হয়ে ওঠে—তেমনিই অর্থপিপাসু হয়ে উঠেছিলেন। ব্যবসার জন্য অনেক নিচে নেমেছেন, স্বাভাবিক ভাবেই মদ ও আনুষঙ্গিক পাপও জুটেছে—শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করতে বাধে নি। এ চরিত্র আপনার আমার সকলেরই পরিচিত। এমন কি ব্যক্তিগত জীবনেও। একসময় ইনি মণি বউদির মাসীর প্রেমাস্পদ ছিলেন, আদর্শের জন্যেই তখন বিবাহ হয় নি, অপেক্ষা করছিলেন —সেই লোকটিই অনায়াসে প্রথম বয়সের সেই দয়িতাকে ত্যাগ করে তারই কিশোরী বোনঝিকে বিবাহ করলেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে অন্য নারীতে আসক্ত হতেও বাধল না। এর কোনটাই নতুন নয়, নতুন হ'ল মণি বউদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা। সেটা কখনও বাৎসল্যের রসে মধুর, কখনও কান্তাভাবে আবেগপূর্ণ। এ দুটো চেহারাই সত্য। এ সত্য জীবনেরই সত্য। এ চরিত্র তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সত্যদ্রষ্টা তারাশঙ্করের বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার ফল।

এ বইয়ের গল্প-বয়নের ভঙ্গী, বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টির দক্ষতা, নিজের জীবনের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মেলানো, দেশের অবস্থার বাস্তব পৃষ্ঠপট—এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের এককালীন আদর্শবাদের পরিণতি, জাতিচরিত্রের নির্মম সত্য দিক উদ্‌ঘাটন—সবেতেই তারাশঙ্করের অনন্যসাধারণ প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। এ বই অনায়াসে দীর্ঘায়ত হতে পারত, লেখক যে সে লোভ সম্বরণ করেছেন সেইজন্যেই বিশেষভাবে সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পঞ্চপুত্তলী

উমার করকমলে

তারাশঙ্কর

প্রথম পর্ব

এক

মলিনের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল মেয়ের কাছে। মলিনের মা পঙ্কজিনী। মেয়ে মনোরমা ; পঙ্কজিনীর যে গাঁয়ে বাস সেখান থেকে ক্রোশ-তিনেক দূরে সে থাকে। একখানি বাজার-গ্রাম বা শহর—যাই বলা যাক, সেই শহরের এক প্রান্তে দেহ-ব্যবসায়িনী-পল্লীর মধ্যে থাকে সে। সেও তাদের একজন। মায়ের কান্না শুনে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। কি হল ?

মলিন কোথায় পালিয়ে গেছে। তের চৌদ্দ বছরের নিতান্ত মুখ-চোরা ভীতু ছেলে। ভয় তার ভূত-প্রেত সাপ-খোপকে নয়, ভয় তার মানুষকে। কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারে না ; বাধ্য হয়ে বলতে হলে মাটির দিকে চোখ রেখে এমন মৃদুস্বরে কথা বলে যে, সে কথার স্বর শোনা গেলেও শব্দ শোনা যায় না। এই মানুষের রাজ্যে সে ছেলে কোথায় হারাল ?

পঙ্কজিনী বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছিল, আমি বুঝেছি রে—আমি সেইদিনই বুঝেছিলাম—

চোখে মুখে মনোরমার অপরিসীম বিরক্তি ফুটে উঠল। এই সন্ধ্যার মুখ। সবে সন্ধ্যার আনন্দ-সন্ধানীরা পথে দেখা দিয়েছে। আসবে তারা দুদণ্ড আনন্দ করতে, কান্না শুনলে তারা আসবে কেন। বিরক্তিভরে সে বললে—সন্ধ্যেবেলা থেকে কাঁদিস নে বাপু। কান্না শুনলে তারা কেউ আসবে না। ভাববে মরেছে কেউ।

মা পঙ্কজিনী বললে—তাই সত্যি রে। তাই সত্যি। আমি জানি ; ওই লড়িয়ার জল তাকে টেনেছে। সেখানকার মূর্তি—

বাধা দিয়ে মনোরমা বললে—আরও কিছু। মলিন সাঁতার জানে, জলে ডুববে কেন ? সে সেই কারিগরের বাড়ী গিয়েছে আমি বললাম, তুই দেখিস। কিন্তু কাঁদিসনে।

মনোরমা জানে, এই বয়সেই জেনেছে—জীবন সহজে যায় না। যতক্ষণ শক্তি থাকে প্রাণপণে মৃত্যুর সঙ্গে জীবন সংগ্রাম করে। তারা দুই ভাই বোন ছেলে বয়সে অনেক সাঁতার কেটেছে পুকুরে। মলিন অবলীলাক্রমে দীঘি পার হত দু তিন বার। সে বেশ একটু শক্ত সুরেই কথাগুলি বলে গেল। পঙ্কজিনী চুপ করলে না, কিন্তু কণ্ঠস্বর মৃদু ক'রে গুণগুণ করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল—ওই লড়িয়াই তাকে টানলে রে। রাক্ষসী লড়িয়া রে। রাক্ষসী।

* * *

প্রবাদ তাই বটে। লড়িয়া দীঘি বহুকালের অভিশপ্ত দীঘি। রাক্ষসী।

কতকালের শুকনো মজা দীঘি 'লড়িয়া'। বিস্তীর্ণ দীঘি ছিল এককালে। দূর অতীত কালে নাকি এক রাজার উদ্যানের সরোবর ছিল। এখানে তখন এক হিন্দু রাজা ছিলেন। তখন এই সরোবরে মহিষীরা স্নান করতেন ; ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে বিহার করতেন ; দুধের মত

শুভ্রবর্ণ-রাজহাঁসেরা ঝাঁকবন্দী হয়ে সাঁতার দিয়ে বেড়াত ; চারিপাশে ফুট্‌ত অজস্র লাল পদ্ম। এই রাজা ধ্বংস হয়েছিলেন তুর্কীদের আক্রমণে। যুদ্ধের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে মহিষীরা সরোবরে ঝাঁপ খেয়ে মরেন। এবং জল নাকি তাতেই বিষাক্ত হয়ে যায়। এক ফকীর নবাবকে এই সরোবর ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। ফলে নবাবেরা দীঘির কোন যত্ন নেন নি। তারপর নবাবেরা ফকীর হন। রাজ্য জমিদারী হস্তান্তর হয়। দীঘিটা পড়েই থাকে। ক্রমে ক্রমে মজে এসে সেটা একটা ঘাসের জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। মানুষের বুক পর্যন্ত উঁচু ঘাস, ঘন চাপ বেঁধে জন্মাত। এমন ঘন যে, বারোমাস স্থানীয় মুসলমান গৃহস্থদের পাঁচ সাতটা দু-হাত আড়াই-হাত উঁচু ঘোড়া সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ওর ভিতরে ঢুকে ঘাস খেয়ে চ'রে বেড়াত তবু দেখা যেত না। ঠিক মাঝখানটায়, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশ হাত পনের হাত পরিমিত জায়গায় খানিকটা জল থাকত এবং সেখানে জন্মাত বড় বড় মাগুর আর কই। কত শত বৎসর পর সেই মজা দীঘি কাটিয়ে দেবীগ্রামের অমৃতবাবু অথৈ-জল সরোবরে পরিণত করবার সংকল্প করলেন। অনেক দিন থেকেই ওটা তাঁর কেনা ছিল, কিন্তু নানান প্রবাদ ও সংস্কারের জন্য কাটাতে সাহস করেন নি। সাহস হল স্বপ্ন দেখে। পর পর কয়েকদিনই স্বপ্ন দেখলেন মজা দীঘিটা সরোবরে পরিণত হয়ে কালো জলে টলমল করছে।

অমৃতবাবুর তখন চরম উন্নতির অবস্থা। এখানকার গৃহস্থ লোকে বার্ষিক আয় হাজার টাকা হ'লেই বড়লোক বলে গণ্য হয়। কালটা উনিশ শো তের চৌদ্দ সাল, প্রথম মহাযুদ্ধেরও অব্যবহিত পূর্বে, দেশে তখন ধানের মণ দশ আনা বারো আনা, চাল টাকায় পনের ষোল সের, কাপড়ের জোড়া পাঁচসিকে দেড় টাকা। কলির অশ্বমেধ দুর্গাপূজা—সেও একশো দেড়শো টাকা খরচে হয়। টানাটানির পূজা নয় ; রীতিমত বাদ্যভাণ্ড সহ ষোড়শোপচারে ভোগ দিয়ে, বিসর্জনের দিন বারুদের বাজি পুড়িয়ে পূজা করা যেত। লোকে তাই অমৃতবাবুর আসল আয় অনুমান করতে না পেরে বলত—লক্ষপতি অমৃতবাবু। কিন্তু অমৃতবাবুর টাকা অনেক কয় লক্ষ এবং বার্ষিক আয়ই লক্ষ টাকার কাছাকাছি। অবস্থায় যখন উন্নতি থাকে মানুষের, লক্ষ্মীর কৃপায় তখন তার সাহসও বাড়ে। স্বপ্নে ভরসা পেয়ে অমৃতবাবু দীঘিটা কাটালেন। কাটতে গিয়ে উঠল এক পাথরের ভগ্ন দেবমূর্তি। দেবমূর্তি নয় দেবীমূর্তি। মুখের আধখানা ভাঙা, হাত ভাঙা, পা ভাঙা, শুধু আছে বুক থেকে কোমরের অংশটা। নিঃসন্দেহে লোকে অনুমান করলে যে, এই মূর্তিটাই সেই হিন্দুরাজার উপাস্য দেবী। পৌত্তলিকতা-বিরোধী মুসলমানেরা সেটা ভেঙে এই দীঘিতে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মূর্তিটি কোন্ দেবীর এ নির্ণয় কেউ করতে পারলে না। অমৃতবাবু ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নিজের ঠাকুরবাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ভগ্ন দেবীমূর্তি—কোন্ দেবী তার নির্ণয় নাই—এটিকে নিয়ে কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। কেউ বললেন, মিউজিয়ামে দিয়ে দিতে ; কেউ বললেন—গঙ্গায় বিসর্জন দিতে ; কেউ বললেন—পাঁচটা দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ওটিকে ওই সব মন্দিরের বারান্দায় রেখে দিন। থাক

একপাশে। কেউ বললেন—গ্রামের ষষ্ঠীতলায় পাঠিয়ে দিন। বাংলা দেশে গ্রামের ষষ্ঠীতলা ভাঙা মূর্তির আড়ৎ। কিন্তু অমৃতবাবুর মন কোনটাতেই সায় দিল না। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর ঠাকুরবাড়ীতে মহালক্ষ্মীর পূজা হচ্ছে। সে মূর্তি উঠেছে ওই লড়িয়া দীঘি থেকে। সকালবেলা তিনি ঘোষণা করলেন—এটি মহালক্ষ্মীর মূর্তি, তিনি মহালক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করবেন। ভাস্কর এনে নতুন বিগ্রহ তৈরী করবেন—তার পাশে এটিও থাকবে। কিন্তু স্বজন বন্ধু এমন কি অমৃতবাবুর স্ত্রী পর্যন্ত বললেন—না। তা হয় না। হট ক'রে কিছু করতে নাই। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বললেন—মহালক্ষ্মী একমতে হলেন রাধা। অন্য মতে—তিনি মহাকালী। তবে আপনি যে মূর্তি দেখছেন- সে হ'ল কমলে-কামিনীর মূর্তি, পদ্মের উপর বসে আছেন—হাতীতে শুঁড়ে ঘড়া ধ'রে জল তুলে চান করাচ্ছে। তা আমরা বলি, প্রথম চার বৎসরের সংকল্প ক'রে, মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরী করিয়ে পূজা করুন, তারপর যদি সহ্য হয়, তবে শ্বেতপাথরের মূর্তি গড়িয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন।

তাই হ'ল। স্থির হ'ল কোজাগরী পূর্ণিমায় হবে কমলে কামিনীর পূজা।

অমৃতবাবু কৃষ্ণনগর থেকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ কারিগরকে আনালেন। মূর্তি নির্মাণ করবেন তিনি। কাটোয়া থেকে গাড়ী ক'রে চার গাড়ী গঙ্গা-মৃত্তিকাও আনালেন। আয়োজনের আর বাকী রাখলেন না। ওদিকে 'লড়িয়া' দীঘি কাটানো হয়ে অথৈ জলে ভরে উঠল, নতুন নাম হল কালীদহ। কালীদহেই মা কমলে-কামিনীরূপে বাস করতেন। ওই দীঘি থেকেই ঘট আসবে, ওই দীঘিতেই মায়ের নিরঞ্জন হবে।

কৃষ্ণনগরের কারিগর, সাধারণ প্রতিমা-গড়িয়ে মিস্ত্রী শ্রেণীর লোক নন। বিখ্যাত লোক, রীতিমত ভদ্রমানুষ। অমৃতবাবু নিজে এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে ফরাশের উপর বসেন, তাঁকেও সেই ফরাশের উপর বসালেন। বললেন—শুদ্ধাচারে প্রতিমা গড়তে হবে। তার জন্যে আমি গরদ আনিয়ে রেখেছি। ধরুন।

তাঁর থাকবার স্থান ক'রে দিলেন নাট-মন্দিরের সামনে যে একসারি পাকা ঘর আছে তারই একখানি ঘরে। কৃষ্ণনগরের শিল্পীরও সব দেখে শুনে ভারী ভাল লাগল। অমৃতবাবুকে ভাল লাগল, তাঁর ভক্তি ভাল লাগল, দেবকীর্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। যেমন দেবমন্দির তেমন নাট-অঙ্গন ; চমৎকার। কৃষ্ণনগরের পুণ্যশ্লোক মহারাজাদের বিশাল কারুকার্যময় নাট-মন্দির তিনি দেখেছেন ; আরও বড় বড় রাজা মহারাজার নাট-মন্দির তাঁর দেখা আছে। সে সবের সঙ্গে তুলনা হয় না, করাও উচিত নয়। তবে অমৃতবাবুর দেবকীর্তির মত কীর্তি রাজা মহারাজা বাদ দিয়ে বড় বেশী নাই। আনন্দের সঙ্গে ভার নিলেন তিনি। ছুতোর ডাকিয়ে কাঠামো তৈরী ক'রে প্রথম মাটি শেষ ক'রে কৃষ্ণনগর গিয়ে আরও দুজন শিষ্য নিয়ে ফিরলেন দু'মাটি করবার জন্য। শুধু দু'মাটি নয়, একেবারে রঙ শেষ ক'রে তিনি ফিরবেন। সঙ্গে হরেক রকম সরঞ্জাম। কাঠের, বাখারির নানান আকারের মাটির-মূর্তি পালিশের যন্ত্র, কত রকমের কাঠের ছাঁচ, মুখের ছাঁচ, একটা বাক্সে শুধু রঙ তুলি এবং ছোট ছোট রঙ গুলবার পাত্র। কয়েকটা শিশিতে তার্পিণ, গঁদ, তুঁত, এবং আরও কত কি।

আরম্ভ করলেন দু'মাটির কাজ; কবঙ্কের মত অসম্পূর্ণ মূর্তি লেপনে-লেপনে, হাতে অঙ্গুলী সংযোজনে, মুখ বসানোয় সম্পূর্ণ হতে লাগল। শিষ্য দুজন মাটি লাগায়, তিনি তার উপর ওই সব যন্ত্রের কোনটি হাতে নিয়ে চালিয়ে যান মূর্তির উপর, বাঁকা টানে বাখারির ছুরির মত যন্ত্রটি টেনে দেন, প্রতিমার অবয়ব নিটোল নিখুঁত রূপ ও সুষমায় ভরে ওঠে, বলি-রেখাগুলি পর্যন্ত পরের পর দেখা দেয়; সে নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। তিনি খানিকটা কাজ করেন—তারপর খানিকটা পিছু হটে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নানা ভঙ্গিতে দেখেন—আবার এগিয়ে কাছে এসে হাতের ছুরি দিয়ে খুঁত সংশোধন করেন। মৃদু স্বরে গুণ গুণ করেন—

চাঁদ নিঙাড়ি কেবা অমিয়া ছানিল রে—
তাহে মাজিল গোরামুখ।

কখনও কবিকঙ্কন চণ্ডীর বর্ণনা আপনমনে আবৃত্তি করেন। এর মধ্যেই সে বর্ণনাও তিনি কণ্ঠস্থ করে নিয়েছেন।

বিকশিত পদ্মদলের উপর বসে আছেন মহালক্ষ্মী, দুই পাশে দুই শ্বেত হস্তী, তারা শুঁড় তুলে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরা দুই সোনার কলসীর জলে মাকে স্নান করাচ্ছে—

রাজহংস-রব জিনি চরণনূপুর ধ্বনি
দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ দর্প হরে বেষ্টিত যাবক করে
অঙ্গুলি চম্পক-পরকাশে॥
অধর বিম্বক-বন্ধু বদন শরদ-ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর-ফোঁটা
তনু-রুচি ভুবন-মোহন॥
রামা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব দেশ তার।

সকালে বিকেলে ছেলেদের ভিড় জমে, গ্রামের ছেলেরা চারিপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কাজ করা দেখে। অপরিসীম বিস্ময় তাদের চোখে। কৌতূহলের আর শেষ নাই। লোভেরও অন্ত নাই। বাখারি ও কাঠের যন্ত্রপাতিগুলি অত্যন্ত সাবধানে রাখতে হয়। কে যে কখন আত্মসাৎ করবে তার ঠিক নাই। ছেলেদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্তে অমৃতবাবু একজন কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে বলে দিয়েছেন। সকাল থেকে সে বসে থাকে আর হাঁকে—সরে এস সব, সরে এস। ওহে ছোকরা! ও ছেলে! যাও সব এখান থেকে।

কারিগর হাসেন। ঠাকুর ওদেরই, পূজো ওদেরই। প্রতিমাতে প্রথম মাটি দেবার দিন থেকে বিসর্জনের ক্ষণ পর্যন্ত ওরা তন্ময়মন সমর্পণ করে বসে থাকে। বলেন—থাকো। থাকো। একেবারে যেতে হবে না, দূরে দাঁড়িয়ে দেখ।

ন'টা বাজতেই ওরা সব চলে যায় ইস্কুল। যে দু'চারটি তখনও থাকে তাদের বেশির ভাগ

ছোট ছোট মেয়ে। ওরা বেশী অগ্রসর হয় না।

বারোটা বাজলেই কারিগর কাজ বন্ধ করেন। কর্মচারীটিও চলে যায়। ছেলেরাও থাকে না। কারিগর স্নান করেন; স্নান উপাসনা সেরে ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করেন। ঠাকুর-বাড়ীও ভোগের পর বন্ধ হয়। আবার কাজ আরম্ভ হয় চারটের সময়, চলে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। কারিগর নিয়মিত ওঠেন আড়াইটের সময়, উঠে মুখ হাত ধুয়ে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেন। হাতে থাকে খানিকটা শুকনো মিহি কাপড়, তাই দিয়ে মধ্যে মধ্যে অঙ্গ মার্জনা করে দেন প্রতিমার। এটি ওঁর সারা জীবনের অভ্যাস। শিষ্যরা তখনও ঘুমোয়। ঠাকুর-বাড়ীও নিস্তব্ধ।

দু'মাটির সময় দুপুরের এই সময়টিতেই প্রথম দিনেই তাঁর নজরে পড়ল মলিনের মায়ের মলিন; দেখলেন—জনহীন খাঁ-খাঁ-করা ঠাকুরবাড়ীতে ওই প্রতিমার সামনে বসে আছে দশ এগার বছরের একটি ছেলে, সুন্দর ছেলে। গৌরবর্ণ বললে ঠিক বলা হয় না, গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত, নাক বাঁশির মত, চোখ দুটি ছোট, কিন্তু আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। কিন্তু কোথায় কি আছে—যার জন্য মন ভরে না। সর্বাঙ্গে যেন একটা শ্রীহীনতা। ঠিক মজা দীঘির পঙ্কতল থেকে পাওয়া ওই পাথরের দেবমূর্তিটির মত অনেক মার্জনা করার পরও মূর্তিটির সর্বাঙ্গে যেমন একটা পাঁকের আভাস ফুটে রয়েছে—ঠিক যেন তেমনি। বেশ-ভূষাও ঠিক তেমনি, মলিন অপরিচ্ছন্ন।

কিন্তু ছেলেটি আশ্চর্য রকমের শান্ত, অদ্ভুত স্তব্ধতা সর্ব অবয়বে, নড়ে না, চোখে পলক পড়ে না; স্থির হয়ে বসে আছে। শুধু দেখছে।

কৃষ্ণনগরের কারিগর পালমশায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বললেন—কি খোকা, ঠাকুর দেখতে এসেছ? ছেলেটি কথা বললে না, সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে জানাল,—হ্যাঁ।

দেবী প্রতিমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রতিমা দেখতে দেখতে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন—ইস্কুল যাও নি? কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, দেখলেন, উত্তর সে দিচ্ছে। ঘাড় নেড়েই জানাচ্ছে—না।

—কি নাম তোমার?

—মলিন। ছেলেটি অত্যন্ত মৃদু স্বরে উত্তর দিয়েছিল।

—মলিন? চমৎকার মিল তো তোমার সঙ্গে! মলিন কি?

এবার সে বললে—মলীন্দ দাস।

ও। মণীন্দ্র। মণীন্দ্র থেকে মলীন্দ, তার থেকে মলিন। তা ভাল হয়েছে। চমৎকার মিলেছে ওর অবস্থার সঙ্গে। বিস্মিত হলেন না কারিগর। কোন দরিদ্র এবং সাধনভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা বৈদ্যঘরের ছেলে। মণীন্দ্রকে বলে মলীন্দ। তা থেকে হয়েছে মলিন, তবে ওর মলিনতার আবরণের মধ্যে সত্যকারের মণিত্ব বোধ হয় নেই, আসলে বোধ হয় কাচ, বেলোয়ারী হলেও হতে পারে।

প্রথম শরতের রোদ তিনটেতেও ঝাঁ ঝাঁ করছে।

নাট-মন্দিরের বড় বড় গোল থামগুলির মাথায় অসংখ্য পায়রার বাস ; তারা তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কোঁ-কোঁ শব্দ ক'রে মিলিত গুঞ্জনের সাড়া তুলেছে, কিন্তু বাইরের বাদুড়গুলে এখনও পাখা মেলে বেরুচ্ছে না। অন্তরে বাহিরে মলিন ছেলেটি কিন্তু এই রৌদ্রেই এসেছে। বাড়ীতে কি আগলাবার কেউ নেই, না পালিয়ে এসেছে? কিন্তু খুব দুরন্ত বলে তো মনে হয় না মুখখানা দেখে—। মুখ ফিরিয়ে দেখলেন তিনি। হ্যাঁ—অত্যন্ত শান্ত মুখ। স্থির দৃষ্টিতে মূর্তিটি দেখছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে একটা কি আছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি আরও পরিচয় জানবার চেষ্টা করলেন। মানুষের স্বরূপ জানবার পক্ষে পরিচয় হল প্রতিমার পিছনের চাল-চিত্র। প্রশ্ন করলেন।

—কে কে আছে তোমার?

—মা। দিদি।

—বাবা?

ঘাড় নাড়লে ছেলেটি—না।

—নেই? তাই। তা ইস্কুলে যাও না কেন?

মাটির উপর একটি কাটি দিয়ে কতকগুলি দাগ টানতে টানতে, বারকয়েক এদিকে ওদিকে অকারণে ঘাড় নেড়ে দুলিয়ে বললে—ইস্কুলে পড়ি না আমি।

—কেন?

এবার তার ঘাড় নাড়া ঘন হয়ে উঠল। হাসলেন পাল, পড়ার কথা বললেই ছেলেরা চঞ্চল হবে। ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে ছেলেটি বললে—পড়ি না—। বলেই সে উঠে চলে গেল। দ্বিতীয় দিন উঠেও তাকে দেখতে পেলেন—সে দিন ছেলেটি সেই ছায়াচ্ছন্ন ঠাঁইটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। একটু হেসে তিনিও প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে মগ্ন হয়ে গেলেন। মনে তিনি ধ্যান-মন্ত্র আবৃত্তি করছিলেন—"পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং। গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্বাভরণভূষিতাং॥"

তাঁর মগ্নতা ভঙ্গ হল ঠাকুরবাড়ীর পূজারী এবং পাচকদের হাঁকে ডাকে। এই সময়টাতেই দুপুরের ঘুম সেরে তারা ওঠে। চারটের পর উঠে নিত্যই এমনি একটা হাঁক-ডাক সুরু করে। ছিন্নসূত্র কথা, হাঁক, এদিক ওদিক সেদিক থেকে—সন্ধ্যার আকাশে তারার ফুটে ওঠার মত উঠতে থাকে।—গোপেশ। ঝি মাগী বাসনগুলো মেজে গিয়েছে, তোল।

তারপর খানিকটা তব্ধতা ; তারপর হুঁকা টানার শব্দ। তাপর গুণগুণানি গান। তারপরই অকস্মাৎ উদাস স্বরে কেউ ডেকে ওঠে—গোবিন্দ হে। জয় গোবিন্দ।

তারপরই হাঁক ওঠে—চায়ের জল হয়ে গেল ঠাকুর। সবাইকে ডাক। নইলে আমার নাম-দোষ নাই। হ্যাঁ।

—ওঠ হে। ওঠ হে। ওঠ হে।

এমন ধারা হাঁক-ডাক অকস্মাৎ একসময় কলরবে পরিণত হয়। নিত্যই এই ধারা। আজও

সেই কলরব উঠল। কলরবে কারিগরের একাগ্রতা ভেঙে গেল ; প্রতিমা থেকে দৃষ্টি ফিরল তাঁর। গামছায় মুখ মুছে, টুলখানার উপর বসে এক টিপ নস্য নিলেন। অকস্মাৎ মনে পড়ল ছেলেটির কথা।—কই ? নাই তো।

কখন ঘুম ভেঙে উঠে সে চলে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর মনে কোন তরঙ্গের সৃষ্টি হ'ল না। আবার তিনি নিজের কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন।

তৃতীয় দিনে ছেলেটার বিচিত্র পরিচয় পেলেন কারিগর। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অসময়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল একটা গোলমালের শব্দে। ঠাকুরবাড়ীর ফটকের পাশে তাঁর ঘরটি, বন্ধ দরজার ঠিক ওপাশেই, কেউ—বোধ হয় অমৃতবাবুর বাড়ীর কোন চাপরাসী দারোয়ান উচ্চ কণ্ঠে কাউকে তাড়না করছে—মারে থাপ্পড়, হারামজাদকে দাঁত তোড় যায়। চোরি করনে আয়া ? হিঁয়া চোরি ? বদমাস, চোট্টা,—। এরপর কতকগুলি গালাগালি। চোর যে, তার মা-ভগ্নীর উল্লেখ ক'রে গালাগাল।

কয়েকটি সমবেত কণ্ঠের হাস্যধ্বনি উঠল এতে। ওই শুনেই তিনি উঠতে গিয়েও আর উঠলেন না। উঠলে যদি তাঁর উপস্থিতিকে গ্রাহ্য না ক'রেই এই ধরনের অশ্রাব্য অশ্লীল উক্তি করে তবে যে সে লজ্জা হবে তাঁর। থাক। কিন্তু সেও হল না, উঠতেই হল তাঁকে। শুনতে পেলেন, ঠাকুরবাড়ীর পাচক হরিহর বলছে—কালাপাহাড়ের রক্ত আছে হে বেটার গায়ে। শেষকালে ঠাকুর চুরি ? আর কি চুরি করেছিস ? ডাক হে, কারিগরমশায়কে ডাক, তিনি সব মিল-জুল ক'রে দেখুন। তাঁর যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা দেখুন।

সুতরাং উঠতে হল তাঁকে। গলায় সাড়া দিয়ে তিনি উঠে দরজা খুলে বাইরে এলেন। দেখলেন ঠাকুরবাড়ীর পাচক পূজক এবং একজন দারোয়ানের বেষ্টনীর মধ্যে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে সেই ছেলেটি। তার বাঁ কানটা লাল হয়ে উঠেছে, গালে চড়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। ছেলেটার রং সুগৌর, চড়ের চিহ্ন বড্ড বেশী লাল দেখাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য ! ছেলেটা কাঁদছে না, শুধু অস্থিরের মত দুলছে আর ঘাড় নাড়ছে। তাঁকে দেখেই পাচক হরিহর বললে —এই যে কারিগরমশায় উঠেছেন। এই দেখুন, হারামজাদা ছেলের কাণ্ড দেখুন। এই সব চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল।

দারোয়ানের হাত থেকে ভাঙা মূর্তির একটা টুকরো নিয়ে সে তাঁর সামনে ধরলে। আর খানিকটা গঙ্গা-মাটি। ওই পুষ্করিণীতে পাওয়া, বহু-টুকরো-হয়ে-ভাঙা মূর্তিটির একটা টুকরো। নেহাৎ ছোট নয়। এবং ওই টুকরোর মধ্যেই মাথা থেকে প্রায় পায়ের কাছ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মূর্তিটি রয়েছে। মূল মূর্তির মাথার দিকে শূন্যচারিণী মাল্যবাহিকা দিব্যাঙ্গনার মূর্তি। এগুলি একজায়গায় জড়ো ক'রে রাখা আছে। এতে প্রয়োজন নেই। মূল মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ফেলেও দেওয়া হয় নি। দারোয়ান বললে—ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণ দিকের পাঁচিলের ওপাশেই রাস্তার ধারের পুকুরটায় নেমেছিল সে মুখ হাত ধুতে। হঠাৎ ঠাকুরবাড়ীর ভিতর পাঁচিল পার হয়ে পথের উপর ধপ করে কি যেন এসে পড়ল। শব্দ শুনেই সে ছুটে উঠে আসে। প্রথম পড়েছিল গঙ্গা-মাটির ঢেলাটা। তারপর প্রায় তার সামনেই

সশব্দে এসে পড়ল এই মূর্তিটা। সে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল—কে রে? কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতেই দুখানা হাত পাঁচিলের মাথা ধরে বের হতে দেখে আর চিৎকার না করে হাতের মালিকের প্রতীক্ষায় পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটা পাঁচিল পার হয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়তেই খপ ক'রে গলা টিপে ধ'রে পাকড়াও করেছে।

কারিগর বিস্মিত খুব হলেন না। পুতুল ওদের লোভের বস্তুই বটে। মাটিও তাই। ওই দিয়ে অপটু হাতে কিছু গড়তে চেষ্টা করবে। আদিকাল থেকেই সব ছেলে এই করে আসছে; সৃষ্টি করে স্রষ্টা হওয়ার সাধ মানুষের যে চিরন্তন। একটু হাসলেন তিনি, বললেন —রেখে দাও যেখানে ছিল। বরং টুকরোগুলো সামনে থেকে সরিয়ে কোথাও ভাল করে রেখে দাও যদি রাখতে চাও। এগুলো তো কোনো কাজে লাগবে না। আর ওকে ছেড়ে দাও। ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ! ফটক বন্ধ। বেটা পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাচ্ছিল। বেটা ছেলেমানুষ! বলে উঠল অনন্ত পূজারী।

তাই তো! এ কথাটা তো একদিনও মনে ওঠে নি তাঁর। দুপুরে তো ফটক বন্ধই থাকে। তা হলে ও তো রোজই পাঁচিল ডিঙিয়েই এসেছে গিয়েছে। অনন্ত পূজারী বলেই গেল, ওর গুণ তো জানেন না। আগে আপনার প্রতিমা দেখুন। প্রতিমার গায়ে কোন কারিগরি করেছে কিনা সেটা দেখুন।

মানে? চমকে উঠলেন কারিগর যোগেশ পাল।

অনন্ত বললে, ও বেটার স্বভাব হল কাঠ কয়লা, নয় খড়ি, না-হয় খোলামকুচির ডগা দিয়ে যেখানে সেখানে আঁক-জোঁক কাটা। বাঁধা ঘাটের রাণায়, দেওয়ালে, গাছের বাকলে, যেখানে হোক, জায়গা পেলেই হল। চুনকাম করা দেওয়াল পেলে তো রক্ষে নাই। ছবি এঁকে দেবে। আজকাল আবার প্রতিমার গায়ে কারিগরি করতে আরম্ভ করেছে। এই গতবারে জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে কারিগর প্রতিমে রঙ করে চলে গিয়েছে, রাত পোহালে পুজো, বেটা কখন এসে তার ওপরে চিত্তিবিচিত্তি ক'রে দিয়েছিল। জগদ্ধাত্রী প্রতিমার দুই পাশে দুই সখী থাকে চামর হাতে, তাদের কপালে কালি দিয়ে বেটা চুলের বাহার করে দিয়েছিল। আজকাল সব পাতা কেটে চুল বাঁধা হয়েছে না, তাই করে দিয়েছিল। বাবুদের কি দেখে চেঁচামেচি করে, বেটা হাতেনাতে ধরা পড়ে। তখন আবার কারিগর ডেকে, কালি চেঁচে রঙ তুলে, নতুন রঙ করে তবে রক্ষে। ওকে বিশ্বাস নাই।

সত্যই বিশ্বাস নাই। ছেলেদের স্বভাব তাই বটে। যোগেশ পাল দ্রুতপদে গিয়ে প্রতিমার আবরণটি খুলে ফেললেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখলেন; কোন কারিগরির চিহ্ন দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, না। সে সব কিছু করে নি। দাও, ওকে এবারের মত ছেড়ে দাও। আর ও এসব করবে না। কি হে, করবে?

বিচিত্র ছেলে। কথা বলে না, সেই তেমনি ভাবে দোলে আর অর্থহীন ভাবে ঘাড় নাড়ে। এটি চাঞ্চল্যের লক্ষণ সে যোগেশ পাল বুঝলেন। কিন্তু দৃষ্টিটা স্থির কেন? পলক

পড়ে না কেন? মাটির দিকেও চেয়ে নেই, সেইটেই আশ্চর্য ঠেকল তাঁর কাছে। এ তো সহজ ক্ষমতা নয়।

হরিহর বললে—কই কোন কথা ওকে বলান দেখি। কিছুতেই 'রা' কাড়বে না।

হেসে পাল বললেন—দাও ছেড়ে দাও। আমি বলছি ও আর করবে না। কিন্তু কাদের ছেলে? রোজই দেখি ভর্তি দুপুরে এসে বসে থাকে। কথাবার্তা বিশেষ বলে না। এদিকে তো দেখে মনে হয় খুব শান্ত।

দুই

অনন্ত পরিচয় দিলে। কারিগর কাজ করছিলেন। অনন্ত ব'সে বলে যাচ্ছিল। তাঁর শিষ্যরা কেউ তখনও জাগে নি।

পঙ্কজিনীর ছেলে—নাম ওর মলিন। পঙ্কজিনীর রূপের মধ্যে উচ্চবর্ণের আভাস আছে, কিন্তু চরিত্রের বর্ণ কালি-মাখা। সূর্যের উত্তাপে প্রখর রৌদ্রে দেহের বর্ণ পুড়ে তামাটে হয়। প্রবৃত্তির আগুনে পুড়ে, স্বভাবের বিষের জ্বালায়, অন্তরের বর্ণ নীল হয়ে যায়। পঙ্কজিনী আসলে কি জাতের মেয়ে তা কেউ জানে না। পঙ্কজিনী নিজে বলে, অদেষ্ট বাবা, অদেষ্ট। জাতে তো ভালই ছিলাম, কিন্তু সে সব ঘুচে মুছে গিয়েছে, এখন ঘোষ্টোম। বলতে বলতেই বলে—'বামন বাবা, বামুন'। কণ্ঠস্বর মৃদু ক'রে বলে—'অল্প বয়সে বিধবা হয়ে পালিয়ে গেলাম একজনার সঙ্গে। নিয়ে বোষ্টম হলাম।' মেয়েটা আশ্চর্য বোকা—অথবা নিতান্তই লাজ-লজ্জাহীনা। এখানে এসেছে আজ দশ এগার বছর আগে। সেবার দেশে হয়েছিল অজন্মা। অন্নকষ্টে হা-হা-কার উঠেছিল। অমৃতবাবু খুলেছিলেন অন্নসত্র। দেশ-দেশান্তরের অভাবীর দল এসে জুটেছিল অন্নের প্রত্যাশায়। তাদের মধ্যেই ছিল পঙ্কজিনী। সঙ্গে ছিল হাত ধরে একটি মেয়ে একটি ছেলে আর কোলে আর একটি, বছর দেড়েক বছর দুয়ের ওই মলিন। মেয়েটার নাম মনো আর অন্য ছেলেটার নাম ফনে। মেয়েটা বছর আষ্টেকের, ফনে পাঁচ ছ বছরের। দুটো-ই দেখতে পেঁচার মত। ছোট জাতের ছাপ তাদের সর্ব অবয়বে। কিন্তু কোলের ছেলেটা যেন পদ্মফুল। পঙ্কজিনীর চেহারা ভাল, শ্রী ছিল, এখনও আছে। কিন্তু তার সঙ্গেও মলিনের চেহারার কোন মিল নেই। সে সময়ে পঙ্কজিনীর শ্রীর সঙ্গে যৌবন ছিল। বয়স আর কত হবে তখন? ত্রিশের নীচেই, ছাব্বিশ সাতাশ।

অনন্ত বললে—বুঝতে পারেন কারিগর মশাই, এ দুটো থাকলে দয়া মায়া একটুকু বেশী পায় সংসারে। ভাল মন্দ কিছু বিচার না করেই বলছি, সংসারে শ্রীর একটা টান আছে। সেই টানে মন টানে। সেই টানে দয়া মায়া একটু বেশী পায়। আবার পুরুষের চেয়ে বেশী পায় মেয়ে-ছেলেতে। যুবতী মেয়ে, ছিরি আছে, কোলে কাঁধে

দু'তিনটে ছেলেমেয়ে। আহা, দাও ওকে আশ্রয়। অমৃতবাবুর গিন্নি-ঠাকরুণ ওকে দেখে, বোষ্টোমের মেয়ে শুনে ঠাকুরবাড়ীতেই বাসনমাজার কাজ দিলেন। বললেন ওই কথা,—আহা। এখন, থাকলেই পাঁচজনে পাঁচটা পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। করেছিলও পাঁচজন, আমিও করেছিলাম। তাতেই বলেছিল ওই জাতের কথা। বাড়ীর কথা বলতে বলতে বলেছিল—নেকনে যার বেধবা হবার যোগ থাকে, তার দু-বার বিয়ে করলে কি হবে? না-কি গো ঠাকুরমশায়? আমি বললাম—হ্যাঁ, তা বটে। পঙ্কজিনী বললে—এ-ই। দেখেন না, প্রথমে বিধবা হলাম ষোল বছরে। বুকের জ্বালা—পাগল করে দিলে; সেই জ্বালায় জাত বাছলাম না, কুল বাছলাম না, শ্বশুরবাড়ীর কিষাণের সঙ্গে মজলাম। একদিন রাতে ছোট জাত লোকটার সঙ্গে চলে এলাম। লোকটা সদল বদল মানুষ, এই বুকের ছাতি, আমার কপালে টিকল না। বছর ছয়েক পরে ধড়ফড় ক'রে মরে গেল।···মনে মনে হিসেব করে বললে, ওই ক্ষণে ত্যাখন আমার কোলে—বছর ত্যাড়েকের, সবে হাঁটছে, আর মনো ত্যাখন বছর চারেকের মতন। একজনাকে কাঁধে একজনাকে কোলে করে গাঁজা খেয়ে মুনষে নাচছিল। উঠানে ছিল কাঁচের টুকরো, সেই তাতেই বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা কেটে গেল, তাও বেশী নয়, 'এতটুকুন', ছটাকখানেকও হবে না—রক্ত পড়ল। বললাম—দুব্বো ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দাও; সে বললে—দেং। পঙ্কজিনী চোখ মুছে হেসে বললে—সবই নেকন। তাছাড়া কি বলব বলুন? ঠাকুরমশায়, আর কি? সেই ছুতোসে আঙুলটা রাত্তিরে টাটিয়ে উঠল, তার সঙ্গে জ্বর। বাস্, সনজে বেলা হতে হতে আঙুলটা এই চ্যাঙমাছের মাথার মত মোটা হয়ে ফুলল, হাঁটু পর্যন্ত থোল নিয়ে জ্বর বেড়ে অঙ্গের তাপ হল আগুনের মত। ধান দিলে যেন খই হয়ে যাবে এমনি। আর কি বলে একেবারে ধনুকের মত বেঁকে গেল। তাতেই মরে গেল। যেন মাথা কাছড়ে মরে গেল! চার বছরের মেয়ে দেড় বছরের ছেলে নিয়ে আতান্তরে ভাসলাম। মলিন হতভাগা তখন হয় নাই, পেটে। ওঃ সে যে কি আতান্তর কি বলব। তাও বছর তিনেক কেটেছে কোন রকমে। এবার আকাড়াতে চারিদিক অন্ধকার। পালিয়ে এলাম।

অনন্ত বললে—বছর দেড়েকের এই ছেলেটা ঘাটের মাথায় বসে ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করত, তখন ভ্যাবা ছিল। কাঁদত না। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকত। কারিগরমশায়, আমি সব শুনে ওই ছোঁড়ার মতই ভ্যাবা হয়ে গেলাম। শুধালাম, এ ছেলেটার বয়স তা হলে কত? চার বছর? তা পঙ্কজিনীর তা'তেও হুঁশ নাই। বললে—তাই হয় ঠাকুরমশায়। এই তো বছর ত্যাড়েক হল! বুঝুন ব্যাপার। শুধু আমাকে নয়, সবারই কাছে এই গল্প করেছে। ধরাও পড়েছে! তাতেও লজ্জা পায় না। এ সেই ছেলে। বেটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। পড়লে পড়া হ'ত। কিন্তু পাঠশালায় নিলেও না ওই জন্যে, ও বেটাও হাঁটলে না ও-পথে। বলে—আর সব ছেলেরা যা-তা বলে। যা-তা মানে বুঝছেন তো? ওরই মায়ের দেওয়া ওই জন্ম সনের হিসেব। বাপের নাম। হাজার হলেও বুদ্ধি হয়েছে তো? তারপর এই দশা। একা একা ঘুরে বেড়াবে, দিন নাই দুপুর নাই, রাত নাই, ভয় নাই, ডর

নাই, ত্রিভুবন জরিপ করে বেড়াচ্ছে। আর ওই বাতিক—যেখানে-সেখানে আঁকাজোঁকা কাটবে। চাকর খানসামার কাজ করবে না। আমাদের বাবুর গেস্ট হাউসে সাহেব-সুবো আসে, সেখানে জাতটাতের তো বিচার নাই, একটুকুন ঝকমকে হলেই হ'ল। ছোঁড়াকে ডেকে লাগানো হয়েছিল, তা সেখান থেকে পালিয়ে গেল—এঁটো কে ঘুচোবে ?

হেসে অনন্ত বললে—ওর দাদা পাঁচ সাত বাড়ীতে জল তুলে দেয়, ওর মা চার পাঁচ বাড়ীতে বাসন মাজে, বাটনা বাটে। দিদিটা ওর চলে গিয়েছে, এই রেল জংশনের শহরে একেবারে নাম-লিখিয়ে বেশ্যা হয়েছে। মা দাদা এখানেই থাকে। ছেলেটা এখানে দু-দিন খায়, দু'দিন দিদির কাছে চলে যায়। আর এই কাজ।

হঠাৎ অনন্ত বলে উঠল—বুঝতে পারবেন না কত বড় বজ্জাত। এখুনি বলছিলাম না আমি যে বেটার দেহে কালাপাহাড়ের রক্ত আছে। এ যদি মিছে হয় তো কি বলি আমি কারিগরমশায়। বেটার যত রোখ ওই ঠাকুর-দেবতার উপর। বুঝেছেন, প্রতিমা বিসর্জনের সময় বেটা তকে-তকে থাকে। প্রতিমাটিও জলে নামাবে এ বেটাও জলে নামবে; প্রতিমাও জলে ফেলবে সঙ্গে সঙ্গে বেটাও ডুববে; ডুবে মুণ্ডু ভেঙে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে। ওর মায়ের বাড়ীতে আমি গিয়েছি কারিগরমশায়। পঙ্কজিনী লোক ভাল নয়। মানে এখানে এসেও স্বভাব ওর পাল্টায় নাই। বুঝেছেন!

মুখে পিচ্ কেটে অনন্ত আক্ষেপ ক'রে বললে—কি আর বলব ? সত্য কথা। পঙ্কজিনীর স্বপক্ষে বলবার কথা কিছুই নাই। দারিদ্র্যের তাড়নায় পেটের জ্বালায় যে মেয়ে ভিখারিণী হয়ে এল, সে মুষ্টিভিক্ষার বদলে মানুষের দয়ায় অন্নপাত্র পেলে। সহজ জীবন-যাপনের সুযোগ পেয়েও সুস্থ মনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে না। পঙ্কজিনী প্রথম যখন গাঁয়ে এল ভিখিরী হয়ে তখন বয়সেই যৌবন ছিল কিন্তু দেহে ছিল না। না খেয়ে শীর্ণতার সীমা পার হয়ে সে একরকম শুকিয়ে গিয়েছিল; শুধু মুখের মধ্যে একটা মিষ্টি ছাপ ছিল। ঠাকুরবাড়ীতে গিন্নীমা চাকরি দিলেন। বাসন টাসন মাজবে, নাট-মন্দির ঝাঁট দেবে; মাইনে পাবে দু'টাকা। কাপড় পাবে; খেতে পাবে; আর ছেলে তিনটে পাতের ভাত পাবে। এবং পাশেই বাবুদের একটা মাটির বাড়ী আছে, সেখানে থাকবে। মাস দুয়েক যেতে না-যেতে তার দেহে জোয়ার এল, যৌবন ফিরল। অনন্ত বললে—শরীর সারল, তেলে জলে বাহার খুলল, চুলে চিরুনি দিয়ে কপালে ফোঁটা কেটে পঙ্কজিনী বাহারের উপর চেকনাই বাড়ালে। রকমসকম দেখে জবাব হয়ে গেল। পঙ্কজিনী তাতে ভয় পেলে না। গাঁয়ে বাজারের একটেরে ঘর ভাড়া করলে। তিন-চার বাড়িতে বাসন মাজা বাটনা বাটার কাজ নিলে। মনো মেয়েটার বয়স আট ন বছর, তাকেও এক বাড়িতে বাচ্চা ছেলে কোলে ধরবার কাজ দিলে। সব যোগাড় হয়ে গেল। যারা পঙ্কজিনীর বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা যেত তারাই যোগাড় ক'রে দিলে। সে রীতকরণ পঙ্কজিনীর, লোকে বলে, এখনো আছে। মেয়েটা যুবতী হয়ে নাম-লেখানো বেশ্যা হয়েছে, চলে গিয়েছে বাড়ী থেকে, তার দায়ও পঙ্কজিনীর। সে-ই মেয়েকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে। বুঝছেন না, পঙ্কজিনীর বাড়ী গেলে

দুর্নাম হয়। তা—তবুও আমি মাঝে সাঝে—দিনের বেলা ওপথ দিয়ে যেতে হলে—আধদণ্ডও দাঁড়িয়ে যাই। উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা-টথা ব'লে চলে আসি। উঠোন থেকেই নজরে পড়ে—ঘরের ভেতর পেরেকে পেরেকে ওই সব মুখ সাজানো আছে।

কারিগর বললেন—বিচিত্র ছেলে তো। এ দিকে মুখ দেখে এমন শান্ত মনে হয়।

—হ্যাঁ। তা শান্তও বটে। তা বটে। আবার বজ্জাতও বটে। বোধ করি সংশয় জাগে অনন্তঠাকুরের মনে। বিচিত্র চরিত্র মলিনের—দুই প্রান্তের দুই বিপরীত রীতচরিত্রের দুটি লাল নীল আলোর মত জ্বলে ওঠে তার মনশ্চক্ষুর সামনে।

একটু চুপ করে থেকে বললে—তা শান্ত না হয়ে করবে কি বলুন। কথা বলবে কোন মুখে? সে জ্ঞান তো হয়েছে বেটার। ওই লজ্জাতেই তো ইস্কুলে গেল না। জাতের কথা বাপের কথা জিজ্ঞাসা করে যে সব। তা ভদ্দনোকের ছেলের পাঠশালাতে না নিক, এখানে নাইট ইস্কুল আছে, সেখানেও যায় না বেটা।

কারিগরমশায় আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন—তিনিও হয়তো এর উত্তর খুঁজছিলেন। ছেলেটি শান্ত না মন্দ? উত্তর পেলেন না—তবু বললেন—

—তা হোক, ওকে আজ ছেড়ে দাও।

সেদিন ওকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

কয়েক দিন পর। সেদিন প্রতিমায় রং দিচ্ছিলেন কৃষ্ণনগরের কারিগর। হঠাৎ ছেলেদের গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে যা দেখলেন তাতে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

ছেলেরা চিৎকার করছিল—ওই। ওই। ওই যে। ওই উঁকি মারছে।

—কি?

—মলিন। হারামজাদা মলিন। ওই গাছে চ'ড়ে ব'সে ব'সে দেখছে। ওই তো। ওই যে।

—তাই তো। ঠাকুরবাড়ীর পাঁচিলের ওপাশে একটা সুদীর্ঘ-শীর্ষ অর্জুন গাছের উপরে ঘন পল্লবের মধ্যে ছেলেটা বসে রয়েছে। ধরা প'ড়ে স'রে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কারিগরের সমস্ত শরীরটা সির্-সির্ করে উঠল। যদি পড়ে যায়।

—মার ঢেলা। একটি ছেলে একটা গঙ্গা-মাটির টুকরো কুড়িয়ে নিলে।

—না। তার হাত চেপে ধরলেন কারিগর। তারপর এগিয়ে গেলেন পাঁচিলের ধারে। ধীরে উচ্চকণ্ঠে বললেন—নাম। আস্তে নাম। আস্তে। নইলে পড়ে যাবে। আস্তে।

একটি ছেলে বললে—ও পড়বে না। খুব গাছে চড়তে পারে। কাঠবেড়ালীর মত খর খর ক'রে উঠে যায়।

তাই বটে। অবলীলাক্রমে নেমে পড়ল ছেলে। অনেকটা নেমে খানিকটা উঁচু থেকে ধপ ক'রে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে; কারিগর দ্রুত বেরিয়ে এলেন ঠাকুরবাড়ী থেকে। ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কই? তিনি ওকে ডাকতে এসেছেন। কি অদম্য তৃষ্ণা। আহা-হা!

কিন্তু গৌরবর্ণ শীর্ণ-দেহ ছেলেটি তখন বিপরীত মুখে চলেছে।

ওই চলে যাচ্ছে, পথ ধরে নয়, অপথে, একটা পুকুরের পাড়ের কচু বনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কচু বনের মধ্যে। মনের মধ্যে একটা বেদনা অনুভব করলেন তিনি।

ফিরে এসে অনন্তকে বললেন—ওকে একবার ডাকতে পারেন ঠাকুরমশায় ?

অনন্ত ঘাড় নেড়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলে—না, আজ্ঞে না। ও বড় পাজী ছেলে। তারপর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—মিছে দুঃখ করছেন আপনি। ওর দুঃখ-টুঃখ হয় না। ডাকবেন, আদর ক'রে দেখতে দেবেন কাছে বসে, ও কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না কিছু মন্দ করে পালাবে—তাতে একচুল সন্দেহ নাই। আমি ডেকে তখন বাবুদের কাছে দায়ী হব। আপনাকে বলছি আমি, এখানকার কোন কারিগর ওকে ঠাঁই দেয় না। বেটা ওই যন্তর নিয়ে পালায়। রঙ তুলি চুরি করে। সব চেয়ে মুশকিল বেটার কারিগরি বিদ্যে। বেটা আবার নিজে পুতুল তৈরী করে কি না।

—পুতুল তৈরী করে ?

—হ্যাঁ। ওই আহ্লাদী পুতুল, এটা ওটা, তা বেশ তৈরী করে।

—কই, সে কথা তো বলেন নি সেদিন ?

হেসে অনন্ত বললে, তার আর কি বলব ? তৈরী করে, ছোটজাতের ছেলেদের দেয়। বাজে পুতুল। এই ঢিপঢিপ গড়ন।

ঠিক এই সময়ে তাঁর শিষ্য এসে ডাকলে। রঙ তৈরী ; চক্ষুদান করতে হবে। চোখ আঁকতে হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরলেন কারিগর এবং ভিতরে গিয়ে তুলি ধ'রে প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে মুহূর্তেই আর সব কিছু ভুলে গেলেন তিনি।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে বেড়িয়ে ফিরবার পথে, অনন্ত সঙ্গে ছিল, সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে—ওই দেখুন, ওই যে পুকুরপাড়ে, কোণটার উপর ঘরখানা। ওইখানা।

—কি ? কি ওখানা ?

—সেই মলিনের মায়ের ঘর।

—মলিন ? সেই ছেলেটি ? চলুন যাব। আছে ছেলেটি ?

—তার ঠিক নেই। সে যে কখন কোথায় থাকে—সে ভগবানও বলতে পারে না।

•

মলিন কিন্তু ছিল। ভগবানের ইচ্ছেতে বোধ হয় নয়, নিজের ইচ্ছেতেই ব'সে ব'সে আহ্লাদী পুতুলই তৈরী করছিল। সারি সারি সামনে সাজিয়ে রেখে, গড়ে যাচ্ছিল। কারিগর সকৌতুক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন। এ যে বিচিত্র ছেলে। জাত কারিগর। তারপর একটি পুতুল হাতে তুলে নিয়ে দেখে বললেন—

—তুমি পুতুল তো বেশ তৈরী কর। কই তা তো বল নি ?

মলিন অবাক হয়ে গেল। কৃষ্ণনগরের কারিগরমশায় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ? বলছেন, তুমি তো বেশ পুতুল তৈরী কর। সে কাজ বন্ধ করে সেই অভ্যাসমত ঘাড় দোলাতে লাগল।

—তাই তো। খোঁপাটি তো বেশ করেছ। নাক-মুখও বেশ হয়েছে। কিন্তু—। বুকটা যে বড্ড ভারী করেছ!

মলিনের হাতে তার নিজের তৈরী একটা পাতলা বাখারির ছুরি ছিল, সেটি হাতে নিয়ে তিনি খানিকটা চেঁচে ঠিক ক'রে দিয়ে বললেন—এইবার দেখ তো!

ওপাশে ব'সে ছিল মলিনের দাদা ফণী। একটি স্থূল-বুদ্ধি স্থূল চেহারার ছেলে। আশ্চর্য, কোন মিল নাই মলিনের সঙ্গে। সে হাঁ করে শুনছিল কথাগুলি। পঙ্কজিনী বাড়ীতে ছিল না। সে গিয়েছিল শহরে—যেখানে মেয়ে মনোরমা থাকে। এবার ফণী এসে পাশে দাঁড়িয়ে বড় বড় দাঁত বের ক'রে বললে—দিন রাত ঐ করছে। কাজ না কাম না।

—করুক। করুক। আর কি করেছ। দেখি। এটা কি? হাতী-ঘোড়া-গরু। এটা কি? বাঘ; এটা সিংহ? হাত তো অপটু নয়।

—ওটা ওর চিড়িয়াখানা।

—চিড়িয়াখানা! তাই তো! একটা ছোট্ট চৌকো জায়গায়—কাঠি দিয়ে ছোট ছোট ঘেরা করে সাজিয়ে রেখেছে মাটির জীবজন্তু।

—সব চেয়ে ভাল করেছে এই দেখুন।

ফণে বের ক'রে নিয়ে এল একটা মাটির ব্র্যাকেট। আবক্ষ একটি নারীমূর্তি মাথায় ক'রে ধরে রেখেছে মাটির আধার। রঙ পর্যন্ত দিয়েছে। অবাক হলেন কারিগর। ছেলের হাতে গড়া মেয়েটি কটাক্ষময়ী। কটাক্ষের ভাবটুকু চোখে সে বেশ ফুটিয়েছে। একটি স্তন অর্ধাবৃত, স্তনবৃন্তের চারিপাশে রক্তিম কৃষ্ণাভা এবং কালো বৃন্তবিন্দুটি স্পষ্ট ক'রতে ভুল করে নি। সেই বিন্দুটির বর্ণ সন্নিবেশ দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন—

—কি দেখে করলে?

—কালোর ঘেরের মধ্যে রঙটি মানান হবে ব'লে দিয়েছি। ব'লেই থেমে গেল মলিন। এই তার প্রথম কথা।

ফণে বললে—দিদি একটা কিনেছে, তাই দেখেছে।

হঠাৎ কারিগর বললেন—তুমি যাবে আমার সঙ্গে? কৃষ্ণনগর? তোমাকে শেখাব আমি।

মলিন উত্তর দিলে না, সে উঠে ঘরের ভিতরে চলে গিয়ে বেরিয়ে এল দুটি ছোট মুখ নিয়ে। বিস্মিত হলেন কারিগর। একটি কৃষ্ণনগরের তাঁরই ওখানকার তৈরী পুতুলের মুণ্ড, আর একটি মলিনের হাতের তৈরী। রঙ খারাপ, জিনিসটা ছাঁচের নয়, ছেলেমানুষের হাতের তৈরী—তবু সাদৃশ্য এনেছে! বেশ সাদৃশ্য এনেছে!

—আপনার জানলার পাশে পেয়েছিলাম এটা কুড়িয়ে।

কারিগর যখন এখানে আসেন তখন কিছু পুতুল এনেছিলেন অমৃতবাবুকে দেবার জন্ত। এটা ভেঙে গিয়েছিল তাই ফেলে দিয়েছিলেন। ছেলেটা কুড়িয়ে এনে নকল করেছে।

—তুমি যাও তো আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

—যাব আমি।

—কাল সকালে তুমি যেও, কেউ কিছু বলবে না আমি বলে দোব।

—না, ওখানে—।

—কেউ কিছু বলবে না। আমি বাবুদের বলে দেব।

—না। ওখানে আমি যাই না।

—যাও না? কারিগর যোগেশ পাল না হেসে পারলেন না।

সঙ্গে সঙ্গে মলিন বলে উঠল—যে তিনদিন গিয়েছিলাম দুপ'র বেলায়, সবাই ঘুমোত তখন, পাঁচিল পার হয়ে গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা বলব ব'লে গিয়েছিলাম। আর খানিক গঙ্গা-মাটি—

—আর ভাঙা ঠাকুর। অনন্তঠাকুর হেসে কুট কাটল।

—সে প'ড়ে ছিল। আর ওটা তো ঠাকুর নয়, পরী—তাই নিয়েছিলাম। ওখানে আমি যাব না।

হঠাৎ ছেলেটা রূঢ় হয়ে উঠল। ওর চরিত্রে এটা অপ্রত্যাশিত, হয় তো অশোভন, তাই বেশী কটু মনে হল। ওর ছোট চোখ দুটি যেন জ্বলে উঠল, বললে—ওরা আমাকে যা-তা বলে। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে। বলতে বলতে যেন ক্ষেপে গেল সেই শান্ত নিরীহ ছেলেটি। একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে সেটাকে মাটির উপর ছুঁড়ে মেরে আ-আ শব্দে একটা অবরুদ্ধ জান্তব চিৎকার করে উঠল। যারা তাকে বিঁধিয়ে কথা বলে—তাদের আঘাত করতে না পেরেই যে ওর সেই বিক্ষোভ তা কিন্তু প্রকাশ হ'তে বাকি রইল না।

অনন্তঠাকুর মুহূর্তে লাফ মেরে ওদের বাড়ী থেকে রাস্তায় পড়ল।—আরে বাপ রে! দিনে দিনে বেটার বিষ দাঁত গজাচ্ছে। আরে বাপ রে!

শিল্পী যোগেশ পাল তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—না-না-না। ওখানে যেতে হবে না তোমায়। আর আমি বারণ ক'রে দোব, ওরা তোমাকে বাইরেও কিছু বলবে না।

ছেলেটা বিচিত্র। তাঁর কথা যেন সে শুনতে পায় নি। একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। কি ভাবছে, তাতেই মগ্ন হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল—না, ওখানে আমি যাব না। আপনার সঙ্গে কেষ্টনগর নিয়ে চলুন আমাকে।

—আচ্ছা। তাই হবে। যোগেশ পাল হেসে বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বললেন কথা দুটি।

—কে গো? কে বটেন? রামজয়বাবু নাকি? কবে এলেন। তবে যে বলে এবার পূজোয় বাবুমশায় আসবেন না। আমি তো ভেবে মরি। বলি, আমার কি হবে? যার ভাগ্যে যা জুটুক হেঁড়াখোঁড়া, আমার মলিন-চাঁদের জামা না হলে কি ক'রে চলবে? আমি অভাগিনী কোথায় কি পাব? ওর চোখের জল আমার সয় না মশাই। ও যে পঙ্কজিনীর পরান-পুতুল।

পঙ্কজিনীর কণ্ঠস্বর। মনোরঞ্জন থেকে সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে বাড়ীর সামনে এসে যোগেশ

পালকে পিছন দিক থেকে রামজয়বাবু ভ্রম করে সরস আনন্দে কথা কটি বলতে বলতে সে বাড়ী ঢুকল।

যোগেশ পাল বুঝতে পারেন নি প্রথমটা। ভেবেছিলেন নিতান্তই পথের কথার ধ্বনি, পথের কোন মানুষ পথের কোন প্রিয়জনকে বলছে। কিন্তু মলিনের এবং পঙ্কজিনীর নাম দুটি শুনে বুঝলেন কথার লক্ষ্য তিনি—যিনি এই বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন। চঞ্চল এবং বিব্রত হলেন তিনি। ওদিকে ঠাকুর পালিয়েছে। কি বিপদ! পঙ্কজিনীর বাক্‌ভঙ্গি তাঁর কাছে আনন্দজনক নয়, ভীতিপ্রদ অস্বস্তিকর।

সেই মুহূর্তেই পঙ্কজিনী এসে সামনে দাঁড়াল। সে দাঁড়ানোর ভঙ্গির একটি বিশেষ রূপ ছিল। একটু বেঁকে ঘাড়টি হেলিয়ে সে দাঁড়াল, মুখে একটু হাসি, চোখে প্রসন্ন সরস দৃষ্টি; আত্মীয়তার চেয়েও একটু গাঢ় অন্তরঙ্গতার একটি হিল্লোল সে যেন ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই অপরিচিত মানুষ দেখে, মাথার ঘোমটা টেনে সহজ এবং সোজা হয়ে দাঁড়াল। চোখের সে দৃষ্টি মুখের হাসি সবই চকিতে মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল সঙ্কুচিত কুণ্ঠার ভঙ্গি। তারপরই বললে, আমি চিনতে পারি নি বাবু। কিন্তু আপনি কে বটেন?

তেমনি সঙ্কুচিত অধীরতায় ঘাড় দুলিয়ে এক' পা এগিয়ে এসে মলিন বললে—উনি কারিগরমশায়। কেষ্টনগর থেকে লক্ষ্মীপ্রতিমা গড়তে এসেছেন।

মুহূর্তে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল পঙ্কজিনীর। কাঁকের পুঁটলিটি ছেলের হাতে দিয়ে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে বললে—আসুন, আসুন। আসুন। তা বসতেও দিস নি তোরা? কই, মোড়াটা কই। ও ফণি।

—না। বসব না আমি। গিয়েছিলাম তোমাদের গ্রাম-দেবতাকে প্রণাম করতে। পথে ঠাকুর বললে, এই মলিনের বাড়ী। মলিন পুতুল গড়ে। তাই দেখতে এসেছিলাম।

—পুতুল না ছাই বাবা, মাটির ঢেলা সব। মাটিতে কাদাতে আর হাতে দিন রাত বসে আছে। কাজ না কম্ম না, ওই বাতিক। বলতে কিছু পারি না, আমার কোলের ছেলে। ওকে গর্ভে নিয়েই বিধবা হয়েছিলাম।

আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু পাল বাধা দিয়ে বললেন—না-না। ছেলের হাত তোমার ভাল। শেখালে আরও ভাল হবে। ও থেকেই ও করে খেতে পারবে।

—তা যে শিখবে না বাবু। কোন কারিগরের কাছে যাবে না। কারিগর কেন প্রভু, কোন মানুষের সঙ্গেই ওর কারবার নাই। বায়ে বায়ে ফিরবে, এখান সেখান; লোক দেখলে পালাবে। বড় মুখচোরা। তার ওপর দুখিনীর সন্তান, দশ জনে শতেক কথা বলে। তা আমি বলি বলুক। বলতে দে। আমাকে বলে না। সারাজীবন বলছে, খানিক সত্যি খানিক মিথ্যে, তা বলুক।

যোগেশ পালের বিস্ময়েরও সীমা ছিল না, বিব্রতবোধের অস্বস্তিরও অন্ত ছিল না।

বুঝতে পারছিলেন না এ মেয়ে কি মেয়ে। ঠাকুর বলেছিল—খানিকটা বোকা। তাই কি? অথবা—?

মলিন এবার মায়ের কথায় বাধা দিয়ে বললে—আমি কারিগরমশায়ের সঙ্গে যাব।

চমকে উঠল পঙ্কজিনী—কার সঙ্গে?

—কারিগরমশায়ের সঙ্গে কেষ্টনগর। উনি বলেছেন।

—উনি বলেছেন? কলের পুতুলের মতই কথা কটি উচ্চারণ করলে পঙ্কজিনী।

যোগেশ পাল বললেন—তোমার ছেলের যা আগ্রহ দেখছি তাতে ওর হবে। বেচারী দুপুরবেলা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। চাপরাসীরা ধ'রে অপমান করেছিল, তাতেও ওর মন মানে নি, অর্জুন গাছে চড়ে দেখছে। লোকে ঢেলা মেরেছে—

—কারা? কারা? কোন অলপ্পেয়েরা? কই আমাকে তো বলিস নাই মলিন?

এক মুহূর্তে পঙ্কজিনী যেন সাপিনীর রূপ ধ'রে সামনে দাঁড়িয়েছে। সাপিনী নয়, বাঘিনী; সাপিনীর সন্তান-স্নেহ নেই, বাঘিনীর মত হিংস্র হয়ে উঠেছে পঙ্কজিনী।

পাল বললেন—থাক সে সব কথা। ওকে আমি নিয়ে যাব। মানুষ ক'রে দেব।

—না। চীৎকার ক'রে উঠল পঙ্কজিনী।—না-না, ওসব বুদ্ধি দেবেন না আপনি। না। দুখিনীর ধন আমার—, না। এগিয়ে এল সে পালের দিকে।

পাল পিছিয়ে গেলেন দু'পা। বললেন—বেশ। বেশ। নিয়ে যাব না আমি। আচ্ছা। বলেই চলে এলেন তিনি। আর দাঁড়াতে চাইলেন না। আসতে আসতেই পিছনে শুনলেন কঠিন কিন্তু মৃদু কণ্ঠের কথা—না। আমি যাব।

তারপরই শুনলেন—ছাড়। ছাড়। ছাড়।

বারেকের জন্য পিছন ফিরে দেখলেন—মলিনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে পঙ্কজিনী।

তিন

পঙ্কজিনীর অনেক দুঃখের ধন। অনেক লাঞ্ছনা তার ওই মলিনের জন্য। ওকে ছাড়তে সে পারবে না।

মলিনকেই বলছিল পঙ্কজিনী।

—যম চাইতে এলে তোমাকে আমি দোব না। আমি পেটে ধরেছি, অনেক কলঙ্ক সয়েছি; আমি থাকতে তোমার উপর যমের অধিকার নাই। জোর ক'রে নিয়ে গেলে পিছু পিছু যাব আমি। খবরদার, ও মতলব তুমি করো না। আমি বারণ ক'রে দিলাম। আমি তা হ'লে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

—কেন মিছে বকছিস মা। ও-ও গিয়েছে, তুইও মরেছিস। ক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, তাই মাঝখানে কথা না বলে সে আর থাকতে পারলে না।

মলিন চুপ করে বসে আছে। ঘরের চালের দিকে চেয়ে রয়েছে; আশ্চর্য ছেলে, মানুষের মুখের দিকে চায় না।

পঙ্কজিনী সে-কালে-নতুন-আমদানী একটা নকল ডিট্‌জ্‌ মার্কা লণ্ঠনের আলো জেলে বসল পান সাজতে। একরাশি পান সাজবে, সে সারাদিনে অনেক পান খায়। পানগুলি সে মনোর ওখান থেকে এনেছে। একটা পান গুটিয়ে খিলি মুড়ে মুখে গুঁজে চিবুতে চিবুতে বললে—কথা বলিস না যে?

ফণের কথা সে গ্রাহ্যই করে না। ওটা আবার মানুষ! প্রশ্ন তার মলিনকে।

মলিন বললে—কি বলব?

—বলবি, যাবি না।

উত্তর দিলে না মলিন।

পঙ্কজিনী বললে—আগে আমি মরি, তারপর যেখানে খুশি যাস।

মলিন একবার ফিরে তাকাল মায়ের দিকে। তার ভুরু দুটি আশ্চর্য ভঙ্গিতে কুঁচকে উঠেছে এবং মোটা ভুরু দুটির নিচে ছোট চোখ দুটির দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছে।

—এমন ক'রে তাকাচ্ছিস যে? ইচ্ছে হচ্ছে, এখুনি মেরে ফেলে দি আপদকে?

দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেকে সে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। বিচিত্র সে টেনে নেওয়ার ভঙ্গি এবং তেমনি আবেগ সে আকর্ষণে। তারপর হেসে বললে—তা হলেও রেহাই পাবে ভাবছ? ভূত হয়ে ঘুরব পিছু পিছু। হ্যাঁ। তার কণ্ঠস্বরে একবিন্দু পরিহাস ছিল না; দৃঢ়প্রত্যয়ে রণরণ করছিল। ভূত হতে পারাটা পঙ্কজিনীর কাছে আদৌ কোন সমস্যার কথা নয়। আত্মহত্যা করলেই ভূত হ'তে পারবে সে।

—ছাড়। ভূতকে আমি ভয় করি না।

—তা জানি। তোর মত নচ্ছার বদমাশ আমি আর দেখি নাই।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাব না। আমাকে ছেড়ে দাও।

—ঠিক তো? আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর।

—করছি। যাব না, যাব না, যাব না।

মুহূর্তে আহ্লাদে গদগদ হয়ে গেল পঙ্কজিনী। ছেলের মুখে বার বার চুমু খেতে লাগল—সোনা রে, মণি রে সাতরাজার ধন মানিক রে! হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আসবার সময় মনোরমা মিষ্টি দিয়েছে গোটা চারেক। বলেছে, ফণে একটা, তুই একটা, মলিনের দুটো। কিন্তু পথে আসবার সময় সে নিজেই দুটো খেয়ে ফেলেছে, দুটো এনেছে—একটা ফণে একটা মলিন খাবে। কথাটা এই গণ্ডগোলে তার মনে ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মলিনকে ছেড়ে উঠে গামছার খুঁট খুলে শালপাতার ঠোঙায় মোড়া মিষ্টি দুটি বের করে মলিনের হাতে দিয়ে বললে,—নে খা।

—কি?

—মিষ্টি। মনো দিয়েছে। ফণেকে আধখানা দে।

—আমি আধখানা? ফণে আপত্তি জানালে।

—বুড়ো মদ্দ, তাইকে হিংসে দেখ। নে, যা দিচ্ছে তাই খা।

মলিন আধখানার চেয়েও কম অংশ দিলে ফণেকে এবং চোখ বুজে নির্বিকার হয়ে নিজে চিবুতে লাগল।

পঙ্কিজিনী বললে—মনো তোকে যেতে বলেছে। পুজোর জামা কিনে দেবে। গায়ে দিইয়ে একেবারে ফিটফাট দেখে কিনবে। বলে, তা নইলে যে ঢুলিদাদের মত লাগবে। আর পদ্ম আঁকতে হবে দোরের পাশে। এবার আবার ওদের বাড়ীতে চুনকাম হয়ে গেল। সব ধব ধব করছে। পদ্ম, ফুল, লতা নইলে শোভা হবে কেন? অনেক মেয়ে তোকে দিয়ে আঁকাবে বলেছে। মনো বলেছে পয়সা লাগবে। রাজী হয়েছে সব। কালই যাস।

—তাই যাব।

পরের দিন তাই গেল সে। দেবীগ্রাম থেকে মনোর ছোট শহরটি ক্রোশ তিনেক দূর। রেলে ভাড়া তিন আনা। মলিন কিন্তু হেঁটেই যায় অভ্যাসমত মন্থরগতিতে আপন মনে দুলতে দুলতে চলে। চলতে চলতে বসে, কোন গাছের তলায় বা কোন সাঁকোর মাথায়। গাছের বাকলে ছুরি দিয়ে কেটে ছবি আঁকে। সাঁকোর মাথায় পলেস্তারার ফাটলগুলি খোলামকুচির দাগ টেনে জুড়ে জুড়ে অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার রেখাঙ্কনে পরিণত করে। আবার চলে। একবেলার পথ চলতে গোটা দিনটাই তার কেটে যায়। কিন্তু তাতে তার ক্লান্তিও নাই বিরক্তিও নাই কখনও। সন্ধ্যায় মনোর বাড়ী পৌঁছে দেখে মনো তখন সাজগোছ করছে। চুপ করে মলিন বাইরের বারান্দায় এক পাশে বসে পড়ে। হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ ডাকে—আছ নাকি? মনো সুন্দরী!

হাসি পায় মলিনের। মনো—আবার সুন্দরী।

কেউ ডাকে—মন্নুয়া!

এই সব বিচিত্র সম্বোধন এবং কণ্ঠস্বরের গদগদ ভাব শুনে কখনও হাসি পায় মলিনের, কখনও বা রাগ হয়। হঠাৎ এক এক সময় ইচ্ছে হয় নখ দাঁত বের ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই লোকটার উপর।

সেদিন মনোর বাড়ীতে যেতেই মনো বললে—এসেছিস!

ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে মলিন বললে—মা যে বললে, পদ্ম আঁকতে হবে!

—হ্যাঁ। আরও মেয়েরা আঁকাবে। এবার যদি পয়সা না নিয়ে আঁকবি তো দেখাব তোকে। চার পয়সা একটি ফুল। লতাপাতা দিতে হলে দু আনা।

—সে তুমি বলো।

—বলব। কিন্তু ওরা ডাকবে মিষ্টিমুখ ক'রে—দাও না ভাই মলিন, আমার দোরে এঁকে—আর তুই গলে যাবি—তা হবে না।

মলিন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। তারপর বললে—খেতে দাও দুটো। ভাত আছে ওবেলার?

—সকালে বেরিয়েছিস বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কি করিস তুই রাস্তায় ? গাছতলায় শুয়ে ঘুমোস, না ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁটিস ? মনোর অবাক লাগে মলিনের এই ধরনটায়। বিরক্ত হয়। কণ্ঠস্বরে সে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

মলিনের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশ্বসংসারে কারও কোন বিরক্তিতে বা নিন্দায় ওর কিছু যায় আসে না। ও সবগুলি সহ্য করবার উপযোগী একটা কঠিন আবরণ তৈরী করে নিয়েছে সে এই অল্প কটা বছরের মধ্যে। নিরাসক্তভাবেই সে বললে—এই দেখতে দেখতে আসি। ভাল লাগলে বসি। বসে বসে দেখি, আবার হাঁটি।

মনো অবশ্য তার উত্তর শুনবার জন্য অপেক্ষাই করেনি, সন্ধ্যার মুখে এই সময়টার প্রতিটি মুহূর্ত তার মূল্যবান। মন তার এ সময়ে অহরহ বাহির দরজায় কারুর ডাক অথবা পদশব্দের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। সে ঘরে ঢুকছিল মলিনের জন্য ভাত বাড়তে, ভাত বেড়ে থালাটা ওর সামনে নামিয়ে দিলে—নে খা। মাগুর-মাছ রান্না করেছি খুব ঝাল দিয়ে। দেখ খেয়ে।

খেতে খেতে মলিন বললে—কমলে-কামিনী পূজো দেখতে যাবে না ?

—কমলে-কামিনী না লক্ষ্মী ?

—ওই একই। যে কমলে-কামিনী সেই লক্ষ্মী। আমি শুনেছি।

—মা গো। এত জানিস তুই ? মনো সত্যই কথা কটি অহংকার ক'রে বললে। মলিনের সম্পর্কে এই অহংকার তার অকপট। কিন্তু মনোর অহংকারে মলিনের আনন্দ হয় না। সে ওসব কথা বাদ দিয়ে সোজা কথা এবং মোটা কথা শুরু করলে।

—খুব ধুম হবে শুনেছি। কলকাতা থেকে যাত্রা আসবে, খুব ভাল পিত্তিমে হয়েছে; এমন কখনও দেখ নাই।

—খুব ভাল ? দেখেছিস ?

—হুঁ। কারিগরমশায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাদের বাড়ী এসেছিল আমার পুতুল দেখতে।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। বললে—ভাল হাত। আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে সঙ্গে। বললে—শেখাব।

—যাবি তুই।

—যাব। তাতেই এসেছি তোমার কাছে। গোটা পাঁচেক টাকা তুমি দাও। বিদেশ যাব।

—মায়ের কাছে নে। মায়ের টাকা আছে।

—দেবে না। সোজা বলেছে তোমার যাওয়া হবে না।

—তবে ?

—আমি পালাব।

—পালাবি ?

—হুঁ। কি হবে বাড়ীতে থেকে ? কি সুন্দর যে গড়ে কারিগর। শেখাবে বলেছে।

যাব না? যেতে না দিলে পালিয়ে যাব।

—বেশ। এখানে পদ্ম এঁকে কত পাস দেখ। তার বাদে পাঁচ টাকা পুষিয়ে দেব আমি। এই সময়টিতেই বাইরে থেকে সেই ডাক এল, মনো আছে? মনোরমা?

—যাই।

মুহূর্তে মনোরমা উঠে চলে গেল। এইটুকুতেই যেন অনেক দূরে চলে গেল। এত দূর চলে গেল যে ডাকলেও আর শুনতে পাবে না। তা যাক, কিন্তু জল দিয়ে গেল না। জল আবার ঘরের ভেতর। ভাতের গ্রাস বুকে আটকাচ্ছে। হাত গুটিয়ে উঠে পড়ল মলিন। থালাখানা নিয়ে খানিকটা দূরের পুকুরে গিয়ে নামল। সেখানেই আঁজলা ভ'রে জল খেয়ে থালাখানা ধুয়ে এনে বারান্দার একপাশে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ল। কোন স্বপ্ন পর্যন্ত দেখলে না।

দিদি মনোরমার ঘরে এবং তার প্রতিবেশীদের ঘরে পদ্ম এঁকে নতুন জামা এবং পাঁচ টাকার একখানা নোট কাছায় বেঁধে মলিন বাড়ী ফিরল তিনদিন পর। এসে, ঘরে পা দিয়েই শুনলে, কাল সকালের ট্রেনেই কারিগর চলে যাবেন। ফণে বললে সে শুনে এসেছে।

মলিন ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। সে কি? তিনি যে বলেছিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ফণের দিকে চেয়ে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—কারিগরমশাই···আর আসে নাই?

—না।

—কোন খবর পাঠায় নাই?

—না।

চুপ ক'রে রইল মলিন। দুলতে লাগল ঘন ঘন।

ফণে বললে—নিয়ে যাবে না তোকে, আর কি।

—ঠাকুর এসেছিল? মা বলেছে বুঝি? নিয়ে যেতে বারণ করেছে?

—না। কাল থেকে মা দখিন-পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে পূজোর কাজে লেগেছে। মুড়ি ভাজছে। পাট-কাম করছে। সেইখানেই সে দিন-রাত। সে বলবে কখন?

আর কোন কথা বললে না মলিন। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা গড়িয়ে হাতে খানিকটা কেরোসিন ঢেলে নিয়ে সর্বাঙ্গে মাখতে মাখতে বেরিয়ে চলে গেল। অকারণে অনেক রাত্রি পর্যন্ত অমৃত-বাবুর ঠাকুর-বাড়ীর চারিপাশে ঘুরল, একবার অর্জুন গাছটায় উঠল, দেখলে প্রতিমা সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। অপরূপ প্রতিমা। চালচিত্রের মাথায় মালা নিয়ে তিনটি—দুপাশে দুটি, মাঝখান একটি—মালাধারিণী পরী। আহা-হা! অবাক বিস্ময়ে সে গাছের ডালে বসে রইল। পোকামাকড়ের কামড় সহ্য করেই বসে রইল। বর্ষায় অসংখ্য পোকামাকড় জন্মেছে। শীত পর্যন্ত থাকবে। গাছে তাদের বাসা। কেউ বা কিছু গাছে উঠলেই ওরা দলবেঁধে এসে ছেঁকে ধরে। ধরুক। মলিন ওসব সইতে পারে। ওই জন্যেই সে কেরোসিন মেখে এসেছে। ইচ্ছে হচ্ছে সমস্ত রাত বসে থাকে। ওই যে কারিগরমশায়।

কারিগর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একখানা চাদর এনে ঢাকা দিয়ে দিলেন প্রতিমার উপর। তখন নেমে এল মলিন। বাড়ী ফিরে নীরবেই শুয়ে পড়ল।

ক্ষণে বললে—দেখা হল ?

উত্তর দিলে না মলিন।

—খাবি না ?

—খাব। দে।

—ওঃ। দে। বাবু মশায় আমার। ওই বেড়ে রেখেছি, নিয়ে খা।

নিঃশব্দেই উঠে খেয়ে শুয়ে পড়ল মলিন। উঠল ভোরবেলা। গিয়ে হাজির হল স্টেশনে।

কারিগর এলেন, অনেক পরে। আসতেই মলিন গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়াল। নীরবে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল। কারিগর তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—এসেছ ?

মৃদুস্বরে মলিন বললে—হ্যাঁ।

—শেখ। ভাল ক'রে শেখ। এখানে তো কারিগর আছে সব। তাদেরই কারুর কাছে এখন শেখ।

—আপনি বলেছিলেন, নিয়ে যাবেন। আমি যাব।

যোগেশ পাল তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর দৃষ্টি তুলে চুপ ক'রে রইলেন। ভাবছিলেন তিনি। অনেক কথা লোকে তাঁকে এই ছেলেটি সম্বন্ধে বলেছে। তিনি ভাবছেন। তাঁর শিষ্যেরাও শুনেছে। এর পর—।

—আমার ভাড়া আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সকরুণ একটু হেসে যোগেশ পাল বললেন—তার জন্যে নয়। অন্য কথা। এখন তো বাড়ী যাচ্ছি না আমি। আরও কয়েক জায়গাতেই যাব আমি। প্রতিমা আছে। সামনে পূজো। পূজো শেষ হোক। লক্ষ্মী পূজোর সময় তো আমি আসব আবার। সেই সময়। সেই সময় তোমায় নিয়ে যাব।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মলিন। নড়ল না। বুকের ভিতর একটা প্রচণ্ড বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছে, তাকে অধীর ক'রে তুলেছে; নিতান্ত শিশুর মত চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে, না—যাব, না—না—আমি যাব। আমি যাব।

কিন্তু যাওয়া হ'ল না। ট্রেনে চেপে চলে গেলেন কারিগর। মলিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তেমনি দুলতে দুলতে ফিরে এল।

তারপর পূজো চলে গেল। অমৃতবাবুর বাড়ীতে মহাসমারোহে লক্ষ্মী পূজা হয়ে গেল। লক্ষ্মী পূজার বিসর্জনের দিন প্রতিমার ঠিক পাশে পাশেই ছিল সে। লক্ষ্য ছিল, সেই চালচিত্রের মাথায় মধ্যবর্তিনী অপরূপ ছোট্ট পরীটির দিকে। প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপও সে দিয়েছিল। বাবুদের চাপরাসীরা দেখেছে। চাপরাসীরা লাঠি চালিয়েছিল। জলের উপর কি মাথার উপর তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু মলিন আর বাড়ী ফেরে নি। তাকে কেউ দেখেও নি। মৃতদেহও ভেসে ওঠে নি। তা না উঠুক। পদ্মজিনী বুঝেছে—সে ওই লড়িয়া

—এখানকার কালীদহ, ওই রাক্ষসী দীঘির তলায় সে মুখ গুঁজে পুঁতে গিয়েছে। কমলে-কামিনীর হাতী শুঁড়ে ধ'রে তাকে পুঁতে দিয়েছে। অথবা সেই তুর্কী আমলের ঝাঁপ খেয়ে ডুবে-মরা রাজকন্যে-রাজরাণীর প্রেতাত্মারা তাকে ধরে রেখেছে।

মনো বললে—কাঁদিস্ নে বাপু। মলিন সাঁতার জানে, জলে ডোবে নি। সে সেই কারিগরের বাড়ী গিয়েছে।

কান্না মনোর ভাল লাগে না; এ সময় তার ঘরে আসবে আনন্দ-সন্ধানীরা। কান্না শুনলে আসবে কেন? পঙ্কজিনীও চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পর সে উঠল। বেরিয়ে এসে দেবীগ্রামের পথ ধরলে। ক্রোশতিনেক পথ অন্ধকারের মধ্যে মৃদুস্বরে একটানা বিলাপ করতে করতে ফিরে এল।—মলিন রে! মলিন! বাপ রে! সোনা রে!

পরদিন সকালে এসে দাঁড়াল কালীদহের বাঁধা-ঘাটে। বর্ষার জলে কালীদহ থৈ থৈ করছে। নতুন কাটানো দীঘি, গোটা দীঘিটার কোথাও কোন জলজ উদ্ভিদ জন্মায় নি এখনও। জল এখনও কালো হয় নি; মাটির রঙের সংমিশ্রণে ঘোলাটে হয়ে আছে। মাটি নিকানো বিস্তীর্ণ-অঙ্গনের মত দেখাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন—এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত কিছু ভাসছে না। দু'চার গাছি খড়কুটো ভাসতেও দেখা যাচ্ছে না জলের মধ্যে। কই? সে কই?

—পঙ্কজিনী? অনন্তঠাকুর ফুল তুলে ফিরছিল; পঙ্কজিনীকে দেখে সে দাঁড়াল।

—ঠাকুরমশায়? মলিন আমার জলের তলায় হারিয়ে গেল গো!

—না। ডুবলে ম'রে ভেসে উঠত পঙ্কজিনী। সে সেই কারিগরমশায়ের ওখানে গিয়েছে। আমি ওবেলা তোর বাড়ী যাব। পোস্টকার্ড কিনে রাখিস একখানা, জোড়া পোস্টকার্ড। চিঠি লিখে দেব তাঁকে। তিন চার দিনেই দেখবি নিশ্চয় খবর পাবি—'কোন ভাবনা করিবা না। মলিন এখানেই আসিয়াছে। ভালই আছে।'

তিন চার দিনেই খবর এল। যোগেশ পাল মশাই লিখছেন—'ঠাকুরমহাশয়, পত্র পাইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। মলিন তো এখানে আসে নাই। এখানে পৌঁছছিলে অবশ্যই আমার বাড়ী পৌঁছছিত। নাম করিলে যে কোন লোক দেখাইয়া দিত। তথাপি পুলিশ আপিসেও খোঁজ করিলাম, তাহারা হারানো লোক জমা রাখে, বিনা টিকিটের যাত্রী হইলে ধরিয়া রাখে। সেখানেও কোন খোঁজ পাইলাম না। অন্যত্র খোঁজ করিবেন। সে নিশ্চয়ই এখানে আসে নাই।

—তা-হলে? মলিন হারিয়ে গেল।

চলে গেল। হতভাগা চলে গেল। হারিয়ে গেল। পঙ্কজিনী হাত বাড়িয়ে বসে রইল মাটির পুতুলের মত।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

'হারানো বা হারিয়ে যাওয়া হল পৃথিবীর একটা নিয়ম। সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাওয়া, নতুন আসা চলে সমানে। হারানো বা হারিয়ে-যাওয়া মানুষ কদাচিৎ ফিরে আসে। মরলে জীয়োয় আর হারালে ফিরে পায় সংসারে কে? যার মহাপুণ্য মহাভাগ্য, সে। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র মহারাণী শৈব্যা মৃত রোহিতাশ্বকে ফিরে পেয়েছিলেন মহাদানের পুণ্যে। সতী সাবিত্রী সত্যবানকে ফিরে পেয়েছিলেন মহাব্রতের তপশ্চরণের পুণ্যে। সে কি ওই পঙ্কজিনীর ওই কর্মে, ওই ভাগ্যে হয়?'

যোগেশ পাল পত্র লিখিবার সময় এই ভেবেছিলেন এবং চোখের জলও ফেলেছিলেন। সেই ফোঁটার চিহ্নটি পোস্টকার্ডখানির মধ্যে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও ভেবেছিলেন···'আর নিজে যারা হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসে তারা হয় মহাপুণ্যাত্মা নয় অতি হতভাগ্য। গৌতম আসেন বুদ্ধ হয়ে, ধ্রুব ফিরে আসেন ধ্রুবলোকের অধীশ্বর হয়ে, আর কৃষ্ণনগরের সংসারত্যাগী নিরুদ্দেশ রামেশ্বর দশ বছর পর শবসাধনার আসন ছেড়ে ভ্রষ্ট হয়ে জটে পাগলা হয়ে ফিরে আসে।'

সে আজ চার বছর আগের কথা। চার বছরে নিঃশেষে হারিয়ে গিয়েছে বোষ্টমদের সেই আশ্চর্য শান্ত, আশ্চর্য দুর্দান্ত ছেলেটি। এবারও দেবীগ্রামে মহালক্ষ্মী গড়তে গিয়েছিলেন যোগেশ পাল। একদিনের জন্য গিয়েছিলেন। রঙের সময়। আজকাল তার ছেলেই কাজ করে, তিনি বাড়ীতে বসে মুখ গড়ে দেন; আর রঙের সময় একদিনের জন্য গিয়ে ওই মুখখানিই রঙ ক'রে দিয়ে আসেন। বিশেষ ক'রে চোখ তিনটি আঁকবার জন্য যান। প্রতিবারই মলিন পঙ্কজিনীর কথা ওঠে। অনন্তঠাকুরই তোলে। এবার ঠাকুর কথাটা তুললে না; পালই তুললেন—কই এবার তো সেই ছেলেটার কথা বললেন না। মলিন? ফিরেছে না কি? অনন্ত হেসে বললে—ওদের সব ধুয়ে মুছে গিয়েছে। কি বলব?

—ধুয়ে মুছে গিয়েছে? মলিন—

—না সে সেই গিয়েছে আর ফেরেনি। যখন ফেরেনি তখন সেও গেছে। এখানে ওর মা মরেছে, দিদি সেই বেশ্যা হয়েছিল, সেও মরেছে।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ। খালাস পেয়েছে। ছেলের শোকটা বড্ড লেগেছিল হতভাগীর। কেঁদে কেঁদে বেড়াত, সে তো দেখেছেন।

—হ্যাঁ। গতবারও তো এসেছিল, 'বাবা, সে যায় নাই আপনার ওখানে?'

এবারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনন্ত বললে—তার ওপর মেয়েটা খুন হয়ে গেল। আর সইতে পারলে না।

—খুন?

—হ্যাঁ। রাত্রে কারা ঘরে এসেছিল, মদটদ খাইয়ে বেহুঁশ করে গলা টিপে মেরে যা ছিল নিয়ে পালিয়ে যায়। ও কর্মের যা ফল···তাই আর কি ?

—নারায়ণ, নারায়ণ। নারায়ণ স্মরণ ক'রেছিলেন যোগেশ পাল।

—সে ছেলেটাও, বুঝলেন না, হয় রেলে কাটা প'ড়ে, নয় নদী-নালায় ডুবে, নয় সাপে-খোপে খেয়ে অকালেই মরেছে।

অবিশ্বাস করেন নি যোগেশ পাল। কি আছে অবিশ্বাসের ?

—থাকতে থাকল ওই কণেটা। খেটেখুটে খায়, নিরীহ লোক।

অনন্তঠাকুর বকবক করে পঙ্কজিনীদের পুরানো কথা পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছিল। যোগেশ পাল বাধা দিয়েছিলেন। তাঁর সহ্য হয় নি।

—ও সব কথা থাক ঠাকুরমশাই, অন্য কথা বলুন। তারপর, এবারকার পুজোর ব্যবস্থা কি রকম বলুন। চার বছরের সংকল্প তো এবারেই শেষ ? না-কি, বরাবরই হবে ?

—শুনছি, ধাতু-মূর্তি হবে। নিত্য-পূজা। এখনও ঠিক নাই। তবে অবিশ্যি কত্তা যদি রোগশয্যে থেকে ওঠেন তবেই। না-হলে যা চলছে তাই চলবে।

—কত্তা ভাল হয়ে উঠুন। মায়ের নিত্যপূজাই কায়েম হোক, আপনাদের মাইনে বাড়ুক। চলুন—এবারেই মায়ের মুখ আমি শেষবারের মত রঙ ক'রে দিই।

* * *

দেবীগ্রাম থেকেই ফিরছিলেন যোগেশ পাল। ছোট লাইনে কাটোয়া পর্যন্ত এসে ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনে গাড়ী ধ'রে নবদ্বীপে নামবেন, ওখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে ট্রেন ধরে যাবেন বাড়ী—কৃষ্ণনগর। নবদ্বীপে মহাপ্রভুকে দর্শন বন্দন সেরে যাবেন। বহুকাল আসেন নি নবদ্বীপে। ভুবন পালমশায়ের সঙ্গেও দেখা ক'রে যাবেন। বৃদ্ধ এককালের বড় কারিগর-সমাজের প্রবীণ ব্যক্তি। এখনও চলছে ভাল।

ভুবন পালের বাড়ীর সামনে নেমেই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ও কে ? অতি পরিচিত—যেন অতি পরিচিত !

প্রতিমা বা মূর্তি দেখে সচরাচর কেউ তার খড়ের কাঠামোর কি একমেটে দুমেটে অবস্থার রূপ কল্পনা করতে পারে না, কিন্তু কারিগর পারে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঙে ঢাকা খুঁতগুলি চোখে পড়ে। একে দেখেও তাই মনে হচ্ছে।

একটি আঠারো উনিশ বছরের সুঠাম সুরূপ তরুণ। কাঁচা সোনার মত রঙ, মার্জনায় উজ্জ্বল, বাঁশীর মত নাক, চোখ দুটি ছোট—কিন্তু উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ, মাথায় বড় বড় চুল ; পরণে পরিচ্ছন্ন পোশাক। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র অস্থির চাঞ্চল্যে সে শুধু দুলছে। দুই গালে নিষ্ঠুর চড়ের দাগ রক্তমুখী হয়ে ফুটে রয়েছে, মাথার চুলগুলি সজোর আকর্ষণে বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে নাক চোখ মুখের উপর এসে পড়েছে। তার আশেপাশে কয়েকজন লোক, বিশেষ ক'রে ভুবন পালের ছেলে রাগে প্রায় আত্মহারা হয়ে তাকে শাসন করছে।

—বল বলছি, বল ? কেন করলি ?

ঈষৎ একটু বেঁকে, যুদ্ধোদ্যত হয়ে, সে মাথা হেঁট করে যেমন নির্বাক দাঁড়িয়ে দুলছিল তেমনিই দুলতে লাগল। কোন উত্তর দিলে না।

এই অবস্থায় যোগেশ পালকে দেখে—ভুবন পালের ছেলে একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল। এই রাগের মধ্যে মাননীয় অতিথি-কুটুম্বকে সম্বর্ধনা করতে হবে। যোগেশ পালের প্রতি সম্ভ্রম সমাজে অকৃত্রিম। নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা ক'রে ভুবন পালের ছেলে জোর ক'রে হাসতে চাইলে, বললে—আপনি! আসুন আসুন! পরক্ষণেই লোকজনের দিকে ফিরে বললে—নিয়ে যা ওটাকে, বেঁধে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দে।

নাকে-চোখে-মুখে-পড়া লম্বা চুলগুলি মাথা ঝাঁকি দিয়ে পিছনে ফেলতে গিয়ে ছেলেটির দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, যোগেশ পালের দিকে তাকিয়ে সে যেন পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তে আত্মসম্বরণ ক'রে সে বললে—চল, কোথা যেতে হবে চল।

যোগেশ পাল বললেন—দাঁড়াও দাঁড়াও। দাঁড়াও তো! এবং দ্রুত তার সামনে এসে বললেন—মলিন!

—কে? কি বলছেন আপনি? কে মলিন! ফিরে দাঁড়াল ছেলেটি! চোখে মুখে অপমান ও ক্ষোভের সঙ্গে বিচিত্র বিস্ময় ফুটে উঠল। সে বিস্ময় রূঢ় এবং উদ্ধত।

—তুমি মলিন নও? মলিন দাস?

—মলিন দাস? কে মলিন দাস?

—দেবীগ্রামের পঙ্কজিনী দাসীর ছেলে।

—দেবীগ্রাম? পঙ্কজিনী দাসী? না। আমি জানি না কোথায় দেবীগ্রাম। কে পঙ্কজিনী দাসী আমি চিনি না।

—পঙ্কজিনী, তোমার মা মরেছে। তোমার দিদি খুন হয়েছে। মলিন যদি হও তুমি তবে শুনে নাও। না হও যদি তবে শুনো না।

মা মরেছে! দিদি খুন হয়েছে! উদ্ধত উগ্র মলিন আকস্মিক আঘাতে পাথর হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর তার যেন চেতনা ফিরল, মৃদু, অতি মৃদুস্বরে শোনা কথা ক'টি পুনরাবৃত্তি করলে—মা মরেছে? দিদি খুন হয়েছে? মর্মান্তিক বেদনায় অভিভূত হয়ে প্রকারান্তরে এবার সে স্বীকার করলে যে, সে মলিনই বটে।

সংবাদটা এমন নিষ্ঠুর এবং মর্মান্তিক যে সব লোক ক'টি এক মুহূর্তে অভিভূত হয়ে পড়ল। না হয়ে পারে না। ভুবন পালের ছেলেও মিনিটখানেক স্তম্ভিতের মত চুপ ক'রে থেকে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, বললে,—দে, ওকে ছেড়ে দে। যাঃ তুই চলে যা। যা শুনলাম তারপর আর তোকে মারধোর করতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু নবদ্বীপে যদি আর তোকে দেখতে পাই তবে তোর মাথা মুড়িয়ে কপালে উল্কি দিয়ে লিখে দোব তোর কীর্তি! শয়তান কোথাকার! নাম পর্যন্ত ভাঁড়িয়েছিস! যা বেরো! বেরো! বেরো!

—আমার স্যুটকেসটা—

—দাও হে, এনে দাও।

যোগেশ পাল নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন অপেক্ষা করে। যাক, ও চলে যাক—তারপর জিজ্ঞাসা করবেন। এখন প্রশ্ন করলে হয়তো আবার রাগটা বেড়ে উঠবে, জ্বলে উঠবে ফুঁ দিয়ে জ্বালানো অগ্নিকুণ্ডের মত।

স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে মলিন চলে গেল। যোগেশ পালের মনে পড়ল—ওর আর একদিনের চলে যাওয়ার কথা। দেবীগ্রামে একদিন অর্জুন গাছ থেকে নেমে ঠিক এই ভঙ্গিতেই মাথাটি দোলাতে দোলাতে চলে গিয়েছিল কচু বনের ভিতর দিয়ে। আজকের চলার ভঙ্গিটিও ঠিক তেমনি। সেই মলিন। ছেলেটা কাঁদে না। এত নিষ্ঠুরভাবে মার খেয়েছে তবুও কাঁদল না। একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওই পথে এগিয়ে গিয়ে পাবে গঙ্গার ঘাট। গঙ্গার তীরভূমির আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ চলবে ছেলেটা।

এতক্ষণে যোগেশ পাল প্রশ্ন করলেন—কি করেছিল?

—এত লোকের সামনে সে বলার নয়। বলতে পারবো না। আসুন, ভিতরে আসুন। কিন্তু ওকে আপনি চিনলেন কি ক'রে? কি নাম বললেন? মলিন? এখানে নাম বলেছিল—অতুল ঘোষ; বাপ-মা-মরা কায়স্থের ছেলে।

—না। ওর নাম মলিন দাস। জাতে—। জাত ওর নেই, তবে বোষ্টম বলেই চলত। বর্ধমান জেলায় দেবীগ্রাম বলে একখানা বড় গ্রাম আছে। সেখানে অমৃতবাবু মস্ত ধনী লোক। তাঁর বাড়ীতে কোজাগরীতে কমলে-কামিনী মূর্তির পুজো হয়। আমিই গড়ি। আজও সেখান থেকেই আসছি। ওর মা বোনের খবরটা এবারই শুনে এলাম। চার বছর ছেলেটা বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ।

ভুবন পালের ছেলে বলল—আমাদের এখানে, হাঁ—তাই হবে, চার বছরই হবে, এসেছে। চার বছর আগে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে ভারী শান্ত ফুটফুটে তের চৌদ্দ বছরের ছেলেটা পথ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের মিস্ত্রিখানার দোরে দাঁড়িয়ে গেল। তখন কালীপ্রতিমার মরসুম। জগদ্ধাত্রী আর কার্তিক প্রতিমায় মাটি পড়ছে। গোষ্ঠাষ্টমীর গরু তৈরী হচ্ছে, রাখাল বালক হচ্ছে, ওদিকে রাসের সখী। সবাই আপন কাজে ব্যস্ত। ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে রইল তো রইল সারাদিন। বিকেলবেলা বুড়ো মিস্ত্রী রতনের চোখে পড়ল সেটা। সে ওকে জিজ্ঞাসা করলে—কে রে তুই? সারাদিন দাঁড়িয়ে আছিস? তখন ওই পরিচয় দিয়ে বলে—আমাকে চাকর রাখবে মিস্ত্রী? আমি জল তুলব, মাটি মাখব। আমি একটু একটু এ সব কাজও জানি। মিষ্টি চেহারার ছেলেটার মুখচোরার মত কথা শুনে মিস্ত্রীর দয়াও হল; আর মরসুমের সময়, লোকও দরকার। মিস্ত্রী আমাদের বলল—অনাথ ছেলে—ভাল ঘরের ছেলে—ভাল ছেলে বলেও মনে নিচ্ছে। থাক না। বাবা বললেন—থাক। দু তিন দিন পর মিস্ত্রী একটি পুতুল হাতে করে এল, বললে—কত্তা দেখুন তো কেমন? ছেলেমানুষের গড়া অবিশ্যি। বাবা বললেন—তাই তো হে, মন্দ নয় তো। কে গড়েছে? মিস্ত্রী বললে—ওই অতুল, নতুন ছেলেটা। ওকে রেখে দিন। ভাল কারিগর হবে। তা হয়েছিল; ছোঁড়ার পুতুলে হাত চমৎকার। আর মাথায় খেলেও অনেক রকম। এই দেখুন—

সামনেই তাকে একটি ছোট্ট কাঠের টুকরোর উপর মাটির গড়া একটি পুতুল; কয়েকটি পুতুল মিলিয়ে একটা ঘটনার ছবি। একটি তালগাছ, তার মাথায় একদিকে পাতার উপর একটা গোখরো সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকের পাতার উপর দুই পাখা সবিক্রমে বিস্তার করে হিংস্রভঙ্গিতে উদ্যত-চঞ্চু একটা শঙ্খচিল একটা পায়ের নখ বাড়িয়ে রয়েছে, মাঝখানে পাখীর বাসা, বাসায় কয়েকটি ডিম। যুদ্ধোদ্যত শঙ্খচিলের ভঙ্গিটি আশ্চর্য; পাখায়, নখে, ঠোঁটে তার সে কি বিক্রম, চোখের দৃষ্টিতে সে কি হিংস্র ক্রোধ! ওদিকে তেমনি সাপটার গ্রীবাভঙ্গি এবং চোখের দৃষ্টিও সমান সুন্দর। দেহটা বেঁকিয়ে ফণা তুলে দাঁড়ানোর মধ্যে আশ্চর্য ললিত এবং ক্রূর বিক্রম।

আর একটা পুতুল দেখিয়ে পালের ছেলে বললে—এটাও ওর।

একটি মেয়ে স্নান ক'রে কাঁধে গামছা ফেলে কাঁকে কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যোগেশ পাল মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। ছেলেটার হাত ভাল তা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু এত শিগ্‌গির—এই চার বছরে! কত বয়স হবে ওর এখন? সতের-আঠারো? এর মধ্যেই এত নিখুঁত হবে ভাবতে পারেন নি। কিন্তু করলে কি?

প্রশ্ন করবার আগেই ভুবন পালের ছেলেই বললে—কিন্তু এত বড় পাষণ্ড, এমন—

কথায় বাধা পড়ল, বৃদ্ধ ভুবন পাল ঘরে ঢুকে বললেন—যোগেশ! কখন এলে?

বৃদ্ধকে প্রণাম ক'রে যোগেশ বললেন—এই তো। ওই ছেলেটাকে নিয়ে যখন কাণ্ড হচ্ছিল তখনই। সেই কথাই হচ্ছিল।

বৃদ্ধ বললেন—রাধামাধব হে! জয় মহাপ্রভু! পাপ! যোগেশ, মহাপাপ এসে ঘরে ঢুকেছিল। জীবন, তুমি যাও এখান থেকে।

জীবন চলে গেলে বৃদ্ধ বললেন—পাষণ্ড করেছে কি জান?

নীরবে প্রতীক্ষা করে রইলেন যোগেশ পাল।

—একটি মূর্তি অপবিত্র ক'রে দিয়েছে হতভাগা শয়তান।

চমকে উঠলেন যোগেশ পাল।

কণ্ঠস্বর মৃদু করে বৃদ্ধ বললেন—সেই মূর্তিটি আমি নিজে হাতে গড়েছিলাম। নাম আর করব না, একজন সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত কন্যার মূর্তি। কৃষ্ণনগরের মহারাজার মূর্তি তোমরা গড়েছ, সেই দেখে তিনি আমাকে গড়ে দিতে বলেন। আমার পুরানো যজমানের বাড়ী। সেখানে প্রতিমা গড়ি। প্রতি বছরই যেতাম। মেয়েটিকে বহুবার দেখেছি। বছর কয়েক আগে হঠাৎ মারা গেল কন্যাটি। তার ফটো বড় করিয়ে, রঙীন করিয়েও আশ মিটল না তাঁর। আমাকে বললেন—পালমশায়, আপনি গড়ে দিন। আমি গড়ে দিয়েছিলাম। কাচের কেসের মধ্যে যত্ন ক'রে তাঁর ঘরে রাখতেন। ক' বছরে এবার খানিকটা বিবর্ণ হয়েছিল—তাই নতুন অঙ্গরাগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বৃদ্ধ হয়েছি, সেখানে নিজে যেতে পারি না। অথচ আমার হাত নইলে তাঁর তৃপ্তি হবে না। পাঠিয়ে দিলেন এখানে। অঙ্গরাগ পরশু শেষ করলাম। ছোঁড়াটা দাঁড়িয়ে দেখল, যেন ছোট ছেলে লাল রঙ দেখছে।

ঘুরে ফিরে দশবার এল—আর দেখলে। কাল রাত্রে,—ছোঁড়া পাশের ঘরে শুত,—মাঝের দরজায় খিল ছুরি দিয়ে খুলে ঘরে ঢোকে। শব্দে আমারই ঘুম ভেঙে যায়। মনে করেছিলাম চোর। উঠে জানলায় এসে দাঁড়াই। ওই জানলায়। ওখান থেকে সব দেখা যায় এ ঘরের। কি বলব যোগেশ। রঙে বাতাস লাগবার জন্য কাচের কেসটা খোলাই ছিল। দেখি ছোঁড়া দুই হাতে মূর্তিটার মুখ ধ'রে অপলক চোখে চেয়ে আছে, তারপর চুম্বন করলে। আমি চীৎকার করতে গিয়ে চীৎকার করলাম না। গিয়ে ডাকলাম জীবনকে। তাকে দেখালাম। চুপিচুপি লোকজন ডেকে যখন ঘরে গিয়ে ঢুকল—জীবন—তখনও ওর ঘোর কাটে নি। সারারাত বাঁধা পড়ে ছিল। তারপর—।

যোগেশ পাল শুধু স্তম্ভিতই হলেন না, সর্বাঙ্গ তাঁর হিম হয়ে গেল।

ভুবন পাল বললেন—জান যোগেশ? হারামজাদা পুতুল গড়তে ভালবাসত। প্রতিমাতে হাত দিতে চাইত না। বলত ও বড় বড়, তা ছাড়া কি রকম লাগে আমার।

মা মরে গেছে, দিদি মনো খুন হয়েছে।

বেশ হয়েছে। যাকগে। ভাল হয়েছে। দিদির জন্য দুঃখ একটু হচ্ছে, কিন্তু মায়ের জন্য—না, হচ্ছে না। মায়ের কথা মনে হলে দেহ তার কেঁপে ওঠে। নবদ্বীপে এসে অবধি সে সাধ্যসত্ত্বে গোস্বামীপাড়া কি মায়াপুরের দিকে কখনও যায় নি। পর্বে-পার্বণে প্রায় লুকিয়ে থেকেছে। ভয়ে, ওই মায়ের ভয়ে। যদি তীর্থদর্শনে আসে, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, ও রে আমার মলিন রে, সোনা রে মানিক রে বলে দু হাত বাড়িয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে।

ভাবনা মাত্রই শরীর তার শিউরে উঠেছে, মন তার চমকে উঠেছে। আশ্চর্য—সে নিজেকে সামলাতে পারেনি, চীৎকার করে উঠেছে—ধে-ৎ। অথবা দূর। অথবা আঃ।

ভুবন পালের কারখানায় একবার মনের খেয়ালে সে একটি বোষ্টুমী-পুতুল তৈরী করেছিল। একটু হেলে ঘাড় বেঁকিয়ে আছে বোষ্টমী, মাথায় চূড়া ক'রে চুল বাঁধা, চোখের দৃষ্টিতে একটু অন্তরঙ্গ বক্র ভাব, মুখে অল্প হাসি, নাকে রসকলি। সে পুতুলটি দেখে মিস্ত্রীশালার সবাই যেন এক মুহূর্তে রসিক হয়ে উঠেছিল। সে নিজে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল—মা, তার মা। তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল দিদির যৌবনের লাবণ্য। সব সেই। কারখানার মিস্ত্রীরা খুব তারিফ করেছিল। ছোঁড়ার দলেরা তারিফের সঙ্গে নানান রসিকতা করেছিল; একটা ছোকরা গুণগুণ করে অশ্লীল গান গেয়েছিল। একজন চুমু খেয়েছিল পুতুলটায়। স্থির হয়ে বসে সে দেখেছিল সব; হঠাৎ এক সময় উঠে মূর্তিটাকে তুলে নিয়ে গলিপথ ধরেই এসে গঙ্গার জলে ঝপ করে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু মিস্ত্রীরা, বিশেষ করে ছোট পাল কর্তাকে বলেছিল পুতুলটার কথা। বলেছিল, ওর ছাঁচ ক'রে

পুতুল ছাড়লে ভাল বিক্রী হবে। ছোট পাল তাকে বলেছিলেন, ওটা আবার করতে। কিন্তু সে করে নি। এক কথা ধরে ছিল—না, ও আমার ভাল লাগে নি। সে আমি জলে ফেলে দিয়েছি।

এইবার সত্যি সত্যি জলে ডুবেছে। যাক। দুটোই গিয়েছে, এবার সে নিশ্চিন্ত নিষ্পাপ।

দিদি লোকটা মন্দ ছিল না। তার ওপর ভালবাসাও নাই, রাগও নাই। আপনার নিয়ে ছিল, সব সম্বন্ধ ছিঁড়ে খুশিমত পথে দাঁড়িয়েছিল—বেশ করেছিল! তা সেও গিয়েছে ভাল হয়েছে। ধুয়ে মুছে গেল তার সব পিছনটা। হঠাৎ আপন মনেই ঘাড় নাড়তে লাগল সে।—না। না। না। গেল আর কোথায়? নবদ্বীপে ভুবন পালের কারখানায় জমা হয়ে রইল।

বদমাইশ বুড়ো, হারামজাদা তার ছেলেটা।

স্যুটকেস হাতে নিয়ে গঙ্গার ধার ধ'রে চলেছিল মলিন। গাল দুটোয় এখনও চড়ের দাগ ফুটে রয়েছে। কানের জোড়টা জ্বলছে, বোধ হয় কেটে গিয়েছে কারও নখে। নিষ্ঠুরভাবে তাকে নির্যাতন করেছে। তার আপসোস হচ্ছে, সেও কাউকে এক ছুরি বসালে না কেন?

মাটির একটা পুতুল।

কোন বড়লোক যজমানের মেয়ের পুতুল, মেয়ে নয়। জ্যান্ত মেয়ের জাতকে তার জানা আছে। ওই মেয়ে যদি বেঁচে থাকত তবে সে তার সন্ধানে যেত। বলত তোমাকে চাই। নইলে ভুবন অন্ধকার। সে তাকে জিতে নিয়ে আসত। না পারলে হার মানলে প্রণাম করে চলে আসত। হার সে মানত না।

বুড়ো ভুবন পালের গল্প শুনে তার যেন নেশার ঘোর লেগেছিল। এই মূর্তিটায় রঙ করতে করতে ভুবন পালই মেয়েটার কথা বলেছিল। বলেছিল তাকেই। সে ছাড়া তো ওই ঘরে মূর্তি রঙের সময় আর কেউ ছিল না। পাল তাকেই ভার দিয়েছিল সরঞ্জাম যোগাবার। রঙ, তুলি, গঁদ, তুঁতে, জল—মলিনই পাশে সাজিয়ে রাখছিল। আর শুনছিল। পাল বলছিল—জানিস, সে প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ী। প্রকাণ্ড নাট-মন্দির। থামগুলিতে পদ্মের পালিশ, মাথায় মাথায় পদ্মের নকশার কাজ, চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে মার্বেল বসানো। আমরা প্রতিমা গড়তে যেতাম। যেতাম সাধারণত রাত্রে। নবদ্বীপ থেকে এই বিকেলের গাড়ীতে যেতাম কিনা। পৌঁছুতাম বারোটা নাগাদ। সকাল বেলা উঠে কাজে হয়ত লেগেছি কি লাগব—এমন সময় তোড়ার ঝম ঝম শব্দ উঠতে লাগত। প্রথমে অন্দরের ভিতরে, তারপর চণ্ডীমণ্ডপের দিকের দোতলার বারান্দায়, তারপর সিঁড়িতে। যেন কল কল ঝর ঝর শব্দ করে পাহাড় থেকে আসছে জলকন্যে—কিম্বা ঝম ঝম শব্দ তুলে নেমে আসছে দেবকন্যে। একেবারে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে থামত।

—কারিগরমশায়!

ভুবন পাল অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। আহা-হা! সে কি রূপ! সে কি কণ্ঠ! কি রঙ,

কি মুখ। কি চোখ, কি নাক, কি ঠোঁট, কি হাসি, কি কথা ব'লে বোঝানো যায় না। এই যে এই মূর্তি, এ মাটি—মাটির পুতুল। তার কাছে এ কিছু নয়, কিছু নয়। রূপে রসে শব্দে গন্ধে সে টলমল; হাসত খিলখিল করে—যেন জলতরঙ্গ বাজত। হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ত। চুল ছিল এক রাশি—সে চুল এসে পড়ত মুখের উপর। আবার ভিক্ষুক আসত, দুঃখী আসত তাদের দেখে মুখখানি যে কি হয়ে উঠত! চোখ ছলছল করত। তখন সে ছেলে মানুষ—এই দশ এগার বছর বয়স। সন্ধ্যের সময় এসে ভুবন পালের কাছে বসত, বলত, ছেঁয়াবাজী (ছায়াবাজী) দেখান কারিগরমশায়। লণ্ঠনের আলোয় হাতে আঙুল মুড়ে মুদ্রা করে দেওয়ালে ছায়া ফেলত ভুবন পাল। বুড়ো আঙুল নিচে রেখে বাকী আঙুলগুলোকে উপরে জড়ো করে ধরলে—দেওয়ালে ছায়াতে কুমীর হ'ত। বুড়ো আঙুলটা নাড়লে মনে হত কুমীর মুখ নাড়ছে। বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল উঁচু করে বাকী তিনটি আঙুলকে—একটু বেঁকিয়ে সামনে সামনে মেলে ধরলে ছায়াতে হরিণ হ'ত। এমনি অনেক রকম হয়। দু হাতের ছায়া দুদিকে ফেলে—কসরৎ ক'রে—ছায়ার লড়াই দেখাত। সে কি খুশী! কি হাসি! বলত—আমাকে শিখিয়ে দিন। হাত এগিয়ে দিত। ভুবন পাল শেখাত। সে যেন ননী-মাখনে গড়া হাত। কি নরম!

সেই মেয়ে বড় হয়ে উঠল। পনেরো ষোল বছর বয়স হল। তখন আর ছুটে আসত না। বারান্দায় বেরিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত। পরনে থাকত ফরাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ী। রঙীন কাপড় সে পরত না। পরলে পরত বেনারসী। কালাপেড়ে শাড়ীতে এমন মানাত তাকে যে মনে হত লক্ষ্মীঠাকরুণ। একটু ঝুঁকে ডেকে বলত—কাল রাত্রে এলেন? ভাল ছিলেন? বাড়ীর সব ভাল আছে? মনে হ'ত বেহালায় সুর বাজছে।

চক্ষু দান করতাম যখন তখন নেমে এসে পাশে দাঁড়াত। তখন পায়ে তোড়া পাঁয়জোর থাকত না। শব্দ হত না তো, তবু কাজ করতে করতেই আমি বুঝতে পারতাম। সুবাসিত তেলের মিষ্টি গন্ধ পেতাম। চোখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞাসা করতাম—এসেছ?

—হ্যাঁ।

বেশী কথা আর তখন কইত না। বড় হয়েছি না—লজ্জা হ'ত।

এক বছর আমার জ্বর হয়েছিল। প্রবল জ্বর; মাথা ধরায় ছটফট করছিলাম। জ্ঞান খুব ছিল না। হঠাৎ মনে হল—কপালে কি যেন ঠাণ্ডা মতন, জুড়িয়ে যাচ্ছে সব। চোখ মেলে চেয়ে দেখি—সে। মাথায় আমার অডিকলনের পটি দিয়ে দিচ্ছে। আমি আরামে বলেছিলাম—আঃ।

আমার কপালে হাতখানি রেখে বলেছিল—খুব কষ্ট হচ্ছে?

ওরে, এমন মেয়ে আর আমি দেখি নি।

শুনতে শুনতে রঙের পাত্র এগিয়ে দিতে ভুল হয়ে যাচ্ছিল মলিনের। বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করে উঠছিল। কালবোশেখীর ঝড়ের আগে পশ্চিম আকাশে মেঘ যেমন ফুলে ফেঁপে উথল-পাথল করে—তেমনি সে উথল-পাথল। স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে সে ওই মূর্তির

দিকে তাকিয়েছিল। ওই মাটির মূর্তি যেন মুহূর্তে তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠছিল। তার মধ্যে যেন ফুটে ফুটে উঠছিল কত পরিচিত পরশ কামনার জন। তাদের দেখেও ঠিক এমনিভাবে তার বুক তোলপাড় ক'রে উঠত। সে প্রাণপণে নিজেকে স্তব্ধ করে রাখত। মুখ ফুটে বলতে পারত না কিছু। এ মূর্তির মধ্যে ভুবন পালের ওই রাজকন্যে জলকন্যের সঙ্গে তারা মিশে গিয়েছে। সে যেন এদের জন্য জন্মজন্মান্তর তপস্যা করে আসছে। পাচ্ছে না।

তার নিজের গ্রামের, ওই দেবীগ্রামের অমৃতবাবুর বাড়ীর ক'টি কিশোরী মেয়ে মূর্তিটার মধ্যে থেকে উঁকি মারছিল যেন। তারাও এমনি, ঠিক এমনি। বছরে একদিন অরণ্য-ষষ্ঠীর দিন তারা ষষ্ঠীতলা আসত। ষষ্ঠীতলা তাদের বাড়ীর পাশেই। সে-দিন সে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের চুলের মিষ্টি গন্ধ পেত।

কাজ শেষ হয়ে গেলেও সে সেইখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই দেখেছিল। কতক্ষণ, তার হিসেব নেই। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ। বুকের ভিতর সমানে সেই তোলপাড় চলেছিল। মূর্তিটা মাটির, সে কথা ভুবন পালের মতই সে জানত। গোবর-মেশানো মাটির পচা গন্ধ তার নাকে লেগে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য সে গন্ধ কেমন ক'রে যেন অপরূপ মিষ্ট গন্ধে পরিণত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল—চুলের মিষ্ট গন্ধ। কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল—মনে হয়েছিল, জ্বর হয়েছে তার।

বুড়ো ভুবন পালই হেসে বলেছিল—দুর থেকে ঠিক জীবন্ত মনে হচ্ছে?

ঘাড় নেড়ে সে জানিয়েছিল—হ্যাঁ।

—যা এখন দরজা বন্ধ ক'রে দি। আমার চেয়েও তোর ভাল হাত হবে।

একটা টাকা তাকে দিয়ে ভুবন পাল বলেছিল—রঙ যা তুই গুলেছিলি এমন এক বুড়ো রতন ছাড়া কেউ পারে না। নে। মিষ্টি খাস।

মিষ্টি সে খায় নি।

খেয়েছিল মদ। মদ খেতে এর আগেই সে শিখেছিল। কিন্তু এমন তৃষ্ণার সঙ্গে কখনও এর আগে খায় নি। সন্ধ্যে থেকে গঙ্গার ধারে বসেছিল। বসে আর কিছু ভাবে নি, শুধু ভেবেছিল এই মূর্তিটিকে। ভুবন পালের বলা গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে মূর্তিটিকে জীবন্ত হয়ে ঘুরতে দেখেছিল চোখের সামনে।

হঠাৎ মনে হয়েছিল—। সে এক আশ্চর্য কথা মনে হয়েছিল।

অনেক সাধু আছে যারা পারে—। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছিল সে। পোড়া মা-ঠাকুরতলায় মধ্যে মধ্যে এক পাগল আসে, লোকে বলে সে সিদ্ধ পুরুষ।

পোড়ামা-তলায় পাগল ছিল না সে উন্মাদ হয়ে ফিরে এসেছিল। মদ খেয়েছিল, সেইজন্য সকালে ফেরে নি। দেরি ক'রে ফিরেছিল। সকলে ঘুমুলে ফটকটা ডিঙিয়ে ফেরার কৌশল শিখিয়ে দিতে হয় না, ওটা আপনিই মনে যোগায়। ডিঙোবার শক্তি থাকলেই যোগায়। যোগায় না বুড়োর আর ছেলের। না, যোগায় না ভীরুর। ছেলে বয়সেও সে অনেক পাঁচিল ডিঙিয়েছে। বুড়ো হলেও—না, বুড়ো সে হবে না কখনও। এ ফটক সে অনেকদিন

আগে থেকেই ডিঙিয়ে ঢুকতে শিখেছে। রাত্রি ক'রে যে দিন বাড়ী ফিরেছে—সেই দিনই চিন্তা না ক'রেই সটান উঠে পড়েছে রেলিং ধরে। এটা আবার বাধা। যাত্রা শুনে ফিরেছে। শান্তিপুরে রাস দেখে ফিরেছে। কেষ্টনগর সে যায় নি, ওই যোগেশ পালের সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে যায় নি।

সেদিন ওই ফটক ডিঙোবার সময়ই তার মনে উদগ্র বাসনা জেগেছিল।

প্রথম বাসনা হয়েছিল—মূর্তিটা নিয়ে পালাবে। এমন একটা মূর্তি সে গড়তে পারে না তা নয়। পারে। কিন্তু সেটা নেহাতই হবে পুতুল, মাটির মূর্তি। ভুবন পালের গড়া এই মূর্তিটা ঠিক যেন পুতুল নয়; মাটি নয়। এ যেন সে-ই; ভুবন পাল যার কথা বললে—সে-ই। এর মধ্যে আছে যেন তার গ্রামের বাবুদের বাড়ীর সেই মেয়েগুলি সবাই। তাদের চুলের মিষ্টি গন্ধ পেয়েছে সে ওই মূর্তিটা থেকে। এ সে রাজার মেয়ে বড়লোকের মেয়েরা সবাই একসঙ্গে। টগবগ ক'রে ফুটতে লেগেছিল তার বুকের রক্ত। নিজের ঘরে ঢুকে—কতক্ষণ তার মনে পড়ছে না—সে ঘরময় ঘুরেছিল, সে ঘুরেছিল, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। কিছুতেই থাকতে পারে নি। ওই পাশের ঘরে তার সব কামনার ধন। মাঝখানে এই বন্ধ দুয়ার। সে তাকে ডাকছে টানছে। দরজার খিলটা ছুরি দিয়ে খুলে ঘরে ঢুকে প্রথমেই জেলেছিল আলো।

না-হলে দেখবে কি ক'রে? না দেখলে সে চুলের গন্ধ পাবে কি করে? আসলে তো রঙের গন্ধ, বার্নিশের গন্ধ, কিন্তু মলিনের চোখের জাদুতে ও-গন্ধ কেশতেলের গন্ধ হয়ে উঠবে। না দেখলে কথাই বা বলবে কি করে?

দেখতে দেখতে অতি সন্তর্পণে মুখখানি ধরে ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট দুটি রেখেছিল। যদি বেঁচে ওঠে তবে বুকে জড়িয়ে ধরবে।

জাগে নি। তবু সে খুশী। রাজার মেয়ে, তাকে সে পেয়েছে।

হঠাৎ উঠল মানুষের সাড়া। কেউ তার ঘাড় টিপে ধরলে।

—কে?

ভুবন পালের ছেলে—তার সঙ্গে তারই সঙ্গীরা।

গঙ্গার কিনারা ধ'রে চলতে তার মনে হল—

মূর্তিটা ভেঙে দিয়ে আসতে পারলে খুশী হ'ত।

তাই দেবে হয়তো। তার উচ্ছিষ্ট পুতুল নিশ্চয় জলে ভাসিয়ে দেবে তারা। ভুবন পাল আবার গড়বে।

হয়তো উচ্ছিষ্টই বা রাখবে।

আপন মনেই হা হা ক'রে উঠল সে।

চলো মুসাফের। গাঁঠরি তার নাই। শুধু স্যুটকেসটা। তুলি আছে, বাখারির, কাঠের ছুরি আছে, মূর্তি-মাজার যন্ত্র আছে, ছাঁচ খোদাইয়ের যন্ত্র আছে, কটা জামা কাপড় আছে। একটা জামা, দু'টো কাপড় বোধ হয়। ওতেই হবে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।

স্নান করবে নাকি? পোড়াকপালী মুখপুড়ী মা মরেছে। দিদি খুন হয়েছে। করবে নাকি স্নান? মাথাটাও ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মর্মান্তিক অপমান ক'রেছে। ভুবন পালের ছেলে। নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে!

মাথাটাও ঠাণ্ডা হবে।

একটা ঘাটে এসে স্যুটকেসটা খুলে একখানা কাপড় বের ক'রে রাখলে। এঃ, গামছাটা যে নাই, ওটা আর একখানা কাপড় শুকোতে দেওয়া ছিল—তাই রয়ে গেল। ধোপা বাড়ীতে আছে দুখানা কাপড় একটা জামা। থাক। কোন আপসোস তার নাই। ওই মূর্তিটির মুখখানি ধ'রে সে—এতেই সে খুশী। না—কিসের খুশী? বুকে তার এখনও তোলপাড় চলছে। মাটির মূর্তি। জীবন্ত হয়ে যদি উঠত মুহূর্তের জন্য তবে পিপাসা মিটত। এ তার পিপাসা বাড়ল। ও মাটির মূর্তি সে গড়বে। কিন্তু সে কি জাগবে?

ভাবতে ভাবতেই নেমে পড়ল সে গঙ্গার জলে। গঙ্গার জলে লোকে তর্পণ করে, শুনেছে সে। মরা মানুষকে জল? দেবে নাকি? মাকে আর দিদিকে জল? স্নানই যখন করছে তখন দিক। নে, জল নে মা। নে, জল নে দিদি। এ সময় কাঁদতে হয় বোধ হয়। কিন্তু কান্না তার আসবে না। কাঁদতে সে পারে না। কারুর কান্না সে দেখতে পারে না।

তৃতীয় পর্ব

এক

পাঁচ বছর পর।

পাঁচ বছর পর, মলিন—ঠিক এই কথাগুলিই বলছিল। সেদিন গঙ্গার চরভূমির উপর দিয়ে চলবার সময় মনে মনে বলছিল কথাগুলি; আজ বলছিল—একটি মেয়েকে। মেয়েটির নাম টিয়া। সে কাঁদছিল। মলিন তাকে বলছিল—

'কান্না! কান্না আর ভাল লাগে না, তুই কাঁদিস না টিয়া। কান্না আমি সইতে পারি না। আমি নিজে কাঁদি না। কাঁদতে আমি পারি না। আমার মা মরেছিল, আমি কাঁদি নি। কেউ কাঁদলেও আমার ভাল লাগে না। কাঁদিস নে। কাঁদবি তো ঘরে গিয়ে কাঁদ।

টিয়া একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে। আশ্চর্য রূপ। এ রূপের জাতই আলাদা। সংসারে রূপেরও জাত আছে। কোন রূপে তেজ থাকে, কোন রূপে চোখ-জুড়ানো মায়া থাকে, কোন রূপে দীঘির কালোজলের ডাকের মত ডাক থাকে, কোন রূপ দেখে মন বিষিয়ে ওঠে—তাতে বোধ হয় বিষ থাকে, কোন রূপ দেখে ঘৃণা হয়; টিয়া মেয়েটির রূপ দেখে নেশা লাগে—টিয়ার রূপে নেশা আছে।

মলিনের জীবনে নেশার ঘোর লেগেছে!

চন্দননগরে লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারের পূর্ব দিকে, যেখান থেকে গঙ্গার ধারের রাস্তাটা দক্ষিণে

চলে গিয়েছে স্ট্র্যাণ্ডের দিকে, উত্তরে গিয়েছে বস্তি অঞ্চলে, সেইখানেই মলিন এখন পুতুলের দোকান করেছে। পাঁচ বছরের মলিন ভরা জোয়ান হয়ে উঠেছে, যৌবন তার দেহের কানায় কানায়; লম্বা গৌরবর্ণ সবল দেহ, দীপ্তদৃষ্টি উজ্জ্বল মুখ মলিনকে আর সে মলিন বলে চেনাই যায় না। আরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, মুখ থেকে—ভাবগুলি থেকে দেবীগ্রামের সকল স্মৃতির রেশ যেন নিঃশেষে মুছে গেছে। বিল্বগ্রামের ধুলার চিহ্ন, পঙ্কজিনীর হাতের ছাপ—আর এতটুকু নাই। চোখে মুখে সে অস্থির-মত ভাব আর নাই। তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখ দু'টির মধ্যে আরও কিছু একটা ফুটে উঠেছে। যেন একটা নিষ্ঠুরতা অথবা শাণিত ধাতুর দীপ্তির মত প্রখর কিছু। অনেক খেটেছে সে, অনেক লড়েছে সে, মার খেয়েছে, মেরেছে। তার সাক্ষী ওই দেহখানা।

যৌবনধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে ভরেই ওঠেনি, বেশ সরল এবং শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে। দেহে তার শক্তিও আছে। দেখেই বুঝা যায় যে, শরীরটাকে কসরৎ ক'রে গড়েছে। দেহ অবশ্য ওর গোড়া থেকেই ভাল এবং দেহকে খাটিয়েছে যথেষ্ট। এ খাটুনীর শুরু হয়েছিল ছেলেবেলা থেকেই। পথ হেঁটে, গাছে চড়ে, সাঁতার দিয়ে। তারপর পালিয়ে এল নবদ্বীপে, ভুবন পালের কারখানায় ভর্তি হয়ে প্রথমেই পেয়েছিল মাটি-ভাঙা আর মাটি-মাখার কাজ। ওর পুতুল গড়ার নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েও ও-কাজ থেকে তাকে অনেকদিন অবধি রেহাই দেয় নি ছোট পাল। কেষ্টনগরে পুতুলের কাজ বেশী। নবদ্বীপে পুতুলের চেয়ে প্রতিমার কাজ বেশী; বছরখানেক পর তবে সে ও-কাজ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। ততদিনে শরীরে তার গুল বাঁধতে শুরু হয়েছিল এবং ওতে তার একটা নেশাও লেগেছিল। কারখানায়ও মলিনই ছিল সবচেয়ে ছোট; ওর থেকে দু'বছর চার বছরের বড় যারা ছিল, তারা সকলেই দুনিয়ার বাঁধা নিয়মে চাইত ওকে হুকুম করতে। প্রথম প্রথম মুখচোরা মলিন সে হুকুম তামিল করত। পুতুল-গড়ার কাজে ওর কদর হতেই মলিন 'পারব না' বলতে শুরু করেছিল। মুখচোরা ছেলেটা 'পারব না' বলেই আপন মনে কাজ করে যেত। আর ঘাড় দোলাত। তারপর আরও কথা ফুটল তার মুখে। এরপর শুরু হল হাত-টানাটানি; তারপর হাতাহাতি। প্রথম শুরু হয়েছিল তাকে 'কুকুর' বলার জন্য। গোপেশ্বর নামে একটা মাথা মোটা ছেলে ছিল। মাথাটা ছিল তার দেখতে আকারেও আর ভিতরে প্রকারেও ছিল বুদ্ধিতে স্থূল। সবাই তাকে বলত মাথা-মোটা অথবা 'কাতলা' অর্থাৎ মাথা মোটা কাতলা মাছ। সে বলেছিল—বড় মিস্ত্রী বললে, হুঁকোটায় জল ফিরিয়ে দে আর তামাক সাজ! শুন্‌ছিস অত্‌লো! মলিন তখন ওখানে অতুল ছিল।

মলিন বলেছিল—তুই ফেরা। আমি পারব না।

—পারবি না?

—না, আমি কায়স্থ তোরা পাল, তোদের হুঁকোতে আমি জল ফেরাব কেন। তুই তো ওই হুঁকোতে তামাক খাবি। তুই সাজ।

গোপেশ্বর বলেছিল—একেই বলে নাই দিলে মাথায় চড়ে। নেয়ের কুকুর পাতে ভোজন।

বেটা কায়েৎ? ভিখিরীর ছেলে—কি জাত না কি জাত ঠিক নাই। বেটা আমার কায়েৎ।

—খবরদার আমাকে কুকুর বলবি না।

মলিন কিন্তু মৃদুস্বরেই প্রতিবাদ করে চলেছিল। মৃদু হলেও আশ্চর্য কঠিন তার কণ্ঠস্বর। এরপরই লেগেছিল মারামারি। মলিন কুকুর বলতে বারণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, কথা শেষ করেছিল গোপেশ্বরকে শূয়োর বলে। বলেছিল—আমি কুকুর হলে তুই শূয়োর।

গোপেশ্বর অভ্যাস মত এসে তার ঘাড় ধ'রে বলেছিল—কি বললি?

অভ্যাস মত মানে এর আগে পর্যন্ত মলিনের অবাধ্যতার জন্য তারা সবাই এসে তার ঘাড় ধরত। মলিন প্রাণপণে ঘাড়টা শক্ত ক'রে সোজা রাখতে চাইত। কাঁদত না, চীৎকার করত না, বাধাও দিত না। অন্য লোক এসে আক্রমণকারীকেই ছাড়িয়ে দিত। মলিন ঘাড় ছাড়া পেয়ে—ঘাড়ে হাত বুলোত না, কোন অভিযোগ করত না। কাজে থাকলে নীরবে কাজ করে যেত, বসে থাকলে বসেই থাকত। কিন্তু বরাত-করা কাজ সে কিছুতেই করত না।

সেই দিন প্রথম গোপেশ্বরের হাত ধ'রে বলেছিল—ছাড়।

গোপেশ্বর আরও শক্ত করে ধরেছিল তার ঘাড়। মলিন একটা আকস্মিক ঝটকা মেরে ঘাড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে গোপেশ্বরকে এক চড় মেরে বসেছিল। তারপরই আরম্ভ হয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। হেরেছিল মলিনই, কিন্তু গোপেশ্বরকেও সে ছাড়ে নি। এরপর থেকে যুদ্ধটা হামেশাই হ'ত। কসরতের কুস্তিতে নয়, সত্যকারের দ্বন্দ্বযুদ্ধের শক্তি প্রয়োগ। এইভাবে মার খেয়ে এবং মেরে তার শরীরটা গড়ে উঠেছে এবং মুখচোরা স্বভাবটাও কেটে এসেছে।

নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে সে এই কয় বছরে তিন চার জায়গা ফিরেছে। এ চার বছর সে পরিশ্রম করেছে মজুরের মত। সে অনেক কথা।

দুই

প্রথমেই বাড়ী যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। যাবে একবার দেবীগ্রাম। শুনে আসবে কি ভাবে দিদি খুন হয়েছে, কে খুন করেছে। শুনে আসবে মা কেমন ক'রে কেঁদেছে। মা আর দিদি তার জীবনের দুই আপদ। তবু তাদের জন্য সেই মুহূর্তে তার অন্তরটা ফণা-থেঁতলানো সাপের মত মুচড়ে মুচড়ে পাক খেয়েছিল। দেবীগ্রাম যাবে বলেই কাটোয়া জংশনের টিকিট কিনেছিল। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে কাটোয়ায় গাড়ী বদলের সময় হঠাৎ কি জানি পাল্টে গিয়েছিল সে ইচ্ছে। দেবীগ্রাম। দেবীগ্রামের বাতাসে মাটিতে, লোকের চোখের চাউনিতে কথায় যেন তাকে, সেই অর্জুন গাছের অসংখ্য পোকার মত কামড়ায়। অস্বস্তির মধ্যেই সে কাটোয়ার বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। ট্রেনের দেরি ছিল তিন ঘণ্টা। সময়টা ছিল পূজোর ঠিক পর কার্তিক মাস। কাটোয়ার বাজারে মিস্ত্রীপাড়ায় ঘরের আঙিনায় সারি সারি ছোট বড় কার্তিকের কাঠামো তৈরী হচ্ছিল। সামনে ৩০শে কার্তিক কার্তিক-পূজো। কার্তিক

পূজোয় কাটোয়ায় খুব সমারোহ। কার্তিকে লড়াই হয় না কি। এখানকার দেহ ব্যবসায়িনীদের মহলে কার্তিক পূজোয় শোরগোল পড়ে যায়। হরেক রকমের কার্তিক। বই শ্লেট বগলে ক'রে পড়ুয়া কার্তিক, লাটাই ঘুড়ি হাতে কার্তিক, সাইকেল চড়া কার্তিক, সে নানান ঢঙ। মলিন যেন বেঁচে গেল। বাঃ, এইখানেই তো অনেক কাজ! ভুলে গেল সে মায়ের কথা দিদির কথা। দেবীগ্রাম আর যাওয়া হল না তার। কাটোয়াতেই সে আস্তানা নিলে। কিছু টাকা তার সঙ্গে ছিল! তার চার বছরের সঞ্চয়, সে প্রায় আশি টাকা; টাকাটা সে অহরহ সঙ্গেই রাখত। কোমরে একটা কাপড়ের লম্বা থলিতে পুরে বেঁধে রাখত। সেই নিয়ে শুরু করে দিয়েছিল তার স্বাধীন জীবন।

বেঁচে গিয়েছিল সে। মার খেয়ে গাল খেয়ে দমে যাওয়া মন—এক মুহূর্তে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছিল; দেহের বেদনা মনের দুঃখ সব যেন কোন মন্ত্রগুণে দূর হয়ে গিয়েছিল। মা-দিদির মৃত্যু সংবাদের শোক ওই কাটোয়ার গঙ্গার জলেই যেন ধুয়ে মুছে গেল। দেবীগ্রামের মানুষগুলির সেই বিষাক্ত হাসি মাখানো চাউনি—তার সর্বাঙ্গ বিষিয়ে দেয়।

আর এই তো! এই তো সে চেয়েছে সারা জীবন। এই তো সে চায়। এইখানে এই গঙ্গার ঘাটে বারো মাসই পুতুল বিক্রী হয়। এইখানেই সে পুতুল গড়বে আর বিক্রী করবে। এখানে দিদির কথা নাই মায়ের নাম নাই, দেবীগ্রামের লোকের চোখের খোঁচা নাই, কথার কাঁটা নাই—এখানেই সে মনের আনন্দে থাকবে! আর একটা কাজ সে করবে। নবদ্বীপের ওই পালের মত একটা কারখানা সে গড়ে তুলবে।

সঙ্গে সঙ্গেই সে একখানা ঘর ভাড়া করে ফেললে। মাসে তিন টাকা ভাড়া। তিন মাসের ভাড়া একসঙ্গে দিয়ে দিলে। বাড়ীওয়ালা খুঁত খুঁত করছিল। সামনেই কার্তিক পূজো, তারপরই একটা গঙ্গাস্নানের যোগ, পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নান, এখন দশ দিন বিশ দিন পর পর যাত্রীর ভিড় লেগেই থাকবে। বাড়ীটা অবশ্য ভাঙাচোরা, মাথাগুঁজে থাকাই চলে এবং একেবারে গঙ্গার ধারে বনজঙ্গলের পাশে, খানিকটা দূরেই শ্মশান, নিতান্ত দায়ে না পড়লে যাত্রীরা এতদূরে আসে না কিন্তু ভিড়ের সময় শীতকালে ওরই কদর অনেক। এই কারণেই দিতে খুঁত খুঁত করছিল বাড়ীওয়ালা। কে জানে এক মাস পরই পালাবে কি না। মলিন একেবারে একখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে হাতে দিয়ে বলেছিল—এই নাও। এ টাকা তোমার কাছে জমা রইল। ভাড়া মাস মাস আমি দিয়ে যাব।

ঘরখানা ভাড়া নিয়েই সে কাজ শুরু করে দিয়েছিল। ঘর দোর উঠোনটা পরিষ্কার করে নিয়েই, বাজারে গিয়ে একটা শাবল একখানা ছোট কোদাল একখানা বস্তা কিনে গঙ্গার ভাঙা পাড়ের মধ্যে গিয়ে আরম্ভ করেছিল মাটি কাটতে। হাঁড়ি থাক কলসী থাক চালডাল নুন তেল থাক, সর্বাগ্রে চাই মাটি। সামনেই কার্তিক পূজোর বাজার। আজ রাত্রি থেকেই সে আরম্ভ করবে। ঠাকুর কার্তিক না, পুতুল কার্তিক। বড় না, ছোট ছোট। হরেক রকম। আর গড়বে কিছু পুতুল। বোষ্টুমী পুতুল। আর কনে পুতুল।

হঠাৎ কিসে যেন পা পড়েছিল। কি?

একটা মরা ব্যাঙ। কিন্তু আশ্চর্য তো। সঙ্গে সঙ্গেই হাতে করে তুলে নিয়েছিল সে। বেশ তো। অনেক দিনের মরা ব্যাঙ, আশ্চর্যভাবে পেটের ভিতরের অন্ত্রপাতি বেরিয়ে গিয়ে শুকনো কাঠের মত হয়ে গিয়েছে। আকারে বেশ বড়। বোধ হয় দাঁড়কাকে ছোঁ মেরে নিয়ে—পেটটা ফুটো ক'রে ভিতরটা খেয়েছিল এবং তারপর তার নখ থেকে খসে পড়ে এমন অবস্থা হয়েছে। না, কোন সাপে ধরেছিল? যাই হোক, যে কারণেই এমন হয়ে থাক এটা হয়েছে চমৎকার! হঠাৎ তার খেয়াল খেলে গিয়েছিল মাথায়; ব্যাঙটা কুড়িয়ে এনে, সেই রাত্রেই মাটি দিয়ে উপরের এবং নিচের দুটো স্বতন্ত্র ছাঁচ তুলে উনোনে সেটা পুড়িয়ে নিয়েছিল।

দিন-দুয়েক পরই ঘরখানার পিছনে জঙ্গলের মধ্যে একটা মাকড়শার জালে পেয়েছিল একটা মরা প্রজাপতি। যেমন বিচিত্র রঙ—তেমনি বড়। ঘন কালো পাখার উপর গোল একটি লাল টোপা। যেন অমাবস্যায় আকাশের চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকেও জাল থেকে ছাড়িয়ে এনে তার ছাঁচও একটা তৈরী করেছিল সে। এ কাজটা ব্যাঙের ছাঁচের মত সহজ হয় নি। এর কারিগরি আশ্চর্য। বলিহারি কারিগরি! হাড় নাই মাংস নাই, শুধু যেন রস জমিয়ে গড়া রস আর রঙের খেলনা! মলিন প্রজাপতিকে সামনে রেখে প্রথমে একটি মাটির প্রজাপতি গড়ে নিয়েছিল, সেটাকে পুড়িয়ে, তার উপর মাটি দিয়ে ছাঁচ তৈরী করেছিল। কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত সারি সারি প্রজাপতি ও ব্যাঙ সাজিয়ে রঙ দিয়ে ভরে তুলেছিল তার পশরা। তার সঙ্গে বোষ্টুমী পুতুল আর কনে পুতুল। কার্তিক পুতুলও কিছু গড়েছিল। কার্তিক পূজোর একদিন আগে একটা পশরা মাথায় একটা কাঁখে নিয়ে এসে বসেছিল গঙ্গার ঘাটে। মিস্ত্রীদের বাড়িতে বাড়িতে কার্তিকের বাজার বসে গেছে। এ বাজারে দেহ-ব্যবসায়িনীদের একটা ভিড় আছে। ওদের বাড়িতে বাড়িতে কার্তিক পূজো। তারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

ওদের দিকে মলিন তাকায় নি। ওদের সে চায়ও নি। ওদের সে জানে। আর ওরা এলেই মনে মনে, দিদির সম্পর্কের ছোঁয়াচ—যেটা সে গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলেছে সেটা আবার জেগে উঠবে, হয়তো বা নূতন ক'রে তার গায়ে লাগবে।

সে পথ চেয়ে তাকিয়েছিল—লালপেড়ে, কালাপেড়ে, নীলাম্বরী, ডুরে শাড়ী পরা এলোচুল, —হাতে মাজা চকচকে ঘটি,—মিষ্টিমুখ,—শান্ত দৃষ্টি,—স্নানার্থিনী মেয়েদের। মা-খুড়ী ঠাকুমা-পিসীমাদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে নামবার সময় যারা থমকে দাঁড়াবে মা-খুড়ীর আঁচল ধরে টানবে, আঙুল দিয়ে দেখাবে—দেখ! দেখ! আমাকে কিনে দাও। তাদের!

যাদের সঙ্গে মিল আছে ভুবন পালের সেই কন্যের তার কনেপুতুলদের। যাদের সঙ্গে মিল আছে তাদের গাঁয়ের বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের। তাদের।

কিন্তু দিদি সর্বনাশী! মা সর্বনাশী। মরেও মরে না।

হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল সেই সর্বনাশীর সম্পর্ক ধরে আর এক সর্বনাশী।

তার দিদি মনোর এক প্রতিবেশিনী। ছোট শহরটিতে দিদি মনো যে বাড়ীতে থাকত,

এ-মেয়েটাও সেই বাড়ীতে থাকত। একটা কালো কুৎসিত মেয়ে। রূপ নাই যৌবন আছে। এ নিয়ে তার অহংকারেরও সীমা নাই। সেই অহংকারেই সে সেই ছোট শহরটা ছেড়ে কাটোয়ার মত শহরে এসেছে। কাটোয়ায় থাকবার সংকল্প করবার সময় ওর কথা মনে পড়েনি মলিনের। মনে ছিল না। অনেক দিনের কথা। মলিনের দেহ মন বিষিয়ে উঠেছিল তাকে দেখে। মেয়েটা কিন্তু গায়ে পড়ে প্রায় হেসে ঢলে পড়তে চেয়েছিল। অন্যান্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রতিমার বাজারে পছন্দ ক'রে ঠাকুর কিনতে এসেছিল সে। মলিনকে দেখেই চিনে ফেলে বলেছিল—আরে আরে তুমি কে হে? ও নবীন কারিগর? তুমি না মনোর ভাই মলিন?

প্রথমটা কথার উত্তরই দেয়নি মলিন। যেন শুনতেই পায়নি। অর্থাৎ সে মলিন নয়, সে শুনতে যাবে কেন? কিন্তু সে ছাড়ে নি। একটা ঢেলা তুলে তাকে ছুঁড়ে মেরে বলেছিল—এই! কানে কালা নাকি? এই নাগর!

—কি? চমকে উঠে বিরক্তি দেখিয়ে ফিরে তাকিয়েছিল মলিন।

—চিনতে পার না, না কি?

প্রথম দু-একবার না-চেনার ভান করে মলিন বুঝেছিল, না-চিনলে এ কদর্য মেয়েটা তাকে না-চিনিয়ে ছাড়বে না। এবং গোটা কাটোয়ায় তাকে একদিনে সকল জনের কাছে চিনিয়ে ছেড়ে দেবে। অগত্যা চেনা দিয়েছিল। মেয়েটার চোখে ফুটে উঠেছিল কুৎসিত লালসা, মুখেও সে বলেছিল—কি সুন্দর তুই হয়েছিস রে!

ওই মেয়েটাই সেদিন একটা মুটে ডেকে প্রায় সব পুতুলগুলো কিনে নিয়ে গিয়েছিল ঝাঁকা ক'রে। তার পাড়ায় বিলোবে সে। এবং কার্তিক পূজার দিন মলিনকে নেমন্তন্নও দিয়ে গিয়েছিল।—যেতে হবে কিন্তু!

সেইদিন রাত্রেই মলিন কাটোয়া ছেড়ে পালিয়েছিল।

তিন

কাটোয়া থেকে এসেছিল বর্ধমান। বর্ধমানের গোলাপবাগ তার মনোহরণ করেছিল। মহারাজার গেস্ট হাউসের সামনে সাদা মেঘের মত মার্বেল-গড়া কি অপরূপ নারীমূর্তি। মূর্তিগুলি দেখে মনে পড়ত আর একটি মূর্তির কথা। সে মূর্তি তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। এর কাছে সে? গ্রীষ্মের সময় সে রোজ যেত গোলাপবাগে। এ সময়টায় রাজবাড়ীর সকলেই চলে যেতেন পাহাড়ে, দার্জিলিং ঠাণ্ডার দেশে। এ সময়ে গোলাপবাগে বেড়াতে কোন বাধা হয়নি। গাছে গাছে নতুন পাতায় কচি সবুজের বাহারে চোখে একটা নেশা লাগত; প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও গোলাপবাগের ঘন সারিবন্দী গাছের তলায় তলায় নিরবচ্ছিন্ন একটি ছায়ার রাজ্য থম থম করত। বাতাস শুধু খেলা ক'রে বেড়াতো শুকনো পাতা নিয়ে দুরন্ত

ছেলের মত। ওদিকে গোলাপবাগের চিড়িয়াখানায় খাঁচার মধ্যে এক কোণে ব'সে ব'সে বাঘগুলো ঝিমুত, হাঁপাত। ভালুকে থাবা চুষত। বাঁদরগুলো ঢুলত। পাখীগুলো চোখ বুজে এক পা তুলে বসে থাকত দাঁড়ের উপর। মলিন যেত সেই ভর্তি দুপুরে। ছায়াবিছানো রাস্তা পার হয়ে এসে পড়ত গেস্ট হাউসের সামনে। খোলা জায়গায় রোদ যেন তপ্ত গলন্ত রূপার মত ঝরত, ঝলসে দিত সব। বিস্তৃত খোলা জায়গায় নানা ছকে ছাঁদে তৈরী কেয়ারীর মধ্যে গোলাপের গাছ, যুঁই-কামিনীর ছাঁটা ঝাড়গুলিতে পাতা ও ডগাগুলি আম্‌রে নুয়ে পড়ত। তারই মধ্যে বাঁধানো জায়গায় উঁচু বেদীর উপর এই শ্বেতবরণীরা নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কত বিচিত্র ছন্দ, কত মনোহর ভঙ্গি! দুধের মত শ্বেতবরণের সে কি শোভা। কতদিন সে তাদের পা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকত; সেও নিথর হয়ে যেত। এর বেশী সাহস হ'ত না।

সন্ধ্যেবেলা যেত সে মহাজনটুলির দিকে। রূপের হাট মহাজনটুলি। রঙে, কাজলে, রঙিন কাপড়ে সেজে দাঁড়িয়ে থাকত রূপসীরা। শরীরের মধ্যে রক্ত তার ফুটত; বুকের মধ্যে আশ্চর্য একটা উৎকণ্ঠার মাথা-কোটাকুটি চলত। হাত পা ঘামত। কিন্তু—। কিন্তু কাছে গেলেই কেমন গোলমাল হয়ে যেত। সকলের মুখের মধ্যেই দেখতে পেত তার দিদির ছাপ। কারও চোখে, কারও কপালে, কারও ঠোঁটে, কারও হাসিতে মনে পড়ে যেত মনোকে। বর্ধমান বাজারে তখন টুনি আর বাব্‌লি নামে দুটি মেয়ের নাম ছুটেছে। তাদেরও সে দেখেছে। বাব্‌লি একটু মোটাসোটা গড়নের, তার দিদির সঙ্গে মিল ছিল। কিন্তু টুনি ছিল পাতলা ছিপছিপে। মাজা শ্যামলা রঙ, কোন মিল ছিল না দিদির সঙ্গে, তবু মনে হত দিদির মত। পালিয়ে আসত সে। তখনই কোমরে সে একটা ছুরি রাখত। শরীরে তার তখন শক্তি বাড়ছে। সাহস তার চিরদিনই আছে। দিদিকে যারা খুন করেছিল, মহাজনটুলিতে তারা নিশ্চয় আসে। যদি দেখা হয় সেই জন্যে রাখত। কিন্তু দিদি ম'রে গিয়েও মহাজনটুলিতে ফিরে আসবে—এ সে ভাবে নি।

এই দিক দিয়ে বর্ধমান তার বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু তবু বর্ধমানে থাকা তার হয় নি। খাবে কি? দিন চলবে কি করে? পুতুল বিক্রি হল না বর্ধমানে। শহরে বড় লোক অনেক, শৌখীন লোকেরও অভাব ছিল না। জামায়, কাপড়ে, চাল চলনে কলকাতার নিচেই বর্ধমান। পুতুল বহুজনেই কেনে; বাড়ীর কাচের আলমারিতে পুতুল সাজানোও থাকে। কিন্তু সে মাটির পুতুল নয়। সে পুতুল চিনে-মাটির; ওই গোলাপবাগের বড় মূর্তিগুলির অনুকরণে ঘষা সাদা রঙ তাদের, পালিশ করা সাদাও আছে, তার উপর সে কি সুন্দর রঙ! দু চারটে কেষ্টনগরের পুতুলও আছে। তার পুতুলগুলি কেষ্টনগরের চেয়ে খারাপ ছিল না। কিন্তু তখনও সে পোড়াতে পারে নি। কাঁচামাটির পুতুল। আর মাটিও ভাল ছিল না। দামোদরের ধারের মাটিতে কি গঙ্গা মাটির মত পুতুল হয়? হয় না। গঙ্গাজলে চান ক'রে মানুষ স্বর্গে যায় কি না সে জানে না, তবে গঙ্গায় চান করলে রূপ খোলে—রঙ ফরসা হয়, আর গঙ্গামাটিতে তৈরী পুতুলের রূপের তুলনা হয় না—এ সত্যটা সে

নবদ্বীপে চার বছর থেকে জেনে এসেছে। তবুও সে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

শেষ চেষ্টা করেছিল—অনেক খেটে, অনেক যত্নে সে তিনটি পুতুল তৈরি করেছিল। পুতুল নয়, পুতুলের ছবি। একটি মহারাজার বাড়ীর অবিকল নকল। সামনে রেলিং, বড় বড় থাম, ফটক, ফটকে সান্ত্রী, এমন কি রাজবাড়ী ছাদের আলসে এবং মাঝখানের বাহারের নক্সাটি পর্যন্ত তৈরী করেছিল। আর একটি কার্জন ফটকের নকল, তৃতীয়টি মহারাজের নূতন প্রতিষ্ঠা-করা ছোট ছোট পাথরের-মন্দির, ঠাকুর বাড়ী। সেই তিনটি নিয়ে সে অনেক চেষ্টা করেছিল মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু হয় নি। আমলা কর্মচারীরা দেখা হ'তে দেয় নি। দিন দশেক ঘোরার পর শেষ দিন ওই সর্বনাশী মা আর দিদি খোঁজ পেলে। সর্বনাশীরা মরেও নিষ্কৃতি দেবে না। মরার আগে যেন দেশ দেশান্তরে ওর খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। শেষ দিন রাজবাড়ীর কাছারীর বারান্দায় দেখা হয়ে গেল—দেবীগ্রামের বাবুদের গোমস্তার সঙ্গে। রাজ-কাছারীতে এসেছে বিষয়ের ব্যাপার নিয়ে। মলিনকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

সুবেশ, সবল, স্বাস্থ্য-রূপবান এই যুবকটিকে দেখে তার আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এ কি—সেই—সেই? মলিন আর দাঁড়ায় নি, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে বেরিয়ে চলে এসেছিল। পথে তিনটে পুতুলকেই কৃষ্ণসাগরের জলে ফেলে দিয়ে আপন মনে বুকে আঙুল বাজিয়ে মুখে বিসর্জনের বাজনার বোল আওড়াতে আওড়াতে বাড়ী ফিরছিল—"ওমা দিগম্বরী না-চ গো! ড্যাং ড্যাং স্যাং; ড্যাং ড্যানা স্যাং; ড্যাডাং, ড্যাডাং। জলে যাও জলেশ্বরী, হাত পা ধুয়ে ঘরে ফিরি।" উঠো মুসাফের। বাঁধো গাঁঠেরী—বহুদূর চলো; বহুদূর চলো। যেখানে দেবীগ্রামের পরিচয় পৌঁছায় না—সেখানে চলো। পরের দিনই বর্ধমান থেকে সে রওনা হয়েছিল।

ত্রিবেণী। ত্রিবেণী। ত্রিবেণী। সারারাত্রি ভেবে ঠিক করেছিল ত্রিবেণী যাবে সে। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হয়েছিল তারকেশ্বর যাবে। শহরে বাবুদের নজর উঁচু; মাটির কারবার এখানে চলবে না। মাটির ঘর না, মাটির পথ না, মাটি নিয়ে যারা কারবার করে তাদের পর্যন্ত ঠাঁই নাই এখানে। কাঁচা মাটির পুতুল সেখানে চলে? পোড়ালে হয়তো চলে। কিন্তু সে মূলধন তার এখন নাই। তা ছাড়া এখানে গঙ্গা নাই। গঙ্গামাটি নাই। মাটির পুতুল কিনবে গাঁয়ের লোকে, ওরা গাঁয়ে কেনে না, কেনে মেলায় এসে। সে মেলা তীর্থের মেলা।

গঙ্গাতীর্থে নিত্যই ছোটখাটো মেলা, নিত্যই যাত্রী আসে। পর্বে পার্বণে হাজারে হাজারে যাত্রী আসে, তাদের টানে তখন বর্ধমানের বাজারও ভাঙে। বর্ধমান ফেলে দোকান-দোকানী ছোটে তারকেশ্বর ত্রিবেণী। এ পুতুল সেখানে কিনবে লোকে। কিন্তু তারকেশ্বর যেতে শেষ পর্যন্ত তার মন ওঠে নি। গঙ্গা নাই, গঙ্গামাটি নাই। তার থেকে ত্রিবেণী ভাল। মগরা ত্রিবেণী। গঙ্গাতীর্থের পার্বণ বছরে অনেকগুলি। ত্রিবেণী ভাল। তাই ত্রিবেণীতে এসেছিল সে বর্ধমান থেকে।

ত্রিবেণী থেকে এসেছে সে চন্দননগর। ত্রিবেণীতে সে নিজেকে গড়ে নিয়েছে। দেহটা তার

ফুলে উঠেছে, এমন চমৎকার খাঁজগুলি ফুটেছে যে সে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায়। মাটি খুঁড়ে, মাটি বয়ে, অনেক খেটেছে। গঙ্গায় সাঁতার কাটে নিয়মিত। খেয়েছে পেট ভরে। তার কাজের হাতও খুলেছে আশ্চর্য রকমের; তেমনি খুলেছে মন আর বুদ্ধি। দিন দিন নতুন পুতুলের কথা মনে আসে। যা দেখে ভাল লাগে তাই তার পুতুল ক'রে গড়তে ইচ্ছে হয়। তার পর ভাবে কেমন ক'রে এর ছাঁচ হবে। ব্যাণ্ডেল জংশনে একটা পুরনো গির্জে আছে। ভারী ভাল লেগেছিল তার। সঙ্গে সঙ্গে মাটির অবিকল একটি গির্জে তৈরি করেছিল। ওটা আর সাহেবদের কাছে সে নিয়ে যায় নি। বর্ধমান থেকে ও লোভ তার চলে গিয়েছে। লোভ নয়, ছ্যাঁচড়ামো। মূর্তিটাকে সে দোকানের সামনেই সাজিয়ে রাখত। লিখে দিয়েছিল—বিক্রীর জন্য নয়। বাড়ীতে উঠোনে পুতুল পোড়াবার জন্যে ছোট ভাঁটাও তৈরী করেছিল ত্রিবেণীতে। ত্রিবেণীতে প্রায় তিন বছরে হাতে জমেছিল পাঁচশো টাকা। ব্যাঙ-প্রজাপতি, পরীর মাথায় ব্রাকেট, পরী, পুলিশ, ফলওয়ালী—অনেক রকম পুতুলের ছাঁচ তৈরী করেছে। সব থেকে বেশী বিক্রী হয় ক'নে পুতুল। একটি কিশোরী মেয়ের মূর্তি। অনেকবার ভেঙে সে তৈরী করেছিল ভুবন পালের সেই মূর্তির মত। প্রভেদ—মলিন পুতুলের হাতে দিয়েছিল গাঢ় লাল রঙের সুতোর তৈরী মালা, আর মাথায় দিয়েছিল মুকুট; কপালে কনে চন্দন, সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, পরণে বেনারসী। পুতুলটি দেখলেই লোকে দুদণ্ড তাকিয়ে দেখত। কিনেও নিয়ে যেত। দাম করেছিল ষোল আনা—এক টাকা। চন্দননগর ক'বছর ধ'রে তিল তিল করে তার মনে একটা আশ্চর্য মোহের সৃষ্টি ক'রেছে। ত্রিবেণীর রং ফিকে করে দিয়েছে।

ত্রিবেণী ইদানীং আর তার ভাল লাগছিল না। গাছপালা জঙ্গল পাড়াগাঁ। সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার নিঝুম। তার ভাল লাগবে কেন? তার চাই শহর, মানুষের হাতের গড়া রঙীন জামা, রঙীন কাপড়, তুলো পাকিয়ে সুতো, সুতোয় বোনা কাপড়, তাতে নক্সার বাহার; তামা রং গালিয়ে মিশিয়ে ঢালাই করে পেটাই মাজাই ক'রে চকচকে বাসন; তার চাই চামড়া রাঙিয়ে পালিশ করে তার জুতো। ফুল চোলাই করে গন্ধ। তিল পেশাই ক'রে তেল। রঙ করে গন্ধ মিশিয়ে শিশি বন্দী তেল। তার চাই ঝকঝকে আলো। তার চাই রূপের হাট। তার চাই মত্ত উল্লাসে হা-হা ক'রে হাসবার জন্যে ভাল মদ। তার এইবার চাই বড় বাজার। বড় হাট। চন্দননগরের লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারে পোস্তা বাঁধানো গঙ্গার ধারের বাঁধানো পথের উপর রথের মেলা। ফরাসী সায়েবদের কি ডে যেন—বাস্তিল ডে—না কি—তার মেলা, ওখানকার চমৎকার মদের দোকান এবং মদের স্বাদ, ওখানকার রূপের হাট দেখে তার মনে হয়েছিল—এই জায়গাতে তাকে আসতেই হবে। সে মনে হয়েছিল তার অনেকদিন আগে। ত্রিবেণীতে প্রথম এসে আস্তানা পেতে যেদিন প্রথম চন্দননগর দেখতে আসে সেইদিনই মনে হয়েছিল। তারপরও ত্রিবেণীতে সে ছিল তিন বছরের উপর। তিন বছর ধরেই কথাটা মনে মনে জপেছে সে। কিন্তু হয় নি, পারে নি ত্রিবেণী ছাড়তে। ছাড়ালে এই টিয়া! টিয়ার জন্যই রঘু-দস্তির সঙ্গে তার ঝগড়া হয়ে গেল। রঘু-দস্তি দস্তি হোক মলিনের সত্যকারের হিতকামী বন্ধু ছিল।

চার

ত্রিবেণীতে পরম-বন্ধু রঘু-দস্তির সঙ্গে টিয়ার জন্যই বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এই টিয়া, যে আজ ফুলে ফুলে কাঁদছে। রঘু শাসিয়েছিল, ওর জান নেবে। মলিন শাসায় নি, বলেছিল—দেখা যাবে। তারপরই দশ-পনের দিনের মধ্যে চন্দননগরে বাড়ী-ভাড়া ক'রে, তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছাঁচগুলি দিনে দিনে সেখানে সরিয়ে নিশ্চিন্ত এবং ঝাড়া-হাত-পা অর্থাৎ কোন ভার-বোঝার বালাই না রেখে শুধু ছুরিখানি সম্বল ক'রে রাত্রে বন্ধুর সঙ্গে মোকাবিলা করে সটান এসে উঠেছিল চন্দননগরে। অবশ্য ছুরি মেরে রক্তারক্তি করে নি, হাতেই মেরেছিল, কিন্তু সে মারও উপেক্ষার নয়। যে মুখে রঘু শাসিয়েছিল, তার সেই মুখে ঘুষি মেরে কেটে দু-ফাঁক ক'রে দিয়েছিল, আর পেটে মেরেছিল এক লাথি। চন্দননগর নিরাপদ আস্তানা। এটা ফরাসী সাহেবদের এলাকা। ত্রিবেণীর পুলিশের নাগালের বাইরে। মার খেয়ে রঘু-দস্তি সোজাসুজি শোধ নেবার চেষ্টা করলে মলিন ভয় পায় না। কিন্তু রঘু শোধ নেবার সময় সোজা-বাঁকার ধার ধারে না ; শোধ তার লক্ষ্য ; তাই এমন ক্ষেত্রে সাধারণত সে বাঁকা পথই ধরে, আর ত্রিবেণীতে বোঝাপড়া হলে একতরফা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী ছিল। ত্রিবেণী রঘু-দস্তির তিন-পুরুষের বাড়ী। ছেলে বয়স থেকে রঘু-দস্তির দল আছে। বাঁকা পথে দল বেঁধে নিজের এলাকায় বিদেশী একজনকে খুন করে গুম করতেই বা কতক্ষণ লাগে? চন্দননগরে আসবার এটাও একটা কারণ। তাই সে চন্দননগরে এসেছে এবং রঘুকে বলেও এসেছে যে শোধ নেবার ইচ্ছে যদি থাকে তার তবে সে যেন চন্দননগরে যায়। চন্দননগরেই সে তাকে পাবে।

রঘুর সঙ্গে মিতালি হয়েছিল হাতাহাতি ক'রে, ছাড়াছাড়ি হল ঘুষোঘুষি করে। বর্ধমান থেকে সে ত্রিবেণী এসেছিল অনেকটা হঠাৎ-আসার মত। বর্ধমানে মাটির তৈরী রাজবাড়ী, ফটক এবং মন্দিরের নক্সা পুতুলগুলি মনের ক্ষোভে যেমন হঠাৎ কেষ্টসাগরের জলে ফেলে দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ সংকল্প করেছিল, এখানে আর নয় ; এবং কাল থেকেই আর নয়। তখন থেকে রাত্রি পর্যন্ত ভেবেছিল—তবে কোথায়? তারকেশ্বরে না ত্রিবেণী? মন বললে ত্রিবেণী। ব্যস, বেঁধে ফেললে জিনিস পত্র। তখন আর নবদ্বীপের অবস্থা নয়। কিছু জিনিস-পত্র হয়েছে। একটা ট্রাঙ্ক, একটা বিছানা, পুতুল নেবার একটা প্যাকিং বাক্স। যন্ত্রপাতির একটা আলাদা টিনের স্যুটকেস। টিয়া কাঁদছে তার সামনে, আর সে নিঃশব্দে বসে অতীত কথাগুলো স্মরণ করছে। শেষরাত্রে বর্ধমান স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়েছিল।

সঙ্গে সম্বল গোটা তিরিশেক টাকা। রেলে মাশুল লাগল। তা সে দিলে। ওদিকে তার মেজাজটা খাঁটি। পয়সা সে ফাঁকি কাউকে দেবে না। ত্রিবেণী পৌঁছতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। খুঁজেপেতে, গঙ্গাস্নানের যাত্রীরা যে পাড়ায় বাসা নেয়, সেই পাড়ায় একটা বাসা

নিয়ে সে-বেলার মত চিঁড়ে দই কলা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল। বিকেল বেলায় স্থায়ী বাসার খোঁজে বের হয়েছিল। বাড়ী চাই একটেরে। উঠোন চাই। গঙ্গার কাছে হওয়া চাই। তা না হ'লে তার চলবে না।

বিধাতা পুরুষের ব্রহ্মাঠাকুরকে পৃথিবীর জন্যে ভাড়া দিতে হয় কি না সে জানে না, তবে পৃথিবী না পেলে গাছপালা, পশুপাখী, ফড়িং-প্রজাপতি, মানুষ গড়ে সে রাখত কোথায়? কয়েকখানা ঘরই সে দেখে সেদিনের মত ফিরে এসেছিল বাসায়। পরের দিন সকালে ঘাটের ধারে একখানা বড় চ্যাটাই বিছিয়ে পুতুল সাজিয়ে দোকান খুলে বসেছিল। বেশী পুতুল ছিল না; কিছু ব্যাং কিছু প্রজাপতি, কিছু—ক'নে পুতুল। সবই তখনও কাঁচা মাটির। যাত্রী খুব বেশী ছিল না। বিক্রী সামান্য হয়েছিল। তবে সকলে প্রায় থমকে দাঁড়িয়ে একবার না-দেখে পারে নি। তাতেই মনে ভরসা পেয়েছিল সে। রূপ যদি চোখে ধরে তবে মনে তাকে পাবার সাধ জাগাবেই এবং সে রূপ যদি নিত্য চোখে পড়ে তবে পাবার সাধও বাড়বে গ্রীষ্মকালের আগুনের তাপের মত, শিখার মত।

এই ভাবনার মধ্যেই তালভঙ্গ করে মূর্তিমান বেতালের মত এসে দাঁড়িয়েছিল রঘু-দস্যি। তখন অবশ্য রঘু-দস্যিকে চিনত না সে। তবে দেহখানাতে এবং কণ্ঠস্বরে তার পরিচয় কিছুটা ছিল। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে তার দিকে, তারপর পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে ভারীগলায় থেমে থেমে বলেছিল—

—পুতুল। হুঁ।···চেহারাখানা তো বেশ বাবু কার্তিকের মত। হুঁ। কোথা থেকে এসেছ? এর পরেই আচমকা ধমকে উঠেছিল—এ-ই, ভাল করে ব'স।

মলিন দুই হাতের ছাঁদের মধ্যে হাঁটু দু'টোকে বেঁধে একটু আলগা হয়ে বসেছিল; এবং পায়ের পাতা দু'টোকে বেশ আরাম ক'রে দোলাচ্ছিল। মনের মধ্যে তার তখন রঙীন ভবিষ্যতের আমেজ লেগেছে। রঘু-দস্যির ভারীগলার গম্ভীর প্রশ্নগুলিতেও সে চকিত হয়ে সতর্ক হয়নি। সেই কারণে রঘু তাকে ধমকে উঠেছিল।

চমকে ওঠে না সহজে। চমকায় নি, তবে সতর্ক হয়েছিল, পা দোলানো থামিয়ে হাত দুটিকে মুক্ত করে একটু ভ্রূ কুঁচকে হেসেই প্রশ্ন করেছিল—মন্দ ক'রে বসে আছি না কি?

রঘুর চাউনির একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে। ঘাড় বেঁকিয়ে চোখের তারা দু'টি উপরের দিকে তুলে নিজের চোখের পাতা এবং ভ্রূর, লোমগুলি দেখতে দেখতে কথা বলে; ভঙ্গিটা অনেকটা যুদ্ধোদ্যত মহিষের দৃষ্টি-ভঙ্গির মত। শাসনের ঘোষণা তো আছেই, আক্রমণের উদ্যোগের আভাসও আছে, এই ভঙ্গিটির মধ্যে। সেই ভঙ্গিতে তাকিয়ে রঘু বলেছিল—হুঁ।···ত্রিবেণীতে এই বুঝি প্রথম?

—হাঁ। তা বটে। কাল এসেছি আমি।

—তাই।···আমি রঘু মিত্তির। লোকে বলে রঘু-দস্যি।···এখানে যে পুতুল সাজিয়ে বসেছ, হুকুম নিয়েছ?

—হুকুমের কথা তো জানি না।

—জান না, জেনে রাখো, জমিদারের হুকুম চাই, খাজনা চাই, আমার চাই। জমিদারের দৈনিক দু আনা, আমার এক আনা।

মলিন খানিকটা চুপ ক'রে বসে ছিল। জমিদারকে দিতে তার আপত্তি ছিল না। তবে ভাবছিল সেটা মাসিক হারে কি বার্ষিক হিসেবে দেবে সে? কিন্তু এই লোকটাকে কেন দেবে? এ যে নেহাতই গায়ের জোরের কারবারী তা বুঝতে তার বাকী নাই। তার দেহের জোর মনকে খোঁচা মারছে ঠেলা দিচ্ছে—হুকুম কর। কিন্তু প্রথমেই ঝগড়া করতে চায় না সে।

দাও, দাও। নয় তো মারব লাথি—চুরমার করে দেব সব।

তিন আনা পয়সা বের ক'রে রঘুর হাতে দিয়েছিল সে। রঘু পয়সা নিয়ে শান্ত হয়ে চোখের তারা নামিয়ে পুতুলগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করছিল। চোখমুখ সপ্রশংস হয়ে উঠেছিল, বলেছিল—বেড়ে হাত তো তোমার। চেহারাখানার মতই হে। এটা তো বেড়ে করেছ। ক'নে? বাঃ, এ যে ভারী সুন্দর ক'নে হে। বহুত আচ্ছা। হুঁ।···আচ্ছা এটা আমি নিলাম। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাব।

খপ ক'রে হাত চেপে ধরেছিল মলিন—না, তা হবে না।

রঘু কৌতুক অনুভব করেছিল—হুঁ, হাত ধরে আটকাবে? আমাকে? বলেই মেরেছিল একটা ঝটকা। ভেবেছিল তার ঝটকায় এই কার্তিকের মত চেহারার ছোকরাটি তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত নিয়ে কাতরাবে; ঝটকায় মুচড়ে যাবে হাতটা। কিন্তু ঝটকা মেরেই চমকে উঠেছিল রঘু। মলিনের হাত মোচড় খায় নি। শক্ত বটে তো ছোকরার মুঠি।

—হ্যাঁ? আচ্ছা—। আবার মেরেছিল ঝটকা।

এবারও ছাড়ে নি মলিন।

নিষ্ঠুর আক্রোশে ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল রঘু। মলিন তার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলেছিল—বেকায়দা হয়ে গেছে আপনার হাত। নইলে আমি রাখতে পারতাম না।

পুতুলটা রঘুর হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। প্যাকিং বাক্সের ভিতর থেকে আর একটা ক'নে পুতুল বের করে তার হাতে দিয়ে বলেছিল—নিন। আমার ক'নে আপনাকে দিলাম—এর পর ঝগড়া করলে চলবে না।

খুশী হয়েছিল রঘু। এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি তো বেশ হে।

—হ্যাঁ। তা আমি বেশ বটে।

—দেখি। বলেই রঘু তার হাতের গুলি, বুকের ছাতি পরীক্ষা করে দেখেছিল। এবং কোমরের ছোরার বাটখানা হাতে ঠেকতেই তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল —আ—চ্ছা। দেখি যন্তরটা?

যন্ত্রটা দেখে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল—তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার মিলবে ভাল।

কি নাম? দেশ কোথায়? এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরেই বেড়াও বুঝি? না—পুতুল-টুতুল বাইরের ঢং। ভিতরের আসল রঙ আলাদা! কি ব্যাপার?

—নাম মলিন দাস। দেশ-টেশ নেই। ছিলাম বর্ধমানে। কারবার চলল না। এখানে এসেছি, গঙ্গার ধার তীর্থস্থান। যদি চলে তো থাকত। কারবার একটাই। এই পুতুলের। তবে ভয় কাউকে করি না, ভয় কাউকে দেখাইও না। মার খেলে মারতে ছাড়ি না। তাই ওটা রাখি। পুতুল পালিশ হয়, ছাঁচ ছোলাই হয়, খোদাই হয়, আবার দরকার পড়লে—হেসেছিল মলিন।

—বহুত আচ্ছা। এই ক'নের বদলে দোস্তি হল তো মার সঙ্গে। হাত ধরেছিল রঘু।

হেসে মলিন বলেছিল—হল দোস্তি।

—মদ খাও?

একটু হেসেছিল মলিন এবার।

—বহুত আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় নেমন্তন্ন তোমার।

সন্ধ্যের আসরে চন্দননগরের মদ খাইয়ে চন্দননগরের সন্ধান প্রথম তাকে রঘুই দিয়েছিল। সে আসরে আরও একটু ঘটনা ঘটেছিল। একটা আধা-স্বৈরিণী মেয়েকে নিয়ে এসেছিল রঘু। মেয়েটার চটক একটা ছিল, রঘুর তা ভাল লাগত, মলিনের ভাল লাগে নি।

রঘু তাকে হাত ধ'রে এনে চোখের ইশারা হেনে মলিনকে বলেছিল—ক্যায়সা হ্যায়?

মলিন হেসে বলেছিল—তুমি বল না। আমার ক'নে পুতুল তো দিয়েছি তোমাকে।

—আরে ও তো স্রিফ মাটি।

—দুই-ই এক ভাই, এ জল পড়লে গলে, আছাড় খেলে ভাঙে, ও আগুনে পুড়ে ছাই হয়, আছাড় খেলে খেঁতলে যায়। সে কাদা ধুলোর চেয়েও ঘেন্নার। ও তুমি রাখ। ওতে আমার দরকার নেই।

তিন বছর তার রঘু-দস্তির সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে কেটেছে। কতবার ঝগড়া হয়েছে, কতবার মিটেছে। পাঞ্জা-কুস্তি তো প্রতি দিনই লড়েছে। মলিন জেতে নি কখনও তবে সমান সমান গিয়েছে অনেকবার। শেষের বার কি হয়ে গেল। রঘুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল মলিন। রঘুর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভোজ্য নারী। পার্বণে-পর্বে গঙ্গা-স্নানের যোগে—রঘু প্রতিদিনই নারী-সংগ্রহ করে আনত। হারানো মেয়ে স্বেচ্ছাচারিণী নারী, কিন্তু তার এ সবগুলিকে দেখেও মলিন নাক কোঁচকাত। শুধু পর্বে-পার্বণেই নয়, সাধারণ সময়েও রঘু-দস্তির এ ভোজ্যের অভাব হ'ত না। এদিকে রুচি ওর বাঘের মত; শিকার দেখলেই ক্ষুধা থাক বা না থাক ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবৃত্তি জাগে। মলিন সন্ন্যাসী নয়, কিন্তু রুচি ওর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

গাল দিয়ে রঘু বলত—তোর কপালে ও আর জুটবে না এ আমি বলে দিলাম। তুই পুতুল নিয়েই থাকবি।

হেসে মলিন বলত—তাও তো তোকে দিয়েছি মিতে।

মধ্যে মধ্যে পর্বে স্নানের যোগে, যাত্রী সমাগমের মধ্যে মলিন চঞ্চল হয়ে উঠত। তার দোকানে ভিড় জমত। তাদের মধ্যে তার দৃষ্টি তৃষ্ণার্তের মত সন্ধান করত কার মধ্যে আছে তার তৃষ্ণাহরা রূপ। পুতুলের রূপের হাটের সামনে বসে যেত তরুণীদের রূপের হাট। ছায়ার টানে যেন কায়া আসত। রঙের মায়ায় মরীচিকা কায়া ধরে শত তরঙ্গে উথলে পড়ত কলস্বর তুলে। তাদের কেশ-সৌরভে বুক ভরে যেত। হাতে হাতে পুতুল দিতে পয়সা নিতে—কোমল স্পর্শ অনুভব করে উন্মনা হয়ে উঠত। রঘু ফিরত আশে পাশে।

নিরালা পেলেই জিজ্ঞাসা করত—চোখে ধরল কাউকে ?

হাসত মলিন। কিন্তু তার চোখ দেখে রঘু তার পাশে বসত।

—আমি তোর পাশে বসছি। পছন্দ হলে আমার হাত টিপে ইশারা দিবি।

—কি করবি ?

—সে রঘুর দল বুঝবে। তুলে নিয়ে আসব রাত্রে।

—উঁহু।

—কেন ?

—জোর ক'রে তুলে আনলে মানুষের দেহটা আসে, মানুষটা আসে না।

তার কথা শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে রঘু বলত—তবে পাবি কি ক'রে শুনি ?

—পায়ে হেঁটে আসবে।

—তোর কার্তিকের মত চেহারা দেখে ?

—নয়ই বা কেন ? তোরাই বা ছুটছিস কি দেখে ? তোরা ব'স্ না। ওরা আসুক।

—ভাগ। তাই আসে ?

—আসে।

মলিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নির্বোধের মত চেয়ে থেকে সে বলত—শা—! অর্থহীন প্রলাপের মত বলে চলে যেত, আবার ঘুরে আসত। চেপে ব'সে বলত—এইবার ঠিক হয়েছে।

—কি ?

—বল কাকে পছন্দ, টিয়া ছুঁড়িটাকে লাগাব। সে গিয়ে বলবে। বাজি রাখছি, নিশ্চয় আসবে।

ভিক্ষুকের মেয়ে ভিক্ষুণী, বুড়ো গোপাল পটোর মেয়ে টিয়া। বয়স তখন এগারো-বারো কি তের। গোপাল পটো ঘাটের পাশে ব'সে মন্দিরে বাজিয়ে ধরাগলায় গঙ্গা-মাহাত্ম্যের অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভের গান করত। টিয়া এবং টিয়ার একটা হাবা ছোট ভাই, নাম ফড়িং —করত তার দোহারকি। ত্রিবেণীর কাছেই গ্রামে ওদের বাড়ী, সে বাড়ীতেও ভাঙা ঘর। তবু সন্ধ্যায় চলে যেত সেখানে, আবার সকালে উঠেই চলে আসত।

সেই বয়সেই টিয়া মেয়েটা পেকেছিল। মুখে কাপড় দিয়ে হাসত। বেঁকিয়ে কথা বলত। হেলে দুলে চলত। অনেক জনেই ওকে নিয়ে রহস্য করত। ইঙ্গিত ক'রে কথা বলত। টিয়া

ঘাড় বেঁকিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে মৃদুস্বরে জবাবও দিত। হাটে ঘাটে বাজারে ভিক্ষে ক'রে ফিরে শুধু দীঘির জলই খায় নি, পঙ্ক-পল্বলের ঘাটের খবরও জেনেছে। টিয়া আবদার ক'রে কথা কইত, আজও কয়।

"তোমার কাছে চাইব না তো চাইব কার কাছে"? "তুমি আমার জীবনধন—শ্যামচাঁদ!"

যে যেভাবে নেয় সে কথা। কথাগুলি ওদের সম্প্রদায়ের প্রাচীনকালের বুলি। আরও গাঢ়রসের বুলিও জানে টিয়া। বলে, "মনের মধু পরাণ বঁধু। আমার ধন মান সব তোমার হাতে, পোড়া পেট মানে না, তাই তোমার কাছে হাত পাতি।" "রাঙা লয়, কালো হাত। সোনা চাই না রূপা চাই না। তামার পয়সা।"

"আ মরে যাই। তোমার বালাই নিয়া আমার মরণ হোক।"—এ কথাটা তো মুখে লেগে আছে। সামান্য কোন দুঃখের আভাস পেলে বলবেই।

এইসব জাত-বুলিগুলি টিয়ার মুখে পাখীর বুলির মতই মনে হত। পুরুষানুক্রমে শেখা কথা, বলতে হয়, বলে যায়। কিন্তু টিয়ার নিজের কথাও হয়েছে। আড়চোখে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলত—পয়সা তোমরা দেবে না তো আমরা খাব কি। কিন্তু তুমি পাষাণ বটে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল দেখি দিব না।

রঘুর মত তরুণ নাগরেরও অভাব নেই। দেশেও নাই, কালেও নাই। নানান ধরনের আছে। যার মনের প্রদীপে যেমন তেল—তেমনি আলোর ছটা, কালির ঘটা। রঘুর প্রদীপটি কেরোসিনের ডিবে, আলো যত লালচে তত তার কালি। সে সোজা ইঙ্গিত জানিয়ে কথা বলে হি হি করে হাসত। টিয়াও মুচকি হাসত। একদিনের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল মলিন। মেয়েটার হাত ধরেছিল রঘু। সে বলেছিল—ছাড় বাবু, ছাড়। তুমরা মানত ক'রে পদ্মকলি গুলান পটপটিয়ে ছিঁড়ে ঠাকুরের পায়ে দাও। মাটির ঠাকুরের নাক নাই, চোখ নাই—সে তাই নেয়। কিন্তু তোমার তো চোখ আছে, নাক আছে, কলিটারে ফুটতে দাও তবে তুলিয়ো। বাস পাবে, চোখ জুড়াবে। হাত ছাড়। তুমি বরং বস, আমি তুমার চরণে হাত বুলায়ে দি।

ক্ষয়া চেহারা, মুখখানা শুধু টলটলে ছিল তখন। রঙটা ছিল চাপা, তার উপর যেন একটা ধূসরতার ছিলকে পড়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে মনে পড়ত, ত্রিবেণীর মজে যাওয়া যমুনার কথা, গ্রীষ্মকালের যমুনা। না। যমুনা নয়। যমুনা বোবা। মেয়েটা যেন বিশীর্ণা পাহাড়ী ঝর্ণার মুখের দিকটা; গা ভাসিয়ে স্নান দূরে থাক হাঁটু ডোবে না, কিন্তু কলস্বরে তরঙ্গিনীর মতই মুখরা। মেয়েটা চলতও নেচে নেচে।

এই টিয়া। তা টিয়ার অসাধ্য কিছু ছিল না। তা' সে পারত। দূতীগিরি করবার যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু মলিন বলত—না। দেখি না, ভাগ্যে কি আছে। ভগবান এমন রূপ দিয়েছেন—সে রূপে নিজে ভুলে যাকে চাইলাম সে যদি নাই-ই এল তবে রূপের দাম কি?

—রূপের গরবেই গেলি।

—দেখি না।

পাঁচ

দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে চারে পড়েছিল। এই ভাবেই কাটছিল রঘুর সঙ্গে। মদ খেয়ে মাতামাতি হাতাহাতি করে; হঠাৎ বিচ্ছেদ-ঘটানো নিরোধ হয়ে গেল। বিরোধ হল এই টিয়া মেয়েটাকে নিয়েই।

তার আগে প্রায় বৎসর খানেকের বেশী টিয়াকে আর দেখা যায়নি ত্রিবেণীর ঘাটে। গোপাল পটো হাবা ফড়িংয়ের হাত ধ'রেই ইদানীং আসত—ভাঙা গলায় গান গাইত। গঙ্গামাহাত্ম্য। পীর-মাহাত্ম্য। পটুয়ারা না হিন্দু, না মুসলমান। হাবা ফড়িং তার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গোপালের ভাঙা কণ্ঠের সুরকে বেসুরো ক'রে তুলত।

প্রথম প্রথম লোকে গোপালকে জিজ্ঞাসা করত।—টিয়া কই গোপাল? সে আসে না?

গোপাল বলত—আর আনি না বাবা। ডাগর হল মেয়েটা। বিয়া-সাদী দিতে হবে। আর সঙ্গে আনলে মন্দ কইবে পাড়পড়শী। মেয়েটারে পাটকাম শিখতে দিছি আমার দিদির ঘরে। আমার গাঁ থেকে কোশখানেক দূরের গেরাম।

মেয়েকে পাঠিয়ে গোপালের কিন্তু সংকট এসেছিল জীবনে। ভিক্ষের পরিমাণ নিতান্তই কমে গিয়েছিল। মধ্যে মধ্যে মলিনের দোকানের সামনে ব'সে দুঃখ গাইত।—দিন আর চলছে না বাবা। সারাটা দিনে বাপ-বেটায় দশটা পয়সা। খাব কি? দুটো পেট!

গোপালের অভিপ্রায় মলিন বুঝত। কিন্তু ভিক্ষে সে নিজে করেনি—কেউ করলে তাকে তার ভাল লাগত না। ভিক্ষে সে দেয় না। ওই টিয়াও কোন দিন তার কাছে ভিক্ষে আদায় করতে পারেনি। রঘু কতদিন টিয়াকে বলেছে—ওই ওর কাছে যদি একটা পয়সা আদায় করতে পারিস তবে আমি দুটো পয়সা দোব। দুটো নয়, চারটে।

টিয়া প্রায় একটা বেলা তার শেখা সকল বুলি নিঃশেষে বলে হার মেনেছিল। কটাক্ষ, অভিমান, দীর্ঘশ্বাস, ছলাকলার যত অস্ত্র তার তূণে ছিল সব প্রয়োগ ক'রে অবশেষে—'দূর বেরসিক', বলে উঠে চলে গিয়েছিল। হা হা ক'রে রঘু হেসে উঠে তাকে ডেকে বলেছিল—নিয়ে যা। পাঁচটা পয়সা আমার কাছে নিয়ে যা। ওর এক পয়সা আমার চার পয়সা।

—না, আমি নিব না। আমি হারেছি। আমি নিব কেন ভিখ মাগি, পয়সা নি, সে আলাদা কথা। ই আমি নিব না।

মলিন এবার বলেছিল—গান শোনা, পয়সা দেব।

—তবু ভাল। তাই শুন। গাইতে বসে গিয়েছিল মেয়েটা।

'ও নিঠুর কালিয়া, অবলায় দুখ দিলিরে নিঠুর কালিয়া।
সরম-সিন্দুর-কৌটা ভুলায়ে হ'য়ে নিলিরে, চতুর কালিয়া।

মরম-হরিণী মোর—
মন-বনে সুখে ভোর—
বাঁশুরীর সুরে তারে আনিয়া বাঁধিলি রে—কপট কালিয়া।'

গান শুনে মলিন তাকে পয়সা দিয়েছিল। একটা আনি। আনিটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে সশব্দে চুমু খেয়ে ছলাকলা-পটীয়সী মেয়েটা বলেছিল—রাঙা হাতের আনি, আমার তেষ্টার পানি, ষোল আনির চেয়েও দামী।

একটা দো-আনি ফেলে দিয়ে রঘু বলেছিল—আমারটা ?

—তুমারটা আমার মুখের পান, চুলের তেল, খোঁপার ফুল।

টিয়া অভাবে এ রোজগার গোপালের বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোপাল দুঃখ গেয়ে বেড়াত। বেশী গাইত মলিনের কাছে। কেন গাইত সে-ই জানত। মলিন ভিক্ষে দেয় না, দিত না। এ সব সময় মলিন সেই পুরনো মলিন হয়ে যেত। চুপ ক'রে বসে থাকত আর অকারণে আগের মত ঘাড় দোলাত। গোপালের দুঃখ শুনে অস্বস্তি অনুভব করত।

গোপাল বলেছিল—কিছু দয়া কর না বাবা।

—না। স্পষ্ট বলে দিয়েছিল মলিন।

—কপাল। বুঝলা না বাবা।

—কপাল কিসের ? খেটে খাও না কেন ? খাট না আমার কাছে ? এই তো, মাটি কেটে আনবে ; মাটি মাখবে। তোমরা পটুয়া, তোমরা তো জান এ সব কাজ। পুতুল শুকোবে, তুলবে। ভাটায় পোড়াবার সময় বয়ে নিয়ে আসবে। কাজ কত রয়েছে। এই তো আমার কাছে বারোমাস তিনটে ছোকরা খাটছে।

গোপাল কপালে হাত দিয়ে বলেছিল—তাই তো বললাম গো। নসীব। পটুয়ার ছেলে হয়ে ই কামটা শিখি নাই। বাপ চাকর হয়েছিল মিয়াদের ঘরে। গরুর চিকিচ্ছা জানত, মিয়ারা গরুবাছুর দেখার কামে রেখে দিয়েছিল। বাঁধা মাইনে। মিয়াদের বাড়ীতে ঘর দিয়েছিল থাকতে। আমি হয়েছিলাম পেথমে গরুর রাখাল। তার পরেতে মাহিন্দার। শেষ য্যাখন মিয়ারা ধুয়া ধরলে কি, ধরমে য্যাখন আমরা ইসলাম ত্যাখন আমাদের ইসলামী নাম নিতে হবে, খাওয়া দাওয়া সব ইসলামী করতে হবে, ত্যাখন নোকরী ছেড়ে পলায়ে এলাম। কিছুই শিখি নাই। ওই গান টান দু চার খান জানতাম, তাই গেয়ে ভিখ মাগি। তা' ই বয়সে আর কাম করতে লারব বাবা। আল্লা, সত্যপীর। গঙ্গা পতিতপাবনী।

বলে উঠে গিয়েছিল গোপাল।

এরই কিছু দিন পর। মাস চারেক। মাসখানেক গোপালও আসে নি।

হঠাৎ রঘু সেদিন এল—কালো মুখ তার থম থম করছে। চোখের চাউনিতে কি যেন

একটা ঝকমকানি ঝকমক করছে। কথার সুরে রন রন করছে তার আমেজ—উঠে আয়।

—কোথায় ?

বসে বসে আপন মনে ছাঁচের ভিতরে নরুন দিয়ে খোদাই করছিল মলিন। কাজ করতে করতেই জবাব দিলে। রঘু লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে খপ ক'রে হাত চেপে ধরলে—আয় না। রাখ ওসব। তার পরই বললে—কি পুতুল তৈরী করছিস ? আয়, দেখবি আয়। কারিগরের কেরামতি দেখে যা। রঙ হবার আগে দেখেছিলি—রঙ শেষ হয়েছে, দেখে যা কি হয়েছে।

—পুতুল ? কোন পুতুল ?

—আয় না বাবা।

হন হন ক'রে ,তার হাত ধরে প্রায় টেনেই নিয়ে চলেছিল। বাজার পার হয়ে বুড়ো কবরেজের কবরেজখানার সামনে হাজির হয়ে বলেছিল—দেখ !

রঘুর কথা সত্যি। তাই বটে। সদ্য রঙ-শেষ-হওয়া পুতুলই বটে। জীবন্ত পুতুল। টিয়া। সে-ই ক্ষয়া গড়ন, শীর্ণ শরীরে ধূসর মালিন্যের যে একটি আবরণ ছিল তার আর চিহ্ন নাই। বাতাসে উড়িয়ে-দেওয়া আগুনের উপরের ছাইয়ের মত উড়ে গিয়েছে। দেহের পরিপূর্ণতায় সে টলমল করছে, বর্ণের উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে। চোখ দুটিতে কৌতুক নাচছে, তবু যেন কিসের ভারে ঈষৎ ভারী হয়েছে চোখের পাতা দুটি। চোখের ক্ষেত আরও সাদা দেখাচ্ছে, গাঢ় কাল দেখাচ্ছে তারা দুটি। চুলগুলি কি চিকন কালো হয়েছে। সে পিঙ্গলতার এতটুকু চিহ্ন নাই। এবং এত বেড়েছে চুল। এক বছর ধরে কারিগর কি তুলিই না চালিয়েছে। সত্যি বলেছে রঘু, বলিহারি কারিগর।

মুখ ভরে হাসল টিয়া।

—ভাল আছ মোহন কারিগর ?

—মধ্যে মধ্যে ওই নামেই ডাকত সে মলিনকে। মলিন উত্তর দেবার পূর্বেই সে আবার বললে—বাবার ব্যামো। কবরেজ দেখাতে এনেছি।

গরুর গাড়িতে গোপালকে এনেছে। সঙ্গে ভাইটাও এসেছে। গোপাল চোখ বুজে পড়ে আছে, নিঃশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া হয়েছে। হাবা ফড়িংয়ের উপর ভরসা করতে পারে নি টিয়া, নিজে এসেছে সঙ্গে।

রঘু-দস্তি ত্রিবেণীতে দণ্ডমুণ্ডের শাসন কর্তা, কালভৈরব। সে এগিয়ে গিয়ে বললে—কারিগরের কাছে বাবার অসুখের খরচটা আদায় কর।

টিয়া বাপের অসুখের ভাবনার মধ্যেও কৌতুকে হেসে উঠল, টিয়া সেই টিয়াই আছে। চোখ ঘুরিয়ে বললে—করব না ? নিশ্চয় করব। মোহন কারিগর এমন সোনার টিয়ার দুখে দুখ মানবে না—তাই হয় কি গো কারিগর ?

মলিন চুপ করে রইল। ভাবছিল, টিয়ার ছাঁচ তুললে কেমন হয় ?

টিয়া আগের মতই আঁচল উড়িয়ে এগিয়ে এল এবং আদর জানিয়ে মৃদুস্বরে বললে—কথা

কও মোহন কারিগর। মনের মধু পরাণ বঁধু!

মলিন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে—উহুঁ। তোর বাবা যদি মরে তো ঘাটের খরচ কি গোরের খরচের সময় আসিস, দেব! বাপকে বাঁচিয়ে করবি কি? মরলে ও খালাস পাবে। তোর পথেরও কাঁটা ঘুচবে।

চলে এসেছিল মলিন। কিন্তু বুকের মধ্যে আবার তুফান উঠেছিল। যেমন তুফান উঠেছিল নবদ্বীপে ভুবন পালের গড়া পুতুল দেখে। কিন্তু তবু যেন তার মধ্যে একটা অস্বস্তি ছিল। মেয়েটার রঙ আছে, রস আছে, গান আছে, কিন্তু সে গন্ধ নেই। আর যেন কি নাই। ভুবন পালের গল্প মনে পড়ছে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াত, পাল শব্দ শুনতে পেত না, চুলের গন্ধে বুঝতে পারত। সে মিষ্টি ক'রে বলত—ভাল আছেন! অসুখের সময় কপালে জলপট্টি দিয়ে দিত। তাকে ডাকলে পাওয়া যায় না। তাকে ডাকতে হয় উপরের দিকে মুখ তুলে। এ ডাকলেই আসে।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরে সে অবাক হয়ে গেল। দাওয়ার ওপর রঘু-দস্তির একজন চেলা বসে আছে। তার নিজের মাইনে করা ছোকরা দুটো নাই। রঘুর চেলা বললে—রঘুদা তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে।

—কেন?

—এই চাবি নিয়ে ঘর খুলে দেখ।

মলিনের নিজের তালাটা ভাঙা পড়ে আছে। তার জায়গায় নতুন তালা ঝুলছে। সে প্রশ্ন করলে—এ তালা? আমার তালা কে ভাঙলে?

—রঘুদা। চাবী নাও। কিন্তু খুব সাবধান। রঘুদা চন্দননগর গিয়েছে মদ আনতে। আমি নৌকো ঠিক করতে চললাম। বলেই সে চলে গেল।

তালা খুলে সে চমকে উঠল। মুখে-কাপড়-বাঁধা হাত-পা-বাঁধা টিয়া পড়ে আছে। বুঝলে রঘু এনেছে। কিন্তু হাত-পা বাঁধা কেন? খুলে দিলে মুখ। টিয়া মুহূর্তে কেঁদে উঠল—আমারে ছেড়্যা দাও কারিগর।

—এলি কেন?

—রঘুবাবু জোর করে এনেছে গো।

—জোর করে?

—হ্যাঁ। কাল আমারে বুলেছিল—বাবার চিকিৎসার লেগ্যা চাঁদা ক'রে টাকা তুলে দিবে। তুম চলে এলে তখুন রঘুবাবু কইলো। আমি বুলে ছিলাম—টাকার কি হবে বাবু? আমি জানতাম—আমি টাকা চাইলে রঘুবাবু তুলে দিবে। রঘুবাবু বুলেছিল—কাল আসিস। দিব তুলে টাকা। সেই ভরসায় এসেছিলাম। ইটা ভাবতে পারি নাই। ভেবেছিলাম—হেসে কথায় রঙ্গরস ক'রে যেমন ভুলায়ে চলে আসি তাই আসব।

—নিজের চেহারা দেখিস নি আয়নায় কি পুকুরের জলে?

রাঙা হয়ে উঠেছিল মেয়েটার মুখ। কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বোধ হয় নিজেকে

সম্বরণ ক'রে বলেছিল—নিজেরে আমি বেশী চতুর ভেবেছিলাম কারিগর।

—চাতুরী করতে গিয়ে হারলে তার মাশুল লাগে। তাই দিবি।

—না। না—গো। না। আল্লার কাছে, ভগবানের কাছে, মা গঙ্গার কাছে কি জবাব দিব আমি! ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে মেয়েটা।

—মানিস ওসব? তবে ডাক তাদিগে, তারাই তোকে রাখুক। এবার ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটা—আমার যে সাদী হবে; আমি তারে কি কইব? তারে যে আমি ভালবাসি।

—কে রে সে?

—আমাদের জাতের পটোর ছেলে। ভারী ভাল লোক। আমারে ছেড়ে দাও কারিগর, আমারে বাঁচাও।

—যাঃ। হাত পা খুলে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল মলিন।

শুধু ছেড়েই দেয় নি, ত্রিবেণী পার করে খানিকটা দূর পর্যন্ত দাঁড়িয়েও দিয়েছিল।

রঘু ফিরে শূন্য খাঁচা দেখে ক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। হয়তো তখনই একটা কিছু হয়ে যেত। কিন্তু চন্দননগর থেকে ফেরার পথে মদ্যপান ক'রে সে এমনই মাতাল হয়েছিল যে মারামারি করবার ক্ষমতা আর তার তখন ছিল না। উদ্যোগ-পর্বে দাপাদাপি করতে গিয়েই পড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। মলিন তাকে তুলে ঘরে তার বিছানায় শুইয়ে অনেক শুশ্রূষা করে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল। যতক্ষণ শক্তি ছিল ততক্ষণ রঘু কুৎসিত ভাষায় তাকে গালাগালি ক'রেছিল। কোনও বাদ প্রতিবাদ করে নি মলিন। সকালে জ্ঞান হয়ে উঠে রঘু মাথা ধরে চুপ ক'রে বসেছিল। মলিন শরবৎ করে এনে সামনে ধ'রে বলেছিল—খা।

—না। হাতের ঝটকা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল গেলাসটা—হারামী বেইমান কোথাকার!

হেসে মলিন বলেছিল—আমার ঘরে এনেছিলি কেন?

—তোর ঘরে আর কখনও আসব না।

উঠে পড়েছিল রঘু।

—মিতে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে রঘু বলেছিল—আজ থেকে ফারখৎ। আমি তোর দুশমন—আজ থেকে জেনে রাখিস। মরদের বাচ্চা যদি হ'স সামলাস।

নিদারুণ জ্বালাকর কোন রসায়ন-মাখানো একটা তীর যেন সশব্দে বুকে বিঁধেছিল। "মরদের বাচ্চা যদি হ'স তবে সামলাস।" মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠেছিল মলিন।

—তোর বাস ওঠাব এখান থেকে। তবে আমার নাম রঘু।

—আমি উঠেই যাব মিতে।

—উঠে যাবার আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া যদি না করে যাস তবে জানব তুই এক বাপের বেটা নস।

—রঘু! চীৎকার করে উঠেছিল মলিন।

রঘু ততক্ষণে চলে গিয়েছে বাড়ীর বাইরে। ওই চীৎকারে ক্রুদ্ধ পশুর মত আবার ঘুরে এসে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল—তোর জান নোব আমি। হাঁ।

মলিন বলেছিল—দেখা যাবে।

এরপর মলিন দিন-কয়েকের জন্যে সেই ছেলেবেলার মলিন হয়ে গিয়েছিল। নীরব অস্থিরভাবে অকারণে ঘাড় দোলাতো যে মলিন, যে মলিন সদর পথে হাঁটত না, মনের কাজটি করে যেত কারও কথা শুনত না যে মলিন, সেই মলিন।

চন্দননগরে সমস্ত ব্যবস্থা করে, যাবার দিন রাত্রি ন-টার পর সে নির্জন পথের একটা জায়গায় প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। রঘু-দস্যি এই পথে ফিরবে। একটা মেয়ের বাড়ী থেকে সে এই পথেই ফেরে। রঘু এ ক'দিনে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। মলিনের সঙ্গে কলহের জন্য অনুতাপ না হোক, মনে মনে বেদনা অনুভব করেছিল।

ভেবেছিল—একটা মিটমাট করে নেবে। কিন্তু রঘু সেই জাতের মানুষ যারা নিজে এগিয়ে গিয়ে মেটাতে পারে না। নইলে মিটে যেত এতদিন।

না। মিটত না। মলিন মেটাত না। তার রক্ত বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল রঘুর সেদিনকার তীরে। তা ছাড়া ওর রক্তের মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে যার জন্যে ওর সংকল্প কখনও শিথিল হয় না। ও ভুলতে কিছু পারে না। সব চেয়ে আক্রোশ ছিল ওর নিজের মায়ের উপর। মা ম'রে তাকে রেহাই দিয়ে গেছে। সেও গঙ্গাস্নান করে রেহাই পেয়েছে। আরও অনেক লোকের উপর তার আক্রোশ আছে। দেবীগ্রামের বাবুদের উপর, সেটা অনেকটা কমে গিয়েছে। হ্যাঁ, কমে গিয়েছে। পূজারী অনন্ত ঠাকুরের উপর, নবদ্বীপের ছোট পালের উপর, বর্ধমানের রাজার আমলাদের উপর। ভুলতে সে পারে নি। রঘুর সঙ্গে মিতালি ঘুচে গিয়েছে, রঘু নিজেই ঘুচিয়েছে—তার উপর কঠিন আক্রোশ মলিন ভুলতে পারত না।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি মলিনকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরমানন্দে গান করতে করতে ফিরছিল রঘু। মলিন তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেছিল—দাঁড়া।

—কে? ও, মিতে। রঘু সুযোগটা ছাড়ে নি।

—মিতে নয়। তুই নিজে বলেছিস দুশমন।

—ভাল। তাই। রঘু সোজা হয়ে খুঁট নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহিষের চাউনির মত সেই চাউনি ফুটে উঠেছিল তার চোখে।— কি চাস বল?

—যাবার আগে দেখা করে যেতে বলেছিলি। বলেছিলি—তা যদি না করি তবে আমি—।

হাঁ। তা আয়, হোক বোঝাপড়া।

তারপর নিঃশব্দে লেগেছিল লড়াই। রঘু ভাবতে পারেনি, মলিন নিজেও ভাবেনি যে এত শীঘ্র রঘু পড়ে যাবে। কিন্তু ঘুঁষিটা মারাত্মক হয়েছিল, উপরের ঠোঁটখানা কেটে দু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, গলগল করে রক্ত বেরিয়েছিল, সেই রক্তের স্পর্শের উষ্ণতায় রঘু ক্ষণেকের জন্য বিহ্বল হয়েছিল, সেই সুযোগে মলিন তার পেটে মেরেছিল লাথি। একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে পেটে হাত চেপে ধ'রে কুঁজো হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে ছিল রঘু, তারপর আর

পারে নি ; অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

ঝুঁকে ডেকে বলেছিল মলিন—আমি চন্দননগরে থাকব। বোঝাপড়া আবারও যদি করতে চাস তো যাস।

বলেই সে চলে এসেছিল চন্দননগর। রাত্রিটা অপেক্ষা করেছিল চন্দননগরের বাইরে। সকাল বেলা শহরে এসে ভাড়া করা বাসার দরজা খুলে ঢুকে বিছানা পেতে সারাটা দিন ঘুমিয়েছিল। পরের দিন থেকে সে আরম্ভ করেছিল কারবার।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ এসে হাজির হল টিয়া। বৈশাখ মাস তখন। দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। সমস্ত পথ জনহীন, পথের ধারে দোকানগুলোর দরজা আধখানা বন্ধ। দোকানে বসে দোকানীরা ঝিমুচ্ছে। নিজের দোকানে বসে মলিন স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল দুপুরের রোদের দিকে। মনে পড়ছিল বর্ধমানের গোলাপবাগের কথা। চন্দননগরের ভিতরে "দ"-এর মত বাঁকা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটার যেখানে মাঝের বাঁক, যেখান থেকে লক্ষ্মীগঞ্জের বাজারের পথটা এসে গঙ্গার ঘাটে পথে মিশেছে—প্রায় সেইখানে মলিনের বাসা। একটা গোটা বাড়ী সে নিয়েছে। ভিতরে ভাটা করবে, পুতুল পোড়াবে। এইখান থেকেই উত্তর দিকে গরীবের পাড়া। মলিন আধ-তন্দ্রায় ঢুলছিল ; আর গোলাপবাগের কথা ভাবছিল। হঠাৎ টিয়া এসে হাজির হল। পরিপুষ্ট মুখখানা দুপুরের রোদে রাঙা টকটকে দেখাচ্ছিল। ডাকলে—

—মোহন। মোহন কারিগর!

চমকে উঠেছিল মলিন।—কে ?

—আমি। টিয়া গো সোনা।

তারপরই বলেছিল—আঃ, চাঁদমুখ দেখে জীউটা আমার জুড়াল আজ!

তার রোগা বাপ গোপালের নিউমোনিয়া সেরেছে, তাকে আর ফড়িংকে নিয়ে চন্দননগরে এসেছে গোপাল। এখন খুঁজে খুঁজে এসেছে তার কাছে।

মলিন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল।

ফিক ক'রে হেসে টিয়া বলেছিল—অবাক হয়ে গেলে কারিগর আমাকে দেখ্যা ?

—কোথায় রয়েছিস এখানে ?

—গাছের তলায়। তোমার সোনার টিয়াকে ধরার লেগে চারিপাশে ব্যাধ জমেছে। টিয়া উড়ে এসেছে তুমার কাছে।

—কিন্তু কি জন্যে এলি দেশ ছেড়ে ?

—বাঁচবার লেগে, তুমার লেগে। শুনলাম তুমি হেথা এসেছ। হোথা গেরামে রঘুবাবুর দল ঘুরে বেড়াতে লাগল। বলে ফাঁক পেলেই তুল্যা নিয়া যাবে আমাকে। শুনলাম তুমি তার ঠোঁট দু'ফাঁক ক'রে দিয়ে হেথা এসেছ। আর ভরসা করতে পারলাম না কারিগর, বাবাকে আর ফড়িংকে নিয়ে হেথা চলে এলাম। তুমার ভরসায় মোহন! মনমোহন! মনের মধু! ঠাঁই দাও।

—না। ঠাঁই আমার নাই। ঘাড় নেড়ে বললে মলিন।

ঠাঁই দেবে ওই ঘাটের মড়াকে, ওই হাবাকে, এই ছলাকলাময়ী মেয়েটাকে? তার দোকানের সামনেই সাজানো ছিল সেই ব্যাণ্ডেলের গির্জের পুতুলটি। সেই দিকে চেয়ে রইল মলিন। এখানকার ফরাসী সাহেব-মেম ক'দিনই এসে দেখে গেছে পুতুলটা। কিনতেও চেয়েছে। সে দেয় নি। বলেছে—আর একটা না গড়ে সে দেবে না। তার দোকানের শোভা নষ্ট হয়ে যাবে। এখানকার গির্জে দেখে আর একটা গির্জে গড়বে সে। আর ওই স্ট্র্যাণ্ডের উপর ডুপ্লে সাহেবের মূর্তি আছে, তাও গড়বে। আরও অনেক গড়বে। দোকানে কাচের আলমারি করবে। রঙে-রঙে মূর্তিতে মূর্তিতে ভরে দেবে। ওই ঘাটের মড়াটা তার গোটা বাড়ীটা কুশ্রী ক'রে দেবে। না। তার অনেক সাধ। সে অনেক পুতুল গড়বে। কৃষ্ণনগরের যোগেশ পালের চেয়েও খাতির হবে তার। ঘর করবে বাড়ী করবে। সে বাড়ীর ভিতরটা কেশতেলের সুবাসে ভরে থাকবে।

—মোহন। মেয়েটা নাছোড়বান্দা। কিন্তু মেয়েটা চোখে যেন কি মাখিয়েছে। রঙ নয়, কাজল নয়, সুর্মা নয়, নেশা। গসার স্বরটা কেমন করে এনেছে, এও নেশার মত।

—আমি ফিরব না মোহন। আমি ফিরবার তরে আসি নাই।

মলিন কোন কথা না বলে উঠে দোকানের দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। অনেকগুলি ক'নে পুতুল সাজানো ছিল চটের উপর। রঙ দেওয়া হয় নি। তুলি নিয়ে রঙ দিতে বসল। হঠাৎ বাড়ির উঠানে কি একটা পড়ল। শব্দ উঠল। মলিন উঠে উঠানে বেরিয়ে অবাক হয়ে গেল। টিয়া গঙ্গার ধারের দিকের পাঁচিলে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়েছে। হাসছে সে। হাসতে হাসতে বলেছিল—আমি মিছা বলি নাই, কারিগর, ফিরব বলে আমি আসি নাই। চরণে আমাকে ঠাঁই দাও মোহন। আমি আর ভিক মেগে বেড়াব না। কারু সঙ্গে হেসে কথা কইব না। তুমি আমাকে বাঁচায়েছ; তুমি নইলে কার পায়ে নিজেকে দিব আমি? যার সাথে সাদীর কথা হয়েছিল তার দিকে আর আমি তাকাতে পারি না। পরাণ আবার ধু-ধু করে ওঠে।

বৈশাখের রৌদ্রেও কি নেশা লেগেছে? লাগবে কি, নেশাই একটা আছে, বৈশাখী রৌদ্রেও একটা নেশা আছে। কৃষ্ণপক্ষের স্তব্ধ দুপুররাতের যেমন একটা নেশা আছে, পূর্ণিমা, চতুর্দশীর প্রথম রাত্রে লালচে গোল চাঁদ যখন সবে দিগন্তের মাথায় ওঠে তখন যেমন একটা নেশা জাগে, বৈশাখের দুপুরেরও তেমনি একটা নেশা আছে। মলিনের মনে পড়ল দেবীগ্রামের প্রান্তরে বাগানে বৈশাখের দুপুরে মহুয়াগাছের মাথায় মৌমাছির ডাক। কানের পাশে নেশায় বুঁদ হয়ে তারা গান করে, সে বৈশাখের দুপুরের নেশা। আজ যেন তেমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ডাকছে। ঝঙ্কার উঠছে। পৃথিবী ঘুমিয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মুছে যাচ্ছে, মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। সত্য শুধু সে আর টিয়া। সে আর টিয়া। টিয়ার গালদুটো রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। অদৃশ্য কারিগর ওর মুখে সিঁদুরের ছিটে মেরে তুলি দিয়ে ঘষেছে। কি সুন্দর।

টিয়া তখনও বলে যাচ্ছিল—কারিগর, সব হারায়ে মানুষ বাঁচে, আবার হয়; ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সা যায় আবার হয় কিন্তু মন হারালে আর ফিরে পায় না মোহন। আমি সেই মন হারায়েছি তুমার পায়ে! রঘু-দস্তি আমাকে বেঁধে ঘরে ভরেছিল। জোর করে আমার ইজ্জৎ লিত—দেহটাকে তছনছ করে দিত ডাকাতের মতন। মোহন—ভিখিরীর মেয়ে আমি, হাসি-কথায় লোকের মন ভুলায়ে পয়সা রোজকার ক'রে খেয়ে বাঁচি, আমার আধা ইজ্জত তো আমি নিজেই বিলিয়ে দিছি। জাতে আমাদের পতিত করেছে। রঘু-দস্তির দস্তিপনাকে আমার ডর লেগেছিল কারিগর, সে আমাকে কাঙাল করত, কিন্তু পরাণ নিতে পারত না। কাঙালকে কি কাঙাল করা যায় মোহন। ধূলা কাঙালের গায়ের ভূষণ। সেই ধূলা বড় জোর বেশী ক'রে মাখাত। ঝেড়ে নিতাম, মুছে নিতাম, মা গঙ্গার জলে চান করে ধুয়ে নিতাম। বলতাম, পতিতপাবনী, এ ধূলা আমি মাখি নাই, দস্তিতে মাখায়েছে; তুমি ধুয়ে নাও, শুদ্ধ কর আমাকে। কিন্তু তুমি আমারে মুক্ত করলে, তিরপিনি পার ক'রে মাঠের পথে এগিয়ে দিলে, আমাকে ছুঁলে না। কারিগর, কেঁদেছিলাম আমি ছলা ক'রে, ভেবেছিলাম তুমি হয়তো দস্তিকে ফাঁকি দিয়া আমাকে নিয়া পালাবে! তা পালালে না। আমি মাঠের পথে ছুটেছিলাম হাসতে হাসতে; ভেবেছিলাম ছলেচি তুমাকে। হঠাৎ হাসি আমার ফুরায়ে গেল; যেন পিদীমের আলো দপ ক'রে নিভায়ে গেল। দেখলাম পিদিমের তেল তোমার চরণে উল্টায়ে ঢেলে দিয়ে এসেছি। মনটা আমার পরাণের মধ্যেই নাই। খাঁ খাঁ করছে, পরাণ-পুরী আঁধার, পরাণ-পুরী নিঝুম। মোহন কারিগর, তুমাকে নইলে আমি মরা। মরাকে তুমি বাঁচাও।

টিয়া সেদিন কথা বলেছিল—যেন গান করেছিল। বেদিনী যেমন সাপকে মোহিত ক'রে বিচিত্র সুরে গান করে, তুমড়ী বাঁশী বাজায় তেমনি ভাবে। গভীর রাত্রে কাক-জ্যোৎস্নার ছটা যেমন ভোরের কুহক জাগায় তেমনি একটা ছটা টিয়ার মুখে চোখে জেগে উঠেছিল। বৈশাখ-মধ্যাহ্নে সূর্যের রৌদ্র মাথায় করে দাঁড়িয়েও মলিন উত্তাপ অনুভব করতে পারেনি। টিয়াও তপ্ত মাটির উপর পড়ে দুটি হাতের উপর ভর দিয়ে কথা বলছিল, সেও বুঝতে পারছিল না উত্তাপ। কোন শব্দ না মানুষের সাড়া না, বাড়ীর পাশেই গঙ্গা, গঙ্গার কলকল, ছলছল শব্দ, তাও না। শুধু টিয়ার কথা। বেদেনীর গানের মত গান, আর পাচ্ছিল একটা গন্ধ। টিয়ার গায়ের গন্ধ। সে গন্ধ মিষ্টি নয়, মধুর নয়, তাতে কেশ-বিলাসের বাস-তেলের গন্ধ নাই; তাতে যেন—যেন কিসের গন্ধ! মাদকের গন্ধ! চন্দননগরের উগ্র মদের গন্ধের মত। একটা উত্তাল আবেগ বর্ষার গঙ্গার অমাবস্যার জোয়ারের মত কররোল তুলে চারহাত উঁচু হয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল তার সর্বাঙ্গে। এগিয়ে গিয়েছিল সে। অস্ফুট স্বরে ডেকেছিল—টিয়া! হাত-খানা বাড়িয়ে দিয়েছিল, কাঁপছিল সেখানা। তার জীবনের সাধের, সংকল্পের সব বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে ছুটেছিল বাসনার বন্যা গঙ্গার বন্যার মত। টিয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল তাতে বর্ষার ঝড় জলের মত।

—মোহন!

—টিয়া। শুধু তুই আর আমি। তোর রোগা বাবা নয়, হাবা ভাই নয়। না। তুই, শুধু তুই

উন্মত্ত আবেগে টিয়া তার গলা জড়িয়ে ধরেছিল।—তাই হবে মোহন। পরাণ বঁধু মনের মধু মোহন কারিগর।

সে আজ ছ মাসের কথা।

ছ মাস সে টিয়াকে নিয়ে প্রায় উন্মত্ত হয়ে আছে। ভুলে গিয়েছে, সব ভুলে গিয়েছে। মায়ের কথা ভুলেছে, দিদির কথা ভুলেছে, বাবুদের বাড়ীর মেয়েগুলির কথা ভুলেছে, অনন্তঠাকুর, যোগেশ পাল, নবদ্বীপ, ভুবন পাল, ছোট পাল, গোপেশ্বর, এমনি কি ভুবন পালের গড়া পুতুলটার কথাও আর তার মনে পড়ে না। তার ক'নে পুতুলের ছাঁচটা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। কি যে করলে, কোথায় রাখলে সে, তা তার মনে নেই। মনেও করতে পারে না। ভাবেও না খুব।

টিয়া আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বলিহারি সুমোহন কারিগর,—টিয়া তাকে বলে মোহন কারিগর—টিয়াকে গড়েছে যে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তার তুলি আজও চালাচ্ছে তার সারা অঙ্গে, তার নাম সে দিয়েছে সুমোহন কারিগর। তাকে সে বলিহারি দেয়, বাহবা দেয়। টিয়া যখন চান করে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফেরে তখন সবচেয়ে ভাল লাগে তার জলে ভেজা পায়ের পাতা দুখানি। ধব ধব করে—যেন শ্বেতপাথরের গড়া মনে হয়। সে মদ খায়, ভাল মদ। টিয়া পরম যত্নে উপচার সাজিয়ে দেয়। তার চোখ রাঙা হয়ে আসে, টিয়া হাসে। সে হাসিতে মদের চেয়েও মাদকতা।

দুর্যোগ রাত্রির অন্ধকার যেমন ক'রে সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে আত্মসাৎ করে, তেমনি ভাবেই সে টিয়াকে আত্মসাৎ করে; বৈশাখের দুপুরের রৌদ্র যেমন পৃথিবীর প্রতিটি পরমাণুকে শোষণ করে তেমনি করেই টিয়াকে শোষণ করে সে।

টিয়ার বাবা টিয়ার ভাই থাকত গঙ্গার ধারে একটা ভাঙা চালায়। গোপাল দাস এসেছিল একবার। টিয়া এসে আর ফেরে নি। তাই খোঁজ করতে এসেছিল। টিয়া তাকে বলে দিয়েছিল—সে যাবে না। তাকে ভিক্ষে ক'রে আর খাওয়াতে পারবে না। যা পেরেছে এতদিন করেছে। আর না। এক কারিগর ছাড়া দুনিয়ায় কারও সঙ্গে টিয়ার আর কোন সম্বন্ধ নেই।

টিয়ার বাবা নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। দুনিয়ায় কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করে নাই। হাবা ছেলে ফড়িংয়ের কাছে পর্যন্ত না। মলিনই ফড়িংকে ডেকে তার কাজে লাগিয়েছে। মাইনে দিত তাকে, খেতে দিত। কিন্তু বাড়ীতে থাকতে দিত না।

ফড়িং সন্ধ্যের সময় একটা গামছায় খাবার বেঁধে নিয়ে চলে যেত বাবার কাছে।

কাল টিয়ার বাবা মরেছে।

টিয়া তাই কাঁদছে।

মলিন বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সে বললে—কান্না। কান্না আমার ভাল লাগে না, তুই কাঁদিস নে টিয়া। কান্না আমি সইতে পারি না, আমার মা মরেছিল—আমি কাঁদি নি। কাঁদতে আমি নিজে পারি না ; কেউ কাঁদলে আমার ভাল লাগে না। কাঁদিস নে! কাঁদবি তো ওঘরে যা।

টিয়া উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদছিল। সে উঠে পাশের ঘরেই চলে গেল।

মলিন উঠে এসে দোকানে বসল। কান্না তার ভাল লাগে না। হঠাৎ মনে হল, টিয়াকেও তার আর ভাল লাগে না।

না। লাগে না।—অস্থির ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে লাগল সে। না লাগে না। কথাটা হঠাৎ যেন গর্তের সাপের মত বের হয়ে পড়ল।

চতুর্থ পর্ব

এক

মানুষের মনের মধ্যে বোধ হয় একটা সাপ আছে। অন্তত মলিনের মধ্যে আছে। মনের মন। অন্তরের অন্তর। কখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে থাকে। ঘুম ভাঙলে গর্তের মধ্যে পাক খায় ; অসহ্য গুমোটে অকস্মাৎ বের হয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না রাত্রের ঠাণ্ডায় আরামে পড়ে থাকে। কখনও ফণা তুলে দোলে। আহত হলে সরোষে ফণা তুলে গর্জন করে। হার সে মানে না, মানতে জানে না।

চন্দননগরে সেদিন টিয়াকে যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো গর্তের সাপের মত বের হয়ে পড়েছিল ; সঙ্গে সঙ্গে মনের সাপটাই যেন বেরিয়ে পড়েছিল। অসহ্য গুমোটে ঘুম ভাঙা সাপ।

টিয়া ভাল লাগে না, চন্দননগর ভাল লাগে না। না, ভাল লাগে না।

* * *

এর আট বছর পর।

আট বছর পর আহত হয়ে সেই সাপটা আবার গর্জন ক'রে ফণা তুলে দাঁড়াল। মলিন আহতফণা সাপের মত কপালে ক্ষত চিহ্ন, মাথার বিপর্যস্ত চুল নিয়েই মাথা তুলে দৃঢ়স্বরে বললে—না কোন অন্যায় আমি করিনি।

আশ্চর্য! মলিনকে সে মলিন বলে আর চেনা যায় না! এ মলিনের মধ্যে দেবীগ্রামের সেই গ্রাম্য ছেলেটির কোন চিহ্নের এক বিন্দু অবশেষ নেই। এ মলিন রূপে, মার্জনায়, বুদ্ধির দীপ্তিতে, ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় সোজা গড়নের তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল শাণিত। জীবনে খোলসের পর খোলস ছেড়ে এক অপরূপ রূপে সে ফুটে উঠেছে। অথবা দেবীগ্রামে বিড়ালের বাচ্চার চেহারা নিয়ে যে ঘুরে বেড়াত সে পালিয়ে বনে গিয়ে কোন মায়া সরোবরে স্নান করে জোয়ান বাঘের চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে।

আহত সাপের মতই ফণা তুলে গর্জন করে উঠল মলিন—না। কোন অন্যায় আমি করি নি।

পাঁচ ছ' জন লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার সেই বাল্যকালের স্বভাবের মত অল্প দুলে দুলে ঘাড় নাড়তে নাড়তে দৃঢ়স্বরে বললে ওই কথা।—ভাল লেগেছে, ভাল বেসেছি। ওকে বিয়ে করেছি আমি।

সামনে দাঁড়িয়েছিল একটি আর্ত-মুখ মেয়ে।

আট বছর পরের কথা।

কলকাতায় চিৎপুর রাস্তার পাশে বস্তিতে খাল এবং গঙ্গার ধারের এলাকার মধ্যে। কাছেই খালের উপর কাশীপুর ব্রিজ। পাঁচ ছ' জন লোক মলিনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বৃদ্ধ তাদের মধ্যে। তাদের চোখে মুখে নিষ্ঠুর ক্রোধ ফুটে উঠেছে। মলিন বলছে—না, কোন অন্যায় আমি করি নি।

চন্দননগর থেকে কয়েক বছর আগে সে কলকাতায় এসেছে। হঠাৎ সেদিন যেন শীত-শেষে ঘুম ভেঙে মনের সাপটা অনুভব করেছিল টিয়ার সঙ্গের মধ্যে তার অঙ্গের মধ্যে অতৃপ্তির পীড়ন, চন্দননগরের আশ্রয়ের মধ্যে সংকীর্ণতার অস্বাচ্ছন্দ্য, গুমোটের অস্বস্তি। সাপটা সেদিন চলতে চেয়েছিল প্রশস্ততর সুন্দরতর আশ্রয়ের সন্ধানে—প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করে। মলিন দাস নয়, মলিন রায়। জাতিতে ব্রাহ্মণ। চন্দননগর থেকে আসবার আগেই সে গলায় পৈতে নিয়েছে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, কাউকে প্রতারণার জন্য নয়, কোন সুবিধা পাবে বলেও নয়, ভাল লেগেছিল বলে নিজের সবল প্রশস্ত গৌরবর্ণ বুকের দিকে তাকিয়ে দেখে—তার কি মনে হয়েছিল—একগাছা পৈতে তৈরী করে প'রে নিয়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল, এই তো? এই তো—এইটি নইলে ঠিক যেন তাকে মানাচ্ছিল না। এইবার ঠিক হয়েছে।

এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। টিয়াকে বিদায় ক'রে দিয়ে মলিন একাই এসেছিল। সঙ্গে শুধু ফড়িং। ওই সেই যে হঠাৎ সেদিন সে অনুভব করেছিল যে টিয়াকেই তার ভাল লাগে না—সে আর মিথ্যে হয় নি কোনদিন। রাত্রিবেলা মদ্যপানে অচেতন মানুষের নেশা কাটার মুহূর্তটি এবং সূর্যোদয়ের মুহূর্তটি এক হ'লে মনটা যেমন চমকে ওঠে, বুকের ভিতর থেকে সমস্ত মুখটা যেমন বিস্বাদ ঠেকে, নিজের গায়ের গন্ধ, নিঃশ্বাসের গন্ধ পর্যন্ত যেমন অসহনীয় ঠেকে—তেমনি অবস্থা হয়েছিল সেদিন তার। টিয়ার গায়ের গন্ধ আর তার সহ্য হয় নি। টিয়া কেঁদেছিল। কান্না সে কোনদিনই ভালবাসে না, নিজে সে কোন দিন কাঁদে না, টিয়ার কান্নাও তার ভাল লাগে নি। কিন্তু এর পর টিয়ার হাসিও আর ভাল লাগল না; টিয়ার গান, টিয়ার সেবা, টিয়ার আনুগত্য, টিয়ার রূপ, টিয়ার টিয়াপাখীর মত কলকলানি কিছুই ভাল লাগত না; চন্দননগরও অসহ্য মনে হ'ল। বড় সংকীর্ণ। বড় ছোট।

বিস্বাদ হয়ে উঠল দিন রাত্রি, বিতৃষ্ণা ধরে গেল সব কিছুতে। রাগ হতে লাগল তার নিজের ওপর। জীবনের স্বাদ সে নিজেই হারিয়েছে, তৃষ্ণা সে নিজেই ঘুচিয়েছে। টিয়ার

দোষ কি? টিয়ার উপর রাগ সে করলে না, কিন্তু টিয়ার প্রতি তৃষ্ণার অভাবের সত্যটার চেহারা পড়ল অবহেলায়। সে অবহেলা ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত কিছুর উপর, টিয়া, পুতুল, দোকান, চন্দননগর—এমন কি নিজের উপর পর্যন্ত। কয়েকদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত স্তব্ধ হয়ে শুধু বসেই রইল। বসেই রইল। নিজেই ঠিক বুঝতে পারত না। খরিদ্দার নাই; স্তব্ধ দুপুর;—চন্দননগরের বাতাস গুমোটে অসহ্য বলে মনে হত।

কয়েকদিন মদ খেলে না। টিয়াকে সে স্পর্শ পর্যন্ত করলে না।

টিয়া জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোমার মোহন?

সে সংক্ষেপে উত্তর দিল—জানি না।

—শরীর? শরীর ভাল আছে?

—না। শরীর ভাল আছে।

—তবে?

—জানি না। বলেছি তো।

টিয়া চলে গেল। আবার ঘুরে এসে প্রশ্ন করলে—আমার 'পরে রাগ করেছ বঁধু?

—নাঃ। রাগ তোর ওপরে করি নি। কথা বলেই সে টিয়ার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিল। সে দৃষ্টি টিয়া সইতে পারে নি। প্রশ্ন করেছিল—এমন ক'রে কি দেখছ মোহন?

মলিন টিয়াকে বিচার করে দেখছিল।

টিয়া আরও সুন্দর হয়েছে। সে পুতুল গড়ে, রঙ দিয়ে রাঙায়; রূপ সে চেনে, বোঝে। টিয়া আরও রূপসী হয়েছে, অবরোধের মধ্যে থেকে তার রঙ উজ্জ্বল হয়েছে। সুমোহন কারিগর পালিশ করেছে, সেটা টিয়ার ছিল না। ভুরু-চোখ আরও কালো দেখাচ্ছে। চুলের রাশি আরও ঘন, আরও কালো হয়েছে, আরও চিকন হয়েছে প্রসাধনের প্রসাদগুণে। প্রথম ভাদ্রের ঘোলা জল-ভরা বিল—আশ্বিনের শেষে কাজল কালো জলে টলমল করছে, চারিপাশে শালুক ফুটেছে। কিন্তু তবু ভাল লাগছে না তার। না ভাল লাগছে না। না—না। স্থির জল তার ভাল লাগে না। তরঙ্গ চাই বেগ চাই।

ভাবছিল সে মনে মনে। শেষ দিকে মনের ওই 'না—না'-এর সঙ্গে মাথাটা না—না করে দুলে উঠল।

টিয়ারও ভ্রূ কুঁচকে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—কি? সে সবিস্ময়ে একদৃষ্টে মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল; মুখের প্রতিটি রেখা প্রতিটি কুঞ্চন লক্ষ্য করছিল। বুঝতে পারছিল না।

—কিছু না।

সময়টা তখন সন্ধ্যার মুখ। সে হঠাৎ, অত্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়াল এবং বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। কোথা যেতে হবে। আবার তাকে খুঁজে পেতে হবে তার তৃষ্ণাকে। স্বাদকে। কোথায় আছে, কিসে আছে? রাস্তায় বেরিয়ে দীর্ঘদিন পর একটা বারে, টেবিল চেয়ার

দিয়ে সাজানো মদের দোকানে ঢুকে বসল। এখানে চেনা লোক তার বেশী নয়। এতদিন টিয়াকে নিয়েই মেতেছিল সে। বাইরে বেরিয়েছে কম। যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে—তাদেরও কোনদিন বাড়ীতে ডাকে নি, টিয়াকে দেখাতে চায় নি।

ভাল মদ খানিকটা খেয়ে সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে। হ্যাঁ, খানিকটা যেন ফিরে পেয়েছে সে তার স্বাদকে, তৃষ্ণাকে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করেছিল। কোথায়? ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চন্দননগরের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘোরা তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। দূর! দূর! আবার খানিকটা ঘুরেছিল সে গঙ্গার ধারে ধারে। সরকারী বাড়ীগুলোর সামনে। সাহেব মেমদের সেই হোটেলটার সামনে। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ ভাল লাগে। হঠাৎ আবার চলতে শুরু করেছিল।

চলো রূপের হাটের দিকে। খানিকটা ঘুরে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। মনো দিদি মরে নি। মনে মনে বলেছিল—মনো দিদি তুই মর, তুই মর, তুই মর। অভিসম্পাত দিয়ে এবার ফিরছিল বাড়ীর দিকে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে সে থমকে দাঁড়াল। পথের উপর একটা আলোর খুঁটির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টিয়া। স্থানটা নির্জন। কয়েকটা ছোকরা আশেপাশে ঘুরছে।

—টিয়া?

টিয়ার চোখে স্থির দৃষ্টি। বোধ হয় কিছুই সে দেখছিল না। নিজের মনের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গোটা দুনিয়াই যেন টিয়ার হারিয়ে গেছে। মলিনের কথাতেও তার মগ্নতা ভঙ্গ হয় নি। তেমনি একভাবেই তাকিয়েছিল সে। মলিন আবার ডেকেছিল—টিয়া?

এবার টিয়া তার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু কথা বলে নি। চিনতে পারছিল না যেন।

—এখানে? কি করছিস এখানে টিয়া!

—মোহন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে টিয়া বলেছিল—ঘর আর আমার ভাল লাগছে না মোহন, তোমাকেও লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি। হাঁফ ধরছিল মোহন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছিল মলিন। পথের অদূরে সেই ছোকরাগুলো কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। গ্রাহ্য করেনি সে। টিয়া স্থির নিস্পন্দ। তারপর বলেছিল—

—খালাস নে টিয়া।

—হ্যাঁ। সেই ভাল। তুমি খালাস—আমি খালাস। এতক্ষণে হেসেছিল টিয়া। তারপর বলেছিল—চল, রাতটার মত ঘরকে যাই।

—চল্।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে টিয়া বলেছিল—কিন্তু এ রাত যদি না পোহায় মোহন?

—পোহাবে। ভাবিস নে।

—আমাকে কিছু টাকা দিবে কিন্তু।

—কত?

—যা তোমার খুশি।

নিজের সঞ্চয় থেকে একশো টাকা বের করে মলিন তার হাতে দিয়েছিল—নে একশো টাকা।

—না এত নিব না।

—কেন? আশ্চর্য হয়ে গেল মলিন। পয়সার জন্য যে টিয়ার এককালে ছলাকলার অন্ত ছিল না—সে টাকা চায় না? হেসে টিয়া বললে—রূপ আছে, বয়স আছে। এর উপর এত টাকা থাকলে—রঘু-দস্তির মাসতুতো ভায়েরা মেরে জলে ফেলে দিবে।

—বেশ, কত নিবি নে।

—ওর অর্ধেক দাও।

টাকাটা নিয়ে খুঁটে বেঁধে টিয়া উঠে চলে গেল। মলিনও আর ডাকলে না। জিজ্ঞাসাও করলে না—কি করবে, কোথায় যাবে? নিশ্চিন্ততা, একটা পরম নিশ্চিন্ততার প্রসন্নতায় চোখ বুজে সে কখন অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। খেলে না। টিয়াও রাঁধলে না—রেঁধে ডাকলে না। তারও ঘুম ভাঙল না। ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে, তখন রোদে উঠোন ভরে উঠেছে। দোর খোলা, ঝি-টা এসে দাঁড়িয়ে আছে। টিয়া নাই।

টিয়া নাই? ঝি-টা জিজ্ঞাসা করলে—সে কোথায় গেল? মলিন বললে—জানি না। তারপর উঠল—দোকানে চা খেয়ে এল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। এই ঘরটা তাদের ঘরকন্না। টিয়ার ঘর এটা। সবই যেমনকার তেমনি আছে। শুধু একটা বাক্স খোলা। টিয়ারই বাক্স—সে-ই তাকে বাক্স কিনে দিয়েছিল, টিয়ার কাপড়-চোপড় থাকত। কাপড়গুলো ছড়ানো। দেখে অনুমান করলে কিছু নিয়ে বাকী ফেলে দিয়ে সে চলে গেছে। আঃ। একটা নিশ্চিন্ততার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। খালাস! সে খালাস! পরম প্রশান্ত মনে ফিরে সে কাজ করতে চেষ্টা করলে। কিন্তু অখণ্ড প্রশান্তির মধ্যে কাজ করা হল না। মধ্যে মধ্যে টিয়ার কথা মনে হল। তার কান উৎকর্ণ হয়ে রইল কখন শুনবে—মোহন, আমি ফিরে এলাম। তুমি নইলে বাঁচব না আমি। কিন্তু সে কথা সারা দিনেও শুনতে পেল না।

কোথায় গেল? যাক, যেখানে তার মন চায়। বালিকা বয়স থেকে পথে পথে যে টিয়া ঘুরছে, পথের বাঁকে সে হারাবে না। আবার কারও সঙ্গে দেখা হবে, থমকে দাঁড়িয়ে মুচকে হেসে হাত পেতে বলবে, জয় হোক তোমার শ্যাম। ভিখারিণীর দিকে ফিরে চাও গুণমণি!

সে খালাস পেয়েছে, টিয়া তাকে খালাস দিয়েছে, এই জন্য তার কৃতজ্ঞতা। না দিলে নিজেই নিত সে। সেই তো আজ বলত, একমুহূর্ত দেরি করলে সে-ই বলত, টিয়া আর ভাল লাগছে না, আমাকে খালাস দে! বল, কি চাস বল। সে কি থাকতে পারে ওই বন্ধনে?

খেলাফুল! ওরা হল খেলাফুল; য'দিন ভাল লেগেছে খেলেছে। ভাল লাগল না, নামিয়ে দিয়েছে। জীবন্ত খেলা-ফুল। ওরা নিজেরাও খেলে, খেলুড়েকেও ভুলায়। মনে পড়ল দিদির কথা। মনে পড়ল কত জনের কথা। সারাটা দিন ধরে চেষ্টা করেছিল একটা পুতুল গড়তে। চন্দননগরের গির্জে গড়বে একটি। মেলা আসছে। স্ট্র্যাণ্ডে গিয়ে দোকান

নিয়ে বসবে। সামনে সাজিয়ে দেবে। ফরাসী সাহেবদের এদিকে ঝোঁক খুব। কিন্তু হ'ল না। হাত মন যেন কিছুতেই এক হচ্ছে না। নাঃ, হবে না এখন। উঠে পড়ল সে কাজ ছেড়ে। দোকান থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে গেল সে ভাল ক'রে। বেলা তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। প্রায় দুটো আড়াইটে। সবে নিঝুম গাছগুলোর পাতা চঞ্চল হচ্ছে, কাকগুলো নিঝুম গাছ থেকে নেমে পথে এসে বসছে; পায়ে পায়ে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পাশের রাস্তাটার বাঁকের ওপার থেকে ডাক উঠল—চুড়ি চাই, চুড়ি! চুড়ি।

চমকে উঠল মলিন। চমকে ওঠার কথাই। এ গলার আওয়াজ কার? কার গলা এমন হাসির পরতের মত কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ে? না, ভুল হয় নি তার। ওই যে চুড়িওয়ালী এই দিকেই আসছে। চুড়িওয়ালীদের ঢঙে কাপড় পরে—মাথায় চুড়ির ঝুড়ি নিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে যে মেয়েটি, সে টিয়াই বটে। সঙ্গে তার হাবা ভাই ফড়িংটা। তার মাথাতেও একটা ঝুড়ি।

চমৎকায় মানিয়েছে টিয়াকে। চমৎকার! তার ঘরে, শৌখিন কাপড়-জামায় এ রূপ টিয়ার খোলে নি। টিয়া তাকে দেখে তার কাছে এসে দাঁড়াল, মুখ টিপে হেসে বললে—কি করছ এখানে? মেম-সাহেব দেখছ? কথাটার মধ্যে ইঙ্গিত ছিল।

—না, গির্জেটা দেখছি, গড়ব।

—গড়া হ'লি পরে আমি দেখে আসব। আমাকে না দেখায়ে বেচিয়ো না। আমি চুড়ি বেচছি। ভালো লাভ। কেমন মানায়েছে বল?—বলেই আবার ফিক ক'রে হাসল। আবার বললে—না পালাই, তুমার চোখে আবার নেশার ঘোর লাগছে।

বলেই হাসতে হাসতে হাঁকতে হাঁকতে আবার চলে গিয়েছিল পশ্চিমমুখে, শহরের দেশী বাসিন্দা পাড়ার দিকে। চাই চুড়ি। চুড়ি চাই।

মলিনও ফিরে এসেছিল। চোখে নেশা নিয়েই ফিরে এসেছিল। বোতল থেকে খানিকটা মদ খেয়ে নিয়েই সে বসে গিয়েছিল। বসে গিয়েছিল মাটি নিয়ে। নতুন পুতুল গড়তে শুরু করেছিল। গির্জে নয়, একটি মেয়ে পুতুল। চুড়িওয়ালী। তরুণী চুড়িওয়ালী, চোখের চাউনিতে অদ্ভুত ইশারা—মুখের হাসিতে তার আশ্চর্য ঢঙ। মুখের রঙে সিঁদুরের আভা। নাম দেবে মোহন-চুড়িওয়ালী।

গড়লে সে নেশায় বিভোর হয়ে। খাওয়া না, দাওয়া না, তিনদিন ধরে গড়লে আর মধ্যে মধ্যে মদ খেলে। আর কখনও চিঁড়ে মুড়ি, কখনও দুটো তেলে-ভাজা; কখনও দোকানে গিয়ে একটা ডিম। নতুন গড়ার সময় তার এমনই নেশা লাগে।

টিয়া অবাক হয়ে যেত। ভয় পেত। কিছু বলতে সাহস করত না। এ মোহনকে ছোঁয়া যায় না। শুধু হাতে হাতে তার প্রয়োজন মত জিনিসগুলি যুগিয়ে দিত। আর মধ্যে মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত—কি সুন্দর! কি সুন্দর গো মোহন কারিগর! কি সুন্দর!

সেদিন যখন শেষ হল চুড়িওয়ালী-পুতুল তখন সে একা। তারিফ করবার কেউ ছিল না।

তাতে ক্ষতি হয়নি, মন ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং নেশাটা যেন বসেছিল ভাল। নিজের দোকানের চারিদিক তাকিয়ে দেখে হিসেব করেছিল কোথায় রাখবে তার চুড়িওয়ালীর ঝুড়ি।

দোকান তার নতুন করে তখন জমে উঠেছে। অনেক পুতুল গড়েছে। নতুন পুতুল। চন্দননগরের গির্জের ছাঁচ হয় না, সে হাতেই অনেকগুলো গড়েছিল। ডুপ্লে সাহেবের মার্বেলের মূর্তি দেখে তার ছাঁচ তৈরী করে পুতুল গড়েছিল। ক'নে-পুতুলের নতুন ছাঁচ তৈরী ক'রে আবার ক'নে-পুতুল করেছিল। বাঘ, ভালুক, কুকুর, বিড়াল, গাই-বাছুর এসব তো ছিলই। এগুলি দামে সস্তা ; ছেলেদের জন্যে ; নেবে, ভাঙবে আবার নতুনের জন্য কাঁদবে। গরীবের জন্যেও বটে। গরীবের সাধও সে বোঝে। বেশী দামের ভালুকওয়ালা ভালুক নাচাচ্ছে, ফোটা পদ্মের উপর ভ্রমর বসে আছে, অজগর সাপে হরিণ জড়িয়ে ধরেছে, মহিষের পিঠে বাঘ লাফ মেরেছে, হাতীর মাথায় বাঘ—হাওদায় শিকারী, এসব পুতুলও তৈরী করেছে। বোষ্টুমী-পুতুল। তার পাশে ক'নে-পুতুল। মোহন-চুড়িওয়ালী বেশ একটু বড় হয়েছে। ভাল বিক্রী হবে। ওগুলিকে রাখবে সবার উপরে। হাতের নাগালের বাইরে। চট ক'রে যেন ছুঁতে না পারে।

রথের মেলায়, বাস্তিল ডে'র মেলায় আজকাল সব চেয়ে বড় দোকান পড়ে তার। সাহেব মেম ভিড় ক'রে আসে। জগদ্ধাত্রী পুজোয়, রাসযাত্রার সময় বারোয়ারি তলায়, পালপাড়ায় দোকান নিয়ে যায় সে। মধ্যে মধ্যে সাহেবদের অর্ডার আসে। ডেকে পাঠিয়ে অর্ডার দেয়।

—মরি-মরি-মরি! এ তুমি করেছ কি গো মোহন কারিগর। আমার পরাণ বঁধু মনের মধু—কই কি তোমায় সাধে, আমার সোনার শ্যাম, নবীন গৌর। টিয়া পোড়ামুখী এমন সুন্দর? এত রূপ?

এ কথা আর কে বলবে? বলেছিল টিয়া। দুপুরে সে রোদের নেশায় ঝিমুচ্ছিল—হঠাৎ টিয়া এসে দাঁড়িয়েছিল কখন ; উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ওই কথাগুলি। মলিনের ঝিমুনি ছুটে গিয়েছিল।

—টিয়া?

—হাঁ মোহন। ফড়িং সকালে এদিক পানে এসেছিল, সে দেখে গিয়েছে নতুন পুতুল। কইল গিয়া—দিদি রে, কি পুতুল গড়েছে কারিগর, দোকান আলো করেছে গো। দেখে আয় গিয়া। চুড়িওয়ালী পুতুল। তাই ছুটে এলাম।—দেখি পুতুল তো নয়, ও যে আমি। আমি এত সুন্দর মোহন?

মলিন হেসেছিল। কি করে বোঝাবে সে যে গড়তে গেলে যে যত সুন্দর পারে তত সুন্দর করেই গড়ে। যেখানে যেমনটি, ঠিক তেমনটি হল কি না হল সে মনে থাকে না, কত সুন্দর হল তাই-ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আর তুলি বুলায়। ওরে টিয়া, সুমোহন কারিগর যে কি থেকে তোকে কি ক'রেছে তা কি ভেবে দেখেছিস? মনে আছে তোর ত্রিবেণীর ঘাটের সেই ধুলোর আস্তরণ-পড়া শীর্ণ মলিন চেহারা?

টিয়া বলেছিল—আর আমার খেদ রইল না মোহন। আমার পুতুল হাজারে হাজারে বিক্রী হোক তোমার। অনেক টাকা হোক তোমার। তোমার মনের ভিতর ইয়ার চেয়েও মোহন রূপে আমি রইলাম···সে জেনে গেলাম। আর আমার খেদ নাই। খেদ নাই—খেদ নাই। তোমারে একটা গান শুনায়ে যাই।

সে গেয়েছিল—অতি মৃদুস্বরে—

কি রঙে রাঙালে কারিগর!
রঙের ছটা মনে লাগি—মন জর জর।
কালো রঙে এত শোভা—
আগে তা জানিত কেবা
ও রঙ পরশ লাগি—তনু কাঁপিছে থর থর।

ওই গান গাইতে গাইতেই সে হেলে দুলে প্রায় নেচে নেচেই যেন চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। তবে পথে-ঘাটে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল। দল বেঁধে গাঁ-গাওলায় চুড়ি বেচতে যেত, চার পাঁচ দিন ধ'রে এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরে চুড়ি বেচে আবার ফিরত চন্দননগর। থাকত দিন কয়েক, আবার চুড়ি সংগ্রহ ক'রে বের হ'ত। কোথাও মেলা হ'লে সেখানে চলে যেত। মেলা সেরে ফিরত। টিয়ার কণ্ঠস্বরে গানের সুর আছে। তা ছাড়াও ওর ডাক শুনেও মলিন বুঝতে পারত—ওই যাচ্ছে টিয়া।—চুড়ি চাই—চা-ই চুড়ি। মোহন-বেশরী চুড়ী।

বুলিধরা টিয়া পাখীকে ছেড়ে দিলে—সে যেমন মধ্যে মাঝে বাড়ীর ছাদের আল্‌সেতে অথবা বাড়ীর ধারের কোন গাছে এসে বসে, বসে থেকে প্রিয় বুলিটি বলে—ঠিক সেই রকম।

এর কিছুদিন পরে—বোধ করি মাস দুয়েক পর—টিয়া যেন কোথায় উড়ে গিয়ে পথ হারাল—আর ফিরল না। পথে ঘাটে দেখলে না, সাড়া শুনলে না। কি হল?

কয়েক দিন পরই মিলল খবর। চুড়িওয়ালীদের দলেরই একজন—হেসে বললে—টিয়া আবার খাঁচায় ঢুকল কারিগর।

—খাঁচায়?

—হ্যাঁ, খাঁচায়। গঙ্গার ওপারে শান্তিপুরের ওদিকে কোন এক মেলায় এক মনিহারির দোকানদার তাকে খাঁচায় পুরেছে। কয়েকটা মেলাতেই দোকানীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, এক শেখের ছেলে; সে তাকে বিয়ে করবে বলেছে; টিয়া অনায়াসে চুড়ির ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে ফড়িংকে ফেলে তার সঙ্গেই চলে গেছে তার ঘরে।

নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। চিন্তা অবশ্য সে করত না টিয়ার জন্য, তবুও এ খবরটায় যেন সে শান্তি পেলে। বেশ করেছিস টিয়া। বেশ করেছিস। সুখে থাক তুই। তোর কলকল বুলিতে শেখের ঘরে জলসা জমে উঠুক।

পরদিনই এল টিয়ার হাবা ভাইটা, ফড়িং। টিয়া চলে গেছে—সে কি করবে? বাবা মরেছে, টিয়া নাই, সে কোথায় যাবে—কার কাছে থাকবে?

—তুঃ মি আঃ-আঃ-মাকে রাখঃ কারিগর। আঃ-আঃমি খুঃব খাঃটব। যা বলবে শুনবঃ।

কারিগর ছাড়া আপন জন সে আর দেখতে পায় নি।

মলিন হেসে বলেছিল—থাক। আমার কাছেই তুই থাক।

জানোয়ারের প্রতি যে মায়া মানুষের, সেই মায়াতেই রাখতে ইচ্ছে হয়েছিল ওকে। তা ছাড়া একটা লোকও তার দরকার। কাজ করবার জন্য দরকার, কথা বলবার জন্য দরকার, রাগ হলে সে রাগের বশে লাঞ্ছনা করবার জন্যও দরকার। মায়া করবার স্নেহ করবার জন্যও দরকার। —থাক—তুই থাক।

ফড়িং থেকে গিয়েছিল। হাবা জড়বুদ্ধি ফড়িং।

দুই

টিয়ার কথা আর মনে রইল না, মনে করবার সময় হল না। নতুন নেশায় তাকে পেয়ে বসল। সে মেতে গেল। শুধু তাই নয়, চুড়িওয়ালী পুতুলগুলো ছিল কাচের শো-কেসে, সব থেকে উপরের থাকে—সেগুলোকে সেখান থেকে সরিয়ে নিচে নামিয়ে দিলে; দাম সস্তা করে দিলে। শো-কেসের উপরের থাকে সারি সারি সাজিয়ে দিলে পুতুল। নতুন পুতুল। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, রবি ঠাকুর।

উনিশ শো তিরিশ সাল। দেশ তখন মত্ত হয়ে উঠেছে। ঝড়ো হাওয়ার মত হাওয়া উঠেছে, অশ্বত্থ বট শাল সেগুন থেকে আগাছার বনে সমান দোল লেগেছে।

আরম্ভ হয়ে গেছে তিরিশ সালের আন্দোলন। চন্দননগর ঠাণ্ডা কিন্তু হুগলী চুঁচড়ো তেলিনীপাড়া কোন্নগর শ্রীরামপুরে তখন যেন তুফান লেগেছে মানুষের জীবনে। মলিন নবদ্বীপ থেকেই অবসর সময়ে কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। ছবির বইই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ছবি থেকে গল্প। বই পেলেই সে পড়ত। ত্রিবেণীতে রঘু তাকে বই দিত। সেই বই "চুম্বনে খুন", "প্রণয়ে বিষ", "রাজকন্যার গুপ্তকথা", আরও অনেক। মধ্যে মধ্যে ছড়ার বই, কিন্তু কেচ্ছার ছড়া। চন্দননগরে এই তুফানের সময় সে খবরের কাগজ পড়ত। পড়ে সে অনেক জেনেছে—অনেক বুঝেছে। মাতন তারও লেগেছিল কিন্তু সে-মাতনে সে কিভাবে মাতবে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ বুঝতে পারলে; পথ পেলে—সেবার রথের মেলায় একটি ছেলে তার দোকানের সামনে এসে বলে গেল—ওই মূর্তিগুলো বেচো না।

—কোন গুলো? কেন?

—ওই ডুপ্লের মূর্তি বেচো না। একদিন ভেঙে দেবো দোকান।

—কেন? ভয় মলিন করে না, সেদিনও করেনি, তবুও জিজ্ঞাসা করেছিল। মনের মধ্যে খট ক'রে লেগেছিল কথাটা। আপনিই লেগেছিল! নইলে সে জিজ্ঞাসা করত না, হেসে বলত—আচ্ছা দেখা যাবে।

—কেন ওই সায়েবদের মূর্তি বেচবে? আর গড়বার মূর্তি পেলে না? কেন? দেশবন্ধুর

মূর্তি গড় না কেন? রামকৃষ্ণের মূর্তি গড় না কেন? বিবেকানন্দের মূর্তি গড়তে পার না?

মূর্তিগুলো তুলে সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের মধ্যে পুরে দিয়েছিল মলিন। বাড়ী ফিরে ফেলে দিয়েছিল গঙ্গার জলে। ছাঁচটা পর্যন্ত। এবং দেশবন্ধু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ছবি যোগাড় করে সর্বপ্রথম তৈরী করেছিল বিবেকানন্দের মূর্তি। প্রথম মূর্তিটি বড় করেই তৈরী করেছিল। তারপর রামকৃষ্ণ, তারপর দেশবন্ধু। রঙ দিতে গিয়ে কিন্তু থমকে গেল সে। অনেকক্ষণ তুলি হাতে বসে রইল, তারপর উঠে হন হন করে গিয়ে দাঁড়াল।—ডুপ্লে সাহেবের মূর্তির সামনে। দেখে চলে এল। হয়েছে! রঙ সে করবে না। তুলি চালাবে না। চোখ আঁকবে না। রঙে চুল আঁকবে না। শ্বেতপাথরের রঙ দেবে। রেখে দিল সে তৈরী মূর্তিগুলি। আবার মাটি এনে আবার বসল। চেঁচারির টানে মাটির উপর দাগ কেটে চুল দাড়ি গোঁফ তৈরি করলে, জামার বেড় ফোটালে; রামকৃষ্ণদেবের কাঁধের উপর ফেলা কাপড়ের আঁচল কেটে বের করলে। বিবেকানন্দের পাগড়ি করলে; দেশবন্ধুর সদ্য জেল-ফেরত মূর্তি তৈরী করেছিল, দাড়িগোঁফ সমাচ্ছন্ন মুখ, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে চশমা। তার উপর অনেক যত্নে তৈরী করা সাদা রঙ লাগিয়েছিল। সরস্বতীর সাদা রঙ। চমৎকার হয়েছিল। দীর্ঘক্ষণ পথের উপর নেমে, এদিক থেকে ওদিক থেকে দাঁড়িয়ে দেখে খুশী হয়ে উঠেছিল সে। এত উল্লাস তার আর অনেকদিন হয় নি। হয়ত জীবনে হয় নি।

দিন কয়েকের মধ্যেই তার দোকানের সামনে লোক দাঁড়াতে শুরু করেছিল ওই মূর্তি দেখতে! কয়েকদিন পর সেই ছেলেটিই এসে তাকে বলেছিল, মূর্তি তিনটি নিয়ে চল—প্রবর্তক সংঘে। দেখবেন কর্তারা।

প্রবর্তক সংঘ চন্দননগরে তখন বিখ্যাত।

প্রবর্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে সে গিয়েছে গতবছর। সংঘের প্রধানকেও সে দেখেছে। অনেক নাম অনেক কাহিনী তাঁর। ওখানকার মেলায় মাটির মূর্তি গড়িয়ে আগেকার কালের অনেক ঘটনার ছবি সাজিয়ে দেন। সে-সব মূর্তি দেখেছে সে। ঘোষপাড়ার সতী মায়ের দীক্ষা। নবাব সিরাজদ্দৌলা আর রামপ্রসাদ।

মূর্তি তিনটি দেখে সংঘের প্রধান ভারী খুশী হয়েছিলেন। তাকে ডেকে আলাপ করেছিলেন—নিজের হাতে লিখে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এতদিন আমাদের এখানে অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে এসব মূর্তি আন নি কেন?

মলিন উত্তর দেয় নি। উত্তর দিয়েছিল সেই ছেলেটি, বলেছিল—আগে সব অন্য পুতুল গড়ত। এসব এবার নতুন গড়েছে।

—চমৎকার হয়েছে। তারপরই প্রশ্ন করেছিলেন—কি নাম তোমার?

—মলিন রায়।

—রায়? তোমরা জাতিতে কি? কুম্ভকার কি সূত্রধরদের তো রায় উপাধি দেখা যায় না। আছে নাকি?

—না। ছুতোর কুমোর নই আমি। আমি ব্রাহ্মণ? একটু রূঢ়ভাবেই উত্তর দিয়েছিল সে।

—ব্রাহ্মণ ?

—হ্যাঁ।

—তা বেশ। কিন্তু তোমার এ মূর্তি তো একজিবিশনে পাঠানো উচিত।

সেই ছেলেটিকে বলেছিলেন—শ্রীরামপুরে একটা হচ্ছে না ? সেখানে পাঠিয়ে দাও।

উৎসাহিত হয়েই সে বাড়ি ফিরে এসেছিল। ফড়িংকে ডেকে টাকা দিয়ে বলেছিল—যা মদ নিয়ে আয়। এলাচের গন্ধওয়ালা, বুঝেছিস। আর শোন। একটা সুতোর বাণ্ডিল আনবি। সুতোর বাণ্ডিল। বুঝেছিস।

সুতোর বাণ্ডিল পাকিয়ে সেই দিনই পৈতে তৈরী করে গলায় পরেছিল সে।

শ্রীরামপুরের মেলায় সে প্রাইজ পেলে। ভালো রূপোর মেডেল আর সার্টিফিকেট। শুধু তাই নয়, ওখান থেকেই কর্তারা মূর্তিগুলি কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও হচ্ছিল একটা বড় একজিবিশন। কলকাতাতেও পেলে পুরস্কার। শুধু তাই নয়—মূর্তি তিনটি বিক্রী হয়ে গেল দেড়শো টাকায়।

ঐ টাকা আর পুরস্কার নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরল সে আনমনার মত।

হাবা ফড়িং তার সে চেহারা দেখে ভয় পেলে! কি হলঃ কাঃ রিঃ গর ?

চুপ ক'রে বসে মলিন, উত্তর দিলে না।

—মাটি আন।

আবার মূর্তি তিনটি গড়তে হবে।

মাটি কিছু কিছু তৈরীই থাকে। ফড়িং আনলে মাটি।

মাটি নিয়ে বসল। মাটির তৈরী তাল ক'রে পাতলা তক্তার উপর বসিয়ে শুরু করলে কাজ। কিন্তু কি হল, ভেঙ্গে দিলে সব। কি হবে ? চন্দননগরে এ কে কিনবে ? ফেলে দিয়ে ঘুরতে লাগল পথে পথে। ফড়িং সভয়ে ভাবতে লাগল কারিগরের কি হ'ল ? যা তার বরাবর হয় তাই হয়েছে। যা হয়েছিল বর্ধমানে, যা হয়েছিল ত্রিবেণীতে, তাই হয়েছে। ত্রিবেণী থেকে শুধু সে রঘু-দস্তির ভয়েই পালিয়ে আসে নি। ওটা হয়েছিল উপলক্ষ। চন্দননগর তার ভাল লেগেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। কলকাতাও তার ভাল লেগেছে অনেকদিন থেকে, মধ্যে মধ্যে যেত সে কলকাতা। চন্দননগরে এসে কলকাতার রঙের দোকানের খোঁজ পেয়েছিল। বিলিতি রঙ, বিলিতি তুলি। আরও আসত কুমোরটুলির প্রতিমা দেখতে। থিয়েটার দেখে গেছে। চন্দননগর ছোট হয়ে গিয়েছিল, হাজার বাতির আলোর কাছে পঁচিশ বাতির আলোর মত। কতদিন সে মরা বড় প্রজাপতি খুঁজতে যেত। খুঁজতে যেত নতুন রঙ নতুন ছকের জন্যে। এক একটা প্রজাপতি এমন পাওয়া যায় যে অবাক হয়ে যেতে হয়; এমন রঙের ছক। আর রঙের বাহার মাথায় আসে না, খেলে না। তাই সে খুঁজত। রাত্রে বের হয় বড় প্রজাপতি। আলো দেখে ছুটে আসে। কিন্তু তার দোকানে বড় একটা আসত না। আসত স্ট্র্যাণ্ডের ধারে এক মেমসাহেবের একটা হোটেল আছে, সেখানে। সন্ধ্যে থেকে সারা রাত্রি প্রায় আলো জ্বলত, একশো ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের

সারি সারি আলো। ফটকের মাথায়, বাড়ীটার মাথায় জ্বলত ; তার জোর আরও বেশী। আড়াই শো ক্যাণ্ডেল পাওয়ার। ভোরবেলা গেলে ওখানেই পেত মরা প্রজাপতি ; অসংখ্য পোকার মধ্যে দু'টি একটি প্রায়ই পেত সে। কলকাতা হাজার বাতি লক্ষ বাতির আলো। চল রে মন, পাখা যখন মেলেইছিস—তখন চল ওই লক্ষবাতির আলোর ছটার ঝলমলানির মধ্যে চল। তাতে মরণ হয়, সে মরণ ভালো। চল কলকাতা। মরতে হয় কলকাতাতে গিয়েই মরবে সে।

আর চন্দননগরে নয়। ভাল লাগছে না তার। চন্দননগর ছোট হয়ে গেছে, চন্দননগর গুমোট মনে হচ্ছে, চন্দননগর অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে। কলকাতার আলো চোখে ভাসছে। যাবে, সে কলকাতাতেই যাবে। রাত্রে বসল সে তার সঞ্চয় নিয়ে। গুনতে লাগল। মূর্তি তিনটের দাম দেড়শো টাকা নিয়ে বারশো টাকা তার সঞ্চয়। অনেক। অনেক। অনেক।

চলো কলকাতা।

কলকাতা এল সে আর ফড়িং। বাড়ী ভাড়া করলে। চিৎপুর রাস্তার পাশে বাগবাজারে অন্নপূর্ণার ঘাট, খড়ো-ঘাটারও উত্তর অঞ্চলে, খালের উপর কাশীপুর ব্রিজের দক্ষিণে, গ্যালিফ স্ট্রীটের দক্ষিণে বস্তির মধ্যে বেশ একটা উঠানওয়ালা মাঠকোঠা, খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই কুমোরটুলি। কিন্তু কুমোরটুলি সে গেল না। আলাদা, ওদের থেকে দূরে থাকবে সে। কাজ আরম্ভ করে দিলে। গায়ের জামা খুলে ফেলে লেগে গেল। সঙ্গে ফড়িং।

ফড়িং হাবা হলেও দেহ খুব অপটু নয়। অপটুতা ওর বুদ্ধিতে, জড়তা ওর কথায়। সে বয়সে সদ্য যুবা হয়ে উঠেছে তখন, খাটতে পারে এবং এই আড়াই তিন বছর চন্দননগরে মলিনের কাছে থেকে কাজগুলি বুঝেছে, শিখেছে। আর একটা আশ্চর্য গুণ ফড়িংয়ের, ওর নিষ্ঠা। কাজটি পরিপাটি না হলে কিছুতেই মনোমত হয় না। ভাঁটা চাপাবার আগে এমন ভাবে সে মাটি ধরিয়ে নিকোয় যে মনে হয় কনিক দিয়ে মেজেছে যেন। নিকোয় আর দেখে, আবার নিকোয়। মাটি সে তৈরী করে আশ্চর্য সুন্দর। আরও গুণ তার—সে মলিনকে ভালবাসে। হাবার হাসি হেসে প্রায়ই বলে—কারিগরঃ তুমিঃ এমন ছোস্তর আর এমন ভালঃ।

মধ্যে মধ্যে কথার শেষে বিসর্গ যোগ করলে যেমন উচ্চারণ হয়, জড়তা হেতু ঝোঁক দিয়ে কথা বলার জন্যে তেমনি বিসর্গান্ত উচ্চারণ হয়ে উঠে। হুঁচোট খেয়েও বুক ছেঁচড়ে চলে যেন কথাগুলো। আর দন্ত্য 'স' এবং 'দ'য়ের উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না। অকারণে বা অতি সামান্য কারণে হি-হি করে হাসে। আবার হঠাৎ হাসি থামিয়ে ত্রস্তভাবে সকলের হাসিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। কর্মহীন অবসরে অসাড়ের মত বসে থাকে, মুখটা হাঁ হয়ে যায়। জগতের কর্মকোলাহল কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গচ্যুত হলেই নির্জন প্রান্তরে একেলা শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়ে। নইলে ফড়িংয়ের গুণ অনেক। ফড়িংই মলিনকে শুধু ভাল বাসে না, মলিনও তাকে ভালবাসে। ফড়িং এই আড়াই বছরে মলিনের যন্ত্রপাতি মতই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। যন্ত্র হারালে কেনা যায় তৈরী করা যায়। ফড়িং মেলে না, ভাগ্য-গুণে জুটে যায়।

যে বস্তুটি ভাল বলে মনে হয় তার, সেটি দেখে এসে সে বলে—করিগরঃ ভালঃ জটোঃ ডেখে এলাম ডোকানে, টুমি টাই কি পরো। মেয়েদের জুতো দেখে এসে একথা প্রায় বলে সে।

সস্তা খাবার হলে কিনে এনে অগ্রভাগটি মলিনের সামনে নামিয়ে দিয়ে বলে—খাও কারিগরঃ।

সামান্য বস্তু। বাদাম ভাজা। চানাচুর। শোনপাপড়ি। নিজের পয়সা থেকে কিনে আনে। দুজনেই আরম্ভ করেছিল কলকাতার জীবন। ঘর সংসার, কারখানা ব্যবসা সব। দেরি হয় নি, দু'জনেই প্রাণপণে খেটে সামান্য প্রারম্ভ শেষ করেছিল কয়েকদিনের মধ্যেই। তার সে সামান্য প্রারম্ভ বছর তিনেকের মধ্যেই যা হয়ে উঠেছিল তাকে অসামান্য বলা চলে না, কিন্তু সেই মুখে গতি নিয়েছে এ কথা সকলেই বলে। বাধা বিঘ্ন কম হয় নি কিন্তু সে তা আপন শক্তিতে সব লঙ্ঘন করেছে। সে বিরক্ত হয় না, রাগে না, হেসে বলে—কুছ পরোয়া নাই ; দেখা যাক।

উঠানে ভাঁটার ধোঁয়ার জন্য প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করেছিল, দরখাস্ত করেছিল। সে যথারীতি লাইসেন্স দিয়ে ধোঁয়া বের হবার জন্যে একটা লম্বা টিনের চোঙ তৈরী করে বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হল না, সঙ্গে সঙ্গে চোঙটাকে ঘিরে আরও দুটো ভাঁটা তৈরী করল। ফড়িং ছাড়া আরও জন দুয়েক লোক রাখলে। একজন করিগর, একজন ছোকরা। কালীঘাটের পটোপাড়া থেকে কুমোরটুলি পর্যন্ত কয়েকদিন অবিরাম ঘুরে লোক বেছে নিয়ে এল। ইচ্ছে হয়েছিল, নবদ্বীপ থেকে মাথামোটা গোপেশ্বরকে নিয়ে আসে। কিন্তু না। এখানে সে মলিন রায়। তার গলায় পৈতে। সে ব্রাহ্মণ। গোপেশ্বর জানে—যোগেশ পালের দেওয়া তার পরিচয়। তার মিথ্যে পরিচয়। সে ব্রাহ্মণ। তার এই রূপ—তার এই বুদ্ধি, তার এত প্রশংসা, সে ব্রাহ্মণ। জাত সে মানে না। জাত কিসের? তবে সবাই যখন জাত মানে তখন সে ব্রাহ্মণ। এই জন্যেই সে কুমোরটুলি যায় নি। সে ছোট কারুর চেয়ে হবে না। কিছুতেই না। এই জন্যেই ঝগড়াও হয়েছে অনেক জনের সঙ্গে। মলিন পিছু হটে না। ঝগড়া ক'রে কেউ ঘুষি তুললে—ঘুষি তুলেই সে আটকায়, ছুরি বের করলে সে নিজের ছুরিটা বের ক'রে দেখায়।—ঠিক আছে, এসো। তুমিও নিজের হাতে সাড়ে তিন হাত, আমিও আমার হাতে তাই। যার হাত মাপে বড়, সে জিতবে। এসো। ফড়িংও সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মাটি-ভাঙা কাঠের মোটা হাতুড়ীটা নিয়ে। দাঁড়িয়েই সে ক্ষান্ত হয় না, হাতুড়ীটা নাচিয়েছে, ওটা তার অভ্যাস।

ঝগড়াও হয়েছে আবার আলাপও হয়েছে। আলাপই হয়েছে বেশী। বন্ধু তার অনেক। কর্মযোগেই তার বন্ধুভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তার অজ্ঞাতসারেই হয়ে উঠেছে, সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারে নি। বৎসর খানেকের মধ্যেই তার ওই মূর্তিগুলি যে প্রশংসা ও সমাদর পেয়েছিল, তারই সূত্র ধ'রে তার কাছেই এল অনেক লোক। মূর্তি গড়তে হবে। ফটো এনে দিয়ে যেত। একদিন ডাক পড়েছিল কলেজ স্ট্রীটের কমার্শিয়াল মিউজিয়ম থেকে। মডেল তৈরি করতে হবে। নানান ধরণের মডেল। কর্তা ছবি ধ'রে দিয়েছিলেন সমানে।

বাড়ীটার ঘরে ঘরে ঘুরে দেখেছিল মলিন। ঘরে ঘরে টাঙানো ছিল অনেক ছবি। যেমন বিচিত্র মানুষ সব, ছবিগুলিও তেমনি। এরা আলাদা মানুষ, এদের কথা আলাদা, মনের রঙ আলাদা, গায়ের গন্ধ আলাদা, সব আলাদা। তার ভারী ভাল লেগেছিল। শুধু ভাল লাগাই নয়, কিছু দিনের মধ্যে জীবনে যেন নতুন মাটি, নতুন জল, নতুন আলো এসে গিয়েছিল। নতুন সুর লেগেছিল। নতুন নেশা। আশ্চর্য! আশ্চর্য, এরা শুধু পুরুষই নয়—মেয়ে পুরুষের আলাদা একটি জাতি। একদিন এদের দূর থেকে দেখেছে, হঠাৎ কাছে এসে গেল। এসব মেয়েরা পুরুষেরা সব নতুন তার কাছে। ভুবন পালের গড়া সেই মেয়েটির মত নয় এ মেয়েরা। এদের চুলে সে মিষ্টি গন্ধ ওঠে না; এরা তার মত সুরে কথা বলে না, এরা আলাদা। এ যেন তার নূতন জগতের নবজন্ম; এরা সব নূতন জগতের নূতন জীবন। তবু বুকে তার আগুন ধোঁয়ায়, কিন্তু জলতে পারে না। সাহসের উল্লাসের বাতাস বয় না, একটা ভিজে গুমোটের সঙ্কোচ ঘিরে থাকে সে আগুনকে। পূর্ব জন্মের সংস্কারের মত। জাতিস্মরের মত সে জীবনের স্মৃতি তাকে দীপ্যমান হতে দিচ্ছে না।

জলছে, সেই আগুন।

সে আগুনের আঁচ যাদের গায়ে লেগেছে, তারাই এসে তাকে ঘিরে ধরেছে। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ে তার সামনে, বিধ্বস্ত ক'রে দিতে চায় আগুনকে, তেমনি ভাবে তারা এসে ঘিরে ধরেছে মলিনকে। যা হয়েছে হয়েছে—বলে তারা ছেড়ে দেবে না ওকে। আগুন লেগেছে যখন তখন পুড়ুক, ছাই হয়ে যাক, এ বলে ছেড়ে দেওয়া মানুষের স্বভাব নয়। সে লড়াই করে জল ঢেলে নেভায়, ধুলো বালি নিক্ষেপ ক'রে তাকে চাপা দেয়; শুধু নেভাবার জন্যেই করে না, আগুনের আক্রমণকে বিধ্বস্ত ক'রে তার উপর প্রতিশোধ নেয়। আগুন নিভে গেলে অঙ্গার ফেলে দেয়, আধ-পোড়া কাঠ তাও ফেলে দেয়, কিন্তু সে জলন্ত কাঠখানাকে নিয়ে অতি ক্ষুধার সময়েও রান্নাশালায় উনোন জ্বালে না। তেমনি আক্রোশের সঙ্গেই ওরা আক্রমণ করেছে মলিনকে।

তার সেই নিজের বাড়ীর উঠানেই—লোকে তাকে ঘিরে ধরেছে। নির্যাতন করতে চাইছে।

কলকাতায় আসার কাল থেকে এর মধ্যে আট বছর চলে গেছে।

উন্মাদের মত চেঁচাচ্ছে এক বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ, বাতেপঙ্গু বঙ্কিম ভটচাজ। চীৎকার করে বলছে—এত বড় পাষণ্ড, এত বড় শয়তান তুই? এত বড় পাপ এত বড় অন্যায় করতে তোর সঙ্কোচ হল না।

মলিন সাপের মত গর্জন করে বললে—না, অন্যায় আমি করিনি। ভাল লেগেছে, ভালবেসেছি। আমাকে খুন করতে হয় কর। খুন হব। কোন অন্যায় আমি করি নি।

একটু দূরে কাঁদছে একটি মেয়ে। বঙ্কিম ভটচাজের কন্যা। মায়া।

তিন

সঙ্কোচের মধ্যে জীবনের কামনা নিয়ে, বর্ষার বাষ্পভার-আর্দ্র বাতাবরণের মধ্যে ধোঁয়ানো আগুনের মত সে যখন অন্তরে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, তখনই কাছে এসেছিল এই বৃদ্ধ বঙ্কিম ভট্টাচার্যের কন্যা মায়া। দেখবামাত্র যেন ঘৃতাহুতিতে তার বুকের আগুন সেদিন দপ করে জ্বলে উঠেছিল। মন বলেছিল—এই, এই তো। একেই তো সে সারা জীবন চেয়েছে। নারীশিল্প-মন্দিরে মায়া তখন কাজ শিখত। সেইখানেই দেখেছিল তাকে। শিল্প-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মলিনকে মেয়েদের মাটির পুতুল গড়ার কাজ শেখাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন ওই কমার্শিয়াল মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে। বেতন দেবার সাধ্য তাঁদের ছিল না; নিতান্তই দাতব্যের উপর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান; অসহায় মেয়েদের কল্যাণ কামনায় তাদের শিল্প কাজ শিখিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য।

মিউজিয়মের একজন প্রধান তাকে ডেকে নারীকল্যাণের প্রয়োজনীয়তা এবং সে দিকে প্রতিটি সক্ষম জনের যথাসাধ্য করার দায়িত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়ে তাকে বলেছিলেন—তাঁরা আমাকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, তুমি ওঁদের ওখানে সপ্তাহে তিন দিন ঘণ্টাখানেক করে কাজ শেখাও।

মলিন আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়েছিল। জীবনের তৃষ্ণা খানিকটা উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। রক্তধারা চঞ্চল হয়েছিল। তবে উগ্র লালসা জেগেছিল এ বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তা জাগেনি। মেয়েরা সুন্দর, পুরুষের চেয়ে সুন্দর; মহানগরীটার চারি দিকে নারীরূপের শোভা। কমার্শিয়াল মিউজিয়মে এ নিয়ে বিচিত্র-কথা সে শুনেছে। শুনেছে—এ অন্যায়। না কি লালসা এর মূলে। মলিনের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। আবার হাসিও পেয়েছিল। পৃথিবীতে গাছে গাছে ফল, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল। সে লোভ? ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায়, আলো জ্বলে, সে কি আগুন জ্বালাবার প্রবৃত্তি, না সে বুকের জ্বালার ইঙ্গিত? মেয়েরা সুন্দর, বিধাতার হাটে পুরুষ বল, নারী রূপ। পুরুষ থেকেই যদি সৃষ্টি চলত তবে পৃথিবী হ'ত দৈত্যের পৃথিবী। মহিষাসুরের মত আকারের অবয়বের মানুষে ভ'রে যেত। ভালবাসা থাকত কোথায়? ওরা আছে, ওদের দেখে চোখ জুড়োয় বলে; চোখে এখনও জল আছে, নইলে চোখে শুধু আগুনই জ্বলত। ওরা জল, পুরুষ রোদ; ওরা মাটির বুক জুড়োয়, নরম করে বলেই পৃথিবী সবুজ; নয় তো পুড়ে যেত পৃথিবী, মরুভূমি হয়ে যেত। কিন্তু ওঁদের সামনে তো বলতে পারে নি এসব কথা। সন্ধ্যায় নিত্য সে যায় চৌরঙ্গীতে, ধর্মতলায়; চোখ জুড়িয়ে আসে মনোহারিণীদের দেখে। কতদিন বেড়াতে যায় চিৎপুরের ট্রামে চেপে। জানালার ধারে বসে দেখতে দেখতে যায়, দেখতে দেখতে ফেরে। ওদের দেখে মনে পড়ে দিদিকে। দিদি অমর, ওর মরণ নাই।

নারীশিল্পী-মন্দিরে গিয়ে যতটা ভাল লাগবে ভেবেছিল তা লাগে নি। মেয়েগুলির চোখ

জুড়োনো রূপ নাই। আর দশটি মেয়ের কোমল মুখ দেখে মায়া লাগে, কিন্তু ভাল লাগার নেশা জাগে না। হঠাৎ চোখে পড়ল ওই মেয়েটি। মায়া।

উনিশ কুড়ি বছরের মেয়েটি। উজ্জ্বল-শ্যাম বর্ণ, কোঁকড়া চুল, ডাগর চোখ, পাতলা শরীর, মুখে শান্ত শ্রীর মধ্যে একটি দীপ্তি। কালো ফিতে-পাড় সাদা ধুতি পরে মায়া, গায়ের ব্লাউজের হাতটিতে সরু বর্ডার, হাতে দুগাছি চুড়ি; সোনার নয়, সোনার পাত মোড়া। সিঁথিতে সিঁদুর নাই। মায়াকে দেখে মলিনের মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। এই তো! এই তো সেই মেয়ে! যে মেয়ে ওই নতুন মেয়ে, তাদের সে দেখেছে—তাদেরই জাতের অথচ তাদের মত দূরে নয়; মেয়েটি এমনিই দীপ্ত অথচ অত উত্তাপ নেই। ওদের মত অত উজ্জ্বল নয়—কিন্তু স্নিগ্ধশ্রীতে প্রসন্ন। এরও মার্জনা আছে, কিন্তু ওদের মার্জনায় হাত দিতে সে পারে না—ও পালিশের মহার্ঘ্যতা মলিনকে সঙ্কুচিত করে। এর মার্জনায়ও পালিশ নাই, যেটুকু আছে মলিন তার মূল্য জানে—সে তা দিতেও পারে। তার ভারী ভাল লাগল।

মায়া জামা-কাটা ও সেলাই শিখত; সুচের কাজ, উলের কাজ শিখত। সেদিন অর্থাৎ যেদিন মলিন শেখানোর কাজ আরম্ভ করে, সেদিন ওর একটা ক্লাসের শেষে মলিনের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। মলিন তার দোকান থেকে কতকগুলি মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল। সেগুলি টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছিল। মাটির কাজ খুব বেশী মেয়ে শিখত না। যা-ও শিখত তা-ও ছিল বাজার থেকে কেনা সরা, কপ্‌টে ভাঁড়, কলসী রঙ করার কাজ। কাজটা পুরনো, কিন্তু কাজটা—তখন ১৯৩৮।৩৯ সাল, একালের শিল্পীরা তাকে নতুন চেহারা দিয়েছেন। বিশেষ যামিনী রায়। বাগবাজারের রায় মহাশয়ের বাড়ী মলিনের বাড়ীর খুব কাছে না হলেও, পাড়াতেই; সে অনেকদিন গিয়ে দেখে এসেছে। তাঁর সঙ্গে মলিন কাঁচামাটির পুতুলের কাজ শেখাবে। ছাঁচ তৈরী, তা থেকে পুতুল করে রঙ করা কঠিন নয়। ছাঁচ থেকে নতুন জিনিস প্ল্যাস্টার অব প্যারিস দিয়ে করতে পারবে। মলিন তা-ও আয়ত্ত করেছে আজকাল।

মায়া এসে অন্য মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পুতুলগুলি। মলিন তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মায়ার হঠাৎ দৃষ্টি পড়েছিল তার দৃষ্টির দিকে। সে দৃষ্টি দেখে অস্বস্তি অনুভব করেই মায়া যাবার জন্য ফিরছিল দরজার মুখে।

মলিন চকিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—চলে যাচ্ছেন?

ফিরে মায়া বলেছিল—আমি এ কাজ শিখি না।

—শেখেন না?

—না, পুতুলগুলি দেখছিলাম। ভারী সুন্দর।

—শিখলে আপনিও পারবেন।

—নাঃ। ঘাড় নেড়ে একটু হেসে 'নাঃ' বলে মায়া চলে গিয়েছিল।

পরের দিন ছিল গঙ্গাস্নানের একটা পর্ব। গঙ্গার ঘাটে ফড়িংকে পুতুল দিয়ে বসিয়ে দিত সে এসব পর্বে। বাগবাজারে একটা ছোট দোকানও করেছিল। সে দিন দেখা হয়ে গেল

মায়ার সঙ্গে। মায়া মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে ফিরছে। মায়ার কোঁকড়া চুলগুলি সে দিন খোলা ছিল। সদ্যস্নাতা মায়ার এই রূপ দেখে তার চিত্ত আরও ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মায়া তার দিকে বক্রকটাক্ষে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু কথা বলে নি। সে-ও বলতে সাহস করে নি।

এর পরের দিন নারী-মন্দির থেকে ফেরার পথে মায়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। মায়াও সেখান থেকে বাড়ী ফিরছিল। বুকের মধ্যে ধোঁয়ানো আগুনে তখন শিখা দেখা দিয়েছে। মলিনের আকাঙ্ক্ষা দমে না, আজীবন বাধাবিঘ্ন ঠেলেই সে চলেছে। থামে নি কোনদিন, থামতে সে জানে না। এগিয়ে এসে সে বলেছিল—আপনি, কিছু মনে করবেন না, আমাদের পাড়াতেই আপনার বাড়ী,—না ?

মায়া তার দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে মাটির দিকে চোখ রেখে পথ চলতে চলতে বলেছিল—আমরা থাকি বাগবাজারে।

—তাই বলছি। কাল আপনাকে দেখলাম কিনা।

—হ্যাঁ, গঙ্গাস্নান করে ফিরছিলাম।

এরপর কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মলিন বলেছিল—আপনি মাটির কাজ শেখেন না কেন ? ভাল পারবেন আপনি।

হেসে ফেলেছিল মায়া।—কি করে জানলেন ভাল পারব ?

—আপনার আঙুলের গড়ন দেখে। ভারী পাতলা আঙুল, আর বেশ লম্বা। বড় মূর্তি যদি করতে পারেন—ওঃ, ও-কাজের এখন খুব আদর হয়েছে।

হেসেই মায়া বলেছিল—আপনার করা পরমহংসের মূর্তি আমি দেখেছি। সত্যিই সুন্দর।

—আপনি শিখুন, আপনিও পারবেন। আমি বলছি।

—পারব ?

—আমি বলছি। আমি শিখিয়ে দেব। সেই দিন তখনই মায়ার হাতখানি ধ'রে আঙুলগুলি দেখে বলেছিল—চমৎকার পাতলা হাল্কা আঙুল। আঙুলের খেলাই ওতে বড় জিনিস। হাল্কাভাবে চেয়ারি ধরে, মিহি ঘন টানে আশ্চর্য খেলবে।

মৃদু আকর্ষণে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল মায়া। মলিন একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, বুঝেছিল হাত ধরা তার অন্যায় হয়েছে। মায়া নমস্কার করে বাঁয়ে ভেঙে চলে গিয়েছিল। প্রতিনমস্কারের জন্য দাঁড়ায় নি।

পরদিনই কিন্তু মায়া ক্লাসে এসেছিল, মাটির কাজ সে শিখবে। মলিন খুশী হয়ে বলেছিল —আপনি মূর্তি গড়া শিখুন।

একদিন বঙ্কিম ভট্টাচার্য নিজে এলেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তার কারখানাতে। তাঁর হাতে একটি বেতের সাজি। সাজির মধ্যে একটি মাটির মূর্তি। বেশ বড় মূর্তিটি। প্রায়

একফুট উঁচু। পরমহংসদেবের মূর্তি। গড়েছে মায়া। মূর্তিটি দেখাতেই আনেন নি, মূর্তিটির খুঁতগুলি সংশোধন করে নিখুঁত করে দিতে হবে। ভট্টাচার্য পরমহংসের ভক্ত; মেয়ের গড়া মূর্তিটি তিনি পূজা করবেন। আর এটিকে রঙ ক'রে দিতে হবে। নইলে মূর্তিটা মূর্তি-মূর্তি মনে হবে না।

মায়া লজ্জিত নত মুখে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কথায় তার শিল্প-জ্ঞানের অজ্ঞতায় তার লজ্জা হয়েছে। বঙ্কিম ভটচাজ একনাগাড় বকেই গিয়েছিলেন—বাত হয়েছে, চাকরি গিয়েছে, আগে মেয়েস্কুলে পণ্ডিতি করতেন। আর সকাল সন্ধ্যে যতটা পারেন পুরোহিতের কাজ করতেন। বাড়ীতে একটি শালগ্রাম ছিল—সেটি নিয়ে লোকের বাড়ীর ক্রিয়া-কর্ম করতেন। ইচ্ছে ছিল—ছেলে দুটোকে পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু—। হাত নেড়ে বলেছিলেন—বলেন কেন? ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং ন-চ বিদ্যা ন-চ পৌরুষং। একটা থিয়েটার করে; তাও এ্যাপ্রেন্টিস, মাইনে দেয় না। আর একটা রোয়াকে রোয়াকে আড্ডা দিয়ে ফেরে। মেয়েটা লক্ষ্মী। ওকে ছেলেবেলায় আমি যে ইস্কুলে পণ্ডিতি করতাম সেই ইস্কুলে পড়তে দিয়েছিলাম। বুদ্ধিসুদ্ধি ভালই ছিল। তা ওর কপাল। ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছিল। কি দুর্মতি হল আমার। পড়া ছাড়িয়ে—।

—থাক না বাবা ও সব কথা।

ভটচাজ চেপে বসে বলেছিলেন—দাঁড়িয়ে থাকার কি উপায় আছে। বাত কনকন করে।

ব্যস্ত হয়ে একটা টিনের চেয়ার এনে পেতে দিয়ে মলিন বলেছিল—বসুন!

চেয়ারে বসে ভটচাজ বলেছিলেন—বিড়ি সিগারেট খান? দিন একটা, আপনি তো ব্রাহ্মণ?

—হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ।

—তবে জল খাওয়ান একটু।

এক গ্লাস জল এনে দিয়েছিল মলিন।—খান।

জল খেয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখে ভটচাজ বলেছিলেন—এখন যে জন্যে এসেছি, বলি শুনুন।

মলিনের বেশী সহ্য হচ্ছিল না। সে বলেছিল—ও রঙ করার মূর্তি তো নয়। তবে বলছেন—করে দেব। নিন, সিগারেট নিন।

সিগারেট খেতে খেতে ভটচাজ বলেছিলেন—দেবেন। আরও কথা আছে। আমি মশায়, প্রথম মায়া মাটির কাজ শিখবে শুনে আপত্তি করেছিলাম। বুঝেছেন। হ্যাঁ, সত্যি বলছি আমি। ও সেলাই কাটাই শিখছিল, সে শেখা ওর প্রায় হয়ে গিয়েছে। এখন ঘুরে-ফিরে দোকান থেকে কাজ নিতে পারলে সংসারে কিছু আনবে। আর ও মাটির পুতুল গড়তে শিখে কি হবে? কে বেচবে? হাঙ্গামা কত? মাটি আন, শুকোও, গড়, আবার শুকোও; শুকুবার জায়গা চাই, রোদ চাই; তারপর বৃষ্টি যদি এল তো গলল, পড়ল তো ভাঙল; নানান ফ্যাচাং নানান ঝঞ্ঝাট। তা কিছুতেই ছাড়বে না। আজ এ ক'মাস এই

চলছে। শেষে রেগে বললাম, বেশ, গড় একটা কিছু, আমার চোখের সামনে গড়; পরমহংসের মূর্তিটি গড়লে। দেখলাম বেশ গড়েছে তো। তা আমাদের পাড়ার মস্ত ছবি-আঁকিয়ে রায়মশায়কে দেখালাম। তিনি আবার আমার দেশের লোক। তিনি বললেন—ভাল। শেখান। শিখতে দেন। এতেই এর ভবিষ্যৎ ভাল হবে। বুঝেছেন—তাই নিয়ে এসেছি ওকে। এইটিই আসল কথা। তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিন। একটু যত্ন ক'রে। বুঝেছেন।

হেসেছিল মলিন।—যত্ন ক'রে শেখাই তো। আর অল্প দিনেই মায়া বেশ শিখেছে।

—আরও একটু বেশী যত্ন নেবেন।

—নেব।

মায়া কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লজ্জায় বোধ হয় সে মরে যাচ্ছিল। এতক্ষণে সে বলেছিল—ওঠ বাবা!

—উঠি। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দেখে বলেছিলেন—ওইগুলো বুঝি ভাঁটা। পুতুল পোড়ান? কিন্তু, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—। এ কুম্ভকার মিস্ত্রির কর্মে রুচি হল কেন?

—আমার ছেলেবেলা থেকেই এদিকে ঝোঁক।

—ভাল। দেশ কোথায়? কেষ্টনগর না কি? আমার দেশ বাঁকুড়ো-বিষ্টুপুর, আমাদের দেশে গোপেশ্বর বাঁড়ুজ্জে মস্ত গাইয়ে, গাইয়ের ঘর। অনেকদিনের গাইয়ের পাট ওদের। বিষ্টুপুরটাই তাই। আমাদের সবাই হাঁ করতে পারে। আমিও পারতাম। বাজাতেও জানতাম। গলা ছিল না, বাজনায় হাত ছিল, তা বলেছি তো কপাল। ভাগ্যং ফলতি সর্বত্রং। ছেলেবেলা বাবা এসেছিলেন শালগ্রাম বুকে ঝুলিয়ে এখানে পুরুতের ব্যবসা করতে। সঙ্গে আমাকে এনেছিলেন। বাঁকুড়োয় থাকলে বাজাতে শিখতাম। এর চেয়ে ঢের ভাল হ'ত।

মলিনের ইচ্ছা হচ্ছিল বৃদ্ধকে আঙুল বাড়িয়ে পথ দেখিয়ে বলে—যান। কিন্তু মায়ার জন্যে পারছিল না। মায়া সকরুণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে, তার মুখের প্রতিটি রেখার সঙ্কুচন-প্রসারণ লক্ষ্য করছে। সে আবার তাগিদ দিলে—বাবা চল।

—চলি। তা হলে আপনার বাড়ী কেষ্টনগর তাই এমন হাত। ভাল হাত। আমার ও মূর্তিটি রঙ করে দেবেন তা হ'লে।

যাবার সময় আবার একটা সিগারেট নিয়ে তবে ভটচাজ গিয়েছিলেন। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আর মায়াকে একটু তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিন। একটু বেশী মন দেবেন ওর ওপরে।

মলিন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ওরা চলে যাবার পর। মনে পড়ে গিয়েছিল অনন্ত ঠাকুরকে। প্রশ্ন করে—ব্রাহ্মণ তো?

কিন্তু না। মায়ার বাপ। মায়া ওর সব ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছে। করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে কতবার মার্জনা ভিক্ষা করেছে। মায়া। মায়ার চোখের সে দৃষ্টি তার ভিতর-বাহির ব্যাপ্ত করে যেন মায়ার একটি রঙীন জাল বিস্তার করেছে।

পরের দিন নারী-মন্দির ক্লাসে মায়া একটু হেসেছিল মাত্র। এখানে বড় সাবধান থাকতে হয়। অন্য মেয়েদের তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি।

নারী-মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এসে দেখলে মায়া তার প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তার পথে দেখা হত, কিন্তু সে এমন ভাবে নয়, মায়া তার জন্যে অপেক্ষা করত না, সে-ই এসে চারিদিক চেয়ে মায়াকে দেখে দ্রুত হেঁটে এসে তার সঙ্গ নিত। আজ মায়া তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। সে আসতেই মায়া বলেছিল—কাল কিছু মনে করেন নি তো?

—না-না-না। কি মনে করব? তোমার বাবা উনি!

—আমার এমন মনে হচ্ছিল। তাই ক্ষমা চাইবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম।

—ক্ষমা? না! সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলেছিল—আমি তোমায় ভালবাসি মায়া, ক্ষমা তোমার জন্যে নয়। তোমাকে নইলে আমার সব মিথ্যে মায়া।

মায়ার হাতের স্পর্শে সে বুঝতে পারছিল মায়া চমকে উঠেছিল। মায়া কি চীৎকার করে উঠবে? না। তা ওঠেনি। অকারণে হাঁপাতে শুরু করেছিল। যেন জলে ডুবে যাচ্ছে সে, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। হাঁপাতে হাঁপাতেই মৃদুস্বরে বলেছিল—ছাড়ুন।

—না। দৃঢ়স্বরে বলেছিল মলিন। ছাড়বে না সে। তার বুকের মধ্যে আবার উন্মত্ত ঝড় উঠেছে। সে ঝড় বাধা মানে না, বন্ধ মানে না; দুর্নিবার। মলিনের কোন জ্ঞান থাকে না। তুচ্ছ হয়ে যায় সব। এর জন্য প্রাণ তুচ্ছ, অর্থ তুচ্ছ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মুছে যায়; থাকে সে, আর যাকে চায় সে।—তোমাকে, আমি তোমাকে বিয়ে করব মায়া।

—আমি বিধবা! ছাড়ুন, ছেড়ে দিন আমাকে।

চমকে উঠেছিল মলিন। হাতের মুঠো আলগা হয়ে আপনি খসে পড়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়। সে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়া থামে নি। হাতছাড়া পেয়ে সে তাকে অতিক্রম ক'রে চলে গিয়েছিল।

সেদিন সারাটা সন্ধ্যা সে লক্ষ্যহীন হয়ে প্রায় বিকৃত-মস্তিষ্কের মত কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছিল। সারা রাত্রি ঘুমোয় নি। না। মায়াকে নইলে তার জীবন বৃথা, জীবন ব্যর্থ। সব মিথ্যা। বিধবা? কিসের বৈধব্য? বিধবার বিবাহ হয়। না-ই যদি হত—তাতেই কি? সে ভালবাসে—তার ভালোবাসা, বিশ্বগ্রাসী তার ভালোবাসা, সে ভালোবাসা মানবে কেন? সে কিছু মানে না, কিছু বোঝে না; ঈশ্বর নিজে এসে বললেও সে মানবে না, আগুনের অক্ষরে-লেখা বিধানটা তার চোখের সামনে ধরলেও সে বুঝবে না। ঈশ্বর সে মানে না। যম, মৃত্যু,—তাকে মানে, না মেনে উপায় নেই; সে এসে সামনে রক্তচক্ষু মেলে শাসন ক'রে দাঁড়ালেও সে মানবে না।

পারবে না, মায়াকে পাবার বাসনা পরিত্যাগ করতে পারবে না। মায়াকে নিয়ে চলে যাবে সে দূর-দূরান্তে।

ভোর বেলায় উঠে সে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে রইল। মায়া যদি আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই অধীর হয়ে উঠল সে। মায়া এল না। সে মায়াদের বাড়ীর গলিটায় ঢুকে হেঁটে গেল বাড়ীটার সামনে দিয়ে। বাড়ীটার নম্বর বের ক'রে থমকে দাঁড়াল। দরজা বন্ধ। ডাকবে? বঙ্কিম ভটচাজকে সরাসরি বলবে—বিধবা মায়াকে সে বিয়ে করবে। তার সংসারের সব ভার নেবে সে। কিন্তু তা পারলে না। দাঁড়িয়ে থাকতেও সাহস হ'ল না। চলে গেল। আবার ফিরে এল। আবার ফিরল। সামান্য বাড়ী। জীর্ণ একতলা একটা দালানের সামনে এক টুকরো উঠান—পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ উপরের দিকে একটা আর্তনাদের মত ধাতব শব্দ উঠল, সেই শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে সে দেখলে, ছাদের সিঁড়ির দরজাটা খুলে দাঁড়িয়েছে মায়া; আলসের উপর দিয়ে শুধু মুখখানি দেখা যাচ্ছে তার। তার বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল; মায়া হাত নেড়ে ইশারায় জানালে—যাও। যাও। যাও।

সে মাথা নাড়লে—না-না-না।

মায়া আবার জানালে—যাও। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে নেমে চলে গেল।

কি করবে সে? উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে দাঁড়াল বড় রাস্তার উপর। কয়েক মিনিট পরেই তার আর উল্লাসের সীমা রইল না। মায়া বেরিয়ে এসেছে, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চাইছে। চোখোচোখি হ'তেই মায়া হন হন করে চলতে লাগল। হাতে তার নারী-মন্দিরে যাওয়ার ব্যাগটা। মলিন তাকে অনুসরণ করলে। অনেক দূর এসে মায়া দাঁড়াল। চিৎপুরের রাস্তায় একটা ট্রামস্টপ। সবে সকালবেলা। তখন ভিড় নেই। মলিন এসে পাশে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছিল সে।

একা দাঁড়িয়েছিল মায়া। মায়াও হাঁপাচ্ছিল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। একটা কি যেন বিপর্যয় হয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। সে বললে—চল, কোথায় নিয়ে যাবে। আমি এসেছি।

—মায়া! সে কথা খুঁজে পেল না।

—চুপ কর, ট্রাম আসছে, ওঠ।

ট্রামে উঠে পড়েছিল তারা। মায়া আগে উঠেছিল। অল্প কয়েকজন লোক ট্রামে। তখন ১৯৩৯ সাল, কলকাতার জীবনে এ ভিড় ছিল না। ট্রামে উঠে পাশাপাশি বসে মায়া বলেছিল—কালীঘাট যাব।

এসপ্লানেডে নেমে বলেছিল—চল হেঁটে চলি খানিকটা। কথা বলি।

হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল—কাল সারারাত আমি ভেবেছি।

—আমি পাগলের মত ঘুরেছি উঠোনে। মনে হয়েছিল, রাত্রেই এসে তোমাকে চীৎকার ক'রে ডাকি, মায়া, তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না। ভোরে উঠে—।

—আমি জেগেছি সারারাত। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। হেরেছি। তোমাকে নইলে.

আমি বাঁচব না। অকস্মাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার, রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—এ তুমি কি করলে আমার! চোখ থেকে তার জল পড়তে লাগল।

মায়া। কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত মলিন তার চোখ মুছিয়ে দিতে গিয়েছিল।

মায়া সরে গিয়ে বলেছিল—লোকের চোখে পড়বে। একটা গাড়ী কি ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সিতে উঠে মায়াই বলেছিল—কালীঘাট চলো।

মলিন তার হাতখানি নিজের হাতে টেনে নিয়ে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে বলেছিল—আঃ! তোমাকে না পেলে আমি হয়তো আত্মহত্যা করতাম। হয়তো—

—কি হয়তো?

—হয়তো তোমাকেও খুন করতাম! তোমাকে ছুরি মেরে নিজের বুকে মারতাম। আমাকে জান না মায়া। আমি যা চাই তা না পেলে আমি পাগল হয়ে যাই।

হেসেছিল মায়া। বললে—তা জানলে আমি আসতাম না। আমাকে খুন করে খুন হলে সে যে আমার সুখের স্বর্গ হত। আগে কেন বললে না গো?

মলিনও হেসেছিল।

মায়া বলেছিল—কালীঘাটে যাচ্ছি, তুমি আমার মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেবে। আমাদের বিয়ে হবে। তারপর কোথা যাবে চল, আমি তোমার।

—বিয়ে? চকিত হয়ে তাকিয়েছিল মলিন মায়ার দিকে।

প্রশ্নটা শুনে মায়াও চকিত হয়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ। নইলে—আমি কি—? আমি কি ব্যাভিচারিণী হব? বিধবারও বিয়ের নিয়ম আছে।

—না। তা আমি বলিনি।

—তবে চমকে উঠলে কেন?

—অন্য কারণে।

—কি?

—বিয়ে কি এমনি করে হবে? দিনে, শুধু সিঁদুর দিয়ে? হঠাৎ হাসলে মলিন, বললে, আরও ভাবছিলাম—যদি ঠকাই তোমাকে আমি—সে কি বিয়ে হলেই—

বাধা দিয়ে মায়া বললে—ঠকাবে? মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে বলেছিল—সে তোমার ধর্ম। আমার ধর্মে আমি ঠিক থাকব। আর বিয়ে এমনি করেই হবে। এমন হয় শুনেছি।

মলিন চমকেছিল অন্য কারণে। মলিনের মনে আছে। সে চমকেছিল—তার সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ে মায়ার বিয়ে?

গাড়ি কালীঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে পকেটে হাত দিয়ে মলিন হিম হয়ে গিয়েছিল। মায়া জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল?

—টাকা।

—আন নি? আমার কপাল! বলে হেসে ব্লাউজের ভিতর থেকে ছোট একটি ব্যাগ

বের ক'রে তার ভিতর থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে দিয়েছিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মায়ার টাকায় ভাড়া চুকিয়ে মলিন প্রথম বিক্রী করেছিল তার সোনার বোতাম। কত টাকা? টাকাগুলি নেড়েচেড়ে বলেছিল—এতে কি ক'রে হবে?

মায়া বলেছিল—কি করবে? প্রেমে পাগল হলে এমনি হয়। টাকার কথাও ভুল হয়ে যায়। তোমার ভালবাসায় আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—আমার কাছে কিছু নেই। একটি জিনিস আছে, একটা আংটি। সে বিক্রী ক'রে ক'টাকাই বা হবে, তা বিক্রী করতেও আমি পারব না।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ মলিন বলেছিল—চল। এস আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—ফিরে যাব, টাকা নিয়ে আসব।

—বেশ, আমি মন্দিরে বসে থাকি—তুমি যাও, নিয়ে এস।

—না। তুমি পাঁচ মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি চেক বই টাকা নিয়ে আসব।

—ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ওখান থেকে যদি উধাও হই আমি? হেসে ফেলেছিল মায়া। মায়া সেদিন ওইটুকু সময়ের মধ্যেই কথায় বার্তায় রূপে রঙে যেন কোন জাদুর ছোঁয়া পেয়েছিল। ট্রাম-স্টপের কাছে মায়াকে যখন দেখেছিল, তখন তার উজ্জ্বল-শ্যাম-বর্ণ মুখখানা যেন সাদা হয়ে গিয়েছিল; যেন সমস্ত রাত্রি ধরে তার বুকের রক্ত ক্ষয়িত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে; চোখ দুটো শুধু ছিল রাঙা, অবশিষ্ট রক্তটুকু যেন আশ্রয় নিয়েছিল তার চোখে; দৃষ্টি ছিল উদ্‌ভ্রান্ত। তাতে সর্বনাশের আতঙ্কের বিহ্বলতা। এরই মধ্যে সব কেটে গিয়েছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মায়া কার্তিকের প্রথম হিমরাত্রির শিশির-ক্লিষ্ট লাল পদ্মের মত রূপে, রসে, গন্ধে, নতুন সতেজ লাবণ্যে নবীন জীবনে ফুটে উঠেছে। মুখরা হয়ে উঠেছে। সূর্য সে।

মলিন বলেছিল—কোথায় যাবে তুমি? যদি মর তবে সেখানে ছুটব আমি।

মলিন বাসায় টাকা বেশী রাখত না। তখন সে ব্যাঙ্কে টাক রাখতে শিখেছে। চার বছরে তার কম টাকা জমে নি। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

—বাইরে একটা বড় কাজ পেয়েছি। অনেক টাকার। অনেক মূর্তি গড়তে হবে। বড় বড় মূর্তি। গান্ধীজির, দেশবন্ধুর, মতিলাল নেহেরুর, আরও অনেকের। যাচ্ছি আমি সেখানে। হঠাৎ খবর পেয়েছি। ফিরতে ক'দিন দেরি হবে। দিন-বিক্রীর টাকা থেকে তোমরা চালিয়ো।

সঙ্গে নিয়েছিল ফড়িংকে। চলুক—ফড়িং চলুক। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। আর নিয়েছিল স্যুটকেস—কাজ পাকা হলেই ফিরব। আরও লোক চাই। সে সব

ঠিক করব তখন।

চলো মুসাফের। না, মুসাফের নয়। মুসাফের একা। এবার তারা দুজন।

ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকাটাই তুলে মায়াকে নিয়ে আবার চলেছিল। বাজারে কিনেছিল অনেক টাকার জিনিস। মায়া বলেছিল—এত কেন?

চাই। আরও অনেক চাই। অনেক গহনা কিনব। কয়েক শো টাকার গহনাও কিনেছিল। সর্বস্বান্ত হতেও তার আপত্তি ছিল না। আপত্তি? তাতেই ছিল তার সর্বোত্তম উল্লাস।

ফড়িং, বিচিত্র ফড়িং। সে অবাকও হয় নি। মলিনের উল্লাস দেখে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল সে। উল্লাসের সঙ্গে সম্ভারগুলি বয়ে বয়ে ট্যাক্সিতে বোঝাই করেছিল।

এরপর মলিনের মস্তিষ্ক কাজ করেছিল মূল্যবান সুইস ঘড়ির মত। ঘাটে ঘাটে সুনির্দিষ্ট গতিতে কাঁটায় কাঁটায় সময় রেখে চলার মত যেটির পর যেটি তাই করে গিয়েছিল। মায়াকে একটা ঘড়িও সে কিনে দিয়েছিল আশি টাকা দিয়ে।

জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছিল একটা হোটেলে, মায়াকে বলেছিল—ঘোমটা দিয়ে নাও। সেখানে ভাল একখানা ঘর নিয়ে, অগ্রিম সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে, হোটেলের বয়দের ছুতো-নাতায় বকশিস দিয়ে শোরগোল তুলেছিল। অনেকদূর থেকে তারা আসছে। স্বামী স্ত্রী। যাবে অনেকদূর। পথে এ কদিন বিশ্রামের প্রয়োজন! কাল সকালেই তারা চলে যাবে।

মায়ার চোখে তখন জীবনের রঙ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। তার জন্য কেউ এত আয়োজন করবে এ সে কোনদিন কল্পনাও করে নি। জীবন তার রিক্ত জীবন, সব রঙ ধুয়ে মুছে—রঙ-জলে-যাওয়া পুরানো শাড়ীর মত বিবর্ণ, জীবনের চারিপাশে সেই প্রায় একশো বছর বয়সের জীর্ণ, সাঁতসেঁতে ভ্যাপসা-গন্ধ-ওঠা দেওয়ালের পরিবেষ্টনী,—তার সেই জীবনের চারিপাশে এত রঙের আয়োজন, এত রঙীন কাপড়; এত আভরণ সাজানো; এত সুরভিত প্রসাধন সম্ভার; এমন সুন্দর রঙীন-দেওয়ালের ঘের, এমন খাট, এমন বিছানা, মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা, ওপাশে ড্রেসিং টেবিল, একপাশে একটি সোফা সেট; মাথার উপর পাখা, এমন সুন্দর শেড দেওয়া আলো! তার জীবনে এ কি আবেগ, এ কি উল্লাস! তার এত মূল্য? আয়নার ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখেও সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। গাল দুটি তার এমন রক্তিম হয়ে উঠেছে? চোখের দৃষ্টিতে এমন মাধুরী!

সে বলেছিল—কেন? কাল চলে যাবে কেন? কোথায় যাবে?

—কোথায় তা ঠিক করি নি। তবে যাব। তোমার বাবা বেতো-মানুষ, বুড়ো, কিন্তু তোমার দাদারা? পাড়াটা কাঁপে ওদের হুঙ্কারে। তারা তোলপাড় করে বেড়াবে।

—না। দু তিন দিন তা করবে না। কাল রাত্রে দুর্দান্ত ঝগড়া করেছি। ছোড়দা খেতে পায় নি বলে লাথি মেরেছিল। বাবার মুখের উপর জবাব করেছিলাম, বলেছিলাম—পারব না সারাদিন খেটে দাসীবৃত্তি করতে। বাবা বলেছিল—যা কোথায় রাণী-গিরির গদি তোর জন্যে পাতা আছে! আমার মন তখন হু হু করছে। আমি বুঝতে পারছি তোমাকে নইলে আমি

বাঁচব না ; সব তেতো, সব তপ্ত, সব অন্ধকার। ঝগড়া মধ্যে মধ্যে কেন, প্রায়ই হয়। কিন্তু এমন কখনও হয় না। ঝগড়া বেশী হলে আমি রাগ ক'রে চলে যাই, কখনও নারী-মন্দিরেই থাকি, কখনও আমার মাসীর বাড়ী গিয়ে থাকি। দুদিন ওরা খোঁজ করে না। মা রোগা, বারমাস অম্বলের ব্যাধি, আগুনতাতে যাওয়া সয় না, মা দুদিন তিনদিন রাঁধে, তারপর কলিক ওঠে, বিছানা নেয়। ওরা তখন খোঁজ করে আমার। আমিও ফিরে যাই।

ম্লান হাসি দেখা দিয়েছিল মায়ার মুখে ক্ষণিকের জন্য। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ। ম্লান হাসিটাই যেন উস্কে দেওয়া প্রদীপের স্তিমিত শিখার মত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল। বলেছিল—আর যাব না। আমাকে এত অলঙ্কার দিলে তুমি, রাণীগিরির গদি দিয়েছ। বেঁচেছি আমি। আঃ!

তারপরেই লুকোচুরি খেলায় লুকোনো ছোট মেয়ের মত ঘাড় নেড়ে কৌতুকের হাসির সঙ্গে বলেছিল—দুদিন তিনদিন ভেবো না। দু দিন তো বটেই। তারপরও খোঁজ খোঁজ করে একটা দিন! এ সুন্দর ঘর। সুন্দর জায়গা! দু দিন এখানে থেকে—তারপর, তারপর যেখানে হয় যাব।

সন্ধ্যার আগে বেনারসী পরে অতি যত্নে প্রসাধন ক'রে তারা বেরিয়েছে কালীঘাটে।

পুরোহিত ইত্যাদি ঠিক করাই ছিল। মায়াকে হোটেলে রেখে মলিন গিয়ে ঠিক ক'রে এসেছিল। বিবাহের পর ফিরেছিল ফুল কিনে।

ঘরের সব আলো জেলে দিয়ে—দরজা বন্ধ ক'রে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা। স্বপ্নের মত। মায়ার মুখে সে কি সুন্দর হাসি!

বিষ থাকলে মলিন সেদিন মায়াকে খাইয়ে মায়াকে সবল আলিঙ্গনে বেঁধে ওই ফুলের বিছানায় শুয়ে পড়ত। এ ঘুম যেন না ভাঙে। এ বন্ধন যেন আর না খোলে! এ আবেগ যেন ফুরিয়ে না যায়।

মলিন এমনি উন্মাদ হয়েই থাকতে চায় ; এ নইলে সে হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় তার মৃত্যু হচ্ছে। বেদনাহত হয়ে শুধু হায় হায় করে। তৃষ্ণা ফুরিয়ে গেলে মানুষ বাঁচে। কেন এ উন্মাদনা ফুরিয়ে যায়?

চার

তিনজনই ওরা চলে গিয়েছিল।

সময়টা ছিল আশ্বিন মাসের প্রথম। মলিনের খেয়ালের কৈফিয়ৎ এক মলিনই দিতে পারে। একদিন গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে স্থির করেছিল—ট্রেনে যাবে না তারা, ষ্টিমারে যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল একটা ষ্টিমার এ সময় পাটনা পর্যন্ত যায়।

সেই ষ্টিমারে পাটনা গিয়ে উঠেছিল।

পাটনাতেই বাসা পেতেছিল। সুন্দর বাসাটি। ছোট বাসা; তবে খানিকটা জায়গা দেখে সে নিয়েছিল। শহরের একটেরে। শহর ওইদিকে তখন বাড়ছে। ভাড়া সস্তা। মনের মত করে সাজিয়েছিল। নানা বিচিত্র টুকিটাকি কিনে এনে অপূর্ব পরিবেশ তৈরী করেছিল।

লম্বা গড়নের প্যাকিং বাক্স কিনে এনে সাদা রঙ দিয়ে, তার উপর উজ্জ্বল রঙের বিছানার চাদরের মাপ-করা টুকরো বিছিয়ে যখন বসবার আসন তৈরী করেছিল—তখন মায়ার চোখেও বিস্ময় ফুটেছিল। সেও শিল্প-শিক্ষার্থিনী, তারও শিল্প-বোধ কিছু ছিল। এবং এ জিনিস না দেখাও নয়। কিন্তু কই, তার মনে তো হয় নি। ভাঁড়-খুরি দীপগাছা এবং ওখানকার পোড়ানো গ্রাম্য পুতুল কিনে এনে তাকে রঙ করে অপরূপ করে তুলেছিল মলিন। এ সকলই তাদের পাড়ার বিখ্যাত শিল্পী রায়ের বাড়ীতে সে দেখেছে। মলিনও দেখেছে। কিন্তু এমন সুন্দর অনুকরণ মলিন করতে পারবে তা মায়া ভাবে নি। একদিন কয়েকখানা ছোট মাদুর কিনে এনেছিল মলিন। মায়া বলেছিল—ছেলেদের মাদুর? আর ওগুলো? শোলার খেলা-ফুল। কি হবে এসব?

—দরকার হবে।

মায়ার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মলিন সে দিকেই যায় নি, ভাবেও নি; মায়ার মুখ দেখেও মনে হয় নি; সে তার আরক্তিম মুখের দিকে চেয়ে আবেশ মত্ত হয়ে পা-পা করে এগিয়ে এসে তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছিল। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে আবার পড়েছিল মাদুর ক'খানা নিয়ে। চারিদিকের দেওয়ালে চারখানা মাদুর পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। খেলা-ফুলগুলি ঝুলিয়ে দিয়েছিল মাদুরের মাথায়। তার শোভা দেখে মায়া বলেছিল—তুমি ম্যাজিক জান। তুমি যাদুকর।

তারপর আরম্ভ করেছিল কাজ।

মূর্তি গড়তে আরম্ভ করেছিল। তিনজনে—সে, মায়া আর ফড়িং।

ফড়িং ভালবাসত পুতুলের কাজ। সে বলেছিল—ভাঁটাঃ করি, পুতুলঃ করঃ। পুতুলঃ ভালঃ।

—কর, তুই কর। ছাঁচ আমি এনেছি, ভুলি নি।

মূর্তি তৈরী ক'রে সে বড় বড় বাঙালীদের বাড়ী নিয়ে দেখিয়ে এনেছিল। বিক্রী হতে শুরু হয়েছিল। ব্যবসায় বুদ্ধিতেও সে চতুর। গান্ধীজী, দেশবন্ধু, মতিলালের মূর্তির সঙ্গে বিহারের নেতাদেরও মূর্তি তৈরী করতে ভুল হয় নি তার। উপার্জনের পথ তার খুলে গিয়েছে।

সেই দিন দশটি মূর্তি দু শো টাকায় বিক্রী করে ওখানকার একজন জমিদারের মূর্তি গড়ার অর্ডার নিয়ে ফিরে এসে মায়াকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—আমি কখনও হারব না মায়া। জিতে আমি যাবই।

—নাও। টাকা নাও। ভাবছিলে, খরচ বেশী হচ্ছে। মজুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এই শুরু।

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। তাদের মূর্তি গড়ার জায়গা করেছিল বারান্দা ঘিরে, দেবদারু কাঠের ফ্রেমে ক্যাম্বিস এঁটে—সাদা রঙ ক'রে ছোট্ট একটি স্টুডিয়ো; ধবধব করত; তারই মধ্যে দুজনের কলহাস্য ধ্বনিত হয়ে উঠত মাঝে মাঝে। সময় সময় স্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে টুকরো কথা। কখনও অকস্মাৎ একজন একজনের মুখে আঙুলের কাদা লাগিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেত। এ ছুটত ওর পিছনে। ধরত। এ বলত—লক্ষ্মীটি। বেশী না। বেশী দিও না, মলিন বলত। ঘাট মানছি। আর করব না। কখনও বলত—দাঁড়াও না, মুখ পেতে দিচ্ছি। মাখাও। মাখাও।

রাত্রিগুলি মধু রাত্রি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যেত। থাকত শুধু ওরা দুজনে। দিনে দিনে আশ্চর্য রূপ খুলছে মায়ার! মায়া যেন—মোহিনী মায়া! বিশ্বসংসারে যেন নেমে এসেছিল একটি শরৎ পূর্ণিমার রাত্রি। কোজাগরী পূর্ণিমা। সে রাত্রে তারা দুজনে চোখে মোহাঞ্জন প'রে জেগেই ছিল—জেগেই ছিল—জেগেই ছিল।

অকস্মাৎ কোথা থেকে এল যেন মেঘ আর ঝড়। যেন আশ্বিনের সাইক্লোন! অন্ধকার হয়ে গেল সব, দরজা জানালা সশব্দে যেন আছাড় খেয়ে পড়ল, চমকে উঠল মলিন। ঘোর কেটে গেল। একদিন মায়া বললে—একবার ডাক্তার দেখাতে হবে।

—কি হল? শরীর খারাপ? কি হয়েছে? কপালে হাত দিলে সে।

হেসে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলেছিল মায়া—লেডী ডাক্তার।

—লেডী ডাক্তার?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কি বোকা তুমি! হেসে সে চলে গিয়েছিল।

মলিন হাতের কাঠের ছুরিটা ফেলে দিয়ে তার অনুসরণ করে ঘরে এসে অপলক দৃষ্টিতে মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তার সে দৃষ্টি দেখে মায়া বিস্মিত হয়েছিল, তবু হেসে বলেছিল—দেখছ কি এমন ক'রে?

—কিছু না। বেরিয়ে চলে গিয়েছিল সে।

ভাল না লাগার সুর বেজে উঠেছিল। দীর্ঘক্ষণ ঘুরে বাড়ী ফিরেছিল।

মায়া সরাসরি এসে বলেছিল—কি, শুরু হল?

—কি?

—অনাদর? ভাল না-লাগা? বল, আমার পথ আমি জানি।

—পথ জান?

—গঙ্গার ঘাটের পথ আমি চিনি।

শিউরে উঠেছিল মলিন। চন্দননগরের মলিন পালটেছে। সে বলতে পারে নি—এখন নয়, রাত্রে যেয়ো মায়া। লোকে যেন না দেখতে পায়; শব্দ যেন কারু কানে না ওঠে।

মলিন পালটেছে। সে শিউরে উঠল। বললে—না মায়া, না। না। তুমি পথের

কথা বললে—বললে পথ জান। আমি ভাবলাম—তুমি পালিয়ে যাবে।

—কোথায়? তুমি ভিন্ন আমার আর আশ্রয় কোথায় আছে বল? বাপের বাড়ী? তা—। হাসল মায়া।

মলিন ভাবতে চেষ্টা করেছিল—ছোট্ট একটি ছেলের কথা। ছেলে। তার ছেলে। তার মত সুন্দর, মায়ার মত চোখ, তার মত তুলির হাত, মায়ার মত কথা। খলখল হাসি, গাল ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, আবোল তাবোল বকা, অপটু পায়ে নাচা, ছোট নরম হাতে রাগ ক'রে মারা। নতুন রঙ, নতুন গন্ধ, নতুন সুর!

তার আগেই কিন্তু মলিনের অসহ্য হয়ে উঠল। মায়া তখন পূর্ণ-গর্ভা। মায়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার উপর। বিছানায় শুয়ে থাকত। মলিন তাকাতে পারত না তার দিকে। অন্তরের ক্ষোভ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ত না, আক্ষেপের হাহাকারে ছড়িয়ে পড়ত। শীতের বাতাসে বাথরুমের ছিটকিনি-ভাঙা একটা জানালার কব্জায় গভীর রাত্রে একটা একটানা কঁ্যা-কঁ্যা শব্দ উঠত—সেই শব্দটা শুনে মলিন প্রথম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—ভিতরের সুরটি বাইরে বাজছে কোথায়, কেমন করে?

মলিন রাগতে চেষ্টা করত। রাগলে সে পারে। সব পারে। মদ খাওয়া বাড়িয়ে ছিল সে। মায়া প্রথম আপত্তি করেছিল, ঝগড়া করেছিল, মলিন রাগ করতে পারে নি, দৃঢ়ভাবে বলেছিল—না খেলে সে পারছে না, দেহ তার বইছে না।

মানতে হয়েছিল মায়াকে। মদ খেয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হত। কিন্তু মায়ার সামনে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেত। শান্ত ধ্যানমগ্নার মত শুয়ে থাকত মায়া। বেরিয়ে এসে অকারণে মারত ফড়িংকে।

ফড়িং বাধা দিত না। বলত—অঃ ছাড়, লাগছেঃ খুবঃ লাগছেঃ। মায়া বেরিয়ে আসত শ্রান্ত পদক্ষেপে, ক্লান্তস্বরে ম্লান হেসে বলত—ছাড়। ছিঃ, কি করছ? ছাড়া পেয়ে ফড়িং বলত—শোঃও, ঘুমিয়েঃ পঃড়ঃ বাঃতাস করিঃ।

জীবনে যে সাইক্লোন উঠেছে—সে সাইক্লোন কাটছে না। দিন দিন যেন বাড়ছে।

ফড়িং তাকে ঘুম পাড়াত।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন। এক মুহূর্তে মলিন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, তিক্ত হয়ে উঠল; একটানে বন্ধন যেন ছিঁড়ে গেল। তিক্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছিল—কেঁদো না, কেঁদো না। সইতে আমি পারি না। ভারী আমার ভাই! কি হবে? গুণ্ডার ফাঁসি হবে না তো হবে কি? তার জন্য কান্না কিসের?

মায়া অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

খবরের কাগজ পড়ছিল সে, খবরের কাগজে বেরিয়েছে—'হত্যাপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ড; বেশ্যাগৃহে বন্ধুতে বন্ধুতে কলহের শোচনীয় পরিণাম!'

মায়ার ছোড়দা ছ'নে—বিমল, এক বন্ধুকে ছুরি মেরেছিল, বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

মেয়েটা চীৎকার করেছিল, তাকেও সে ছুরি মেরেছিল কিন্তু মেয়েটা মরেনি। আশপাশ ঘরের লোকজন এসে তাকে ধরে ফেলে পুলিশের হাতে দিয়েছিল। 'জুরীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আসামী বিমলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দোষী ঘোষণা করায়—তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া বিচারক প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।'

মায়া কেঁদে উঠতেই কাজ ছেড়ে ছুটে এসেছিল মলিন—কি হল?

খবরটা দেখিয়ে দিয়েছিল মায়া কাঁদতে কাঁদতে।—আমার জন্যে। আমার জন্যে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল মায়া।

'বেশ্যালয়ে মদ্যপান করিয়া হতব্যক্তি আসামী বিমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কলহ কালে তাহার ভগ্নীর প্রসঙ্গ তুলিয়া কুৎসিত কথা বলিয়াছিল।'

কাগজখানা ফেলে দিয়ে মলিন বলেছিল—ছ'নের এই পরিণাম সুনির্দিষ্ট। কেঁদো না ওর

—আমার জন্যে। আমার জন্যে।

—না। তোমার জন্যে নয়। বেশ্যাবাড়ী গিয়ে মদ খেয়ে ছ'নে যে কোন কথা নিয়েই ঝগড়া করে এই করত। কেঁদো না। কান্না আমার ভাল লাগে না। আমি নিজে কাঁদি না, কাঁদতে পারি না।

অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল মলিন—আমার মা মরলে আমি কাঁদিনি।

মায়া উঠে প্রায় টলতে টলতে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাধা দিয়ে মলিন বলেছিল—কোথায় যাবে?

—কাঁদতে। কাঁদতে যাচ্ছি আমি। গঙ্গার ধারে।

—না। ওই ঘরে গিয়েই কাঁদ যত পার কাঁদ।

সে তাকে প্রায় ঠেলেই ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দিয়েছিল দুরন্ত ক্রোধে। দুরন্ত ক্রোধ হয়েছিল তার। ক্রোধ হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর। কারণ কি সে বুঝতে পারেনি। আজও পারে না। কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে শীর্ণদেহ আসন্নপ্রসবা মায়ার কান্না দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সটান গিয়েছিল ব্যাঙ্কে, সেখান থেকে টাকা তুলে নিয়ে স্টেশনে, কাশীর টিকিট কেটে গিয়েছিল কাশী। কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ। চার মাস পর ফিরে এসেছিল পাটনায়। পাটনার বাসা শূন্য। সেখানে শুনেছিল যে মাস কয়েক আগে মায়ার একটি মেয়ে হয়েছিল। মায়ার খুব অসুখ করেছিল। কিছুদিন আগে মায়ার ভাই চিঠি পেয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছে কলকাতা। ফড়িংও সঙ্গে গিয়েছে। এখানকার বাস তুলে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে।

কলকাতায়—বাড়ী ফিরে গিয়েছে মায়া?

মায়াকে সে চিঠি লিখেছিল। মায়া লিখেছিল—তুমি ফিরে এস। আমাকে আর একবার উদ্ধার কর। আমি নিজে আসিনি। আমার তখন অসুখ, ফড়িং কাকে দিয়ে বাবাকে খবর

দিয়েছিল। তখন প্রসবের পর আমার বড় সঙ্কটের অবস্থা। বড়দাদা এসে নিয়ে গেলেন। আমাকে বাবা প্রায় বন্দিনী করে রেখেছেন। তুমি আমায় বাঁচাও। তুমি ভিন্ন আমি বাঁচব না।

বাঁচবে না? হেসেছিল মলিন। মরা যত সহজ তত কঠিন। কিন্তু প্রথমটা সত্য নয়, সত্য শেষেরটা। মায়া! মায়ার উপর সে আকর্ষণ আর নাই। না—নাই। মুক্তি পেয়ে সে বেঁচেছে। না। তা ঠিক নয়। তবে সে ফিরে এল কেন? মায়া ঠিক টিয়ার মত নয়। মায়া দেহে দেউলিয়া হয়ে গেছে, রূপশ্রী তার ঝলসে গেছে, তবু মায়াকে মনে পড়ে। মায়ার একটা মন আছে। আছে সেই মনটাই। অবশ্য ওইটেই সব নয়; মায়ার কাছে তার কতক-গুলো মূল্যবান জিনিস আছে। সেগুলো তার চাই। টাকা পয়সা তার ফুরিয়ে এসেছে। টাকা কিছু মায়ার কাছে থাকার কথা। গহনাও তাকে সে কম দেয়নি। কিন্তু সে তা ফিরে চায় না। সে মায়ারই থাক। মায়াকে সে মূর্তি গড়ার কাজও শিখিয়েছে। করে সে ওতে খেতে পারবে। সে চায় শুধু তার সার্টিফিকেটগুলো। তার প্রশংসাপত্রগুলো। লক্ষ্ণৌ ঘুরে এসেছে সে। ওখানে ভাল পুতুল হয়। সে লক্ষ্ণৌয়ে যাবে। সেখানে বসবে। সার্টিফিকেট-গুলো তার চাই।

ফিরে এল সে কলকাতায়। নামবে পুরনো আস্তানায়। জানে না সে আস্তানাগুলো আছে কিনা। তবে বাড়ীওয়ালাকে সে এক সঙ্গে অনেক টাকা দিয়েছিল, পাঁচশো টাকা। বাড়ীতে ভাঁটা করার জন্য ছ মাসের ভাড়া অগ্রিম দেবারই কড়ার ছিল। বাড়ীওয়ালার প্রয়োজনে পাঁচশো টাকা দিয়ে ভাড়াটা কিছু কমিয়ে নিয়েছিল সে। ত্রিশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা, বারো মাসে ষাট টাকা কম। সে সুযোগ সে ছাড়ে নি। তার রসিদটা তার স্যুটকেসে আছে। গ্যালিফ স্ট্রীটে ট্যাক্সি থেকে নেমে বাসায় এসে ঢুকল।

বাসাটা আছে। কিন্তু হাঁ-হাঁ করছে, খাঁ-খাঁ করছে। লোকজন কেউ নেই। ভাঁটাগুলো ভেঙে গেছে, চিমনীটা ভেঙে পড়েছে। দরজাগুলো খোলা। একটা ঘর শুধু ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিলে সে—কে আছ? কে আছ? কে?

বেরিয়ে এল ফড়িং।

—ফড়িং!

কাঃরিগঃরঃ! মুখখানা এমন হয়ে গেল যে তার চেয়ে ফড়িং কাঁদলে কি হাসলে ভাল ছিল। মলিন বুঝতে পারলে না—সে হাসতে চায়, না কাঁদতে চায়।

—রাখ্ জিনিস তুলে। বসবার কিছু থাকে তো দে। মায়াকে খবর দিতে হবে।

জিনিস সামান্য। এক স্যুটকেশ, একটা বিছানা। বসবার কিছু নেই। মলিন রুমাল দিয়ে ঝেড়ে দাওয়ার উপরেই বসল। জিজ্ঞাসা করলে—মায়ার সঙ্গে তোর দেখা হয়? কেমন আছে সে?

উত্তর না পেয়ে ডাকলে—ফড়িং। এবারও উত্তর পেলে না। ছোঁড়া কি—?

অস্বস্তি অনুভব করলে মলিন। চীৎকার করে গোল না বাধায় হাবা।

পাশের বস্তি থেকে উঁকি মারছে কে।—কম্পাউণ্ডার নৃপেন।

—রায় মশায়, কেমন? কখন? মর্ত্যধামে কখন পদার্পণ হল। বলিহারি বলিহারি। ও শ্যাম, মলিন রায়, বিখ্যাত মলিন রায় এসেছে হে। দেখ-দেখ।

কথার সুর ভাল লাগল না মলিনের। গ্রাহ্যও করলে না সে। একটা সিগারেট ধরালে। ঠিক এই সময়েই হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরল ফড়িং। তার পিছনে ও কে। মায়া? সেই রুগ্ন, দেহে রূপে দেউলিয়া মায়া? এ যে মায়ার নতুন রূপ। এ কি রূপ! অপরূপ কোলে তার শিশু।

মায়া থমকে দাঁড়িয়েছে। চোখে তার জল, মুখে হাসি। ঠোঁট কাঁপছে। কথা বলতে চাইছে সে, কিন্তু পারছে না।

—মায়া! সে এগিয়ে গেল। কিন্তু পিছনের দিকে কিছু যেন পড়ল, মায়ার চোখে আতঙ্ক ফুটল, দেখেই সে মুখ ফেরালে, ঘুরে দাঁড়াল। পাশের বস্তি থেকে নৃপেন, শ্যাম, আরও দুজন লোক বেঁড়া ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে।

—খবরদার। তোমাকে কেটে তোমার লাস ভাসিয়ে দেব খালের জলে। বেটা বদমাশ।

মলিন ভয় করে না। ভয় তার নেই। তার উপর সে অনেক ঘুরে অনেক শিখেছে—ওদের চেয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে—কি চান আপনারা? খুনোখুনি?

ওদিক থেকে বর্বর চীৎকার উঠল; ভাঙা বার্ধক্যশীর্ণ কাঁপা গলায় একটা জান্তব চীৎকার। তার সঙ্গে মিশে গেল মায়ার কণ্ঠস্বর—বাবা!

বাতগ্রস্ত বঙ্কিম ভটচাজ তার স্থবির দেহ নিয়ে চীৎকার করে মলিনের উপর গা ঢেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।—শয়তান, পাষণ্ড। এত বড় পাপ—এত বড় অন্যায়—। পিশাচ!—খামচে ধরলে তার চুলের মুঠো।

মলিন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে—না, কোন পাপ কোন অন্যায় আমি করিনি।

—করিস্ নি? আমার বিধবা কন্যাকে—। ওরে—। এত বড় অন্যায়—

—ভাল লেগেছিল, তাকে ভালবেসেছি। বিয়ে করেছি। কোন অন্যায় আমি করিনি।

—তুই জোচ্চোর। তুই জাতিহীন। তুই—তুই—জারজ!

চীৎকার করে উঠল মলিন—না—।

—না? এই দেখ—যোগেশ পালের চিঠি। কেষ্টনগর তোর বাড়ী নয়। তোর বাড়ী দেবীগ্রাম। তোর, তোর—।

আবার চীৎকার করে উঠল মলিন—না। এবং ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। সে ঝটকা বৃদ্ধ বঙ্কিম ভটচাজ সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। মুহূর্তে চারটে লোক ক্ষুধার্তের মত লাফ দিয়ে পড়ল মলিনের উপর। মায়া চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

বঙ্কিম ভটচাজ ফেটে পড়ল—কুলটা কলঙ্কিনী—। চুপ কর।

মায়া চীৎকার করে বললে, না।

লোক জমছিল। একটি দুটি ক'রে নয়, অনেক। তখন রটে গিয়েছে।—মলিন ফিরেছে। লোকে জানে—বঙ্কিম ভটচাজ চীৎকার করে জানিয়েছিল, সে সময় ছ'নে বেঁচে ছিল—সেও আস্ফালন করে জানিয়েছিল মলিন মায়ার কাহিনী। যাদের জানতে বাকী ছিল—ছ'নের ফাঁসির মামলায় তারাও জেনেছে সে ইতিবৃত্ত। জেনেছে মলিন কারিগর বিধব মায়াকে নিয়ে পালিয়েছে। জেনেছে মলিন ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ দূরের কথা—মলিনের জাত নাই—মলিন জারজ। গোটা কলকাতা জেনেছে। আক্রোশে তারা ফেটে পড়েছে। ছ'নে ফাঁসি গিয়েছে।

মলিন শয়তান—মহা পাষণ্ড মলিন।

মায়া কুলটা—মায়ার লজ্জাহীনতার তুলনা নাই।

মলিনকে তারা বিপর্যস্ত করে নিয়েই ক্ষান্ত হল না। বাঁধলে।

—বাঁধ ওকে।

মায়াকে ক'জনে টেনে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে বন্ধ করে দিলে।

মায়া চীৎকার করছিল—না—না—না। সব মিথ্যে। সব মিথ্যে। আমার স্বামী। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে যাব।

বস্তির মুখ থেকে প্রতিধ্বনি তুলে মায়ার আর্তনাদ সেই গলিটার ভিতরে—জীর্ণ ঘর খানার অন্ধকূপের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

পাঁচ

মলিন বন্ধনের মধ্যে ভয় পায় নি। সে কাঁদে নি। দাঁতে দাঁত টিপে পড়ে ছিল। ওরা তাকে নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছে। করুক। খুন করে করুক। খুন যদি করে তবে মায়াকেও যেন করে। দুজনে একসঙ্গে যাবে। খুন হতে তার একমাত্র আপত্তি—মায়া। মায়া অপরূপ হয়ে উঠেছে। এ এক নূতন রূপ। অপরূপ। কি শ্রী। কি শান্তি। সে আবার নতুন করে পাগল হয়ে গেছে। এই নির্যাতনের মধ্যেও মায়ার দিক থেকে সাধ্যসত্ত্বে চোখ ফেরায় নি। মায়া চীৎকার করেছিল, না—না। আমার স্বামী, আমার স্বামীর সঙ্গে যাব। ওরা তখন ধরে নিয়ে গেল তাকে। তখন তার মাথার অবগুণ্ঠন খসে পড়েছিল, রাশীকৃত কোঁকড়া চুল ফুলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার পিঠের উপর।

অপরাহ্ণের দিকে ঘর খুলে এসে ঢুকল অমল, তার সঙ্গে বাড়ীওয়ালা। অমল ভটচাজ মায়ার বড় ভাই। যে থিয়েটার করে। অমল ঘরে ঢুকে নীরবে মলিনের পাশে বসে বাঁধনটা তার খুলে দিলে। বললে—তুমি চলে যাও। পালাও। মায়া বড় কাঁদছে। আর তুমি তার ওপর অন্যায় খুব কর নি। আমি দেখে এসেছি, পাটনায়, তুমি তাকে সুখেই রেখে-

ছিলে। কিন্তু তাকে ফেলে এমন ক'রে চলে গেলে কেন? কি বলব? রোজগার করিনে। তার ওপর বিয়ে করেছি। দুজনকে খাওয়াচ্ছে বাবা পুরুতগিরি ক'রে। বউটা রান্না করে, জোর এইটুকু। মা বেঁচে থাকলে হয়তো তাকেও ভাত দিত না। মা মরাতে তার ঠাঁই হয়েছে। আমার রোজকার থাকলে, বাসা থাকলে, মায়াকে এনে এখানে তুলে দিতাম না। তোমাকেও লাঞ্ছনা সইতে হত না। কি করব? এখন তুমি চলে যাও। পাড়ায় খুব জটলা চলছে।

মলিন অবাক হয়ে গেল প্রথমটা। এ লোকটাকে এমনভাবে বুঝতে পারেনি আগে। আগে দেখেছে। খেত আর চুল আঁচড়াতো, পকেটে চিরুনি রাখত, পথ চলতে চলতেও চুলে হাত দিয়ে ঢেউ তুলত। হা-হা করে উচ্চ কণ্ঠে হাসত। বক্তৃতার ঢঙে কথা কইত। মলিন ভাবত এও ছ'নের মত। কিন্তু এ লোকটি তো তা নয়।

বাড়ীওয়ালা বললে—কাজটা তুমি অন্যায় করেছ। জাতটা ভাঁড়ানো, তোমার অন্যায় হয়েছিল। ছ'নেটার ফাঁসি হয়ে গেল।

অমল বললে—ছ'নের এ পরিণাম ওর কুষ্ঠীর ফল ভাই। ওর স্বভাবের ফল। আর জাত নিয়ে হৈ-চৈ-টা তোমরা বেশী করছ, বাজে করছ। মায়া বলছে, সে তার শ্বশুরের নাম জানে—বলছে ওরা সত্যই বামুন।

মলিন বাধা দিয়ে বললে—জাত আমার থাক না থাক, মায়া আমাকে নইলে বাঁচবে না, আমি মায়াকে ছাড়ব না। মায়াকে এনে দিন। আমি তাকে নিয়ে চলে যাব। তার গহনাগাঁটি সব আপনারা নিন। তাকে ছেড়ে দিন।

হেসে অমল বলল—আমি চাই না। ও লোভ আমার নাই। বাবার আছে। কিন্তু সে বলাও মিছে কথা। মায়া যখন বাড়ীতে এসে ঢুকেছে তখন সব তো পাওয়া হয়েই গেছে। ও আশা তুমি করো না। তবে তুমি আর এখানে থেকো না। আমাদের ওদিকেও যেয়ো না। পাড়ার ছেলেদের তো জান। তারা আগলে আছে, বাড়ীর উপর কড়া নজর রেখেছে। পাড়ার সাধারণে তোমাকে ছেড়েই দিতে বলেছে। মানুষকে খুন করা তো যায় না। কিন্তু ওই দলটা এখনও রাজী হয় নি। তারা তোমার আরও লাঞ্ছনা করতে চায়। কেউ বলে, নাক কেটে ছেড়ে দাও। কেউ বলে, মাথা কামিয়ে গুড়-তুলো মাখিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে তবে ছেড়ে দাও। কেন সে সব পোয়াতে যাবে? চলে যাও তুমি। একটা মেয়ের জন্যে—কাজ কি? বরং চলে যাও। কোথায় থাকবে ঠিকানা জানিয়ো আমাকে, পরে সুযোগ বুঝে দেব মায়াকে পাঠিয়ে। এখানে আর থেকো না।

মলিন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালে, স্যুটকেস নেই। স্যাণ্ডেল? একপাটি পড়ে আছে। আর একপাটি? পেলে না খুঁজে। কোথায় ছটকে পড়েছে। একটা পাটিই হাতে করে নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল। গলিপথে গ্যালিফ স্ট্রীটে বেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। হাতে একপাটি স্যাণ্ডেল।

অমল হাসলে। মাথার ঠিক নেই বেচারার।

গঙ্গার জল তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। ওপারে সূর্য নেমে গেছে বালি-বেলুড়ের বাড়ী-ঘরগুলির আড়ালে। আকাশে ছিল মেঘের ছিল্‌কে, তার গা বেয়ে সূর্যের ছটা কয়েকটি সুদীর্ঘ সরল রেখার মত উপরের দিক ছুটে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। রাঙা হয়ে উঠেছে মেঘের ছিলকে ; তারই প্রতিবিম্ব পড়েছে গঙ্গার জলে। ওই দিক দিয়েই চলল সে। গায়ের কাপড় জামা ধুলোয় একেবারে ধূসর হয়ে গেছে, ভারী লাগছে, ঝাড়লে ধুলো উড়ছে, ছিঁড়ে গেছে, মুখে কপালে কালসিটে পড়েছে। মাথায় চুল ছিঁড়ে গেছে, তাতেও ধুলো লেগেছে। সেদিকে তার খেয়ালই নেই। লজ্জা তার নেই। যা ছিল তা আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে বস্তির উঠোনের ধুলোর মধ্যে। দুর্জয় ক্রোধ, দুরন্ত সংকল্প তার মনের মধ্যে। তারই মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে সে। এ ক্রোধ তার মেটাবার উপায় নাই। কতজনের উপর প্রতিশোধ নেবে? পারে এক বঙ্কিম ভটচাজকে খুন করতে। তা পারে। লুকিয়ে থেকে কোনদিন নির্জন অবসরে ঘরে ঢুকে ছুরি মারতে পারে। আর কি পারে? আর কিছু পারে না। আর পারে—নাম যশ অর্থ অর্জন করে এই পাড়াতে সকলের চোখের সামনে মায়াকে নিয়ে বাস করতে। মায়াকে তার চাই। মায়াকে পেতেই হবে। বুকের মধ্যে এমন উত্তাল আবেগ কারও জন্য সে কখনও অনুভব করে নি। মায়াকে তার চাই। কি ক'রে? কোন উপায়ে? ভাবতে হবে। সেই ভাবতেই সে চলল গঙ্গার দিকে, লাল-ছটা-মাখা গঙ্গার দিকে চেয়ে সে ভাববে। তারপর—।

মরতে তার ভয় নেই। শেষ পর্যন্ত গভীর রাত্রে ঘরে ঢুকে মায়াকে বঙ্কিমকে ছুরি মেরে সেও মরবে।

—কাঃরিগঃর। কাঃরিগঃর।

পিছর থেকে শেষে গায়ে হাত দিয়ে ফড়িং ডাকলে—কাঃরিগঃর।

ফিরে তাকালে মলিন।—ফড়িং।

—কোথায় ছিলি? পালিয়েছিলি। প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠলো মলিনের বুকে। একটা লাথি মারবার দুর্নিবার ইচ্ছে জেগে উঠল।

তার চোখ দেখে ফড়িং পিছিয়ে গেল খানিকটা। সে মলিনের ক্ষুদ্র উজ্জ্বল চোখের প্রতিটি শিরার রক্তাভ হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বোঝে। পিছিয়ে যেতে যেতেই বললে—পাঃলাবঃ কেন? বউদিঃদির কোঃল থেঃকে মেয়েটা যেঃ পড়েঃ যাঃচ্ছিল। আমি কোলেঃ করেঃ নিয়ে সরেঃ গেঃলাম। নঃইলেঃ যেঃ মরে যেঃত।

—কই? কই মেয়ে?

—দিয়েঃ এসেছিঃ।

—কাকে? ওদের বাড়ীতে?

—হ্যাঃ। বউদিদিঃকে দিঃয়েছিঃ। আঃর কারুঃর হাঃতে দিঃইনি। বঃললামঃ তাঃ দোবঃ নাঃ আমি। মেরে ফেলঃলেওঃ দোব না। তঃখন নিঃয়ে গেল ঘরেঃ। তাঃর হাতেঃ দিলাম।

সেঃ তোমাকেঃ থাকতেঃ বলেছে। আর একজন কে বলেছে। ফাঁক পেলেই বউদিদিঃকে বার করেঃ দেবেঃ।

—আয়।

—কিঃছু খাঃও। পঃয়সা আছেঃ আমাঃর কাছেঃ। মুড়ি তেঃলে-ভাঃজা আনি।

মুড়ি তেলে-ভাজা সে আজ বোধ হয় চার পাঁচ বছর খায়নি। আজ গঙ্গার ধারে বসে গোগ্রাসে গিললে। গঙ্গার জল আঁজলা পুরে খেলে। ঝোলানো উনোনের উপর পিতলের কেতলি বসিয়ে যারা পথে পথে চা বিক্রী ক'রে—তাদেরই একজন যাচ্ছিল, তাকে ডেকে একভাঁড় চা খেলে। সে পয়সাও দিলে ফড়িং। টাকা পয়সা তার আছে। গোপন সঞ্চয় সে রাখে। মোটা সোল্ বোম্বাইয়ের স্যাণ্ডেল পরে সে। নতুন স্যাণ্ডেল। কিনেই অত্যন্ত গোপনে সোলের পাশের সেলাই কেটে তার মধ্যে রাখে এক একখানা দশটাকার নোট। একপাটি স্যাণ্ডেল আছে। আরও আছে। হাতে সে একটা মোটা তামার তারের তাগা পরে—তার সঙ্গে আছে একটা চৌকো তাবিজ। বেশ বড়। তার মধ্যে দেবতার নির্মাল্য কি মন্ত্রলেখা ভূর্জপত্র নেই, আছে একশো টাকার একখানা নোট। সেটা হাতেই আছে। তামার তাবিজ তামার তারের ওপর নজর কারুর পড়ে নি। একশো দশ টাকা তার আছে। কিন্তু সে এখন থাক। দশ টাকার নোটটা সে বের ক'রে নেবে একটু অন্ধকার হলেই।

ফড়িংকে মলিন আবার পাঠাল, তুই যা। কোন রকমে বলে আয়, আমি এখানে বসে আছি। সারা রাত থাকব। লোকজন কমে গেলেই, গিয়ে দাঁড়াব,—অন্নপূর্ণা ঘাটে। ঠিক দাঁড়িয়ে থাকব। সে যেন আসে। যে কোন রকমে পারে চলে আসে যেন। পাহারা থাকলে—ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বলবি। মেয়েটা পড়ে থাকে থাক। পরে দেখব। পুলিশ নিয়ে মেয়ে নিয়ে যাব।

সে যেন আসে। মায়া। মায়া যেন আসে। মেয়ে না পায় না পাবে। কত মরছে; আবার হবে। মায়াকে না নিয়ে সে যাবে না।

গঙ্গার কল্লোল বাড়ছে; জোয়ার আসছে।

বসে আছে সে গ্যালিফ স্ট্রীটের পাশের মারহাটা-ডিচ খালটার সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম-মুখটার কাছে, লক-গেটটার পাশে, একটা গাছের তলায় গুঁড়ির আড়ালে। উপরের রাস্তাটা সরু; সামনে লক-গেটের সঙ্কীর্ণ ব্রিজ। এদিকে লোক হাঁটে কম। রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ, তার উপর দুর্গম। নিতান্ত দায় না হলে কেউ হাঁটে না। কদাচিৎ দু-চারটি দুঃসাহসী ছেলে শখ ক'রে অথবা গোপন পরামর্শের জন্য এসে দাঁড়ায়। দাঁড়ায় ধ্বজার মত। ধ্বজা দেখে দ্বিতীয় জন এলেই তারা নেমে গিয়ে বসে গাছতলায়। কখনও কখনও দুঃসাহসীরা দাঁড়িয়ে বান দেখে।

গঙ্গার জলে লাল রঙের সঙ্গে কালো রঙ মেশাচ্ছে। ঢালছে, ঢালছে, ঢালছে। মুহূর্তে মুহূর্তে রঙ পালটে পালটে গাঢ় বেগুনী থেকে সীসের মত হচ্ছে। আরও গাঢ় হয়ে কালো হতে হতে মিলিয়ে গেল সারা গঙ্গাটাই। শুধু এখানে ওখানে জ্বলে উঠল আলো। নৌকার

আলো। ওপারে ওদিকে হাওড়া-স্টেশন-ব্রিজ থেকে দূর উইলিংডন ব্রিজ পর্যন্ত আলোর সারি জ্বলেছে। মাঝে মাঝে খুব উঁচুতে এক একটা আলো। হাওড়া স্টেশনের মাথায়, বড় বড় জুটমিলের মাথার আলোগুলি। অন্ধকার গঙ্গায় তার প্রতিবিম্বগুলি কাঁপছে।

মলিন স্থির দৃষ্টিতে ওই দিকে চেয়ে নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে। গঙ্গার কল্লোল শোনা যাচ্ছে আর শুনতে পাচ্ছে—তার নিজের বুকের ধ্বক ধ্বক শব্দ। ভাবছে মায়ার কথা।

মায়া আসবে। গভীররাত্রে অকস্মাৎ তাকে দেখা যাবে গলিপথের মুখে। চিৎপুর রোড পার হয়ে এসে পোর্ট কমিশনারের লাইনের মালগাড়ীগুলোর ছায়াতে এসে দাঁড়াবে। মুহূর্তে সে ইশারা দিয়ে চলতে আরম্ভ করবে। কোন দিকে? বাগবাজার ধ'রে নয়, চিৎপুর ধরেও নয়। কলকাতা দিন রাত্রির মধ্যে ঘুমোয় না। তার চোখ লক্ষ লক্ষ। যত লক্ষ লোক কলকাতায় তার দ্বিগুণ চোখ কলকাতার। কয়েক শো চোখ জেগে থাকেই। পুলিশ আছে, গুণ্ডা আছে; হাজার হাজার আছে; ওসব পথে হাঁটবে না। উত্তরের পথে। এই দিকে।

—কাঃরিগঃর। ফড়িং এসে উপরে দাঁড়িয়ে ডাকছে।

—ফড়িং! এখানে। গাছতলায়।

ফড়িং বললে—বঃড্ড ভিঃড়ঃ। লোকেঃ খুঃবঃ বঃকঃছে। তোঃমাঃকেঃ গাঃলঃ দিঃচ্ছে।

—দেখা করতে পেরেছিস কি না বল।

গাল দিচ্ছে। দিক। কি গাল দেবে? গালিগালাজ নির্যাতন সে গ্রাহ্য করে না।

—তাঃর দেঃখা পাঃই নাঃই। তঃবে ওঃদেঃর বাঃড়ীঃর বঃউয়ের দেঃখা পেঃয়েছি। ভাঃরী ভাঃল লোকঃ। । খুঃব চাঃলাকঃ।

ফড়িং তার জড় জিহ্বায় যা বললে মলিন তা বুঝলে।

ওদের দরজায় পাড়ার লোকের একটি দল জুটেছে। গাল দিচ্ছে তাকে, গাল দিচ্ছে মায়াকে। মায়া জলস্পর্শ করে নি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। দরজায় বসে আছে বঙ্কিম ভটচাজ নিজে। সে গাল দিচ্ছে মায়াকে। আর গাল দিচ্ছে অমলকে। কেন ছেড়ে দিলে তাকে। কেউ কেউ বলছে ধরে আনা হোক তাকে। কোথায় যাবে? দু চার জনে খানিকটা খোঁজাখুঁজিও করেছে। অমলের বউ খুব লোক ভাল আর খুব চালাক। মায়ার তখন অসুখ। সে খুকীকে নিয়ে থাকত আর মায়ার সেবা-শুশ্রূষা করত। বিনাপয়সার চাকরে আপত্তি হয় নি ভটচাজের। সে সময় মায়ার বউদি খুব যত্ন করত মায়াকে, ফড়িংকে সে-ই মিষ্টি কথা বলত, খেতে দিত। 'পনের কুড়ি দিন পর মায়া খানিকটা সুস্থ হতেই ভটচাজ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ফড়িং এই পড়ো বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মোট-ঘাট বয়ে পেট চালাত। কিন্তু অবসর পেলেই ওদের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াত। মায়ার কাজ-কর্ম ক'রে দিত। ভটচাজও মধ্যে মধ্যে তাকে দিয়ে তামাক সাজাতো। পা টেপাতো। ওই বউটি ফাঁক পেলে তাকে ডেকে খাবার দিত। বউটি ভাল। আজ সে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকে তাকেও মারতে এসেছিল। কোথায় সে, কোথায় তোর মনিব বল? সে বলেছিল —আমি জানি না। কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

তবু লোকে তাকে চেপে ধরেছিল।

ফড়িং বললে—তাঃ ওঃই বঃউটিই বঃললেঃ—

বউটিই বলেছিল—ও কি ক'রে জানবে? ও তো মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সকলের আগে ছুটে পালিয়ে এসেছে। সেই তাকে মুক্ত করেছিল। ভটটাজও বলেছিল—না-না, ওটা জানে না। ছেড়ে দাও ওকে। সাজ রে হাবা, একবার তামাক সাজ।

তামাক সাজবার অবসরে চতুর বউটি জিজ্ঞাসা করেছিল—জানিস সে কোথায়? চুপি চুপি সব কথা ফড়িং বলেছিল তাকে।

সে বলেছিল তাকে—ঠিক আছে। ওখানেই থাকতে বলিস। আমি মায়াকে ঠিক বার ক'রে দোব। এগারটার পর। যখন হোক।

শুনে মলিন আশ্বস্ত হলো—মায়া আসবে। মনে মনে পরিকল্পনা শুরু করে দিলে সে। এই বার সর্ব্বাগ্রে পরিচ্ছন্ন হতে হবে তাকে, নিজের ধূলি-ধূসর কাপড় চোপড়ের পানে চেয়ে ফড়িংকে বললে—তোর গামছাটা দে।

ফড়িংয়ের গামছা নিয়ে সে নামল গঙ্গার জলে। স্নান করলে। কাপড় জামা কাচলে শুকুতে দিলে। বসে রইল গামছা পরে। এখনও অনেক দেরি। এখন সবে সাড়ে সাতটা আটটা। ঘাটের মুখে কালীতলায়, শনি-সত্যনারায়ণতলায়, অন্নপূর্ণাতলায় কাঁসর-ঘণ্টা সবে বাজতে শুরু হয়েছে। অনেক দেরি এখনও। ফড়িংয়ের কাছে ছুরি নিয়ে স্যাণ্ডেল কেটে নোটখানা বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—ভাঙিয়ে নিয়ে আয়, আর বিড়ি নিয়ে আয়। সিগারেট নয়। সিগারেট পরে। এই নির্জনে সিগারেটের গন্ধ লোককে কৌতূহলী করে তুলবে। কাপড় জামাটা ময়লা হয়ে ভাল হয়েছে। এখন গামছা প'রে আরও নিরাপদ। মায়ার কাপড়টাও ময়লা হলে ভাল হয়।

মায়া আসবে। নিশ্চয় আসবে। মায়ার মন সে জানে। নিজের মন থেকে সে বুঝতে পারছে। যম এসে তার পথ রুখলেও সে যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে হে'রে তবে ক্ষান্ত হবে। ভয়ে থামবে না, পিছিয়ে ঘরের কোণে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদবে না।

ফড়িং ফিরে এল বিড়ি দেশলাই নিয়ে, ভাঙানী নিয়ে।

আর এনেছে ওর নিজের একখানা ধোয়া কাপড় আর হাফ সার্ট একটা।—পঃরঃ।

বাঃ। বাঁচল মলিন।

ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজছে কোথায়। পেটা ঘড়ি। চঞ্চল হয়ে উঠল মলিন। ক-টা? মায়ার আসবার সময় হয়নি? না। ন'টা সবে এখন। ন'টা। ঘাট এখান থেকে দূর হলেও দেখা যাচ্ছে। এখনও ওখানে অনেক লোক। ফড়িংকে বললে—তুই যা। তুই এখান থেকেই ওখানে যা। একেবারে বাড়ীর কাছে কোথাও থাকবি। বের হলেই চলে আসবি। যা।

ফড়িং চলে গেলে মলিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর অস্থিরের মত ব্রিজের উপর উঠে দাঁড়াল। কি নিষ্ঠুর উদ্বেগ! ওঃ, এত দুরন্ত উদ্বেগময় প্রতীক্ষা মলিনকে কখনও

করতে হয় নি। কাঁধের নিচে দু পাশে কণ্ঠার কাছটা যেন কন্ কন্ করছে। বুকের মধ্যে কি হচ্ছে! উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছে সে। আর সে পারছে না। আসবার সময়ের অনেক দেরি, তবু বিস্ফারিত পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। চোখ জ্বলছে। কখন বাজবে এগারটা?

* * * *

বাজল এগারটা। একটা বিড়ি মুখে ধরে ছিল মলিন, হাতে দেশলায়ের কাঠি ও বাক্স; ধরাবার অবসর হয়নি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুণে যাচ্ছিল, এক—দুই—তিন। এগারটার শেষ ঘণ্টা বাজতেই ফস করে কাঠিটা জেলে বিড়িটা ধরালে। তারপর অগ্রসর হল। এসে দাঁড়াল পোস্তা-বাঁধানো সুদীর্ঘ ঘাটটার মুখে। প্রায় জনহীন হয়ে গেছে ঘাট। উঁচু লাইট-পোস্টের মাথার আলোটা পর্যন্ত যেন স্পন্দনহীন; মানুষের ছায়ার চঞ্চলতায় চঞ্চল নয়, প্রতিবিম্ব নিথর হয়ে পড়ে আছে। দু'চারটে পোকা উড়ছে শুধু। হন হন ক'রে এগিয়ে এল সে। ওয়াচম্যান্ আছে, কনস্টেবলও একটা দুটো কোথাও আছে। থাক। ওরা একটু পরেই ঢুলবে। সে এসে ঘাটের উপর পথের দিকে মুখ করে বসল।

না। সদর রাস্তায় না এসে যদি দক্ষিণের গলিপথে আসে? হ্যাঁ, তাই আসবে। অন্ধকারে অন্ধকারে এসে শুধু চিৎপুর রোড পার হয়েই আবার গলিপথ, পথটা ধরে একেবারে গঙ্গার ধার। পোর্ট কমিশনারের তারের বেড়া। ওই পথ! বুকটায় আঘাতের পর আঘাত পড়ছে, থেঁতলাচ্ছে যেন। সমস্ত বুকটা জুড়ে উদ্বেগের যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। মায়া কখন আসবে? মায়া শ্বেত-বস্ত্রাবৃতা ব্রতচারিণী রহস্যের মত কখন অকস্মাৎ এসে পড়বে; যে কোন মুহূর্তে। ঘাট থেকে সে উঠল, এসে দাঁড়াল গলিপথটার মুখটায়। অন্ধকার গলির মুখে একাগ্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওপারের গলির মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিজে সে স্থির নিস্পন্দ; নিষ্পলক তার দৃষ্টি; নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তাও যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। কই? কই? দৃষ্টির সামনেও সব মধ্যে মধ্যে ঝাপ্‌সা বা অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মায়া মায়া! মায়া আসছে। কই? একেবারে বোধ করি বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার, অথবা হয়তো ঢুল এসেছিল, শুধু মায়া আসছে কথাটি জেগে ছিল, সে চমকে উঠল।

মায়া!

তার পাশ দিয়ে লঘু দ্রুত পদক্ষেপে সে গলির মধ্যে এগিয়ে চলে গেল। কখন এল? কিন্তু সে ভাববার অবসর নেই। সেও পশ্চিম মুখে অগ্রসর হল। ওই মায়া চলছে। শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা রহস্যের মত লঘু দ্রুতপদে চলেছে, যেন উড়ে চলেছে। ডাকতে সাহস নাই নয়, ইচ্ছা করেই সে ডাকলে না। চলুক। চলুক, চলেছে। ডানদিকে উত্তর মুখে দু'সারি মাল-গাড়ীর মাঝখানের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সাদা-কাপড়-পরা মায়া ঠিক চলেছে। উত্তর মুখে। চলেছে। মলিনও চলল। চলল। চলল। নিশীথ রাত্রির নিথরতার মধ্যে মায়াকে অনুসরণ করে উদ্‌ভ্রান্তের মত চলল মলিন।

একটা একটা ক'রে লেবেল ক্রসিং পার হয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রেল লাইন, স্লিপার,

ডগলেন, সিগন্যালের তার, শান্টিং পয়েন্টের বাধা-বিঘ্ন ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে পার হয়ে চলল সে তাকে অনুসরণ করে। সামনে একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। মায়া সেটা পেরিয়ে কোন দিকে যাবে? ইঞ্জিন পার হয়ে ব্রিজ পার হয়ে বরানগরের দিকে? হ্যাঁ তাই সে ফিরল। পেরিয়ে গেল ইঞ্জিনটা।

মলিনও মুহূর্তে ঘুরল। সে ইঞ্জিনটার পিছনের ওয়াগনটার পিছন দিয়ে লাইনটা পার হবে।

সেই মুহূর্তেই ইঞ্জিনটা সিটি দিয়ে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল সামনের সার্চলাইট। একজন লোকও চীৎকার ক'রে উঠল—কোন হ্যায়?

ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলে মলিনকে।—কাঁহা যায়েগা?

—মায়া। উচ্চ চাপা গলায় মলিন বললে—মায়া।

—কেয়া?

—মায়া যাচ্ছে—আমি যাব।

কোথায় কে? কই? কেউ নেই কোথাও। সার্চ লাইটের তীব্র আলোতে সমস্ত সামনেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। কে কোথায়? কেউ কোথাও নেই। জনহীন গঙ্গার তটভূমি—বড় বড় গাছগুলোর ছায়ায় যেন ভয়াল হয়ে উঠেছে, স্তব্ধতা থমথম করছে—কেউ কোথাও নেই—খাঁ খাঁ করছে; শুধু চলছে গঙ্গার জল—কলকল খলখল। নৈশ প্রকৃতির ক্রূর হাসির মত। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মলিন। সশব্দে একরাশি বাষ্প উদ্গীরণ করে নড়ে উঠল ট্রেনটা, চলতে লাগল। দীর্ঘ মালগাড়ীটা একঘেয়ে উচ্চ যান্ত্রিক শব্দ তুলে তাকে ক্রমাগত অতিক্রম ক'রে শেষ গাড়ীটি যখন লাল আলোর বিপদ সংকেত দেখিয়ে পার হয়ে গেল, তখন সে থর থর ক'রে কেঁপে পড়ে গেল সেইখানে। আর সহ্যের শক্তি তার ছিল না।

মায়া নয়। তার মনের ভ্রম। তার বুকের বাসনা তার বুক থেকে বেরিয়ে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে। মলিনের বুকের দুর্দান্ত বাসনা।

পঞ্চম পর্ব

এক

দুর্দান্ত বাসনার অনির্বাণ চিতার আঁচে ঝলসে গিয়েও মানুষ মরে না; মরতে পারে না। তার উপর এ মানুষ মলিন দাস, মলিন কারিগর, মলিন রায়। তবে আঁচের ক্রিয়া যাবে কোথায়?

এ ঘটনার দীর্ঘদিন পর এই আঁচে ঝলসে ঝলসে প্রায় প্রেতমূর্তি হয়ে কলকাতায় ফিরল সে।

তার জীবনের ওই চরমতম নির্যাতনের দিনটি—যেদিন ওই গভীর রাত্রে আপনার মনের

অত্যুগ্র বাসনার চরমতম তৃষ্ণায় অলীক মায়ার পিছনে পিছনে ছুটে রেল-ইঞ্জিনের চাকা থেকে সামান্যের জন্য বেঁচে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তার দীর্ঘদিন পর।

আজ উনিশশো পঞ্চান্ন সালের অক্টোবরের বারই তারিখ, এর ক'বছর আগে—আট-চল্লিশ সালের এপ্রিল মাসে প্রেতমূর্তির মত আকৃতি নিয়ে ফিরে এল মলিন।

সেদিন রাত্রে ভোরবেলা ফিরে এসেছিল ফড়িং। সে-ই তাকে খুঁজে বের করে-ছিল। তখন সে নিজেই চেতনা ফিরে পেয়ে উঠে বসেছিল। কিন্তু বুঝতে পারছিল না তার কি হয়েছিল, কেন সে সেখানে? সব যেন জড়িয়ে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। শিবের জটার পথ হারানো গঙ্গার মত তার স্মৃতি ও জটের পাকের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে গোলকের ধাঁধায় ঘুরছিল।

ফড়িং তাকে দেখে তার কাছে এসে কোনো প্রশ্ন করেনি—সে ওই রেললাইনের উপর কেন? শিউরে ওঠেনি—যদি ট্রেন আসত তবে কি হ'ত ভেবে। এমন কি কি হয়েছে তাও জিজ্ঞাসা করেনি। জড়বুদ্ধি ফড়িংয়ের মাথায় এ সব প্রশ্ন জাগেনি। সে শুধু এসে তার সামনে বসে সকরুণভাবে বলেছিল—আঃসেনি। সাঃরাঃ রাত ঠাঃয় দাঁঃড়িঃয়ে ছিলাম। ভোঃর বেঃলা সেই বঃউটি বললে সেঃ যাঃবে না। আঃমি দুঃবার ডেঃকেছি, দঃরজাঃ খোঃলেনিঃ। ঘঃরের ভিঃতরঃ থেঃকে একঃ বারঃ বলেঃছে যাঃব না আঃমি। একঃবার সাড়াঃ দেঃয়নি। এঃখনও ঘুঃমুচ্ছে।

—কে? কে আসেনি? ও। মায়া!

চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল সব। মায়ার সেই ছায়ামূর্তি দেখার কথা মনে পড়ে শিউরে উঠেছিল সে। ফড়িংকে বলেছিল—একটা রিক্সা ডাক।

রিক্সায় চড়ে বাগবাজার থেকে এসে উঠেছিল হাওড়ায়। হাওড়ায় স্নান করে সুস্থ হয়ে কাপড়-জামা-জুতো কিনে এসেছিল পাটনা। থাক মায়া। মায়ার মোহ তার কেটে গেছে। কয়েকটা দিন অবশ্য সে মুষড়ে ছিল। লাঞ্ছনা অপমানের স্মৃতি, মায়াকে না পাওয়ার ক্ষোভ, তাকে মুহ্যমান করে রেখেছিল। তারপরই সে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিছু না। ও কিছু নয়। প্রথম প্রথম মনে হ'ত সে হেরে গেছে জীবনে এই প্রথম, তারপর সে মাথা তুলে পরাজয়ের সকল চিহ্ন, সকল গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে বলেছিল—কিসের হার? লড়াই এখনও শেষ হয়নি তার। হার কিসের? আবার সে ফিরে যাবে কলকাতা। এখন তার চাই টাকা প্রথম টাকা চাই।

অর্থ সঞ্চয় করে কলকাতায় ফিরে গিয়ে সে মামলা করবে স্থির করেছিল। মামলা করবে, মায়াকে এবং তার কন্যাকে ফিরে পাবার জন্য। প্রকাশ্য আদালতে মুক্ত কণ্ঠে বলবে তার পরিচয়। একটু মিথ্যাই বলবে—এ জেনেই মায়া তাকে বিবাহ করেছিল। এবং বলবে, মা তার ব্রাহ্মণ কন্যা; সে জানে না তার পিতৃ পরিচয়—তবে তার বাপ যে ব্রাহ্মণ ছিল এ কথা সে জানে। সুতরাং সে ব্রাহ্মণ।

মস্তিষ্ক শীতল হ'লে ভাবত, না, অর্থ হোক, তারপর কিনবে সে ওই লোভী ব্রাহ্মণটাকে—

ওই বঙ্কিম ভটচাজকে। টাকার বিনিময়ে লুব্ধ ব্রাহ্মণ নিজে কন্যার হাত ধ'রে এনে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

প্রচুর অর্থ চাই তার। নতুন করে সে কাজে লাগল।

মধ্যে মধ্যে নির্জন অবসরে সে শিউরে উঠত। মনে পড়ত তার সে রাত্রির সেই ছায়া-মায়ার কথা। কি? কি দেখেছিল সে? কি? অবিকল মায়া। ভ্রান্তি? ভ্রান্তির পিছনে পিছনে সে এতখানি বন্ধুর পথ, দুদিকের মালগাড়ীর মধ্যে অন্ধকার, কঠিন লোহার সারি সারি লাইন, কাঠের স্লিপার, লোহার নেল, তারই মধ্যে দিয়ে এক মাইল পথ চলে গেল। চোখের সামনে থেকে একবার হারায় নি, একবারও না, তার চোখের উপর এখনও ভাসছে। চোখ বুজলে এখনও সে দেখতে পায়—সেই ছায়া-মায়াকে ;—চলছে চলছে, অবলীলাক্রমে চলছে।

সে কি? ভুল? তার মনের ভুল? ভুল নয়, ভুল সে বলবে না।

সে মায়া তার মনের মায়া ; মন থেকে বেরিয়ে গঙ্গার জলে—না গঙ্গার জলে নয়- খালের জলে ডুবে গিয়েছে। যাক্।

তার মনের বাসনার খেলা বলেও মাঝে মাঝে মনে হত এবং শিউরে উঠত সে। ভাবত—না, ওর চেয়ে রূপের হাট ভাল। মুছে দেবে, দিদির মুখের ছাপটা সে মুছে ফেলে দেবে ; দিদির মুখের ছাপ ওদের মুখে নেই, আছে তার মনে, চোখের আয়নায় ছটা বাজিয়ে সে-ই ফেলে তাদের মুখে সে আদল। মন থেকে মুছে ফেলে দেবে।

পাটনায় আবার জেঁকে বসতে খুব দেরি হয়নি তার। প্রতিষ্ঠা তার ছিলই, সে ফিরে পেতে ক'দিন লাগে? এবার সে পুতুলে মন দিয়েছিল প্রথম। সস্তা জিনিস চলতে দেরি লাগে না। ফড়িং তার সঙ্গে ছিল—সুতরাং তাকে বেগ পেতে হয় নি। সে বসে ছাঁচ তৈরী করে খালাস, বাকী যা করবার সে সব করত ফড়িং। দেখতে দেখতে দু তিন মাসের মধ্যে আবার সে যে মলিন রায় সেই মলিন রায় হয়ে উঠেছিল। এবার সে এক নতুন ছক পাতলে, বুদ্ধি খাটিয়ে। মোগলসরাইয়ে স্টেশনে স্টলে সে দেখে এসেছিল ছোট সাজির মধ্যে মেয়েদের খেলাঘরের গৃহস্থালীর সেট—উনোন, কড়াই, হাঁড়ি, বালতি, খন্তা, জন্তু-জানোয়ারের সেট ; পিতলের, কাঠের। চুনারের-তৈরী পাইপ্-ক্লের সেট। কল্পনাটা তার ভাল লেগেছিল। এবার সে সেটা কাজে লাগালে। ঘরে, বিশেষ ক'রে ড্রয়িংরুম সাজাবার নানান সেট সে তৈরী করলে। চার-চারটির সেট। চারটি রঙ করা ছোট কলসী, তার উপর চারটি কাঁচা ডাব ; চারটি রঙ করা পিলসুজ। চারটি জানোয়ার—বাঘ, সিংহ, ভালুক, মহিষ। চারটি শিকার—হাতির হাওদায় শিকারী ও হাতীর মাথায় বাঘ ; বাঘ লাফ দিয়ে ধরেছে মহিষ, অজগর সাত পাক দিয়ে ধরেছে হরিণ, কুমীর ধরেছে মাছ। চারটি পদ্ম—পদ্মের কুঁড়ি এবং পাতা, আধ ফোটা পদ্ম, সম্পূর্ণ ফোটা পদ্ম তার উপর ভ্রমর, আর ঝরে পড়া পদ্ম, চারটি পুতুলী —বৈষ্ণবী, ক'নে পুতুল, মোহন চুড়িওয়ালী, মোহন মায়া। এবার সে মায়ার পুতুল তৈরী করলে। ওই সেই রাত্রের দেখা রূপ। সেই ছায়ার মায়া। সে যেন শূন্যে ভেসে চলেছে—

একটি পা মাটিতে মাত্র ঠেকে আছে, ঈষৎ কাৎ হয়ে মুখ ফিরিয়ে আহ্বান জানাচ্ছে। ড্রয়িংরুমের চার কোণে ব্র্যাকেটের উপর যার যেমন পছন্দ চারটি পুতুল সাজিয়ে দেবে। দাম চার টাকা, ছ-টাকা, আট টাকা, দশ টাকা। মেয়েদের পুতুলগুলি আকারে করেছিল বড় এবং পুতুলগুলি রং করতে তার বেশী সময় লাগত, এগুলিতে ফড়িংকে তুলি চালাতে সে দিত না।

রং যখন রূপ হয়ে ফোটে তখন সে মোহ বিস্তার করে, চোখই তখন ভোলে না, মনও তখন মুগ্ধ হয়। মন মুগ্ধ হলে তখন আর রক্ষা থাকে না, সে তাকে পাবার জন্য পণ করে বসে। সে বস্তু পণ্য হলে তার বিক্রী হতে কতক্ষণ?

কয়েক মাসের মধ্যেই মলিন নতুন মলিন হয়ে উঠল। সে হল এম. রায়। পোশাক-পরিচ্ছদে, ভাবে-ভঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় নতুন। এতকালের মলিনের সঙ্গে অমিল না-থাকলেও তফাৎ অনেকখানি। একটা বিচিত্র বাঁকা হাসি ফুটল তার মুখে। ব্যঙ্গ-বক্র ধারালো হাসি। কথাবার্তাগুলিও বাঁকা চেহারা নিলে; সাজ-সজ্জায় সে ধরল পশ্চিমী ধরণ, ঢিলে পা-জামা, ঝলমলে পাঞ্জাবি, দাড়ি গোঁফ রাখলে, চুল রাখলে।

একজন একদিন ড্রয়িংরুম সেট কিনতে এসে মেয়েদের ওই পুতুলগুলি দেখে বলেছিল—পুতুলগুলি—

—কি?

—কি বলব? একটু—রঙ্গিনী!

—কি—রূপের চেয়ে রস বেশী? রঙের চেয়ে ঢং চড়া? একটু বাঁকা হাসি হেসেছিল সে।

—হ্যাঁ কতকটা তাই।

—রস আর ঢংয়েই তো মানুষ স্যার; নইলে ফুলের রূপ আর রংয়ের কাছে মানুষ কি লাগে? শুনেছি—রাধা নাকি জন্মেছিলেন পদ্মের মধ্যে। রাধা যতই সুন্দরী মোহিনী ছিলেন না কেন পদ্মটির রূপ রঙের সঙ্গে তুলনা করলে নিশ্চয়ই পদ্মের জিত হবে। কিন্তু রস আর ঢং এতেই তো রাধা—রাধা। কিছু মনে করবেন না স্যার, আমি পুতুল গড়িয়ে কারিগর, আর সত্যিই বলছি মুখ্যু মানুষ। ওই দুটো বাদ দিলে কি ও রূপ ফোটে?

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি ও-সেট কেনেন নি।—নাঃ, ও থাক।

—থাক।

—আপনার দেবমূর্তি নেই?

—নাঃ।

—কেন?

—জানিনে কেন। তবে গড়িনে।

—কেন তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

—একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না স্যার।

—আচ্ছা তা হলে চলি। বলে ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

মলিন বলেছিল—কিছুই নিলেন না স্যার ?

—নাঃ, এ সব আমার পছন্দ হল না। গড়ে দিতে পারবে তো নিই।

—কোন দেবতা গড়তে হবে তাকে আমাকে একবার দেখাবেন ? তা হ'লে গড়ে দেব।

—আচ্ছা, আমার কাছে ছবি আছে, দেখাব।

—ছবি। না ছবিতে হবে না। আসলটিকে দেখাতে পারেন ? গম্ভীরভাবে কথাটা আরম্ভ করেছিল—শেষ ক'রেছিল বাঁকা হাসিতে।

ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। পাটনার বাঙালীরা পূজোর সময় প্রতিমা গড়ে দিতেও তাকে অনুরোধ করেছিল। সে জোড় হাত করে বলেছিল, আমি স্যার নিতান্তই ছাগল ভেড়া যা বলেন তাই, আমার দ্বারা কৃষিকর্ম হবে না। ধোপার গাধা বললেও রাগব না, কিন্তু বলদের কাজ আমার অসাধ্য। ও আমার আসে না।

এর পরই সে পাটনা থেকে চলে গিয়েছিল। শুনেছিল—নবদ্বীপ বা কেষ্টনগর থেকে কারিগর আনার কথা হচ্ছে। পরিচয় প্রকাশ হবার ভয়ে ঠিক নয়; সে ইদানীং বলত, কোন প্রসঙ্গে জাতের কথা উঠলেই বলত, জাত আমার কাছে দুটি, সদ্‌জাত আর বদ্‌জাত। অন্য জাত আমি মানিনে, পৈতে ছিল, ফেলে দিয়েছি। এখন আমার একটি জাত—বদ্‌জাত।

মায়ার কথা উঠলে সোজা বলত—বনল না তার সঙ্গে। ওই, ওই জাত নিয়ে। সে সদ্‌জাত আমি বদ্‌জাত—বনল না; আলাদা হয়ে গেল। ছেলেবেলা যাত্রার দলে গান শুনেছিলাম—

সুজনে কু-জনে প্রেম পদ্মপত্রে জলের ফোঁটা।
(তবু) জলেই ভাসে পদ্মপত্র পুষ্প বৃন্তে তীক্ষ্ণ কাঁটা॥

বলে তীক্ষ্ণ হাসি হেসেছিল। একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ এসে তাকে দায় উদ্ধারের জন্য ধরেছিল। সে বলেছিল—আমার এক বিবাহ আছে আপনি জানেন না ?

—জানি। কিন্তু সে তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে শুনেছি আপনাদের।

—তাও শুনেছেন ?

—সেই শুনেই এসেছি।

—আমি জাত মানিনে এটা শুনেছেন ?

—কিন্তু জন্ম তো আপনার ব্রাহ্মণ কুলে।

—হ্যাঁ তাতে ভুল নেই। কিন্তু বিয়ে আমি করব না।

—আমার মেয়েটি সুন্দরী।

—ভাল বিয়ে হোক তার। গঙ্গার দুটো ধারা—পদ্মা আর ভাগীরথী, পদ্মা দিয়েই সব জল যায়, নদী হিসেবে সে-ই বড় কিন্তু তার নাম কীর্তিনাশা; তার জলে গঙ্গার জলের কোন মাহাত্ম্য মহিমা নেই। ব্রাহ্মণের রক্ত আমার দেহে আছে—কিন্তু তবু আমি পদ্মার মত কুলনাশা। মেয়েকে জলে ফেলতেই হবে—পূজো শেষ হওয়া প্রতিমার মত ঘরে রাখবার উপায় নেই। ফেলা ভিন্ন যখন পথ নাই তখন কুলনাশার জলে ফেলবেন না। কলকাতার

ধারের অনেক পচা নর্দমার জল পড়েও ভাগীরথী ভাগীরথী। ওই ভাগীরথীর মত একটি নদী দেখে তাতেই ঝুপ করে ফেলে দেবেন।

কথা শুনে ভদ্রলোক দুঃখিত হয়ে চলে গিয়েছিলেন। সে দিন সে সারাটা দিন উন্মনা হয়ে ছিল। বুকের দিগন্তে ঝড় যেন উঁকি মেরেছিল। মনে হয়েছিল—মেয়েটিকে দেখতে দোষ কি? পছন্দ যদি হয়—। আবার—আবার সে—

না। শুধু একবার বলেই ক্ষান্ত হয় নি। বার বার বলেছিল—না—না—না—না—না—। কিন্তু ঝড়ের একটা নিজের বেগ আছে গতি আছে। বন্যার জলের মত তাকে বাঁধ বেঁধে বাঁধা যায় না। ক্ষুধার পীড়নকে রুদ্ধ করা যায়, নির্জীব হয়ে এলিয়ে পড়েও মরে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু রক্তমাংসের ক্ষুধা যার বুকে ঝড় হয়ে ওঠে,—যার জীবনে রুদ্রের তপস্যা নাই, সেই তৃতীয় নয়নের বহ্নি-প্রসাদ নাই, তার বুকে ঝড়ের তাণ্ডব তুলবেই। কিন্তু না। আর না। জীবনের পুতুল আর সে গড়বে না। তার চেয়ে সে মনের ভেতর থেকে দিদি মনোর সকল রঙ ধুয়ে মুছে ফেলে দেবে। দিদিকে এতদিন বলেছে—মর—মর—মর, মনোদিদি তুই মর। এবার সে তাকে মারবে। হত্যা করবে। রূপের হাটে নিজেকে সে বিকিয়ে দেবে।

সন্ধ্যাবেলা মদ্যপান করে ভাল একখানা এক্কা ভাড়া করে ছুটল সে সিটির দিকে। পাটনা সিটির রূপের হাট। ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে বললে পল্লীটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত। এখানে একটা আবিষ্কার সে করলে। বাংলাদেশে মনোদিদির ছাপ যাদের মুখে দেখত, তাদের থেকে এরা বেশভূষায় ভঙ্গিতে আলাদা। মিল নেই। মনোর ছাপ এদের উপর পড়েও যেন মিলছে না। সে আবার মদ্যপান করলে। পকেটেই ছিল তার একটা শিশি। হঠাৎ এক জায়গায় সে বলে উঠল—বাস্ করো, রোখো এক্কা। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল একটি তরুণী। সে উঠল গিয়ে তার ঘরে। মনোদিদি মরেছে। মরে মনোদিদি যে পথটা মুক্ত করে দিলে জীবনের ঝড় তার সেই পথে উড়ে চলল।

দুই

পরদিন ফড়িংকে বললে, বেঁধে ফেল সব। আমি ঘুরে আসি।

ফড়িং সভয়ে জিজ্ঞাসা করল—কোঃথায় যাবেঃ আবাঃর।

মলিন বললে—ভয় নেই। কদিন পরেই ফিরব। যাচ্ছি লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌ—এবার লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ থেকে বাস ভাড়া করে সে পাটনায় ফিরে এল।—চল্ লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ শহরের পুতুলের বাজার সে জয় করবে। লক্ষ্ণৌ তার ভালো লেগেছে। আর ভালো লেগেছে লক্ষ্ণৌয়ের সুরতের মহল্লা, রূপের হাট। আর ভালো লেগেছিল লক্ষ্ণৌয়ের কৈসরবাগ, ছত্রমঞ্জিল, গোমতী নদী। আর ভালো লেগেছিল—তামাক ফুরসী।

দাড় গোঁফ রেখেছিল সে এবার। সে চুলে বাবরী বানালে। মাথায় টুপী চড়াল। আতর লাগালে। কস্‌মেটিক দিয়ে গোঁফ পাকালে। আর বাঙালী পরিচয়টা পর্যন্ত মুছে দিলে। সারাটা দিন রঙ, তুলি, ছাঁচ, মাটি, পুতুল—রাত্রে রূপের হাট—সুরতের মফল্লায় জীবনের ঝড়ে লুটোপুটি। সব ঝুট হ্যায়। সব ঝুট! মায়া তার সব মিথ্যে ক'রে দিয়ে গিয়েছে।

একাদিক্রমে বারো বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন, বিচিত্র মলিনের ভাগ্যে বিচিত্র ঘটনা ঘটল। বিচিত্র অবশ্য এমন কিছু নয়। এমন অনেক ঘটে। তবে তার পরিণতি মলিনের মত মানুষের জীবনে যে বিচিত্র রূপ নেয় সাধারণ মানুষের তা নেয় না। একদিন চৌকের কোঠা বাড়ীর বারান্দায় একটি সদ্য যুবতী মেয়েকে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ঠিক টিয়ার মত। টিয়ার মত নয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, নখ থেকে চুল পর্যন্ত আশ্চর্য সাদৃশ্য। দিনের বেলা। তবু এতটুকু পার্থক্য দেখতে পেলে না। টিয়া বিনিসুতোর মালা, ওতে বাঁধনের পীড়া নেই, বাঁধবার কোন আগ্রহই নেই বিনিসুতোর মালার, গলায় ঝোলে খসে পড়বার জন্যই। কখন খসে যায়—বুঝতেই পারা যায় না। টিয়া সত্যই টিয়া। যতক্ষণ তার কলকল ভালো লাগে শোন তারপর ছেড়ে দাও, সে উড়ে যাবে। আপনমনে আকাশে পাখা মেলার আনন্দে উড়ে চলে যাবে। জীবনের ঝড়ে সেদিন নেমে এসেছিল তাণ্ডব। সঙ্গে সঙ্গেই মলিন সেখানে গিয়ে উঠল। বসল, পান খাবার জন্যে পাঁচটা টাকা ফেলে দিলে।—কি নাম বেগমের?

—হামিদন্-নেসা।

—বহুত মিষ্টি আর সুন্দর নাম তো! যেন ঠুমরির আলাপের একটি কলির মত শোনাচ্ছে কানে।

হামিদন্-নেসা সদ্য-যুবতী হলেও সে হল জাত-কসবীর মেয়ে। ওর মা বললে—লক্ষ্ণৌএর শের, হিন্দুস্থানের সেরা শৌখীন আর সায়েব অর্থাৎ কবি, আর দরিয়ার মত দরাজ দিল যাঁর—সেই নবাব আমীরউল্ মুল্ক্ ওয়াজেদ আলি শার আমলে তার মায়ের মায়ের মা শাহের নজরে পড়েছিল। গাঁয়ের মেয়ে ছিল, ঘাগরী পরে গাগ্‌রী মাথায় গোমতী থেকে জল নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছিল। ওয়াজেদ আলি শা—তাঁর বাজ পাখী ছেড়েছিলেন একটা উড়ন্ত হাঁস দেখে। সেই বাজের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ দেহাতী মেয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর প্রসাদ দিয়েছিলেন। তারা যেমন তেমন ঘর নয়। তবিবৎ কথাবার্তার কায়দাকানুন এসব আর কোন ঘরে পাবে না। হামিদন্-নেসা সেটা প্রমাণ করেছিল, জবাব দিয়েছিল, জনাবআলির কথাবার্তা যেন ঠুমরীর গানের সঙ্গে সারেঙ্গীর সঙ্গত। গাইয়ের গলা যতই মিঠে কামদার হোক, তারের সুর আর ছড়ির কায়দায় নিখুঁত পর্দার বাহার অনেক বেশী কদরের।

মলিনের নেশা ধরে গেল। যে বুনো টিয়াকে সে ছেড়ে দিয়েছিল সেই টিয়া যেন বুলি শিখে ফিরে এসেছে। মলিন এরপর আসর পাতলে সেখানে। যেন পাকা আসর। আবার যেন পুতুল গড়তে হবে তাকে। না। নতুন পুতুলের দরকার নেই। এ অবিকল টিয়া।

অবিকল একদিন তার চুড়িওয়ালী পুতুলটা এনে তার হাতে দিয়ে বললে—দেখ তো। ঢংটা তোমার মত কি না ?

সে বলেছিল—তাই তো। এ জনাব-আলি পেলেন কোথায় ?

—আমার গড়া।

—হাঁ! আপনার এমন হাত ?

—চল। একদিন দেখবে আমার গরীবখানা। কত পুতুল দেখবে। যত চাও আনবে।

—যাব। কবে ? আজই ? আজই চলুন। দেখে আসব আপনার দৌলতখানা। আর আঁচল ভরে নিয়ে আসব এই পুতুলের দৌলতের দুএক মুঠো।

—যাবে ? আচ্ছা। কিন্তু আমি তোমাকে নতুন সাজে সাজিয়ে নিয়ে যাব।

—নতুন সাজে ? কৌতুক উথ্‌লে উঠেছিল হামিদনের—সেই টিয়ার মত দুটি ছোট চোখে। মলিন তৎক্ষণাৎ বাজার থেকে পছন্দ ক'রে শাড়ী কিনে এনেছিল। টিয়া যেমন শাড়ী পরত, তেমনি শাড়ী—তারপর সাজিয়ে তাকে ক'রে তুলেছিল অবিকল টিয়া। আর বলেছিল—তোমার নাম এখন টিয়া, কেমন ?

তারপর এসে উঠেছিল বাসায়।

দরজায় ধাক্কা দিতেই ফড়িং দরজা খুলে দিয়েছিল।

মলিন তাকে সকৌতুকে বলেছিল—চিনতে পারছিস ? কে বল তো ?

এই কৌতুকটুকু করবার জন্যই সে হামিদন্‌কে টিয়া সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল।

জড়বুদ্ধি ফড়িংয়ের পক্ষে এ রহস্য ভেদ করা সম্ভবপর হয় নি। এত মিল। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সে। স্তম্ভিতের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। টিয়া ? তার দিদি ? এখানে ?—হ্যাঁ সেই তো ? মলিন হামিদনের হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ফড়িং স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হামিদনের খিলখিল হাসি শুনে সে ঘরে ঢুকল এবং ঘরে ঢুকেই বর্বর ক্রোধে চীৎকার করে উঠল। মলিন তখন হামিদনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। জড়বুদ্ধি হলেও ফড়িং আর বালক নয়, সে পূর্ণ পরিণত যুবা, যুবা কেন—তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। ওই বর্বর চীৎকার করে মূর্তি পালিশের একটা ছুরি তুলে নিয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মলিনের উপর ঠিক একটা পশুর মত। মলিন পড়ে গেল।

মুহূর্তে এবং যেন চকিতের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল ঘটনাটা। ফড়িংয়ের বর্বর চীৎকার শুনে মলিন চমকে উঠেছিল কিন্তু ব্যাপারটা অনুমান ক'রে সতর্ক হ'তে সময় পায় নি সে। যখন ফড়িং ঝাঁপিয়ে পড়ল—তখনও না। ওদিকে তখন ভয় পেয়ে হামিদন চীৎকার ক'রে উঠেছে; মলিন ভেবেছিল ফড়িং হামিদনকেই বোধ হয় আক্রমণ করবে। সে হামিদনকে আগলে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছিল। ফড়িং যখন তার উপর পড়ল তখন সে বুঝলে, শুধু বুঝলে নয়, চকিতে ছেলেবেলার স্মৃতি মনে পড়েছিল—মনোর বাড়ীতে যখন 'মনোসুন্দরী' বলে ডেকে আগন্তুক আসত—তখন—। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই একটা তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর আঘাত অনুভব করেছিল পিঠে। জন্তুর মত ফড়িং ঘাড়ে পড়েছে, নিজের দেহ দিয়েই মলিনের সামনেটা ঢেকেছে,

পিঠটাই সে পেয়েছিল ছুরির মুখে।

সে একটা আশ্চর্য নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। এমন বলশালী দেহ তার আঘাতের ফলে একটা নিদারুণ চমকে চমকে উঠে যেন এলিয়ে গিয়েছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব পাক খেতে খেতে ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে।

তিন

জ্ঞান হয়েছিল হাসপাতালে। তখন বোধ হয় মধ্যরাত্রি। ধীরে ধীরে সব মনে পড়েছিল তার। নার্স কখন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ খোলা এবং খোলা চোখের স্থির চাউনি দেখে সে বোধ হয় ভয় পেয়েছিল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মলিন একটু হেসে তাকে আশ্বস্ত করেছিল।

নার্স জিজ্ঞাসা করেছিল—কেমন বোধ করছে সে।

সে বলেছিল—যন্ত্রণা রয়েছে। তবু ভাল।

মনে পড়ে জল চেয়ে খেয়েছিল।—তেষ্টা পেয়েছে, জল দাও। আর যন্ত্রণা কমবার কোন ওষুধ দাও।

জল খাওয়ার পর নার্স ওষুধ খাইয়েছিল তাকে—এতেই যন্ত্রণা কমবে।

এবার সে জিজ্ঞাসা করেছিল—আর একটা কথা বলতে পার? আমার সঙ্গে কোন মেয়েছেলে এমনি ছুরি খেয়ে এসেছে? খুব সুন্দরী মেয়ে!

নার্স বলেছিল—না তো। তোমাকে যখন স্ট্রেচারে করে বয়ে আনে তখন আমি-ই ছিলাম।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে ঘুমোতে চেষ্টা করেছিল। ফড়িংয়ের কথাও সে ভেবেছিল। সে কি ধরা পড়েছে? তার চীৎকার মনে আছে। আর কিছু নেই। ধরা যদি না পড়ে থাকে ফড়িং তবে যেন ধরা না পড়ে। সে জানে, সে জানে, ফড়িংয়ের যন্ত্রণা সে জানে। ফড়িংয়ের কাছে তার অনেক ঋণ। খানিকটা রক্ত দিয়ে তা শোধ হয় না। অন্তত টিয়ার জন্য ফড়িংয়ের ঋণ। টিয়ার ঋণ তার নেই। সে শোধবোধ হয়ে গেছে। কিন্তু টিয়ার ভাই ফড়িংয়ের কাছেও তার ঋণ ছিল ও-জন্য।

ফড়িংয়ের খবর এনেছিল পুলিশ। একদিন পরেই। একখানা ফটো নিয়ে তার কাছে এসেছিল।—দেখিয়ে তো ফটোগ্রাফ্।

ফড়িংয়েরই ফটোগ্রাফ। রেললাইনের পাথর কুচির উপর ফড়িং বীভৎস মূর্তিতে পড়ে আছে। পা দুটো কাটা, ঠিক জানুর নিচে থেকে কেটে গেছে; তার উপরের দিকটা যেন থ্যাঁতলানো, অক্ষত আছে শুধু মুণ্ডটা।

ট্রেনে কাটা পড়েছে ফড়িং।

ছুটে পালাচ্ছিল সে উন্মাদের মত। কারিগরকে ছুরি মেরে উন্মাদই হয়ে গিয়েছিল সে। বোধ করি রেল লাইন ধরে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে—এই ধারণা থেকেই সে লাইনে-লাইনে ছুটছিল।

তারপর—।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল মলিন। জীবনের ঋণ তার কারও কাছে নেই। রয়ে গেল শুধু ফড়িংয়ের কাছেই।

হাসপাতালে দিনের পর দিন মনে পড়ত ফড়িংয়ের কথা। বিশেষ করে বিকেল বেলা, যখন রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা দেখতে আসত; আপন-আপন প্রিয়জনকে ঘিরে বসত। কথা বলত। সে একলা চুপ ক'রে শুয়ে থাকত, আর ভাবত ফড়িং থাকলে সে আসত। ফল নিয়ে আসত, ফুল নিয়ে আসত।

সংসারে আপন মানুষের মূল্য এমন ক'রে কখনও বুঝতে পারে নি।—কিন্তু কে আপন জন?

একদিন সে নার্সকে ব'লে পোস্টকার্ড আনিয়ে চিঠি লিখলে কলকাতায়। মায়া রায়, কেয়ারফ—বঙ্কিম ভট্টাচার্য। পাঁচ ছ দিন অধীর হয়ে রইল। হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে টাঙা একার শব্দের মত কোন শব্দ পেলেই সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত। কে এল?

সাতদিন চলে গেল।

মায়া—মায়াবিনী। সব মিথ্যে। কে আপন জন?

—সিস্টার!

—ফরমাইয়ে।

তার দীর্ঘদেহ, সুগৌর বর্ণ, কথাবার্তার ঢঙ, সর্বোপরি তার অপরিসীম সহ্যগুণ এই মেয়েগুলির কাছে তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। বোধ করি তার সঙ্গে করুণাও ছিল। লোকটির কেউ নেই। কেউ তাকে দেখতে আসে না।

—একটা আর্জি আছে আমার, শুনে যেন ঘেন্না করো না। আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ো না, রাগ করো না।

—না-না-না। কি বল?

—এই ঠিকানায় হামিদন্ বেগম বলে এক বাইজী আছে। তোমাদের জমাদার টমাদার কাউকে যদি একবার তার কাছে পাঠিয়ে একটা খবর দাও। বলবে রায় সাহেব তোমাকে একবার দেখতে চায়! আমি জমাদার সাহেবকে একা ভাড়া ও কিছু মজুরিও দেব।

একটুক্ষণের জন্য নার্সটি চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বলেছিল—বেশ তো। কিন্তু একটা খত লিখে দেবে না?

—দরকার নাই। আর আমি তো উর্দু লিখতে জানি না। মুখে বললেই হবে!

নার্স চলে গিয়েছিল। জমাদারকে ডেকে তার সামনে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে—

পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হামিদনও আসে নি। জমাদার এসে বলেছিল—বেগম তো আনে নহি সকেগী। বড়া ভারী শেঠ আয়া হ্যায়। মাইফেল চলতা হ্যায়। মুলাকাত নহি হুয়া।

তখন ঠিক সন্ধ্যার মুখ।

হাসপাতাল থেকে বাইরের লোক সব চলে গেছে।

সুদীর্ঘ ওয়ার্ডটার মধ্যে রোগীরা শুধু কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে, কেউ নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; কেউ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে—অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—এক একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

সমস্ত পৃথিবীর চেহারাটা তার কাছে ঠিক এমনি হয়ে গেল সে দিন।

* * * * *

না। পৃথিবী হাসপাতাল নয়। সেখানে অন্তত সেবা আছে।

পরিচ্ছন্নতা আছে। শৃঙ্খলা আছে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ী এসে, পৃথিবীটা তার কাছে শেষরাত্রির ভাঙা জলসার আসর বলে মনে হল।

আলো নিভে আসছে, কতকগুলো নিভে গেছে। যে যার বাড়ী চলে গেছে আপন আপন পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে। ধুলোয়-উচ্ছিষ্টে, শূন্য ভোজনপাত্রে, পানের পিচে নোংরা হয়ে গেছে সব। নিজের সর্বাঙ্গে অবসাদ। কেউ নেই, কিছু নেই, সে একা একা বসে আছে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। আকণ্ঠ তৃষ্ণা, একবিন্দু জল নেই। শূন্য সুরাপাত্রগুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে। সূর্যোদয় আর হচ্ছে না। হয়ত হবে না।

তবু বাঁচতে হবে। হ্যাঁ বাঁচতে হবে।

দেহ তার ভেঙে গেছে। একটা আঘাত তাকে যেন দুমড়ে বেঁকিয়ে দিয়েছে। যেন ভূমিকম্পে খানিকটা মাটিতে ব'সে যাওয়া ফেটে যাওয়া একটা স্তম্ভের মত হয়ে গেছে সে। রক্তপাত প্রচুর হয়েছিল। সে বেঁচেছে তার অসাধারণ সবল স্বাস্থ্য আর অপরিমেয় জীবনী-শক্তির বলে; তার সঙ্গে ধন্যবাদ দেয় সে ডাক্তার নার্সদের। পেনিসিলিন ব্লাডব্যাঙ্কের রক্ত তাকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

সেদিন প্রায় সারাটা রাত্রিই সে জেগে ছিল। ঘুম আসে নি।

হঠাৎ একসময় মনে হয়েছিল—না, জীবনটা ভাঙা জলসার শেষ রাত্রিও নয়—। তার মনে পড়ে গিয়েছিল সেই গঙ্গার ধারের সেই রাত্রির কথা। যে রাত্রে ছায়া-মায়া তাকে বিভ্রান্ত মোহগ্রস্ত ক'রে সেই রেললাইনে রেললাইনে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে উদ্যতগতি ইঞ্জিনটার সামনে ফেলতে চেয়েছিল। মায়া মরীচিকার পিছনে পিছনেই সে সারা জীবন ছুটছে।

আশ্চর্য, তবু সে বাঁচছে। বিচিত্রভাবে সে বাঁচছে।

না। বিচিত্রভাবে নয়। সে বাঁচছে তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে—তার দুই-আর-দুইয়ে-চার বোধের জোরে।

জানালার ধারে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভোর হয়ে আসছিল। সেই দিকে তাকিয়ে—আবার সে সংকল্প করেছিল বাঁচবে। সকালে উঠেই সে লোক খুঁজে নিয়ে আসবে। ফড়িং আর হবে না। তবু লোক চাই। যে লোকটা মজুর হিসেবে খাটত ফড়িংয়ের সঙ্গে—দেহাতের এক খাপরা ব্যবসায়ীর বাড়ীর ছেলে—তাকে পাকাপোক্ত ক'রে রাখবে—সঙ্গে আরও দুজন লোক নেবে। নিজের সেবার জন্য—।

হঠাৎ মনে হল—ওই নার্সটিকে নিয়ে এলে কি হয়?

আবার নতুন খেলা! আবার নতুন পুতুল।

নার্স পুতুল চমৎকার হয়। সুন্দর।

অকস্মাৎ যেন দেহে তার জোয়ারের ইশারা জাগছে। মস্তিষ্কের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। দেহের রক্ত তার ক্ষয়িত হয়ে গেছে তবু যেন জোয়ারের তরঙ্গ জাগছে—ঢেউ উঠছে।

তাকে সে অনেক দেবে।

অর্থের অভাব তার নেই।

এই বারো তেরো বছরের মধ্যে একটা বিরাট যুদ্ধ চলে গেছে। যুদ্ধের কোন কিছু তাকে স্পর্শ করে নি। তার কানে আসে নি। যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নি। এখনও জের মেটে নি—জার্মানী হেরেছে। জাপানও হারবে হারবে করছে। এদেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো একটা রক্ত-গঙ্গা হবে। হোক। তাতে তার কিছু আসে যায় নি—কিছু আসবে যাবে না। সে পেয়েছে শুধু অর্থ। প্রচুর তার বিক্রী হয়েছে। হবেও এখনও। ও নার্সটি যা চাইবে তাই দেবে। অনেক অর্থ তার লক্ষ্ণৌয়ের রূপের হাটে গিয়েছে। শেষ ক'মাস টিয়াও তার কম নেয় নি। তবুও এখনও অনেক আছে।

শুধু অর্থ নয়—অনেক সমাদর—অনেক—অনেক ভালবাসা—অফুরন্ত জীবনের উত্তাপ তার আছে। ও মেয়েটাকে সে ননীর মত গলিয়ে দেবে।

স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে সেজেগুজে সে টাঙা নিয়ে বিকেলে গেল হাসপাতালে। সঙ্গে নিয়ে গেল অনেক পুতুল। কিন্তু পথ থেকে সে ফিরে এল।

—ঘুরে চল—বাড়ী পৌঁছে দাও, টাঙাওলা সাহেব।

বড় ক্লান্ত সে। কিছু ভাল লাগছে না।

একদিন নয়। দিনের পর দিন। কোন দিন পথ থেকে ফিরেছে, কোন দিন ওদের সঙ্গে দেখা করেছে। পুতুল দিয়েছে। কুশল জিজ্ঞাসা করেছে। সুখদুঃখের খোঁজ নিয়েছে। চলে এসেছে। যে উল্লাসে পুরুষের মন নারীর মনে তরঙ্গ তোলে, সে উল্লাস যেন তার কোথায় হারিয়ে গেছে। অন্তত ওই মেয়েটিকে দেখে সে উল্লাসকে সে খুঁজে পায় নি। তাই বা কেন? কতদিন সে চৌক বাজার ঘুরেছে, উপরের বারান্দায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকা বিলাসিনীদের দিকে চেয়ে দেখেছে—তাতেও তার মন উল্লসিত হয় নি।

মদ তার বিস্বাদ লাগে। সহ্যও হয় না। মাথা ধরে অল্প একটুতেই।

তবে তার কি ভাল লাগবে ?

বাইরে বের হওয়া সে বন্ধ করে দিলে। চুপচাপ ঘরে বসে ভাবত।

বাঁ হাতে পুতুল—ডান হাতে তুলি ধ'রে বসে বসে ভাবত। ভাবত ঠিক নয়—মন যেন শূন্য হয়ে যেত। সব শূন্য—ভিতর—বাহির সব শূন্য। আকাশ মাটি আলো অন্ধকার মানুষ জন —সব অর্থহীন। তার চোখের সামনে থাকা না-থাকা সব সমান। নিরর্থক।

এর মধ্যে মাঝে মাঝে অকস্মাৎ দিবাস্বপ্নের মত চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই ছায়া-মায়া। গোটা ছবিটা নয়। মনে ভেসে উঠত সেই গভীর রাত্রে গলি মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ তার পাশ দিয়ে যেন চলে গেল শ্বেতবস্ত্রাবৃতা মায়া। আবার ভেসে উঠত দুপাশে মালগাড়ীর ছায়ায় গাঢ় রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মায়া চলে যাচ্ছে, লঘু পদক্ষেপে, হয়তো বা পা তার মাটিতে পড়ছে না।' আর দেখতে পেত ইঞ্জিনটার সামনে দিয়ে সে পার হয়ে চলে গেল। কোথায় গেল—কে জানে ? এই স্বপ্ন মায়াই তার জীবন। সব মায়ার মত মিলিয়ে গেল।

ভাবতে ভাবতে ক্ষোভ আক্ষেপ সব স্তব্ধ হয়ে আসে! হাহাকার না, বেদনা না, কিছু না—থাকে শুধু একটা প্রশ্ন। —কি ? কি দেখেছিল সে ?

ভ্রম ? তার অতি ব্যগ্র মনের মিথ্যা সৃষ্টি ? এই পুতুলগুলোর মত ?

এগুলোও তার কাছে মনের এই অবস্থায় মিথ্যা মনে হয়। এক এক সময় জলে-ডুবে যাওয়া মানুষের মত তার ভিতরের মানুষটার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হয়। সব ভেঙে চুরমার ক'রে দেবার বাসনা উগ্র হয়ে ওঠে।

কিছু নাই—কেউ নাই—এরা সব ফাঁকি—সব মেকি—সব মিথ্যে হয়ে গেলে সে বাঁচবে কি ক'রে ? অথচ তার চাই। জীবন চাই। তার প্রাণ-মন-ভরা জীবনের স্পর্শ চাই, কান জুড়ানো নয়—প্রাণ মাতানো কথা চাই, কান্না নয়—হাসি চাই। এই দুঃখ নয়—সুখ চাই ; জীবনের এই অন্ধকার ঘুচানো আলো চাই। এ যেন সেই ছায়া-মায়া দেখা রাত্রিটাই আজও তাকে ঘিরে রেখেছে—এর আর শেষ হল না। না—তাই বা কেন ?—দেবীগ্রামের সেই রাত্রিটা, সেই উজ্জ্বল আলোয় ভরা নাট-মন্দিরের মহালক্ষ্মীর প্রতিমা যোগেশ কারিগরের তুলিতে ফুটে উঠেছে—চোখ মেলেছে—জাগছে—আর, আর সে পঙ্কজিনীর ছেলে মলিন—সে দূরে সেই অর্জুন গাছটায় বসে দেখছে—তার চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার, তার সর্বাঙ্গ বিষাক্ত পোকায় ছেঁকে ধরেছে, তার দেহ জ্বলে গেল। চীৎকার করতে ইচ্ছে হয়, পারে না। চীৎকার সে করবে না।

হঠাৎ একদিন। সাজানো শোবার ঘরটা খুলে ঢুকল। অনেকদিন এ ঘরে সে ঢোকে নি। এ ঘরটা তার নারী নিয়ে বিলাসের ঘর। কতদিন বিলাসিনীকে নিয়ে এই ঘরে রাত্রি যাপন করেছে। কত বিচিত্র নগ্ন নারীমূর্তি দিয়ে সাজানো। তার নিজের হাতে গড়া।

এই ঘরে ঢুকেই সে হামিদনকে আলিঙ্গন করেছিল এবং হামিদনের হাসি শুনে ফড়িং ঘরে

ঢুকেই তাকে ছুরি মেরেছিল।

সামনেই বড় ড্রেসিং টেবিল। ঘরে ঢুকেই বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। ও কে? সে? ওঃ! এই কয়েক মাসেই সে এমন হয়ে গেছে? এ কয়েক মাস তার ভাল ক'রে নিজেকে দেখবার অবকাশ হয় নি। চোখ ছিল না। সাধারণত স্নানের পর একবার ছোট একখানা আয়না সামনে ধরে চুলটা আঁচড়ে নিত। কোনদিন বা আয়না সামনে ধরতও না।—আজ বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। এই কয় মাসেই—তার চুলে এমন পাক ধরেছে! মুখে এমন রেখা পড়েছে! ভাঙা শরীর জোড়া তো লাগেই নি উপরন্তু আরও যেন ভেঙেছে! বয়স তার আর কত? পঞ্চাশ এখনও হয় নি। সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বোধ হয়। জন্মসাল সে জানে না। কি করে জানবে? হতভাগিনী ব্রাহ্মণ কন্যা পঙ্কজিনী কর্ম ফেরে বোষ্টুমী হয়ে দাসী বৃত্তি করত। হিসেবে গোলমাল করে নিজের কলঙ্ক-কাহিনী ছড়িয়ে হতবাক হয়ে অপ্রতিভ হাসি হাসত। সেই জীবন-তছরূপের ভুল হিসেবের অঙ্ক-ফল সে। নিজের জন্ম-সাল সে জানবে কি করে! তবুও পঞ্চাশ এখনও হয় নি, এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। অথচ—।

অথচ ক'মাস আগে, এই ঘটনাটা ঘটবার আগেও তার দেহে ছিল যৌবনের জোয়ার। প্রথম আশ্বিনের ভরা নদের মত ছিল তার রূপ। তার সবল দেহ পশ্চিমের জল হাওয়ায় আরও সবল সুদৃঢ় হয়েছিল; তার গৌরবর্ণ রঙ আরও উজ্জ্বল হয়েছিল; গালের উপরে কপালে যেন রক্তমাখা একটা কি আনারের দানার রঙের মত ফেটে পড়তে চাইত। শুধু চোখের কোলে কালি পড়েছিল। রূপের হাটের জোর-জৌলুস আলোর কালি। আর মদ খাওয়ার জন্যও বটে। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে হাসত আর বলত—চন্দ্রের কলঙ্ক!

সাধারণ লোকে চুস্ত পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা তাকে দেখে বিশ্বাসই করত না বাঙালী বলে। বললেও বিশ্বাস করত না। নিজেই নিজের বাঙালী পরিচয়টা গোপন রেখেছিল এই সুযোগে। বাঙালী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে নি। ইচ্ছে হয় নি তার। রায় উপাধিটাকে রাও করে নিয়েছিল। সেই দেহ, সেই রূপ তার কয়েক মাসের মধ্যেই ভেঙে গেল—বিবর্ণ হয়ে গেল। কিসের একটা যেন ছায়া পড়ল। কিসের ছায়া? উপবাসী অন্তরের ছায়া? পুড়ে-খাক-হয়ে যাওয়া মনের ছাপ? মনের আগুনের কালি। কেন জলে তার এ আগুন নিভছে না। কি করবে সে? কাঁদতে চায়, কিন্তু কাঁদতে পারে না। অকস্মাৎ সে দিন সে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, উন্মত্তের মত ক্রোধে ওই একটা নগ্ন মেয়ের পুতুল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল—সামনের আয়নাটাতে। ঝন ঝন শব্দে আয়নাটাও ভেঙেছিল, পুতুলটাও ভেঙেছিল। পুতুলগুলো ছিল বড় এবং ভারী। পোড়ানো নয়; প্লাস্টার দিয়ে তৈরী করেছিল সে। বর্ধমানের গোলাপ-বাগের মার্বেল মূর্তির মত।

তারপরই সে বসেছিল বোতল নিয়ে। মদ খেয়ে সে আজ মনকে বেঁধে বের হবে। নতুন হামিদন বের করবে। কিংবা কি চায় বের করবে। কিন্তু যাওয়া হয় নি। মদ খেয়ে সে অল্পক্ষণেই সংজ্ঞা হারিয়েছিল।

সংজ্ঞা ফিরেছিল শেষ রাত্রে। উঠে বসে স্তব্ধ হয়ে সে বসে ছিল সকাল পর্যন্ত।

সকাল হ'তে স্নান করে সুস্থ হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ফিরতে হয়েছিল প্রায় তিনটা। অনেক কাজ করতে হয়েছিল। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা বের করা, বাড়ীওয়ালাকে এক বছরের বাড়ী-ভাড়া জমা দেওয়া, টিকিট করা—অনেক কাজ।

চার

দুনিয়া খুঁজে—প্রয়োজন হলে দুনিয়ার বুক চিরে খুঁজে দেখবে। যা পেলে মন ভরে, প্রাণ ভরে—জীবন জুড়িয়ে যায়—তাই নিয়ে তবে সে ফিরবে।

বৃন্দাবন থেকে শুরু করলে। বৃন্দাবন থেকে মথুরা। ভাল লাগল না তার। দেবতাতে তার বিশ্বাস নাই, মন ওঠে না। ওই ত্রিভঙ্গঠামের ঠাকুরের চেয়ে মন্দিরের গায়ের মূর্তি অনেক ভাল।

আগ্রা—ফতেপুর সিক্রী।

বিরাট। সুন্দর। কিন্তু তাও ভাল লাগল না। ঠিক তারই মত—খাঁ-খাঁ করছে—হা হা করছে।

হঠাৎ মনে হল—না—এর চেয়ে মন্দিরগুলো ভাল। ওগুলো এমন খাঁ-খাঁ করে না—হা-হা করে না।

পাথরের ঠাকুর—কাপড়ে চোপড়ে অলঙ্কারে আভরণে সাজিয়ে ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে ভরাট করে রেখেছে। মানুষ কাঁদছে, হাসছে। কলরব করছে। ঢেলে দিচ্ছে। মিথ্যে সবই—তবু বিচিত্রভাবে শোকের সান্ত্বনা সাজানো কথার মালার মত সেজে রয়েছে।

ওই ছায়া-মায়ার মত।

হঠাৎ তার মনটা ব্যগ্র হয়ে উঠল—কোন সত্যকারের সাধুর জন্য। জিজ্ঞাসা করবে—এই ছায়া-মায়ার কি অর্থ? কিছু অর্থ আছে কি?

চললো সে হরিদ্বার। ওখানে অনেক সাধু আছেন। তার মধ্যে সত্যকারের সাধু আছেন। শুনেছে সে। তাঁদের মতের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক—মিথ্যা তাঁরা বলেন না। তাঁরা জানেন অনেক।

মিলল এক সাধুর সন্ধান।

ভাল লাগল সাধুকে। স্থবির উদাসী, ছোট একটি কুটিরের সামনে—একটি ধুনি জ্বেলে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। বসেই আছেন। যেন অনন্ত কাল বসে আছেন। দৃষ্টি চলেছে—চলেছে—দূর থেকে দূরান্তর—সীমাকে অতিক্রম ক'রে আরও চলেছে। কোটি কোটি দূরবর্তী কোন গ্রহের রশ্মির ধারার মত—যা ছুটে আসছেই, আসছেই—সৃষ্টির আদিকাল থেকে—কিন্তু আজও এসে পৌঁছয় নি পৃথিবীতে।

মলিন গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল; আরও লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁদের মধ্যে দিয়ে

গিয়ে তাঁকে দেখলে, তারপর সামনে গিয়ে প্রণাম করে বসল। সাধু একবার হাত তুললেন, তারও অনেকক্ষণ পর ভিড় কমল, যারা ফিরবে তারা ফিরতে শুরু করলে, যারা এগিয়ে যাবে শুধু। অগ্রসর হল। মলিন চেষ্টা করলে কথা বলতে। কিন্তু কোথায় যেন বাধছে।

সাধুই প্রশ্ন করলেন—কেয়া ভাই? তুমি ফিরবে না?

মলিন মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—মুখ তুললে।

—কিছু বলছ আমাকে?

—কুছ পুছনেকা আছে বাবা!

—পুছনেকা? আশ্চর্য একটি হাসি সাধুর মুখে ফুটে উঠল। তারপর বললেন -সনসারমে সৃষ্টিমে—পুছনাই আছে ভাই—জওয়াব—। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন—নেহি।

—নেই? মলিন যেন কেঁদে উঠল।

মৃদুস্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন—পুছনা—প্রশ্ন! জ্ঞাতুম ইচ্ছাই তো প্রশ্ন। জানাতেই তার জওয়াব। শোনাতে নয়। দুনিয়ার সব জানাই হয় আপনা জিন্দগী থেকে। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—আমার নিজের প্রশ্নের জবাবই আজও মিলল না। সেই শুরু করেছি কবে থেকে। প্রশ্নের জবাব আমি কি ক'রে দো বেটা?

বলেই তিনি ধুনি থেকে একখানা কাঠ তুলে নিয়ে চলে গেলেন কুটিরের মধ্যে।

সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলেছে। অপরাহ্ণের আলো রাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মলিন উঠল, দ্রুতপদে ফিরল।

সারা রাত্রি তার ঘুম হল না।

পরের দিন সকালে উঠেই আবার চলল সে।

জিজ্ঞাসা করবে, বলবে—তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব। নিজের খুঁজবার শক্তি আমার নাই। তুমি বল।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হল না। পথ থেকেই সে ফিরল। পথের ধারে একটা পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করছিল, বিশ্রামের তার প্রয়োজন ছিল না, বিশ্রামের উপলক্ষ করেই বসে সে ভাবছিল। ছায়া-মায়ার কি ব্যাখ্যা করবেন সন্ন্যাসী? ভ্রম? মনের বাসনার ছলনা? কিন্তু সে তো সবই ওই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। সে যে চোখে দেখেছে; বিষের ক্রিয়ার মত তার ক্রিয়া যে আজও চলেছে তার দেহে-মনে। যার এত বড় ক্রিয়া তা মিথ্যা কি করে হবে?

ছায়া-মায়া কি বলে গেছে—কি ইঙ্গিত দিয়ে গেছে? ইঙ্গিত দিয়ে গেছে—মায়ার মোহ ছাড়। সে আমারই মত মিথ্যা।

না—বলে গেছে—কায়া-ধারিণী মায়াই তার জীবনের একমাত্র সত্য।

পথ ধরে যাত্রীরা চলেছিল কেউ উপরের দিকে কেউ নীচের দিকে। হঠাৎ একটা খিল-খিল হাসিতে পার্বত্য-পটভূমি যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। নারী কণ্ঠ। একটি দল নিচের দিকে নামছে। দুটি মেয়ে আর জন দুয়েক পুরুষ। একটি ছেলের কাঁধে ঢোলক রয়েছে।

আশ্চর্য প্রাণবন্ত মেয়ে। উজ্জ্বল পার্বত্য ঝর্ণার মত। পার হয়ে তারা চলে গেল। নিচের দিকে তারা নামছে। ওরা অনর্গল হাসতে হাসতে চলেছে। সে হাসি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ভেসে ভেসে আসছে। তারপর মিলিয়ে গেল। সে বসেই রইল। অনেকক্ষণ পর সে উঠল। কিন্তু উপরের পথ ধরলো না। নিচের পথ ধরলে। সাধুর কাছে সে যাবে না। সে ওই দলটার খোঁজে চলেছে।

কি বলবে সাধু? তার নিজের প্রশ্নেরই জবাব সে পায় নি তার প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে? তার চেয়ে ওই মেয়েটার ডাক তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে!

ভাবে ভঙ্গিতে পোশাকে পরিচ্ছদে মেয়েটা দেহাতি নাচওয়ালী। মন্দ হয় না। ওই মেয়েটার সঙ্গে ঢোলক কাঁধে নিয়ে দেশ-দেশান্তরের পথে ঘুরে বেড়ালে। কি গাইবে—? গজল—ঈশক পর জোর নহী—?

ন লগায়ে ন লগে—আওর বুঝায়ে ন বনে—
ঈশক পর জোর নহী—।

নামতে লাগল সে। নামতে নামতে হরিদ্বারে এসে পৌছুল। কিন্তু দলটাকে আর পেল না। পেলে দুদিন পর। সে তখন রওনা হচ্ছে হরিদ্বার থেকে। পথের ধারে ওদের আসর পড়েছে। লোক জমেছে। কি গাইছে।

রূয়েঙ্গে হম হজারো বার
কোই হমে মনা ন কিও।

মেয়েটাকে আজ অত্যন্ত কুৎসিত লাগল। বলছে—আমি হাজার বার কাঁদব—আমাকে কেউ মানা করো না।

অথচ মেয়েটা বাঁকা চাউনিতে কটাক্ষ হানছে এবং মুচকি মুচকি হাসছে। বিশ্রী! কুৎসিত। অতি কুৎসিত। দুনিয়াটাকে মিথ্যে বানিয়ে দেয় এরাই।

রূয়েঙ্গে হম হজারো বার
কোই হমে মনা ন কিও।

একথা যখন বলে মানুষ আর সত্যিই কাঁদে তখন ওই চোখের জলে আর ওই গানের সুরে মরুভূমির ফুল ফোটে—শিউরে ওঠে মরুভূমি মানুষের দেহের রোমাঞ্চের মত—মরুভূমির বুক অকস্মাৎ সবুজ ঘাসের কণায় ভরে যায়। রূয়েঙ্গে হম হাজারো বার কোই হমে মনা ন কিও।

এ গান সে শোনে নাই কিন্তু এ কথা সে শুনেছে—এ কান্না সে দেখেছে পাটনায়।

মায়ার কান্না; শীর্ণ-দেহ আসন্নপ্রসবা মায়া সেদিন ছনের ফাঁসির হুকুমের খবরের ছুতো ধরে কাঁদছিল।

সে বলেছিল—কেঁদো না, আমার কান্না ভাল লাগে না।

মায়া অকস্মাৎ উঠে বাড়ীর বাইরের দরজার দিকে চলতে শুরু করেছিল। বাধা দিয়ে মলিন বলেছিল—কোথায় যাবে?

মায়া বলেছিল—কাঁদতে। কাঁদতে যাচ্ছি আমি গঙ্গার ধারে।

রূয়েঙ্গে হম হজারো বার
কোই হমে মনা ন কিও।

সে তাকে একটা ঘরের মধ্যে পুরে তালা বন্ধ করে দিয়েছিল। সে সেই ঘরের মধ্যেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। ছনের ফাঁসির হুকুমের সংবাদটা উপলক্ষ। আসল কথা ছিল—সে। সে তখন তাকে সহ্য করতে পারছিল না। না মিথ্যে। ঝুট। সব ঝুট। মায়ার কান্না ঝুট। মিথ্যে। ছায়া-মায়া তাকে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছে সব ঝুট। মায়ার কান্না মিথ্যে। এ মেয়েটার এই গান মিথ্যে। সত্য ওই হাসি আর কটাক্ষের অন্তরালের দুনিয়াদারী। বানিয়াগিরি!

যে গান-লিখনেওলা এই গান লিখেছিল—তার এই গান লেখাও হয়তো ঝুট—মিথ্যে। দুনিয়ার লোকের তারিফের জন্যই হয়তো লিখেছিল। তারই খেলনার পুতুলের মত।

না, তার চারটে পুতুল অন্তত তা নয়। মিথ্যে নয়। না—মিথ্যে নয়।

তার বোষ্টুমী পুতুল, ক'নে পুতুল, চুড়িওয়ালী, ছায়া-মায়া—এ তার মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয়। কতদিন এই পুতুলগুলিতে তুলি চালাবার সময় হঠাৎ এক এক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়েছে। কেউ জানে না। রঙের মধ্যে তার চিহ্ন আছে। লোকে জানে সে কখনও কাঁদে নি। সে নিজেও বলে—কান্না তার ভাল লাগে না।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে মেয়েটা নাচতে নাচতে এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে একটা হাত গালে দিয়ে অন্য হাতখানি নেড়ে—গাইলে—

দিলহী তো হৈ ন্ সঙ্গয়া খিশ্‌ত,
দর্দ সে ভর ন আত্র কিঁও?

এ তো মানুষের হৃদয়, পাষাণ তো নয়, পোড়ানো মাটি ইটও নয়, বেদনায় ভরে উঠবে না কেন?

সুতরাং—রূয়েঙ্গে হম হজারো বার, হমে কোই মনা ন কিও।

মেয়েটার হাতে একটা টাকা দিয়ে হেসে সে বললে—অব উধর।

বলেই সে ফিরল।

মিথ্যে। ঝুট!

চলো মুসাফের। আর ঝুট-কিছুর পিছনে নয়। সাচ্চা কিছু চাই। সত্য কিছু। সাদা হোক কালো হোক—যা চিরকালই সাদাই থাকবে, অথবা কালোই থাকবে। মায়া-ছায়া হবে না।

কলকাতার দিকে পিছন ফেরো। চল, খোঁজ।

দীর্ঘ দেড় বছরেরও বেশী কেটে গেল।

দিল্লী, আজমীঢ়, জয়পুর, চিতোরগড়। সেখান থেকে বোম্বাই। বোম্বাই থেকে সারা

দক্ষিণ। এরই মধ্যে মন তার যেন খানিকটা লেগে গেল। বেশ লাগল।

বড় বড় মন্দির, মসজিদ, পাহাড়ের উপর পাথরের কেল্লা, কত মতিমহল, নূরমহল, হাওয়া-মহল, রত্ন মঞ্জিল; কত বাহারের নক্সা, কত অপরূপ সুন্দর পাথরে খোদাই পুতুল। গুহা দেখলে। অজন্তা ইলোরা। কি অপরূপ ছবি!

বিচিত্র ভাবনা মনে জাগত। এ-বেলা একটা, ও-বেলা তার বিপরীত।

এ-বেলা তারিফ করত।—কি স্বর্গই না তৈরী করে গেছে!

ও-বেলা মনে হত—ও স্বর্গে যারা বাস করত—তারা কি সব পেয়েছিল? কোন দুঃখ ছিল না? যারা তৈরী করেছিল—তারা?

দুনিয়ার লোকের মন ভেজাবার জন্য গান-লিখ্‌নেওয়ালার গানের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়?

মধ্যে মধ্যে মদ খেতে ইচ্ছে হত। চেষ্টা করত। কিন্তু দেহে সহ্য হত না আর মুখের কাছে এনে মনেও ভাল লাগত না। কখনও কখনও মন চঞ্চল হয়ে উঠত,—রূপের হাটের দিকে ছুটত। কখনও কোন নারীকে দেখে কয়েক দিন ঘুরত তার পিছনে। হয়তো বা কয়েক ঘণ্টা। আবার মাঝপথ থেকে ঘুরত। এবং চলে যেত সে জায়গা ছেড়ে আর এক জায়গায়।

হরিদ্বারে সাধুর কাছে তার কথার ঠিক জবাব পায় নি। তিনি বলেছিলেন, নিজের জবাব নিজের জীবন থেকে খুঁজে নিতে। কিন্তু দক্ষিণে এসে একজন পাগলা সাধুর কাছে একটা জবাব পেয়েছে। পাগলাকে তার ভাল লেগেছিল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পার?

পাগল বলেছিল—প্রশ্ন মানে দুঃখ। সুখ যখন আসে তখন তো মনে হয় না—এটা কি হল। দুঃখ এলেই মনে হয়—কেন এমন হল? দুখ হল সুখের অভাব—অসুখ। সুখ যাতে মেলে তাই কর ভাইয়া, দুখ ঘুচে যাবে, কোন প্রশ্ন মনে জাগবে না। তবে দেখো ভাই, সুখ বলে এমন কিছু ধরো না যা পরে দুখ দেবে। ভুখ লাগলে খাও বাবা, কিন্তু এমন কিছু খেয়ো না যাতে অসুখ করে। সংসারে কিছু খেয়ে জাত যাবার ভয় ঝুট, কিন্তু অসুখের ভয় সচ্। আনন্দ রহো ভাই। আনন্দ। বস! মদ খেয়ে আনন্দ মেলে তাই খাও। তবে তবিয়ৎ খারাপ না হয়, দিল না দুখায়। বস্। প্রশ্ন মানেই ভুখা—খাও ভাই খাও। খাবার একমাত্র চিজ হল আনন্দ। বস্।

তাই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি ভাল লাগবে? কিসে আনন্দ?

ঘুরতে ঘুরতে তার কাঁচা সোনার মত গৌর বর্ণ পুড়ে তামাটে হয়ে গেল, একদিন এসে দাঁড়াল রামেশ্বরমের সমুদ্রের ধারে। আর যাবার জায়গা নেই। অথৈ সমুদ্র। দেবে ঝাঁপ।

নাঃ। মরতে তার ভয় নেই। রঘুর সঙ্গে লড়েছে সে, বাগবাজারে বঙ্কিম ভটচাজের দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। রেল ইঞ্জিনের সামনে এনে ফেলতে চেয়েছিল ছায়া-মায়া—উল্লাসের সঙ্গে সে অনুসরণ করেছিল। ফড়িং তাকে ছুরি মেরেছিল, তাতেও তার

মরবে বলে ভয় হয় নি। কিন্তু মরার মধ্যেও সুখ নাই। কষ্ট আছে।

নাঃ—। মরবে না সে।

ফেরো মুসাফের।

ফিরল সে। ফেরবার সময় তার খেয়াল হল দেশে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে। অনেক বদল। সে দিন একত্রিশে জানুয়ারী উনিশ শো আটচল্লিশ। সন্ধ্যের সময় সে স্টেশনে বসে চমকে উঠল। গান্ধীজীকে গুলি ক'রে মেরেছে!

দেশে দাঙ্গা হয়েছে। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা।

দেশ ভাগ হয়েছে। ইংরেজ চলে গিয়েছে।

যা হয়েছে—তার তাতে কিছু যায় আসে নি। এই গান্ধীজীর মৃত্যুতে সে দুঃখ পেয়েছে। ক্ষতি তার কিছু হয়েছে। সায়েবরা চলে গিয়ে তার ক্ষতি হয়েছে। ওরা পুতুল কিনত অনেক।

পথে একবার সে দিল্লীতে নামল। ঘুরে দেখলে স্বাধীন দেশের রাজধানী। একদিন মিটিংয়ে নেহেরুজীকে দেখলে, প্যাটেলজীকে দেখলে, মাউণ্টব্যাটেনকে দেখলে। আর দেখলে কি ভিড়! পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু। ছেলে মেয়ে—মেয়েছেলে! কে বললে—সুন্দরী যুবতী মেয়ে বিক্রী হচ্ছে।

চৌকবাজারের আশে পাশে অলিতে গলিতে, পার্কে পার্কে, কুতুবমিনারের ওখানে নির্জনে হাট বসে যায়।

সে বের হল। কিনুক না-কিনুক দেখবে। দেখে পছন্দ হলে কিনবে। কাউকে দেখে যদি উল্লাস জাগে—আবার ঘর পাতবে। বাস! এই ঠিক।

এল। একজন, দু'জন। তিন চার দিনে দশ বারোটি মেয়ে। গরীবের মেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে—শহরের মেয়ে। মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, চতুরতার ছাপ; উদাসীন দৃষ্টি; ঈষৎ চঞ্চল কটাক্ষের সঙ্গে একটু হাসি। কারুর হাত নিজের হাতে টেনে নিতে গেলে চকিত হয়ে হাত টেনে নিতে চায়, কেউ ছেড়ে দেয় চেতনাহীনের মত, কেউ জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে; কারও স্পর্শ শীতল; কারও স্পর্শ জ্বরোত্তপ্ত; কারও হাত ঘর্মাক্ত কম্পিত।

নাঃ। হল না। পছন্দ হয় নি, হবেও না। আর এনো না। নাঃ।

না-না। আর আনতে হবে না! চাই না। আমার চাই না।

কি? চাই না যদি তবে আনতে বলেছিলাম কেন? কি? ছুরি? হাসলে মলিন। মেরে ফেলতে চাও? না টাকাকড়ি কেড়ে নিতে চাও? আমার কাছেও ছুরি আছে। টাকা চাও তো নাও। মেরে ফেলতে চাইলে নিশ্চয় একবার লড়ে দেখব।

টাকাকড়ি কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হল না। গায়ের দামী পাঞ্জাবি আর কোটটাও নিয়ে গেল। যাও। মলিনের স্যাণ্ডেল জোড়াটা আছে। হাতে তামার মাদুলী আছে। আস্তানার জিনিসপত্রের সঙ্গে আরও কিছু আছে। ব্যাঙ্কেও আছে। পড়ে আছে সেটা লক্ষ্ণৌতে।

ঠিক আছে। নমস্তে! চলে যাও সাহেব! চলে যাও!

* * *

দিল্লী থেকে ফিরেছিল লক্ষ্ণৌ।

লক্ষ্ণৌয়ের অবস্থাও সে-অবস্থা নেই। সব ভেঙেচুরে গোলমাল হয়ে গেছে। হামিদন্ নেই। কেউ বলে সে পাকিস্তান চলে গিয়েছে, পথে লুঠ হয়েছে। যাক। কত গিয়েছে—কতজন গিয়েছে। যাক।

সে আবার আরম্ভ করলে কাজ।

হঠাৎ একদিন আবার বন্ধ করে দিলে সব।

নাঃ। ভাল লাগছে না। কিছু ভাল লাগছে না। মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে। দু'একজন পুরানো পাইকারী খরিদ্দার এসে বললে—নয়া জমানার নতুন পুতুল তৈরী করুন সাহেব! গান্ধী, নেহেরু, নেতাজী, পাটিল সাহেব, অশোক স্তম্ভ, ভারত মাতা।

মলিন বললে—নেহি। বন্ধ করে দিলাম আজ। কাম আওর নাহি করুঙ্গা। বস্।

নয়া জমানা, নয়া জমানা! বিলকুল ঝুট!

যার নয়া জমানা তার। তার নয়। তার সব জমানা ঝুট হয়ে গেল।

চলো মুসাফের।

এবার সে যাবে কলকাতায়।

দুনিয়ার সব জমানার মধ্যে একটি রাত্রি তার কাছে শুধু সাচ্চা। সে ছায়া-মায়া দেখার রাত্রি।

সেই অন্নপূর্ণার ঘাট। সেই আশ্চর্য রাত্রি। জীবনে একটি মাত্র দুর্লঙ্ঘ্য প্রশ্নের মত তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া নয়। মায়াকে সে আর খুঁজবে না। মায়াকে তার আর প্রয়োজন নেই। সে আজ প্রৌঢ়া। মোহিনী মাধুরী আজ গলিত হয়ে গেছে।

সেই ছায়া-মায়া সে চিরনবীনা। তাকে খুঁজবে সে। রাত্রির পর রাত্রি দাঁড়িয়ে থাকবে সেইখানটিতে।

চলো কলকাতা। চলো চিরদিনের মত। চিরদিন আর ক' দিন?

তবুও পুতুল ছাঁচ-তুলি-রঙ—এ সব সে নিলে। চিরদিনের বাকী কটা দিনও বাঁচতে হবে, খেতে হবে তো!

এক সময় মনে হয়েছিল, ওইটেই আসল। খাওয়া-পরা। খাওয়া পরাতেই সব সুখ। আজ উল্টেছে পাশা। এবার দানের অঙ্ক বলছে—না, ঝুট।

তা বলুক! কিন্তু বাঁচতে হবে তো। মরলে তো রামেশ্বরমেই ঝাঁপ খেতে পারত।

বাঁচবার জন্যে খেতে হবে!

পাঁচ

কলকাতায় এল সে। নামল আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস থেকে। এরই মধ্যে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা পথটুকুর মধ্যে তার অনেক বদল হয়ে গেছে।

হঠাৎ সে নেমে পড়েছিল কাশীতে। গঙ্গাস্নান করেছে। পাজামা ছেড়েছে, পরেছে থান ধুতি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছে। বাবরি চুলও ছেঁটে ফেলেছে। তার সে গৌর বর্ণ আর নাই, তবুও লক্ষ্ণৌতে মাস দেড়েক বিশ্রাম করে অনেকটা ফিরেছে; থান ধুতি সাদা পাঞ্জাবিতে দীর্ঘকায় মানুষটিকে সুন্দর মানিয়েছে। চোখে একটা নীল চশমা।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বিস্ময়ের সঙ্গে চারিদিক চেয়ে দেখলে। ১৯৩৭।৩৮ সালের সঙ্গে অনেক তফাৎ। আর কি ভিড়। অগণিত মানুষ। অসংখ্য যানবাহন। ঘোড়ার গাড়ী নাই। ট্যাক্সি-মোটর-বাস-লরী। বাইরে এসে আরও চেনা যায় না সে হাওড়া স্টেশনকে। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে নতুন হাওড়া ব্রিজটা। সে তৈরী-হচ্ছিল-অবস্থায় দেখে গিয়েছিল। ব্রিজটার দিকে তাকিয়ে সে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল। হাওড়া ব্রিজটার একটা পুতুল করলে কেমন হয়।

চমক ভাঙল তার কিছুক্ষণ পর। একটা কর্কশ তীক্ষ্ণ ধাতব আর্তনাদ—তারপরই একটা প্রচণ্ড উচ্চ শব্দ; সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ শব্দ। একখানা ট্যাক্সি আর বাসে ধাক্কা খেয়েছে। কোলাহল করে লোক ছুটছে। সে সচেতন হয়ে ডাকলে একখানা ট্যাক্সি।

চলো, হোটেলে চলো এখন।

হোটেলে উঠে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কলকাতা। এ হোটেল সেই হোটেল যে হোটেলে বিয়ের দিন মায়াকে নিয়ে উঠেছিল। ঘরখানা সেই ঘরখানা নয়, তার ঠিক পাশের ঘর। সবই এক প্রায়। তবে ঘরগুলি আগের থেকে শৌখীন হয়েছে—আরামের উপকরণ বেড়েছে। দেওয়ালের রঙ পাল্টেছে। নিওন লাইট হয়েছে। আসবাবপত্রে নতুন ফ্যাশানের ছোঁয়াচ। ভাড়াও অনেক বেড়েছে। টাকা তার আর বেশী নাই! সবই প্রায়ই শেষ হয়ে আসছে! আছে মাত্র শ কয়েক টাকা। চার অঙ্কের এক অঙ্ক ক্ষয় হয়েছে।

কলকাতায় জনারণ্য। বাসা পাওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু পেতে হবে তাকে। পেতে হবে ওই অন্নপূর্ণা ঘাটের কাছে। নিত্য রাত্রে সে গিয়ে দাঁড়াবে।

হঠাৎ সে উঠল। দরজায় তালা দিয়ে নেমে এল। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। এখনি সে ট্রামে চড়ে একবার ঘুরে আসবে। বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটটা দেখে আসবে। ঠিক তেমনি আছে। বুকের মধ্যে বিচিত্র অনন্ত তৃষ্ণা—সে তৃষ্ণা মিটতে পারে এক অন্নপূর্ণা ঘাটের জলে। প্রাণের মধ্যে তার মর্মান্তিক ঘৃণা। সে ঘৃণার পাত্রী আছে ওই বাগবাজারে। নিষ্ঠুর ক্রোধে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে মধ্যে মধ্যে। বঙ্কিম ভটচাজ থাকে ওই বাগবাজারে।

ঘুরে এল।

তেমনি আছে অন্নপূর্ণা ঘাট। পোর্ট কমিশনার'স অফিস, লকগেট তেমনি আছে।

বিকেল বেলা আবার এসে ঢুকল। এবার শ্যামবাজারের দিক থেকে। বাগবাজার আর নেই। বিস্ময়ের আর কিছু নাই তবু বিস্মিত হল সে। এত পাল্টে গেছে। বাড়ীঘর দোকান আর চিনবার উপায় নাই। ঢুকতেই মোড়ে উত্তর দিকের সে বস্তিটাই আর নেই। কি একটা বড় বাড়ী তৈরী হচ্ছে। একটু এগিয়ে বোসেদের বাড়ীর সামনে দোকান উঠেছে খোলার-চাল বাড়ীগুলো আর একটাও নেই। আনন্দ চাটুজ্জে লেনে ঢুকে এগিয়ে এসে দাঁড়াল, পত্রিকা বাড়ির সামনে। পত্রিকা আপিসের বিরাট মেসিনটা চলবে তার উপক্রম হচ্ছে। একটু এগিয়ে শিল্পী রায়ের বাসা! কই? শিল্পী রায় নেই। কে যেন বললে—রায় এ বাড়িতে নেই, উঠে গেছেন বালিগঞ্জে। পার হয়ে সে চলল। আঁকে-বাঁকে গলিতে গলিতে এসে দাঁড়াল সেই বাড়ীখানার সামনে। কই? সে বাড়ীখানা? জীর্ণ একতলা বাড়ী! বাড়ীখানাই নেই! এ যে ভেঙে নতুন বাড়ী হয়েছে!

তারা কোথায় গেল? কে বলবে? গলি থেকে বেরিয়ে এসে সে দাঁড়াল বাগবাজারের উপর। চারিদিকে অনেক পরিবর্তন। নিকিরি পাড়াটার চিহ্ন নাই। নতুন নতুন বাড়ী। লোক, আর লোক। কিন্তু চেনা লোক কই?—ওই একটা চায়ের দোকান—এসে দাঁড়াল দোকানটার সামনে। এখানে আগে একটা আড্ডা বসত। মায়ার ভাই ছনের আড্ডা ছিল। হ্যাঁ, এখনও বসে। ওই যে সব বসে আছে। এদের দলই সেদিন তার উপর নির্যাতনে সব থেকে বেশী হাত চালিয়েছিল। চেনা মুখও রয়েছে। ওই যে। যৌবনে ভাটা পড়ে এসেছে। তবু চিনলে সে। তাকে চিনতে পারবে না সে জানে। সে মলিন রায় মরে গেছে। এ তার শীর্ণকায় প্রেতাত্মা। তৃষিতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে; খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জীবনকালের প্রিয় লীলাভূমিগুলি। সামনে বসে ছিল যে—সে শচী ঘোষাল। ছনের বন্ধু। তাকেই সে নমস্কার ক'রে বললে—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি দয়া ক'রে উত্তর দেন।

শচী—তারও সে উদ্ধত রূঢ়তা আর নেই—তার দিকে আপাদমস্তক ভাল ক'রে দেখে বেশ সম্ভ্রম করেই বললে—বলুন।

—এই গলিতে বঙ্কিম ভটচাজ থাকতেন—

—বঙ্কিম ভটচাজ—ও ছনের বাবা! হ্যাঁ—হ্যাঁ। তা বঙ্কিম ভটচাজ তো মারা গেছেন।

—তাঁর ছেলে অমল ভটচাজ? থিয়েটার করত। আর তাঁর বাড়ীর—

—অমল? সে অনেক দিন উঠে গেছে। ওদের বাড়ীতে সে একটা কাণ্ড ঘটল। তার পরই সে স্ত্রী নিয়ে বাপকে ফেলে উঠে চলে গেল। থিয়েটারও আর করে না। কোথায় থাকে ঠিক বলতে পারব না। বঙ্কিম ভটচাজ তার পরও কিছুদিন বেঁচে ছিল। বুক চাপড়ে বেড়াত। কিন্তু কেন বলুন তো? কি দরকার?

—দরকার! দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মলিন। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বললে—দরকার একটু

ছিল। আমার বাড়ী বাঁকড়ো-বিষ্ণুপুরে। ওঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক কালের আত্মীয়তা। আমরা অবশ্য দেশ ছাড়া অনেকদিন, দুপুরুষ—লক্ষ্ণৌতে থাকি। বাংলাদেশে এসেছি, তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম ওঁদের।

একটু থেমে আবার বললে—হঠাৎ তার মাথায় খেলে গেল, বললে—আমার মা না আজও বেঁচে আছেন, খুবই বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর দেখবার-শোনবার একটি লোকের প্রয়োজন, মা বললেন—বঙ্কিম ভটচাজ-আত্মীয় আমাদের, ওর একটি মেয়ে আছে ওরই পোষ্য—সে যদি আসে তো দেখিস। তাই—। কিন্তু খোঁজ তো পাচ্ছি না!

—ওঃ! সেই মেয়ে! সে তো বেঁচে নেই। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে। কি কাণ্ডই যে করলে বঙ্কিম ভটচাজ! ওঃ! শেষে আবার বুক চাপড়ে চাপড়ে বেড়াত।

পায়ের তলার পৃথিবী দুলে উঠল। আবছা অন্ধকার তখন; আলো জ্বলেছে, কিন্তু খোলে নি এখনও। মায়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেছে! বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করে সে বললে—গঙ্গায় ডুবে মরেছে! বঙ্কিম ভটচাজ—

শচী বলে গেল—বঙ্কিম ভটচাজ ওইরকম লোক ছিল। ওঃ! মেয়েটাকে তো প্রথম বিয়ে দিয়েছিল একটা বুড়ো দোজপক্ষের পাত্রের সঙ্গে। বিয়ের দুবছর না যেতেই বিধবা হল। মেয়েটাকে কাজকর্ম শিখতে দিয়েছিল নারী-মন্দিরে। সেখানে মাটির মূর্তির কাজ শেখাত মলিন রায়। ভদ্রলোক গুণীলোক—আমাদেরই এই পাড়াতেই থাকত। যেমন হাত তেমনি দিলদরিয়া মানুষ! আমার সঙ্গে আলাপ খা ছিল না, তবে শুনেছি, যে দু চার জনের সঙ্গে আলাপ ছিল তারা বলত—

শচী বলে যাচ্ছিল বিবরণ। তার কিছু কানে যাচ্ছিল কিছু যাচ্ছিল না, মলিন শুধু ভাবছিল মায়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলে তবু তার সঙ্গে গেল না? এল না? সেও শেষটা তাকে অবিশ্বাস করেছিল, ভালবাসা ঠুনকো কাচের বাসনের মত একটা ঘায়ে ভেঙে গিয়েছিল!

শচী বললে—কথায় আছে—চিলে কান নিয়ে গেল ব'লে কে যেন চিলের পিছনে ধাওয়া করেছিল। ঠিক তাই করেছিল বঙ্কিম ভটচাজ। ওরা বিয়ে করে পাটনা গেল; ভটচাজ তাকে খুঁজতে গেল কেষ্টনগর। সেখানে কে বলেছিল—ওর বাড়ী কেষ্টনগর নয়, ও বামুনও নয়—মানে মলিন রায়। বামুন তো বামুন—ওর জাতই নেই, বাপের ঠিক নেই। সেই নিয়ে ভটচাজ আর কোন খোঁজ না করে পাড়াময় রটনা করলে। সেই রটনা নিয়ে ছনেকে—ভটচাজের ছোট-ছেলেকে—গাল দিলে আমাদের সুরো, ছনে তাকে ছুরি মারলে—সুরো মল, ছনের ফাঁসি হল। এ একদফা। তারপর মেয়েটার অসুখ হতে পাটনা থেকে চিঠি পেয়ে তাকে অমল নিয়ে এল। কিছুদিন পর মলিন রায় এল—তাকে নিয়ে সে বিশ্রী কাণ্ড। লোকটাকে মেরে ধরে বেঁধে অপমান ক'রে সে যে কি লাঞ্ছনা করলাম আমরা—আমিও ছিলাম মশায়, ছনে আমার বন্ধু ছিল, প্রাণে বড় লেগেছিল। আঃ, এখন আপসোস হয়—গুণী লোক, ব্রাহ্মণের ছেলে—। মেয়েটা মশাই, স্বামীর ওই অপমানে দুঃখে ভোরবেলা গঙ্গায় এসে—যেন হাত ধরে মশাই—মা নাও আমাকে, বলে ঝপ ক'রে

লাফ দিয়ে পড়ল। মস্ত চিঠি লিখে গিয়েছিল। তাতে শ্বশুরের নাম লিখে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—লিখেছিল, আমি জানি আমার শ্বশুরের নাম ঈশ্বর রায়, তাঁর বাপের নাম ভগবান রায়—গোত্র বন্দ্যঘাটী—তাঁরা আমার স্বামীর মতই সুন্দর ছিলেন। আমার স্বামী ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ। তাঁকে যে অপমান আমার বাবা করলেন—তারপর তাঁর কাছে যাবার আমার মুখ নাই। আমার জন্য এত লাঞ্ছনা হল তাঁর—এ যখন আমার মনে পড়বে তখন কি ক'রে তাঁর মুখের দিকে তাকাব। তাই আমি মরব। মানুষ কম দুঃখে মরে না। বড় দুঃখ আমার। পৃথিবীতে ধরছে না দুঃখ। কিন্তু আমার স্বামীর যেন আর লাঞ্ছনা কেউ না করে। তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি গুণী, দেবতার মত কান্তি। দেবতার মত অহঙ্কার। তিনি কি অব্রাহ্মণ হতে পারেন!

মলিন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে। চঞ্চল হল না, পা টলল না, চোখে জল কোনদিনই তার নেই, আজও এল না। এর মধ্যে বেশ একটি ভিড় জমেছিল চারিদিকে। মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল মলিন। রাস্তার আলোয় চুলগুলি তার ধবধব করছিল, সকলের উঁচুতে উঠেছিল তার মাথা। কেউ তার চাঞ্চল্য দেখতে পেলে না। শচীর কথা শেষ হতেই সে একটি নমস্কার করে সেখান থেকে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলে গেল মোড়ের দিকে।

মায়া মরেছে। বড় আঘাত সে পেয়েছিল। কিন্তু সে মরল কেন? চলে এল না কেন? লড়াই করল না কেন? জাত! জাত! জাত! ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! মনে পড়ল বিয়ের সময় পুরোহিত যখন বাপ-ঠাকুরদাদার নাম বলতে বলেছিল, তখন—ভেবে নিয়ে বলেছিল—ভগবান রায়ের পৌত্র—ঈশ্বর রায়ের পুত্র; গোত্র বলেছিল—বন্দ্যঘাটী। নবদ্বীপের বুড়ো রতন রায় কেষ্টনগরের রাজাদের ঘরে অন্নপূর্ণার আবির্ভাবের গল্প বলত। কবিতা আউড়ে বলত। ঈশ্বরী পাটনীকে ছলনা করে যে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই কবিতা।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
শুনহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥

তাতেই শুনেছিল—'পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য-বংশজাত।' রতন বুড়ো বলত—বন্দ্যবংশ আসল মানে হল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূজো পায় এমন কুল। পাটনি বুঝলে 'বন্দ্যঘাটী' মানে বাঁড়ুজ্জে। সেও সেদিন তেমনি করেই বলেছিল—বাবা তার ঈশ্বর। ঈশ্বরের পিতা কে তা সে জানে না, বলেছিল ভগবান। গোত্র বলছিল—বন্দ্যঘাটী।

মায়া তাই ঘোষণা করে মরল।

হঠাৎ সে চমকে দাঁড়াল!

তবে কি সেদিন রাত্রে যাকে দেখেছিল—সে মায়ার প্রেতাত্মা? সে কি তাকে সঙ্গে নেবার জন্য সেই রাত্রে ছায়া-মূর্তি হয়ে—? না—না। তা কেমন ক'রে হবে। মায়া যে জলে ঝাঁপ দিয়েছে পরের দিন সকালে। সমস্ত অন্তরাত্মা তার চীৎকার ক'রে উঠল—মায়া—মায়া—মায়া!

হায় মায়া। এ তুমি কি করেছ মায়া? ছি—ছি—ছি। এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পার নি? প্রশ্ন করেছিলে, কি ক'রে মুখ দেখাবে? মুখ মানুষ দেখায়, মায়া, নিজের রূপের জোরে। বাবার অপরাধের কালি তুমি মুখে মেখে মুখ কালো করে গঙ্গায় ঝাঁপ খেলে কেন?

সে আবার ফিরল। ধরল গ্যালিফ স্ট্রীটের পথ।

যাবে সে এখন লকগেটের ব্রিজের কাছে। তারপর যাবে অন্নপূর্ণার ঘাটে। সে মায়ার প্রেতাত্মা নয়। সে এক বিচিত্র ছায়া-মায়া। সে যদি আজ একবার আসে।

সারা রাত্রি ব্যর্থ জাগরণের পর—সে ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরল হোটেলে। জিনিসপত্র ছাড়িয়ে এনে সারাদিন ঘুমুলে। আবার যাবে রাত্রে। সে দিনও ফিরে এল। কোথাও কিছু না। সারাটা রাত্রি খাঁ খাঁ করছে; পাথরের পিচের নির্জীব রাস্তা চিৎপুর; আলো জ্বলছে স্থির হয়ে; পোর্ট কমিশনারের রেললাইনে মধ্যে মধ্যে গাড়ী চলেছে, বকৌ সময়টা রাত্রির পৃথিবীর নিথরতা থম থম করেছে। কোন দূর-মাথায়-দাঁড়ানো ইঞ্জিনটায় স্টীমের একটা একটানা সোঁ সোঁ শব্দ উঠেছে। আর গঙ্গার কল কল শব্দ উঠছে।

সেদিন সকালে সে ফিরল সে বিচিত্র মন নিয়ে।

কায়াময়ী পৃথিবী, ছায়া ছায়াই। সে অলীক। সে মিথ্যা। মিথ্যার পিছনে সে আর ঘুরবে না। এই ভাবতে ভাবতেই ফিরছিল, হঠাৎ তার মন চীৎকার করে উঠল। না—মিথ্যা নয়। ও-ছায়া ছায়া নয়, ও মায়াও নয়, সে তার মুখ দেখেনি। সে তার অন্তরের ভালবাসা। অন্তরের তৃষ্ণা মায়া—মায়া। মায়াকে জড়িয়েই রূপ ধরে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল। সে দিন গঙ্গার জলে জীবনের সব ভালবাসা সব তৃষ্ণা—ডুবে গেছে।

তবু বাঁচতে হবে। মায়া নেই! তার জীবনের তৃষ্ণা—ভালবাসা সত্যই আর নেই। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত সে, কই—আর কাউকে তো ভালবাসতে পারলে না। অন্নপূর্ণা ঘাটের সেই এক যুগ আগের সকাল থেকে আজকের সকাল পর্যন্ত এতকালের শুষ্ক অধীর জীবনের স্মৃতি এক মুহূর্তে যেন ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। চলো মুসাফের। ফিরে চলো। এ পথে আর হেঁটো না এই ঘাটের পথে। ছায়া মায়া তার মনের ভ্রমই হোক আর জীবনের তৃষ্ণাই হোক—সে সেই রাত্রে গঙ্গার জলে ডুবে ভেসে গেছে। মায়া মরেছে। বঙ্কিম ভটচাজের সব ধুয়ে মুছে গেছে। থাকবার মধ্যে অমল—আর তার বউ—কোথায় গেছে কেউ জানে না। কি হবে ও পথে হেঁটে?

সত্যই সে ছেড়ে দিলে ও পথে হাঁটা। মন দিল সে নতুন আয়োজনে।

বাঁচাতে হবে। ভাঙা দেহ, তৃষ্ণা-জর্জর ক্লান্ত মন নিয়েই বাঁচতে হবে।

মায়ার মত জলে ঝাঁপ দিতে সে পারবে না।

বাঁচবে—আবার সে হৈ হৈ ক'রে বাঁচবে। শুধু কাজ নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বাঁচবে। মস্ত বড় দোকান করবে। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে। ভালো শো-কেসে-কেসে সাজিয়ে দেবে নতুন নতুন পুতুল। নতুন পুতুলের পত্তন করবে হাওড়া ব্রিজের পুতুল তৈরী ক'রে। মস্ত

বড় একটা হাওড়া ব্রিজ তৈরী করে সামনে রেখে দেবে! গান্ধী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের বড় বড় মূর্তি করে সাজিয়ে দেবে।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। চারিদিকে কাজের সমারোহ পড়ে গেছে। নিত্য নতুন কত কিছু খবর, কত কি হচ্ছে। কলকাতায় অগণিত মানুষ। কি কলরব! সেকালের যারা তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরা এখন বড় বড় কর্তা। তার কাছে তাঁদের পরিচয় পত্র আছে। সে একেবারে অজানা লোক হবে না।

হোটেলের মালিককে বলে ছাদে খানিকটা স্থান সংগ্রহ করে আরম্ভ করে দিলে কাজ। হাওড়া ব্রিজ। কাজ নিয়ে মেতে গেল। সারাদিনের মধ্যে শুধু সন্ধ্যায় একবার বের হ'ত চৌরঙ্গীর দিকে। আলো—আলো—আলো। মানুষ মানুষ মানুষ। আলোতে রঙ, মানুষের পোশাকে রঙ, মেয়েদের গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ; কি রঙের তৃষ্ণা! দেওয়ালে দেওয়ালে, বড় বড় বাড়ীর গায়ে আঁটা বিজ্ঞাপনের বোর্ড—রঙীন ছবির বিজ্ঞাপন। রূপ হারিয়ে গেছে রঙের উগ্রতার মধ্যে। মধু যেন মদ হয়েছে। দৃষ্টি কটাক্ষ হয়েছে। হাসি লাস্যের মধ্যে হারিয়ে গেছে। তৃষ্ণা—খোঁয়াড়ি হয়েছে। বার-এ হোটেলে নিওন লাইটের বিজ্ঞাপন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত—তারপর ধীরে ধীরে ফিরে আসত। ভাল লাগে না। ও আর ভাল লাগে না। সহ্যই যেন হয় না। দুনিয়া পাল্টালো কি সে পাল্টালো হিসেব করে ঠিক মেলাতে পারে না। কিন্তু সে যেন বেখাপ্পা হয়ে গেছে। মিলতে পারছে না—মিশতে পারছে না।

মনে পড়ে যায় ছেলেবেলার কথা। ঠিক এমনি করেই সে মিলতে পারত না। দেবীগ্রামের পথে পথে—মাঠে মাঠে একা একা বেড়াত। দেবীগ্রাম থেকে এরই তাড়নাতে সে বেরিয়ে এসে দুনিয়ার বুকে দুর্দান্ত পরিশ্রমে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছিল। আবার হঠাৎ সে উল্কার মত অকস্মাৎ কক্ষচ্যুত হয়ে গেল। আজ আর দুনিয়ার দোষ নাই। আজ দোষ হোক, দায় হোক যা হোক—সব তার, সব তার। ভাল লাগে না। কোন কিছু না।

ফিরে এসে আবার সে গড়তে বসে—হাওড়া ব্রিজ! প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, উঁচুতে চার ফুট, বাখারি ছাতার শিক বেঁধে ফ্রেম তৈরী করে তার উপর প্লাস্টার অব প্যারিস দিয়ে গড়ে তোলে দিনের পর দিন।

শেষ হল সে দিন। বাস।

এইবার ঘর একখানা চাই। ঘর চাই, পুতুল গড়ার কারখানার জায়গা চাই। লোক চাই। ফড়িংয়ের মত লোক চাই।

মিশন রোয়ের কাছে—বড় এ্যাভেন্যুটার উপর ঘর একখানা মিলল। ভাড়া অনেক। একশো টাকা। শুধু দোকান ছাড়া আর কিছু হবে না। তাই সে নিলে ভাড়া। একশো টাকা, বায়না দিয়ে এল। কাল এসে তিন মাসের ভাড়া দিয়ে পাকা ক'রে যাবে।

হোটেলে এসে সে শুয়ে পড়ল। ওঃ—কি ক্লান্তি, কি অবসন্নতা তার দেহে মনে! সে আর পারছে না। আর পারছে না।

বয় এসে তাকে ডাকল—খানার সময় হয়েছে।

—নেহি। নেহি খায়েগা। ভাল লাগছে না। কি হবে খেয়ে?

—এখানে এনে রেখে দেব—সাহেব?

—না। দরকার নেই।

কি খাবে? হোটেলের এই খাদ্যগুলো কিছু ভাল লাগছে না ক'দিন থেকে। বয় চলে গেল। ক্রমে নিচের তলায় হোটেলের কোলাহল স্তব্ধ হয়ে এল। ঘরে ঘরে বাসিন্দারা শুয়ে পড়ল। বাইরে রাস্তায় আর গাড়ীর শব্দ নাই, হর্ণ বাজে না। উঠে গিয়ে দাঁড়াল সে জানালায়। রাস্তায়ও লোক নেই। খাঁ খাঁ করছে। থমথম করছে। দরজা খুলে সে বাইরে এল—ছাদে গিয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে রইল তার হাতে তৈরী ব্রিজটার সামনে। হঠাৎ মনে হল তার—কি হবে? এইটেকে সামনে সাজিয়ে বড় দোকান ক'রে কি হবে?

ইচ্ছে হল—ওটাকে ভেঙে ফেলে দেয়। নাঃ, থাক। হোটেলওয়ালাকেই ওটা দিয়ে চলে যাবে। ও একদিন বলেছে—দিন না ওটা আমাকে, আমি নিচের হলে সাজিয়ে রেখে দেব।

তাই দিক হোটেলওয়ালা। ওর শ্রীবৃদ্ধি হোক দিন দিন। সমারোহের ওর প্রয়োজন আছে। মলিনের নাই। বড় কাজ, সমারোহ, কলরব—ভিড় এ সব তার চাই না। ভাল লাগছে না। অনেক চেষ্টা করলে—লাগল না ভাল।

বাঁচবার জন্য নিতান্ত ছোট— অত্যন্ত সামান্য আয়োজন।

রাত্রে শুয়ে শুয়েই সে ঠিক করে ফেলল। সব কল্পনার ওলটপালট হয়ে গেল। নতুন কল্পনা বড় ভাল লাগল তার। সামান্য বাঁচবার আয়োজন। শাক আর অন্ন। আলুভাতে ভাত। একটু নুন। শুকনো-পরিচ্ছন্ন সামান্য একখানি ঘর—মাথা গুঁজবার আশ্রয়। অল্প খানিকটা কাজ করবার জায়গা। ওই গঙ্গার ধারে কোথাও। ছোট্ট এক টুকরো দোকান —ওই কাছাকাছি কোথাও। যে কটা ছাঁচ তার আছে—ওই ছাঁচেই সে পুতুল তৈরী করবে, আর নতুন নয়। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, তার সঙ্গেই ওই বোষ্টুমী পুতুল, ক'নে পুতুল, চুড়িওয়ালী, ছায়া-মায়া। সারি সারি সাজিয়ে রাখবে। বেচবে আর দেখবে। তাও দেখতে ক্লান্তি এলে দৃষ্টি তুলে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকবে।—দোকান থেকে দেখা না যায় দোকান থেকে উঠে কিনারায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আবার সে হঠাৎ উঠে চলে গেল ছাদে। একটা কাঠ নিয়ে আঘাত করলে ব্রিজ মডেলটার উপর। ভেঙে গেল ওটা।

ওটা থাকলে পাছে আবার তার মত পাল্টায় তাই সে ওটা ভেঙে দিল।

ছয়

যা চেয়েছিল তা সে পেলে। গঙ্গার ধারে একখানি পরিচ্ছন্ন অথচ অনাড়ম্বর ঘর। পাকা একখানি ঘর, খানিকটা উঠান, একেবারে গঙ্গার ধারে, বাড়িটার খানিকটা গঙ্গায় ভেঙে নিয়েছে। তাই ভয়ে কেউ ভাড়া নেয় নি। কলকাতার ভিতরে নয়, বরানগরে। দোকানও একটা সে পেলে আহিরীটোলার কাছাকাছি চিৎপুরের উপর। দোকান তার একবেলা। সকাল থেকে একটা পর্যন্ত। বিকেল বেলা বাড়িতে বসে পুতুল গড়া।

তাতেও তার বেশ চলল। মাসখানেকের হিসেবে লোকসান দাঁড়াল না তার। কিন্তু এও ভাল লাগছে না তার। না। ভাল লাগছে না। মন ভরছে না। কি ভাল লাগবে তাও সে বুঝতে পারছে না। আবার বড় কাজ? বড় দোকান?

না।

আবার সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়বে?

এই কি সে চেয়েছিল? নিস্তব্ধতাই তো শান্তি নয়। পরিশ্রম কম হওয়াই তো সুখ নয়। এ যে সে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাচ্ছে পথহারা জীবন-নদীর ধারার মত। দল বেঁধে মানুষ চলেছে—একটা নদীর বুকের কোটি তরঙ্গের মত—কল-কল্লোল তুলে নরম মাটি দেশে দেশে পথ কেটে কেটে সহস্র ধারায় লক্ষ ধারায় কোটি কোটি ধারায়—জোয়ারে ভাঁটায়—সমুদ্রের দিকে—আর সে এ কোন্ পথে চলেছে—এ যে শুধু বালি—শুধু বালি—যত দূর চোখ যায় শুধু বালি।

মলিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তাকে যেন শুষে নিচ্ছে।

বৈশাখের সূর্য প্রচণ্ড দহনে জ্বলছে, আকাশ পুড়ছে, মাটি শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে, গঙ্গার জল বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে। খাঁ খাঁ করে দুপুরবেলাটা। দোকানে বসে সেই দিকে তাকিয়ে মলিন অনুভব করে এমনিই ভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের তৃষ্ণা নাই, সে শুধুই জ্বলে, সে জ্বলার মধ্যে জ্বালা নাই তার, আনন্দ আছে। জ্যোতি আছে। সে শুকাচ্ছে মাটির মত—নদীর মত। গঙ্গাকে সূর্য শোষণ করে কিন্তু সমুদ্র জোয়ারে ভরে দেয়। কৈলাস পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ গলে জল নেমে আসে। তার আদিতে পঙ্কজিনী অন্তে সব শূন্য। কিছু নাই নাই, কিছু নাই।

বৈশাখী দ্বিপ্রহর, শহরে ইঁট কাঠ পাথর—উনানের উপরে চাপানো চাটুর মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তবুও আজ এখন পর্যন্ত গঙ্গার ঘাটে লোক চলাচল ক্ষান্ত হয় নি। আজ অক্ষয় তৃতীয়া। সকালের দিকে বেশ ভিড় গেছে। আজ তার দোকানে বিক্রী গেছে খুব ভাল। সেই কারণেই এখনও বসে আছে সে। নইলে এতক্ষণ দোকান বন্ধ ক'রে চলে যেত বরানগর। এত রৌদ্রে আর যাবে না। বেলা প্রায় দেড়টা। পথ ঘাট ক্রমে জনবিরল হয়ে আসছে। একটা সময় আসবে, কিছুক্ষণের জন্যেও অন্তত, যখন একটিও লোক থাকবে না পথে। চিৎপুরের পূর্ব ফুটপাথে তার দোকান, পশ্চিম দিকে—সামনেই একটা গলিপথ

চলে গেছে—গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। বরাবর দেখা যায়। শূন্য মনে তন্দ্রাতুর দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে সে বসে ছিল; মধ্যে মধ্যে চোখের পাতা নেমে আসছিল তন্দ্রার গাঢ়তায়। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল কোন চলন্ত ট্রামের শব্দে, ক্বচিৎ কখনও কোন মোটরের হর্ণে। তন্দ্রা ভাঙলেই জাগছিল চিন্তা।

চিন্তা তার একটি। ভাল লাগছে না। বেরিয়ে পড়তে হবে। পুতুলগুলো যা মজুত আছে—সেগুলো পাইকিরি দরে সস্তায় বিক্রী ক'রে দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। আর না। শেষ করো এ পালা। চল মুসাফের! ব'সে ব'সে জ্বলা যায় না। দহনের মধ্যে ছুটোছুটিই স্বাভাবিক। ওতে আগুন নেভে না—কিন্তু জ্বলার পালাটা শীঘ্র শেষ হয়।

চলো—মুসা—!

মনে মনে কথাটা শেষ হল না তার, অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ময়—বজ্রদীপ্তির মত ঝলসে উঠল তার দৃষ্টির সম্মুখে। তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক ক'রে চলতে শুরু করল। থর থর ক'রে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ। গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

এ কি? এ কি? ও—কে? ও—কে? ও—কে রে? কে ওই মেয়েটি? কে? প্রশ্নটা তার সর্বাঙ্গ চঞ্চল করে তুলেছে।

সামনের গলিপথটায় ওপ্রান্ত থেকে আসছে দুটি মেয়ে। সামনেরটি একটি কিশোরী; ঘন কালো চুলে ঘেরা মুখখানি যেন জ্বলতে জ্বলতে আসছে। সাদা মিলের লালপাড় শাড়ী পরনে, দীর্ঘাঙ্গী, হাতে একটি জলভর্তি ঢাকা দেওয়া পিতলের বালতি, সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে মহিমান্বিতার মত চলে আসছে। পিছনে আর একটি মেয়ে। মনে হচ্ছে প্রৌঢ়া।

চশমা! চশমা! চশমাটা কোথায় গেল!

এ কি রূপ! এ কি মহিমা! কে? কে?—এ কে? আশ্চর্য—মায়ার সঙ্গে এত অমিল—আবার এত মিল! মায়া ছিল মাথায় একটু খাটো, শীর্ণাঙ্গী—এ মেয়েটি সবল স্বাস্থ্য, দীর্ঘাঙ্গী। মায়া ছিল শ্যামবর্ণা—এ মেয়ে গৌরী—তবু এরই মধ্যে মায়ার ছাপ তার ছায়া মিশে রয়েছে—রঙের সঙ্গে ছটার মত, গন্ধের সঙ্গে স্বাদের মত। ফুলের বোঁটায় সবুজ বেষ্টনীর মত। এ কে?

মেয়েটি পিছনদিকে মুখ ফিরিয়ে কথা বলছে—পিছনের মহিলাটির সঙ্গে। চকিতে মনে পড়ে গেল—ছায়া-মায়ার কথা। এমনি করে সে ফিরে ফিরে তার দিকে বার বার তাকিয়েছিল। তফাৎ তার মাথায় ছিল ঘোমটা—মুখ ছিল ঢাকা। এ কি সেই! সে কি এতকাল পরে কায়া ধরে গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসছে—অনবগুণ্ঠিতা হয়ে, প্রত্যক্ষ হয়ে?

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এ কে?

সে উঠে বসতে চাইলে। কিন্তু পারলে না। যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছে।

ষোল-সতের বছরের কিশোরী। আশ্চর্য মিল।

বুকের ভিতর তার ঝড় বইছে। প্রাণপণ শক্তিতে সমস্ত স্তম্ভিত অবসন্নতা কাটিয়ে সে উঠে

বসল। মেয়েটি গলির মুখে ওপারের ফুটপাথে এসে পৌঁছেছে। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মলিনের বুকের ভিতরটা ধ্বক ধ্বক করছে। সে উঠে দাঁড়াল। পৃথিবীতে আবার স্বাদ জাগছে। ভাল লাগছে। বৈশাখের ঝলসানো দুপুর ঝলমল করছে।

মেয়েটিও ওপারের ফুটপাথে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে তার দোকানের দিকেই চেয়ে রয়েছে। প্রৌঢ়া মহিলাটিকে কি বলছে। আঙুল দেখাচ্ছে। তার দোকানে সাজানো পুতুলগুলির দিকে। কিশোরী মন পুতুল দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

প্রৌঢ়া মহিলার হাতে শুধু দুগাছি শাঁখা, মেয়েটির হাতে কাঁচের চুড়ি। পুরোনো দিনের অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝতে পারছে এর পরই দৃষ্টি ফিরিয়ে সকলের অগোচরে একটি ছোট্ট দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে প্রৌঢ়ার সঙ্গে সে চলে যাবে। কিনবার সামর্থ্য নাই।

মলিন ব্যাকুল হয়ে উঠল—কি বলে ডাকবে? কি করে বলবে তোমার যা খুশি নিয়ে যাও, যত খুশি নিয়ে যাও।

হঠাৎ মনে হয়ে গেল। —মা। মা বলে ডাকবে। জীবনে পঙ্কজিনীকে মা বলে এসেছিল—তারপর এ পর্যন্ত মা বলে সে আর কাউকে ডাকেনি। সে পরম আগ্রহে ডাকলে —আসুন মা, মা লক্ষ্মী—আসুন; পুতুল নিন। অনেক ভালো ভালো পুতুল আছে মা।

তাড়াতাড়ি সে সব রকমের পুতুল এনে বাইরে নামিয়ে দিল। বাঘে মহিষ ধরেছে, সাপে হরিণ জড়িয়ে ধরেছে। তার প্যাকিং-বাক্সে মজুত করা এ পুতুলগুলি এই পর্ব উপলক্ষে আজই এনেছে। কিছু বিক্রিও হয়েছে। সমাদরের সঙ্গেই কেটেছে। এগুলি চোখে-ধরা পুতুল। এর মধ্যে খেলা আছে। পাখী নিয়ে খেলার মত; কুকুর বেড়াল পোষার শখের মত।

—অনেক পুতুল আছে মা। ভাল ভাল পুতুল আছে।

মেয়েটির দৃষ্টি কিন্তু স্থির হয়ে রয়েছে মেয়ে পুতুলগুলির উপর। সে সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল—দোকানের ধারে। তারপর ভিতরে উঠে এল।

দোকানের ভিতরে চারদিক সে তাকিয়ে দেখল। মলিনের বুকের মধ্যে ঘুমন্ত হৃৎপিণ্ড যেন ঘুম ভেঙে জেগেছে আজ। দৃষ্টি তার বিস্ময়-বিস্ফারিত, মেয়েটির মুখের উপর নিবদ্ধ। মেয়েটির মুখ ঘুরছে—তার দৃষ্টিও ফিরছে সঙ্গে সঙ্গে।

—আশ্চর্য! দেখেছ মা! মেয়েটি বলছে প্রৌঢ়াকে।

—নিন মা—যা পছন্দ হয় নিন। বলতে ইচ্ছা হল—দামের জন্য তুমি ভেবো না। তোমাকে দিতে পারলে আমার জীবনটা কৃতার্থ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহস হল না। এ মেয়ের কাছে যেতে তার যেন ভয় করছে।

—না। এ সবই আমার আছে।

—আছে?

—হ্যাঁ। এ সব পুতুল—এইগুলি—এই বোষ্টুমী, ক'নে পুতুল, চুড়িওয়ালী আমার আছে। এটা নেই।

মোহিনী মায়া—ওই ছায়া-মায়া পুতুলটা সে দেখিয়ে দিলে। তারপর বললে—কিন্তু এ পুতুল আপনি কোথায় পেলেন? এ তো আর কোথাও দেখিনি? যে দেখে সেই বলে।

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে অভিযোগ ফুটে উঠল।—এ সব পুতুল তো আমাদের।

প্রৌঢ়া মহিলাটি মেয়ের এই অলীক রূঢ় অভিযোগের জন্য লজ্জিত হলেন, তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—একজন একটা গড়লে—তাই দেখে পাঁচজনে নকল করে। উনি দেখে গড়ে থাকবেন।

মেয়েটি বললে—এ সব পুতুল আমার বাবাই প্রথম গড়তেন। আজও পর্যন্ত কলকাতায় আর কোথাও দেখিনি তাই জিজ্ঞাসা করছি।

মহিলাটি বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন না ওর কথায়। ওর বাবা একজন খুব ভাল কারিগর—

—না, কারিগর কি? শিল্পী। শিল্পী ছিলেন তিনি। এ সব পুতুল তাঁর নিজের কল্পনা। নিজে তৈরী করেছিলেন। ওই ব্যাঙ, ওই প্রজাপতি, ওই বষ্টুমী, কনে, চুড়িওয়ালী—এ সবের ছাঁচগুলো পর্যন্ত আমার কাছে আছে।

—তোমার—আপনার বাবা?

—আমার বাবা মস্ত শিল্পী ছিলেন—মলিন রায়। এম. রায়। মলিনের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। সবল প্রশান্ত তার বুক, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাণ্ডব জেগেছে যেন। প্রচণ্ড একটা চীৎকার তার বুক ফাটিয়ে বের হতে চাচ্ছে। থর থর করে কাঁপছে। হাত পা ঘামছে। বিস্ফারিত দৃষ্টি আরও বিস্ফারিত হতে চাচ্ছে। ওর মুখখানা দু হাতে ধরে মুখের কাছে এনে পুঙ্খ পুঙ্খ মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। কে তোমার বাবা? কে তুমি? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। মনে পড়ছে—তাই তো, মায়ার মৃত্যু-সংবাদ শুনে চলে আসবার সময় তো মায়ার মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করে নি সে। শচী বলেছিল—মায়া মরল। সংসারটা তছনছ হয়ে গেল। অমল তার বউকে নিয়ে কোথায় গেল। বঙ্কিম ভটচাজ বুক চাপড়ে বেড়াত। ধুয়ে মুছে গেল সব। তারপর সেও মরে গেল। সে ভেবেছিল—ওই ধুয়ে মুছে যাওয়ার মধ্যেই মেয়েটিও ভেসে গেছে। মায়ার মৃত্যু হয়েছে—মায়া জলে ঝাঁপ খেয়েছে—তার অপমানের দুঃখে ক্ষোভে—এর পর আর কিছু জানবার ইচ্ছা হয় নি; মনে থাকে নি; মায়ার পর মায়ার মেয়ের দিকে ফিরে তাকাবার প্রবৃত্তিও বোধ হয় তার ছিল না। ছিল না। স্বীকার করছে সে। অথচ, অথচ—একেই তো সে এতদিন খুঁজছে। এই তো! এই তো সেই! যাকে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে খুঁজে এল। এই তো সেই গঙ্গার জল থেকে লক্ষ্মী প্রতিমার মত এসে আজ দাঁড়াল।

মেয়েটি ঘুরে ঘুরে প্রতিটি পুতুল দেখছিল আর কথা বলছিল—বললে—এ হাত আর কারও হয় না। আমি দেখলেই চিনতে পারি। আমি নিজেও গড়তে পারি—আঁকতে পারি। আমার মাও গড়তে পারতেন। বাবা তাঁকে শিখিয়েছিলেন। আমি শিখব। ইস্কুল ফাইন্যাল দিয়েই আমি আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হব।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করলে মেয়েটি। তারপর আবার হঠাৎ প্রশ্ন করলে—কিন্তু আপনি এ সব কি ক'রে পেলেন বললেন না তো? এইটি নতুন। সে মোহিনী মায়া পুতুলটি তুলে নিলো।

নতুনই বটে। মায়ার মৃত্যুর পর ওটি তৈরী করেছিল মলিন।

মহিলাটি বললেন—কি বলবেন মলিনা? উনিও গড়েছেন দেখে-দেখে। চল, বাড়ী চল। কিছু নেব না অথচ কেন মিছিমিছি ওঁকে বিরক্ত করছিস?

—না-না-না। বলে উঠল মলিন। কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছে, তবু কোনক্রমে সে বললে—না-না-না। সে কি কথা? নাও মা পুতুলটা। তোমার সেটটা পুরো হবে।

—না-না। পুতুল নিতে আমি চাই নি। সে জন্যে আমি দেখছি না। পুতুল আমি চাই না। নামিয়ে দিলে সে পুতুলটি।

—আমি দিচ্ছি তোমাকে।

—আপনি দিলেই বা আমি নেব কেন? বৈশাখ মাস অক্ষয় তৃতীয়ার দিন, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে—কেন আমি আপনার দান নেব? আমার বাবাকে লোকে অব্রাহ্মণ বলে সন্দেহ করেছিল। আমার মা—বাবা যে ব্রাহ্মণ তার প্রমাণ দিয়ে গঙ্গার জলে ঝাঁপ খেয়ে মরেছেন। আপনার দান আমি নিতে পারব না—এ কি? কি হ'ল আপনার?

মলিন আর পারে নি। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছে। পঞ্চাশ বৎসর পর আজ ভূমিকম্পে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার মত চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে সে।

অকস্মাৎ কেঁদে ফেলেছে মলিন। কেঁদে ফেলেছে নয়—কান্না যেন ভূমিকম্পে ফাটা মাটির বুক থেকে বের হওয়া জলের ধারার মত চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। অনর্গল চোখেল জল বেরিয়ে আসছে। দুরন্ত আবেগে মাথা কুটছে। ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।

—উঃ। উঃ।

—কি হল আপনার? কি হল?

—চোখে কি পড়ল। ওঃ অসহ্য মনে হচ্ছে।

—জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন।—নিন, আমার বালতিতে জল আছে। নিন, ধুয়ে ফেলুন।

দুই হাত পাতলে সে। মেয়েটি বালতি থেকে জল ঢেলে দিলে। সেই জল দিয়ে সে চোখ ধুতে লাগল। ধুয়ে যাক চোখের যত কালি, ধুয়ে যাক। এবং প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করলে সে। সে মলিন রায়। সে শক্তি তার আছে।

মেয়েটি বলল—তা হলে আমরা যাই। একটা কথার উত্তর কিন্তু দিলেন না আপনি। কেমন করে এসব পুতুল আপনি পেলেন? আমার বাবা,—তিনি—নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন—আমি জানি। না হলে জিজ্ঞাসা করতাম আপনি—আপনিই কি তিনি? তিনি আরও সুন্দর। শুনেছি দেবতার মত দেখতে। আপনি সুন্দর। কিন্তু দেবতার মত নয়। রাগ করলেন না তো?

মলিন হাসলে। তারপর বললেন—তুমি ধরেছ ঠিক মা। এসব পুতুল তোমার বাবার তৈরী ছাঁচেরই পুতুল বটে। এখান থেকে তিনি লাঞ্ছনা পেয়ে ফিরে গেলেন পাটনায়—তখনই

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কিছুদিন আমাদের ওখানে ছিলেন, আমি তাঁর কাছেই কাজ শিখেছিলাম—তিনি যাবার সময় ছাঁচগুলি আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি। কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

এবার মেয়েটি যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল—আর কি তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা হয় নি?—তিনি বেঁচে আছেন কি নাই—জানেন? আমার বড় দুঃখ জীবনে কখনও তাঁকে দেখলাম না। কখনও তাঁর কোল পেলাম না।

আবার, আবার বুঝি সব কিছুর বাঁধ ভেঙে যাবে। চোখ দিয়ে জল পড়বেই—এইবার হয়তো চীৎকার ক'রে উঠবে সে—ওরে—। কিন্তু না, নিজেকে সম্বরণ সে করবেই।

মেয়েটি বলেই চলেছিল—আপনি তাঁর বন্ধু—তাই আপনাকে বলছি। এসব কথা তো বলি না—বলবার নয় কাউকে। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করতাম—আমার একটা খোঁজ করলেন না কখনও? এই মামীমা আর মামা যদি না-থাকতেন—

মেয়েটি হঠাৎ থেমে প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল। মলিন বুঝলে—এই মেয়েটি অমলের স্ত্রী। তিনি তাকে চোখের ইশারায় কিছু বলছেন। তিরস্কারের ইঙ্গিত রয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এসব কথা বলতে বারণ করছেন। বলছেন বোধ হয়—না-না, এসব কার কাছে কি বলছ? চুপ কর—বলতে নেই।

সত্যিই মেয়েটি ওসব কথায় ছেদ টেনে একটু ম্লান হেসে শুধু বললে—আমরা যাই। কিছু মনে করবেন না। বাবার বন্ধু বললেন আপনি, তাঁর হাতের কাজগুলি রয়েছে—সব দেখে শুনে অনেক কথা বললাম।

মলিন কঠিনভাবে নিজেকে সংযত করে রাখলে। চুপ ক'রে রইল সে। বুকের ভিতরে কান্নার সহস্র তরঙ্গ উঠছে! কিন্তু সে কাঁদবে না। মেয়ের সামনে কাঁদবে না। পরিচয় সে দেবে না। ভয় হচ্ছে তার। আতঙ্ক হচ্ছে! মুখে তার অসংখ্য রেখা পড়েছে, রেখায় রেখায় তার বিক্ষুব্ধ অসংযত জীবনের কথা লেখা রয়েছে শিলালিপির মত। ওর বাপ শিল্পী মলিন রায় ব্রাহ্মণ। তার গৌরব ওর অনেক গৌরবে। বৈশাখ মাসে—অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে সে কারও ক্ষুদ্রতম দান গ্রহণ করে না। সে কি তাকে—ওর বাপ বলে মানতে পারে?

দু'জনেই তারা নামল দোকান থেকে। বললে—চললাম।

চলে গেল তারা।

মলিন হঠাৎ উঠল—মোহিনীমায়া পুতুলটা হাতে ক'রে ছুটল।—মা! মা! কি নাম তোমার? মা।

অল্প দূরেই গিয়েছেন তাঁরা। থমকে দাঁড়াল।—ডাকছেন? আমার নাম মলিনা। মলিন রায়ের মেয়ে।

—এইটি অন্তত তুমি নিয়ে যাও মা। আমি তোমার বাবার বন্ধু। এ তোমার বাবার হাতের গড়া। না-নিয়ে গেলে দুঃখ পাব।

—নোব?

—নে বাপু এত ক'রে বলছেন। বাপের বন্ধু, নিলে তোর বাপের নাম ছোট হবে না। নে।

—দিন।

—আরও কিছু নাও না। সব পুতুল একটা একটা করে—

—কি করব নিয়ে? রাখব কোথায়? মামার কষ্টের সংসার—মোটে একখানা ঘর। ঠাকুর-দেবতা হলেও না-হয় লক্ষ্মীর আটনে রাখতাম।

—তাই তো মা! ঠাকুর দেবতা তো আমার নেই।

—গড়েন না কেন? একটি সুন্দর লক্ষ্মী মূর্তির আমার ভারী সাধ। কিন্তু মনের মত কোথাও পাই না।

আমি গড়ে দেব মা, তুমি নেবে?

—গড়ে দেবেন? কিন্তু দাম নিতে হবে। লক্ষ্মী প্রতিমা অন্যের কাছে ভিক্ষে নিয়ে ঘরে তুললে সে তো কোন ফলই দেবে না। ভিক্ষের তো লক্ষ্মী সদয় হন না। আর এটা নিলাম আপনার কাছে, আমার বাবার হাতের তৈরী ছাঁচে গড়া। আর তো নিতে পারব না।

—নেব মা। দাম নেব। যা দেবে তুমি তাই নেব।

—বেশ তা হ'লে গড়ে দেবেন।

—দেব। এক সপ্তাহের মধ্যে গড়ে দেব। কিন্তু—কিন্তু কি রকম লক্ষ্মী নেবে মা?

—লক্ষ্মী যেমন হয়—

—আমি ছেলেবেলায় দেখেছি মা—আমাদের দেশে মহালক্ষ্মীর পূজা। কমলা। কমলে-কামিনী শতদল পদ্মের উপরে মহালক্ষ্মী কমলা বসে আছেন—দুদিকে দুই সাদা হাতী শুঁড়ে কলসী ধ'রে ক্ষীর সমুদ্রের জল তুলে স্নান করাচ্ছে।

মলিনার চোখ শুনতে শুনতে স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল।

মলিন বলে গেল—ছেলেবেলায় অপাংক্তেয়ের মত সেই গাছের উপর চড়ে দেখা মহালক্ষ্মী প্রতিমার বর্ণনা।

—দেবেন। তাই দেবেন। বড় ভাল মূর্তি হবে। সাতদিন পর আমি—

—না-না-না। আমি যাব। মূর্তি নিয়ে আমি যাব।

বৈশাখী সূর্য তখন পশ্চিমে চলেছে। রৌদ্রে পড়ন্ত বেলার ছাপ পড়েছে। পথে মানুষের ভিড় দেখা যাচ্ছে।

মলিনা বললে—আপনি যাবেন?

—হ্যাঁ। আমি যাব। আমি যাব। তুমি এখন যাও মা। মুখ তোমার শুকিয়ে গেছে। স্নান করেছ কখন। আমি তোমায় আটকে রেখেছি। তোমার ঠিকানাটা আমায় বল তো।

—নং বলরাম ঘোষের স্ট্রীট! একটু গলির মধ্যে। জিজ্ঞাসা করবেন—অমল ভটচাজ যিনি পুরোহিতের কাজ করেন—তাঁর বাড়ী। বাড়ীর দোরে আমারই নাম ধরে ডাকবেন।

চলে গেল তারা। মলিন দাঁড়িয়ে রইল। ওদের পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘাঙ্গী মলিনার খোলা চুলের রাশি তার পিঠের উপর দুলছে। বাঁকের মোড়ে তারা

মিলিয়ে গেল, জনতার আড়ালে ঢাকা পড়ল। সে ফিরে এল।

আঃ! জীবনের সব বিষ তার অমৃত হয়ে গেল। জীবনের সব শূন্যতা আজ সঙ্গীতে পূর্ণ হয়ে গেল। কিছু ভাল না-লাগা আজ সব ভাল লাগায় পরিণত হল। সব যেন মধু হয়ে গেল। আকাশে মধু বাতাসে মধু ধুলাতে মধু! সব বহ্নিদাহ শান্তিজল হয়ে ঝরে পড়ছে—যেন বর্ষণ হচ্ছে; এই বৈশাখের রৌদ্রের মধ্যে সে তাই অনুভব করছে। তার জীবনের সকল গ্লানি—সকল কলঙ্ক সকল কালি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। মায়া গঙ্গায় ঝাঁপ দেবার সময় চীৎকার করে ঘোষণা করেছে—তার স্বামী ব্রাহ্মণ—ভগবান রায়ের পৌত্র ঈশ্বর রায়ের পুত্র, গোত্র বন্দ্যঘাটী।

মলিনা বলে গেল—তার বাবা ব্রাহ্মণ। শিল্পী। দেবতার মত রূপ—দেবতার মত গুণী! জীবন আজ ভরে গেছে। মা পঙ্কজিনী আজ সকল কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেলে। পঙ্কজিনীর গর্ভে জন্মেছিল অপরিচয়ের অন্ধকার জগতে; সেখান থেকে কোথা আলো কোথা—ব'লে উন্মাদের মত ছুটতে ছুটতে সে সেদিন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ছায়া-মায়ায় আকর্ষণে অন্ধকার রাত্রে মৃত্যুর বন্ধ দ্বারের সম্মুখে আছাড় খেয়ে পড়েছিল—এতদিন সেই দুয়ারে মাথা কুটেছে—আজ সেই দ্বার খুলে কায়াময়ী লক্ষ্মী অমৃতভাণ্ড হাতে আবির্ভূত হয়েছে! মৃত্যুর দুয়ার থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল এ কোন্ সুন্দর মধুর পৃথিবীতে?

আঃ! আর সে আত্মসম্বরণ করতে পারছে না। জীবন আজ চোখের জলে ভেসে যেতে চাচ্ছে! কান্নায় এত সুখ! এত তৃপ্তি! এত শান্তি!

হে ভগবান! হে ঈশ্বর! হে পিতামহ! হে পিতা!

কাঁদতে কাঁদতেই সে উঠল—স্নান করবে সে গঙ্গায়। গঙ্গায় স্নান করে মাটি নিয়ে আসবে। মহালক্ষ্মী প্রতিমা সে গড়বে। ছেলেবেলায় গাছে চ'ড়ে দেখা সে মূর্তি মনের মধ্যে জলজল করছে। পুতুল নয়—প্রতিমা সে গড়বে এবার। এমন প্রতিমা গড়বে—যা কেউ কখনও দেখে নি।

মনে মনে পরিকল্পনা ফুটছে। উপবাস ক'রে থাকবে সে, শুচি হয়ে গড়বে মহালক্ষ্মীর প্রতিমা। যোগেশ পালের মত। কিন্তু যোগেশ পালের প্রতিমার নকল নয়! গড়বে সে নতুন করে। পাথরে খোদাই করা মূর্তির মত শতদল পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘাঙ্গী দেবী মূর্তি—ওই মেয়েটির মত আকার অবয়ব, ওরই মত মুখের আদল কিন্তু ও নয়, তাতে অপরূপ সুষমা—অপার্থিব! মাটিতে নাই, মনে আছে। যত রূপ তার মনে আছে।

সে রূপের সমুদ্র তার অন্তরে উথলে উঠেছে। জীবনের আকাশে আজ অমাবস্যার অবসান হয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। ঝলমল করছে সব—ঝলমল করছে।

সেই প্রতিমা নিয়ে সে যাবে—বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের সেই গলিতে। অমল হয়তো থাকবে। তাকে চিনবে; চিনুক! সে কাউকে কোন উত্তর না দিয়ে ডাকবে—মলিনা—মা! মাগো!

এখন শুধু কাঁদবে। হে ভগবান! হে ঈশ্বর! হে পিতামহ! হে পিতা!

সংকেত

কথা আমিই অর্থাৎ উমানাথ মুখোপাধ্যায় বলছি কথক হিসাবে। উপন্যাস না গল্প না কারুর কাহিনী তা বলতে পারব না। তবে নাম দিলাম 'সিগন্যাল'। বলতে পারেন—সিগন্যাল-সংকেত উপাখ্যান, কথক আমি। সংকেতই ভাল। নামটা বলেছে আমাকে—যার কথা বলছি সেই। তার সঙ্গে আলাপের প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল—সেটা তার দুটো চোখ। জবাফুলের মত লাল। না, যেন দুটো রক্তের ঢেলা। তার মধ্যে কালো তারার আভাস মাত্র জেগে রয়েছে।

আমার দেশের বাড়ী খড়ের চাল মাটির দেওয়াল বটে; কিন্তু দেখতে অতি সুন্দর, যে কোন রুচিসম্মত বাংলোর মত। সামনে বাগান আছে। বাগানটিও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে। লোক থমকে দাঁড়িয়ে দেখে যায়। একটি বাঁধানো নিমগাছতলা আছে—তার উপরে চারটি খুঁটির উপর খড়ের চাল, দেখে মনে হয় কোন তপোবন বা আশ্রম। আমি সেই নিমগাছতলায় বসে ছিলাম। পথিকের সারি চলেছে সামনের সদর রাস্তা দিয়ে। সব সেটেলমেণ্ট আপিসের মক্কেল। থমকে দাঁড়াচ্ছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে। তার মধ্য থেকে একখানা গামছা মাথায় দিয়ে একটি লোক এসে ভিতরে ঢুকল। লম্বা মানুষ, বেশ শক্ত কাঠামোর লোক। রঙটা গৌরবর্ণ। মাথায় গামছার ঢাকাটার জন্যে মুখখানা দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। তবে কদিন দাড়ি কামানো হয় নি এটা ঠিক এবং একজোড়া গোঁফ আছে। পায়ে একজোড়া টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল। গায়ে একটা ঘরে-কাচা হাফশার্ট, পরনে লাল-নরুণ পেড়ে ন হাতি খাটো ধুতি।

একটু হেঁট হয়ে একটি নমস্কার করে বললে—শ্যামাপতিবাবু আছেন? শ্যামাপতি আমার ভাই; আমি তাকে বলি স্বাধীন আমলের রায়সাহেব। দেশের কাজকর্ম নিয়েই মেতে আছে। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে। তাঁরা ওকে একটু পাগলা বলে থাকেন। অনেকে চটাও বটে। সে সাধারণ লোকেদের হাজার ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নিয়ে তাঁদের কাছে যায়, কাজ করিয়ে দেয়। ভাই বলে নয়, ভগবান মানি—তাঁর নামে হলফ নিয়ে বলতে পারি—সে এ থেকে কোন স্বার্থসিদ্ধি করে না। কাগজ-কলমে দখল থাকলে—মার মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে—এবং কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ধরলে উপরে উঠতে পারত। হাল ধরবার শক্তি তার আছে—পেশী তার শক্ত কিন্তু বুদ্ধিটা সোজা ব'লে বন্দরে নৌকোর ভিড় ঠেলে এঁকে-বেঁকে কূলে এসে ভিড়তে পারলে না। ওর দলের কর্তারা ওকে স্নেহ ক'রেই বলেন দুর্বাসা। দুর্বাসা নামটা ঠিক দিয়েছেন তাঁরা—যেমন কটুভাষী তেমনি খড়ের মত চরিত্র—আগুন ঠেকলেই দাউ দাউ করে জ্বলে। থাক—তার কথা থাক; আগন্তুক তাকেই খুঁজছিল—আমি বললাম—এই তো ছিল—কোথায় গেল। বসুন, আসছে।

খানকয়েক লোহার চেয়ার পাতা ছিল—দেখিয়ে দিলাম। সে বসল না। বললে—আপনি উমানাথবাবু?

বললাম—হ্যাঁ।

সে নমস্কার ক'রে বললে—আজ আমার ভাগ্য। আপনাকে দেখলাম। দেখবার বাসনা

আমার অনেক দিন থেকে। বলে নিমগাছের ছায়ায় একটা বাঁধানো স্বতন্ত্র বেঞ্চির উপর বসে তার মাথার গামছাখানা সরালে।

এবার চোখ দুটো নজরে পড়ল। রক্তের ঢেলা দুটো, কালো তারার আভাস শুধু দেখা যাচ্ছে। নইলে ভাবতাম অন্ধ। বললাম—আপনার চোখে কি হয়েছে—এমন লাল। শিউরে উঠলাম।

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—শিউরে উঠছেন?

—তা উঠছি। কি হয়েছে? চোখ উঠেছে?

—না—ও কিছু না। ধরতে পারলেন না। ও হচ্ছে সিগন্যাল।

—সিগন্যাল? কিসের সিগন্যাল।

—রেড সিগন্যাল।

—রেড? আপনি পলিটিক্স করেন?

—করতাম। আর করিনে। কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কিছুই নই। শুধু মানুষ। ও দুটো আমার পারসোন্যাল সিগন্যাল, লোককে বলে আমার কাছে এসো না।

কথাটার মধ্যে দার্ঢ্যিকতা বা রূঢ়তা কি আছে বুঝতে পারলাম না। মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে যেন আর এক মানুষ হয়ে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত বিনীত মানুষ একটি। কণ্ঠস্বর নিম্ন হয়ে গেল—সুরে বেদনা বা আক্ষেপ ফুটে উঠল। বললে—কাকে কি বলতে হয় সব সময়ে ঠিক থাকে না। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়। সব কিছুকে যেন বিষিয়ে দেয়। আপনাকে যে কত শ্রদ্ধা করি—আপনাকেই বলে ফেললাম কথাটা।

অনুতাপের বিষণ্ণতায় ভরা একটি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। আবার বিস্ময় অনুভব করলাম—একটা পাথরে খোদাই করা কঠোর মুখ-ভঙ্গীর মত মুখ এই হাসিটুকুতে শুধু প্রসন্ন কোমলই নয়, সুন্দরও হয়ে উঠেছে। কারণ বোধ হয় সুন্দর সুগঠিত মুক্তার পাতির মত দাঁত-গুলি। ঝকঝক করছে।

একটু ভাবছিলাম। সে বললে—একটু জল খাব।

বললাম—নিশ্চয়। রোদ্দুরে এসেছেন। ওরে ধীরেন। জল দে বাবা এঁকে। তারপর তাকে বললাম—কোত্থেকে আসছেন?

—ঘাটবলরামপুর থেকে। হেসে বললে—রাস্তা বেশী নয়, শীতকাল—রোদ্দুরও বেশী নয়। গ্রীষ্মের সময় চালের উপর বসে ঘর ছাইয়েছি। সে জন্যে নয়। আমার তেষ্টা পায় বড্ড বেশী। আগে পেত না। এখন এই চোখের ব্যামোর পর থেকে হয়েছে।

ধীরেন একটি প্লেটে দুটি মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে আমার সামনের ছোট টেবিলটির উপর নামিয়ে দিলে।

—মিষ্টি? আমি শুধু জল খাচ্ছি।

আমি বললাম—ওটি আমার গৃহিণীর পূজার প্রসাদ এবং এটি তাঁর সংসারের নিয়ম।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—মিষ্টি আমি খাই না বাবু।

—খান না?

—না। নিমের পাতা খাই, নিমের ফল মিষ্টি বলে মুখে দিই নে। সে আমার চাকরের দিকে তাকিয়ে বললে—দুটো মুড়ি থাকে তো নিয়ে এস।

শান্ত নম্র কণ্ঠস্বর—কখন শক্ত হয়ে উঠেছিল টের পাই নি। শেষ কথা কটায় টের পেলাম। আবার সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

আমার গৃহিণী ভাগবত পড়ছিলেন বারান্দায়, তিনিও বিস্মিত হয়ে উঠে এসে বললেন—খাবেন না—কেন? ব্রত-ট্রত—?

—না, এমনি খাই না। সামান্য মানুষ, সামান্য কাজ করি—

আমি বললাম—কি করেন?

—করি? পাঠশালা করতাম। তা সে উঠে গেল। এখন মাটি কাটি, লাঙলও চালাই। সরকারী রিলিফে দিনমজুরও খাটি। আবার জাল বুনে তৈরী ক'রে বিক্রীও করি।

—জালও বুনতে পারেন?

—জাল ফেলতেও পারি।

—আপনি তো অসাধারণ লোক!

শান্ত নীরব হাসিতে মুখ ভরে উঠল। হাসলে সুন্দর দেখায় মানুষটিকে—সে এবার আরও সুন্দর হয়ে উঠল। কারণ হাসিটি এবার প্রশান্ত।

আমার গৃহিণী ইতিমধ্যে ঘরে গিয়ে একটি গ্লাসে কিছুটা দুধ নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন। —খান।

—দুধ?

—হ্যাঁ। এ তো খাব না বললে চলবে না!

—না-না-না। আমার বাড়ীতে গাই আছে—নিজে সেবা করি, ঘাস কেটে আনি। খাওয়াই। বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী। সে আর আমি। দুধ আমি খাই। দিন।

দুধের গ্লাসটি নিঃশেষে পান ক'রে জলের গ্লাস তুলে আলগোছে জল খেয়ে, হাত মুখ ধুয়ে নামিয়ে রাখলে। তারপর তৃপ্তির একটি আঃ শব্দ করে সে বললে—গত বড় বন্যার সময়। বুঝলেন? তিন দিন একটা চালের উপর বসেছিলাম—নিরম্বু উপবাস ক'রে। আর আমার সুরভি—ধ্বসে পড়া বাড়ীর মাটির উপর। তিন দিন—ওরই দুধ খেয়েছি বাঁটে চুমুক দিয়ে। জল থৈ থৈ চারিদিক—কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে, তবু খাবার জল নেই। কাদা জল। ওই দুধেই জল পেয়েছি। আহার পেয়েছি। তিন দিন পর জল নামল। গ্রামের—আশপাশ গ্রামের বন্ধুরা—আমি তখন বামপন্থী বাবু। গোঁড়া বামপন্থী—কেউ খোঁজ করলে না। প্রথম খোঁজ করলেন শ্যামাপতিবাবু। এই দু কোশ দূর থেকে জল কাদা ঠেলে—

—আমার বাড়ী গ্রামের প্রথমেই। আমার বাড়ীতে এসে ডাকলেন—গোসাঁই আছ? আমি সেদিন তখন সবে একটা খড়ের গুটি মাটির ঢিপির তলা থেকে বের করে, ধুয়ে সুরভিকে

খাইয়েছি। সুরভির বাছুরটা ভেসে গিয়েছিল বানে। সুরভির বাঁট দুধ জমে টাটিয়ে ছিল—সে হাম্বা-হাম্বা শব্দ করে মরা বাচ্চাটাকে ডাকছে। আমার পেট জ্বলছে, গলা-বুক শুকিয়ে আছে—দুধটুকু খাব। এমন সময় ডাক শুনে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল দপ ক'রে; আবার বাবু ভালও লাগল—কোন মানুষ এল খোঁজ করতে। ডাকছে—দেখছে বেঁচে আছি কিনা। বললাম—কে? উনি বললেন—আমি শ্যামাপতি। নবগ্রামের। বেরিয়ে আসতে আসতে উনি ঢুকে থপ্ ক'রে বসে পড়লেন। জলে-কাদায় জামা-কাপড় একাকার, মোটা মানুষ হাঁপাচ্ছেন, বসেই বললেন—গাঁয়ের খবর কি বল তো। বললাম—তা তো জানি না, তবে আমি চালের উপর তিন দিন কাটিয়েছি। উনি ওঁর জলের বোতল খুলে জল খেলেন খানিকটা। আমি ওঁর হাত চেপে ধরে বললাম—আপনি এই দুধটুকু খান। ভদ্রলোক ভাল লোকের ছেলে, নামী লোকের ভাই, আমার বাড়ী এসেছেন, এইটুকু খান আপনি। উনি আমার হাত ধরে বললেন—গোসাঁই ভাই, তুমি ওটুকু খাও আমি দেখি। আমরা তো বানে ভুগি নি। আমরা তো ভাল মন্দ যেমন খাই খেয়েছি। তোমরা উপোস ক'রে আছ। তুমি খাও, আমি দেখি। অনেক কষ্টে এসেছি। নিজে কিছু আনতে পারি নি, তবে আসছে, চাল, ডাল, বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ কিছু যোগাড় করেছি—তা আসছে জিপে। আমি ভোরে বেরিয়েছি। ওরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাবে। বুঝেছেন—আমি দুধটা খেলাম। ওই সুরভির দুধ খেয়েই ভরা পেটে মনে মনে বললাম—আর রামপন্থী-টন্থী নয়। মানুষ, শুধু মানুষ আমি। আমি মানুষকে ভালবাসতে চাই, পারি না, ওই দু-চারজনকে বাসি। দু-চারজনও কিন্তু আমাকে ভালবাসে না। এক-আধজন বাসে। আর বাসে আমার সুরভি।

আমার সমস্ত স্নায়ু-শিরার মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল, নির্নিমেষ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গোসাঁই? গোস্বামী? ঘাটশলরামপুরের নারান গোস্বামী? কেউ বলে—খুনে গোঁসাই। কেউ বলে—অসুর। আমি কাহিনী শুনেছি অনেকজনের কাছে—অনেক রকম। আমার কাছে বিচিত্র বিস্ময়কর মানুষ। আমার যদি নব মহাভারত লিখবার শক্তি থাকত, তবে তার মধ্যে একটি উপাখ্যান থাকত, নারান গোস্বামী উপাখ্যান—তার নায়ক হ'ত নারান গোস্বামী। ইতিহাসের হাজার কি পাঁচশো বছর আগেও যদি জন্মাতো, তবে হয় তো একটা বংশই সে স্থাপন করতে পারত।

আমি উঠে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তুমি—নারান, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। আমি এর আগে দু-তিনবার তোমাকে আসার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম, তুমি আসো নি।

সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল—বার বার মৃদুস্বরে বললে—বাবু—বাবু! আমি—আমি। আমাকে ছাড়ুন। বাবু!

আমি বললাম—বাবু নয়। বরং দাদা বল।

—দাদা?

—হ্যাঁ। দাদা—

—দাঁড়ান ছাড়ুন, তা হলে—প্রণাম করি।

প্রণাম নিলাম। ধন্য মনে করলাম নিজেকে। নারান গোস্বামী সামান্য-বেশী মানুষটি তো সামান্য নয়। অসামান্য। বাংলার সেক্রেটারিয়েটে বিশ্ববন্ধু একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। তার কাছে ওর কথা শুনেছি। বাংলার আইনসভার সভ্য প্রমোদবাবুর কাছে শুনেছি।

নারান বললে—না দাদা, আমি কাঁটা গাছ। আমি মরি না। পোড়ালে আবার জন্মাই কাটলে আবার গজাই। অমৃত-টমৃত জানি না। অমর বললে বলব, না; তবে মরণ আমার নাই। আমার কাঁটার ঘায়ে আমিও জ্বলি। এই দেখুন—কাঁধের হাড় উঠে আছে। মেরেছিল আমাকে। আরও দাগ আছে। এই দেখুন—কপালে একটা মাংসপিণ্ড, এক সময় পাথর দিয়ে নিজেই ঠুকেছি, মাথার যন্ত্রণাতেও বটে—জ্বালাতেও বটে।

মৃদু-শান্ত-প্রসন্ন কণ্ঠে বললে নারান।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে বসে রইলাম। তারপর বললাম—কোথায় এসেছ, ভাই, এবার তো আমি খবর পাঠাই নি—আর আমিও সবে কাল এসেছি, একেবারে হঠাৎ এসেছি।

—একটু কাজ আছে দাদা সেটেলমেণ্ট আপিসে। সামান্য কিছুটা, কাঠা-দশেক জমি আমার আছে নদীর ধারে। ওইটে নিয়ে গোলমাল বাধিয়েছে ভূতু চাটুজ্জের ছেলেরা—ওই জমিটার ওপরেই ভূতু চাটুজ্জে খুন হয়েছিল। কিন্তু ওটুকু তো আমি দিতে পারব না। তাই শ্যামাপতিবাবুর কাছে এসেছি—উনি সেটেলমেণ্ট আপিসে আমার কাগজ-পত্র দেখিয়ে মিথ্যে ডিসপিউট যদি কাটিয়ে দেন। উনি বলেছেন—তা করিয়ে দেবেন। আমি বুঝি না, পারি না, তা নয়। কিন্তু—

চুপ ক'রে গেল নারান। স্থির মানুষটি অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। মুখ যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠছে। দাঁতে দাঁতে টিপে ধরে আছে বুঝতে পারছি, দুটো ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় নিবদ্ধ কঠিন; চোয়ালের দুটো হাড়কে মনে হচ্ছে যেন চামড়া ঢাকা দুটো বোল্টের মত। নিজের নিষ্ঠুর ক্ষোভকে নিষ্ঠুরতর দৃঢ়তর শক্তিতে নাট্ কসে বোল্ট দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে।

আমি কোন কথা বললাম না। এ-যুগের মানুষের ক্ষোভ আমি জানি। রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত দল কংগ্রেসের সভ্য আমি—কিন্তু তার চেয়েও আগে এবং তার চেয়েও সত্য আমি সাহিত্যিক। তাকে অস্বীকার করব কি ক'রে।

এবং বিশ্বাস করি—নারান আজ বামপন্থীও নয়, দক্ষিণপন্থীও নয়, সে যা বলেছে, তা সত্য, সে মানুষ। হয়তো যে জ্বালা তার বুকে—যে ক্ষোভ তার অন্তরে, তার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-এর সম্পর্কটাই সব নয়। হয় তো বামপন্থী ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার অন্তরে এখনও তার প্রভাব আছে। এবং নারানের ক্ষোভ হয় তো—নারানের ক্ষোভ। তার সঙ্গে অন্য মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। তবু পুরাণে আছে—এক-একটা মানুষের সারাজীবন অগ্নিদাহে জ্বলে—আর ভগবানকে অভিসম্পাত দেয়, তার সৃষ্টিকে অভিসম্পাত দেয়। জীবনের জ্বালাটা

বিশ্ময় ছড়িয়ে দিয়ে যায়। নারানের সে জ্বালা অবিরাম স্ফুরিত হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি —তার দুই চোখ দিয়ে।

মিথ্যে বলে নি নারান—ও দুটো রেড সিগন্যালই বটে। রক্তের ঢেলার মধ্যে কালো তারা দুটোর আভাস দেখে মনে পড়েছে—লাল কাঁচের পিছনে যে আলোটা জ্বলে ও দুটো যেন সেই আলো।

দুই

—না দাদা! নারানের উপাখ্যান নয়। নারানকে ভুলে যান।

—তবে কার উপাখ্যান? বল, তুমিই বল। নারানকে বললাম আমি।

হেসে বললে—দুঃখীরামের উপাখ্যান। মা-বাপ নাম রেখেছিল নারান; কিন্তু আসলে সে দুখীরাম। সংসারে দুখীরামের শেষ নাই, কোটি কোটি দুখীরাম, অসংখ্য কোটি দুখীরাম। সুখ-সুখ ক'রে ভিড় করে ছোটে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, ঠেলাঠেলি করে। এক-দল একদলকে পায়ে দলে চ'লে যায়। হুঁচোট্ খেয়ে পড়ে। মরে। এরই মধ্যে দুটো-চারটে দুখীরাম থাকে দাদা—যাদের মরণ হয় না। কই মাছের প্রাণ।

একটু থেমে বললে—কোথা থেকে সে এত শক্তি পায়, তা বলতে পারি না।

* * *

ঘাটবলরামপুরে একটা ছেলে জন্মেছিল গোসাঁইদের বাড়িতে। হরি গোসাঁইয়ের এক মেয়ে এক ছেলে। হরি গোসাঁই বাস করেছিল শ্বশুরের ভিটেতে। শ্বশুরের দুই মেয়ে—বড় মেয়ের হরি গোসাঁইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাকেই ভিটেতে রেখেছিল, ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল এক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে, তার বাড়ী শহরে কলকাতার কাছে। টাকা দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল—সে মেয়ে-জামাই থাকত সেখানে। ক্রমে গাঁয়ের লোক ভুলেই গিয়েছিল তাদের। হরি গোসাঁই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তিন-চার ক্রোশ দূরে, জামাই সমর শহরে মোক্তারের মুহুরী। চাষীবাসী সংসার। নারানের আসল নাম দুখীরাম, ভগবান আমি মানি না—তবে ভগবান ছাড়া কার দেওয়া নাম বলব? বলতে পারি বাঘের মধ্যে যেমন চিতে-বাঘ আছে, গুল-বাঘ আছে, নেকড়ে-বাঘ আছে, ডোরা-বাঘও আছে, তেমনি মানুষের মধ্যে দুখীরাম আছে, সুখীরাম আছে, আরও হয়তো অনেক আছে। নারানের হল দুখীরামের জাত। হয়ে গেল তাই। হঠাৎ বাপ মরল, মা মরল, নারানের বয়স তখন বছর আষ্টেক; বাস, নারান নারান ঘুচে দুখীরাম হয়ে গেল।

ত্রিসংসারে আপনার মধ্যে বোন-ভগ্নীপতি—আর অনেক দূরে মাসী-মেসো। মাসী-মেসো চিঠি দিয়ে বোধ হয় খোঁজ করেছিল—তখন থাকত মেদিনীপুরে উড়িষ্যার ধারে। বোন আর বোনাই এসে নারানকে নিয়ে গেল। তখন সে দুখীরাম হয়ে গেছে।

এ উপাখ্যান দুখীরামের। বহু দুখীরামের মধ্যে একজন দুখীরাম।

ভগ্নীপতি রামহৃদয় মাস কয়েক পর সেদিন শুক্রবার সদর থেকে বাড়ী এসেছিল। কিছু কাল ছিল বাড়ীতে। দু-মাইল দূরে একটা বাস টার্মিনাস, সেখান থেকে হেঁটে আসে। শনিবার বিকেলে আসে সোমবার ভোরে উঠে চলে যায়। বেশী বোঝা থাকলে কুলী নিয়ে আসে, নইলে নিজেই আনে রামহৃদয়। সেদিন সময়টা শীতের প্রথম, এক ঝুড়ি কপি এনেছিল। শনি-রবি দুদিন সকালে কপি ঝুড়িটা গ্রামে বিক্রী করবে। পাঁচ টাকার জিনিস অন্ততঃ সাত আট টাকা হবে। হিসেবী লোক।

বাড়ীর দোরে নারান দুখীরামের দিদি লক্ষ্মী শঙ্কিত মনেই দাঁড়িয়ে পাশের প্রতিবেশী শিবু ভল্লাকে বলছিল, তুমি একবার যাও শিবু, মিয়াদের গিয়ে বল—আর এমন কখন হবে না। নারানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আজকের মত ছেড়ে দিতে বল।

দাওয়ায় বসে আট-বছরের নারান কেরোসিনের ডিবের সামনে একখানা প্রথম ভাগ খুলে রেখেছিল। পাশে খানিকটা মাটি। আসলে গড়ছিল সে একটা পুতুল।

রামহৃদয় থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কি? কি হয়েছে?

—গরু।

—গরু কি? গরু?

—গাইটে পালের ছোঁড়াটা দেখে নি—কতকগুলো গরু ছটকে গিয়ে নদীর ধারে মিয়াদের তরীর ক্ষেতে ঢুকেছিল—মিয়ারা ধরে নিয়ে গিয়ে আটক রেখেছে।

রামহৃদয় কুলীটাকে বললে—নামা। এই নে। বলে একটা দোআনি দিলে তাকে।

সে বললে—দু-আনা কি মশায়?

দুহাত নেড়ে রামহৃদয় বললে—তবে কি দু-টাকা না কি মশায়? এই তো আধ ঘণ্টার পথ। সারাদিনে আট ঘণ্টা খাটলে আট আনা মজুরী। আধ ঘণ্টায় কত হয়? আধ আনা মানে দু পয়সা হয়। তার জায়গায় দু আনা দিয়েছি। আবার কি দেবে?

—যা বলছি যা?

বলেই সে দাওয়ার দিকে তাকিয়ে নারানকে দেখে ডাকলে—এই! এই! ওরে শূয়ার! নারানে!

চমকে উঠল নারান—এঁ্যা?

কাছে গেল হৃদয়—কি হচ্ছে কি?

—পড়ছি।

—পড়ছিস! পড়তে হবে না—উঠে আয়।

—এঁ্যা!

—উঠে আয় আমার সঙ্গে। গরু ডাকিয়ে আনতে হবে।

—আমার যে পড়া হয় নি। কাল পণ্ডিত মারবে যে!

কানে ধরে তাকে টেনে তুলে হৃদয় বললে—আজ আমি মারব শূয়ার কি বাচ্চা। উঠে

আয়। পড়ে তো হাইকোর্টের জজ হবি।

—উঠে আয়।

মিয়াদের বাড়ী থেকে গরু খালাস করে—সেই রাত্রে নারানই বেশ নিপুণতার সঙ্গে গরুগুলোকে তাড়িয়ে বাড়ী এনেছিল।

পরদিন সকালে হৃদয় দাওয়ায় বসে তামাক নিয়ে বসবার আগেই ডেকেছিল স্ত্রীকে—বলরামপুরের বউ। লক্ষ্মী উনোন ধরাচ্ছিল—হৃদয়ের জন্যে চা করবে। নারান মুখ হাত ধুয়ে মুড়ির জন্যে বসেছিল, খেয়ে পাঠশালা যাবে। লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে।—আমাকে ডাকছ?

—তোকে না তো—পরের পরিবারকে ডাকতে যাব?

লক্ষ্মী হৃদয়কে ভয় করে। হৃদয় হৃদয়হীন মানুষ, সে মারে লক্ষ্মীকে। এ নিয়ে হৃদয়ের কোন সঙ্কোচ নেই—লজ্জাও নেই। অকুতোভয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে—বেশ করছি মারছি। নিজের স্ত্রীকে মারছি। অন্যের গায়ে হাত দিলে ফৌজদারীতে নালিশ করিস। নইলে আমার সঙ্গে মারামারি করিস।

লক্ষ্মী তার কথায় হেসেই বলেছিল—সকাল বেলা কথার ছিরি দেখ দেখি। পরের পরিবারকে ডাকলে যে খেঁটে হাতে আয়ান ঘোষ বেরিয়ে আসবে।

হৃদয় কল্কেটা দিয়ে বলেছিল—সকাল বেলা মুখে আগুন দিতে বলছি। কল্কেতে আগুন নিয়ে আয়। আর কপিগুলো দেখ। যেগুলো একটু একটু শুকনো হয়েছে সেগুলো আলাদা করে সাজিয়ে দে একটা ডালায়। আর এক কাজ করবি। প্রত্যেকটা থেকে একটা দুটো ফুল ছাড়িয়ে নিবি। দশটা কপিতে একটা বেরুবে। পাতা নে—দুটো তিনটে করে।

লক্ষ্মী বলেছিল—বাবাঃ।

—হুঁ, বাবাই বটে। যা বললাম তাই কর। আর নারানে কোথায়? ও যাবে আমার সঙ্গে কপির ডালাটা নিয়ে। ঐ কালীতলায় ওকে বসাব, আমি দাঁড়িয়ে থাকব, বেচব।

—ও পাঠশালা যাবে না? ক্ষুণ্ণ এবং মৃদুস্বরে বললে লক্ষ্মী।

—পাঠশালা? না। পাঠশালা গিয়ে হবে কি?

লক্ষ্মী ঘরের ভিতর এসে নারানকে বলেছিল, নারান, আজ আর পাঠশালায় তোকে যেতে হবে না।

খুশী হয়ে উঠেছিল নারান। যেতে হবে না?

—না। তোর জামাইবাবুর সঙ্গে কপি বেচতে যাবি, কেমন? তাতে আরও খুশী হয়েছিল নারান।

লক্ষ্মী কিন্তু অপরাধী মনে করেছিল নিজেকে, বলেছিল—নইলে কতকগুলো কপি একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। আজ আমাদের কপির তরকারী হবে। আয় আমার সঙ্গে কপি বাছবি।

নারান একমুহূর্তে অনুভব করেছিল যে সে মস্ত বড় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এবং কপির পাতা আর ফুল ভেঙ্গে নেওয়া কাজ বেশ নিপুণভাবেই করেছিল—বলতে গেলে লক্ষ্মীর থেকে। লক্ষ্মী হিসেব করছিল—ভয় করছিল ভেঙে নেওয়ার জোচ্চুরি বা চুরি খদ্দেরের কাছে ধরা পড়বে। নারানের সে হিসাব ছিল না। তা ছাড়া ওর হাতে একটি সহজ নিপুণতাও আছে।

সেদিন কপি বিক্রী করে ফিরে এসে খুশী হয়েছিল হৃদয়। বলেছিল, ছোঁড়া চালাক আছে। একজন একটা কপি কিনে আর একটা সরাচ্ছিল—ধরে ফেলেছে।

এই সময়েই গাঁইটে পালের রাখাল এসেছিল গরু খুলতে।

হৃদয় তাকে গতকালের ঘটনার জন্য তিরস্কার করে বলেছিল—যাঃ, তোকে আর গরু চরাতে হবে না। যা!

তারপর ডেকেছিল—নারানে! শোন!

নারান আঁচলে মুড়ি নিয়ে পেঁয়াজ আর লঙ্কা হাতের মুঠোয় ধরে পাশের ভল্লাপাড়ায় যাবার উদ্যোগ করছিল। ভল্লাপাড়াটা নারানের বড় ভাল লাগত। ভল্লাদের পেশা চাষ। তরীর চাষে ওরা আশ্চর্য চাষী। তার সঙ্গে ওরা শরীর-চর্চা করে, লাঠিয়ালি ওদের বংশানুক্রমিক নেশা। বড় বড় বিয়েতে ওরা রায়বেঁশে নাচে। নানান রকম কসরত দেখায়। গানও করে। ওদের জীবনে অভাব অনেক। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ, আশ্চর্য সহ্যশক্তি। তার মধ্যে ওরা কাঁদে না—দুঃখ গেয়ে বেড়ায় না, ওরই মধ্যে ওরা হাসে। হা—হা করে হাসে। এককালে ওরা ডাকাত ছিল। কয়েকজন দাগীও আছে। নানান গল্প করে, বিচিত্র বিচিত্র গল্প।

ভূতের নাম করলে হা হা করে হাসে। রাম ভল্লার একটা গল্প তার আজও মনে আছে। ভল্লাদের বাড়ীতে ওই গল্পটাই সে প্রথম শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল। গল্প হচ্ছিল 'পেত্যা'র অর্থাৎ আলেয়ার।—রাম বলেছিল—বছর দশেক আগে 'পেত্যা' দেখা দিলে। নদীর ধারে লোকে বলতে লাগল—এক জোড়া পেত্যা ঘোরে। পেত্যা আমার দেখা ছিল। আগে একবার দেখেছিলাম। ধরেছিলাম। ওই নদীর ধারে ধারে চলে আসত। আসত ওই দণ্ডেশ্বর তলা থেকে। দপ-দপ করে জ্বলতে জ্বলতে চলে আসত—এসে ঢুকত ভোগপুরের যোগিনী তলায়। লোকে বলত—ওই গাঁয়ের পাড়ার চাঁড়ালের মেয়ে কামিনী কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে—এ হল—সে। আমি বলি দেখব একদিন। নানান কথা বলত। দূরে থেকে নাকি দেখেছে কেউ কেউ। ওই যোগিনী তলার সন্নেসী বলত—সর্বাঙ্গ চামড়া ওঠা একেবারে শেতির মত। মাথার চুল পোড়া। সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমার ভয়ও লাগত, আবার ভারী ইচ্ছেও হ'ত। কি হবে? তারপরে একদিন যা হয় হবে ব'লে রাতে উঠে নদীর ধারে—লাঠি একগাছা নিয়ে বসে থাকলাম। টেনে নেশা করলাম। তারপর হঠাৎ দণ্ডেশ্বর তলায় দপ করে আলো জ্বলল। নিভল। আমার বুক ধড়াস করে উঠল। মনে হল—ছুটে পালাই। কিন্তু তার পরেই ধমক দিলাম নিজেকে—খবরদার রামা! তারপর আসতে লাগল, দেখতে

তো পাই না অন্ধকারে, হঠাৎ দেখলাম রশি খানেক এগিয়ে এসে আবার দপ। এবার দপ-দপ-দপ করে বার তিনেক। আবার অন্ধকার। আবার রশি খানেক পরে। দেখতে দেখতে কাছে। দপ করে জলতেই দেখলাম—সাদা মূর্তি। আমাতে তখন আমি নাই। কিন্তু তার-পরই মনে হল কাপড়। হ্যাঁ কাপড়।—আবার দপ। এবার দেখলাম পুরো চেহারা। হাত। পা। আলো জলছে মাথায়। হাঁ-হাঁ। সোজা উঠে দাঁড়ালাম।—ডাকলাম—কে?

—এ্যাঁ—। বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি তখন বুঝেছি। লাঠি তুলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—মারব লাঠির বাড়ি। ফেল—ফেল—মাথার সরা।

এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম।—কে? কে তু?

কথা কয় না। মাথায় ঘোমটা টেনেছে। টেনে খুলে দিলাম—ঘোমটা। মেয়েটা আছড়ে পড়ল পায়ে—তুমি আমার বাবা।

আমি মাতাল তখন—তার ওপর ভর্তি জোয়ান, তবু পিছিয়ে এলাম—বললাম—করছ কি মা। তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যে। তোমার বাবাকে গুরুর মত ভক্তি করি।—ওঠ মা ওঠ! কিন্তু এ কি কাণ্ড মা?

কাণ্ড ওই—যোগিনী তলার সন্নেসীর কাছে রাতে আসে বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যে। সন্নেসী বললে—আমি কি করব বল? আমি বারণ করি। কিন্তু ও শুনবে না।

আমি বললাম—তা হবে না—তুমি ওকে নিয়ে যাও ভৈরবী করে। আর শোন, যদি কখনও এই কন্যে ফিরে এসে বলে যে—তুমি ফেলে পালিয়েছ তবে আমি ব্রেহ্মাণ্ড খুঁজে—লাঠির ঘায়ে মাথা ভেঙ্গে দিয়ে আসব। চল আজই রাতে চল তোমাদিগে জংশনে রেলে তুলে দিয়ে আসি। তাই দিয়ে এসেছিলাম।

এবার বুঝলি—জোড়া পেত্যা। হুঁ, বুঝলাম খেলটা জমিয়েছে ভাল। দুজনাতে দুটো সরা মাথায় নেত্য করে লীলা করে। বেরিয়ে গেলাম রাত্তিরে। সন্দ হয়েছিল শক্ত ব্যাপার। মানে পেরায় সারা রাত ছুটোছুটি করে। সঙ্গে নিলাম অবিনেশকে। ছোঁড়াটা শক্ত। গেলাম দুজনায়। দেখলাম হন-হন করে যেন সাইকেলে চড়া মানুষের বেগে—আলো দপ দপ করে জলতে জলতে ছুটে আসছে। মধ্যে মাঝে একই জায়গায়—খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে পাক খাচ্ছে। কি ব্যাপার। অবিনেশ একবার বু-বু করে উঠল। আমি বললাম—এই-ই। আর এই। ছোঁড়া তখন পিছু ফিরেছে। দে ছুট। আমি বললাম—যা শালা। যাওয়াই ভাল। কোথা ভিরমি খেয়ে পড়বে! বিপদ হবে, যাওয়াই ভাল। এক পা এক পা করে নদীর শরবনের আড়াল দিয়ে ওদের পানেই এগুলাম।—তখন কোথা গেল আর ঠাওর পাই না। হঠাৎ বুঝলি কি না, হাত চারেক দূরে দপ ক'রে আলো জ্বলল। চমকে উঠলাম। এ কি রে বাবা! এ যে চারপেয়ে জন্তু রে! কুকুরের মতন। যা হবে হবে বলে সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দিলাম লাঠি—জয় কালী। চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে পড়ে গেল। আর একটা তখন হ্যা-হ্যা করে তেড়ে আসছে আমাকে—যত হ্যা-হ্যা করে হাঁ করছে—তত দপ দপ করে আলো

জলছে। আমি আবার লাঠি তুলে হাঁকড়ালাম। কিন্তু লাগল না। জন্তুটাও পালিয়ে গেল। একটুকুন দাঁড়িয়ে থেকে মরা জন্তুটাকে টেনে নিয়ে এলাম। চামড়াটা নুন দিয়ে মুচিদের ঘরে দিলাম। শেয়াল। একরকম শেয়াল।

আশ্চর্য লাগত। নারান দুখীরাম আশ্চর্য সুখের আস্বাদ পেত ওই গল্পের মধ্যে। বোধহয় ভল্লাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। তাই ছুটি পেলেই নারান যেত ভল্লাপাড়ায়।

সেদিনও নারান যাচ্ছিল—ওই ভল্লাপাড়াতেই। মস্ত বড় হুঁকোটা নিয়ে রাম ভল্লা বসে আছে বকুলতলায় ওদের শিব-কালী-হরি সব ঠাকুরের মাটি-বাঁধানো আটনের সামনে—চ্যাটাই বিছিয়ে—হয় লাঠি বানাচ্ছে, নয় জাল বুনছে, নয় গায়ে জুত পাচ্ছে না বলে—উঠ-বস করছে, ডন টানছে, নইলে কোন একটা তরুণ জোয়ান পিঠের উপর দুহাত মুঠো বেঁধে গুম-গুম শব্দে কিল মারছে। মেয়েরা ঘুঁটে দিচ্ছে, ধান মেলে দিচ্ছে পায়ে পায়ে, ঢেঁকিতে ধান ভানছে, অল্পবয়সীরা কাঠ কুড়ুতে যাবার জন্যে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে—বাকী সঙ্গিনীদের ডাকছে —কই লো সাবি—হ'ল? পাড়া থেকে বেরিয়েই গান ধরবে একসঙ্গে, নদীর ধারের ওলাতে লো ফুল ফুটিছে মটর লতাতে!

সে গেলেই রাম বলত—এস ঠাকুর, এস!

মেয়েরা তাকে বলত—ছোট্ঠাকুর!

ভল্লাপাড়ায় ছিল তার স্বপ্নরাজ্য!

সেদিন পা বাড়াতে ভগ্নীপতি হৃদয় তাকে ডেকে বলেছিল—শোন—। এই যে মুড়ি নিয়ে আঁচলে। ঠিক হয়েছে। গরুগুলো খোল। ডাকিয়ে নিয়ে যা—নদীর ধারে। খবরদার, যেন কারুর ক্ষেতে না ঢোকে। তা হলে তোমার পিঠের চামড়া তুলব। সেই তিনটের সময় বাড়ী আনবি। এসে চান ক'রে খাবি। বুঝলি!

দিদি লক্ষ্মী ছুটে বেরিয়ে এসেছিল—না!

খুব গম্ভীরভাবে হৃদয় বলেছিল—কি?

—গরু চরাবে কি—

—হ্যাঁ চরাবে। গাঁইটে পালে গরুর চরাট ভাল হয় না। তাছাড়া এই সব ঝঞ্ঝাট!

—তাই বলে—বামুনের ছেলে—

—বামুনের ছেলের চারটে হাত বেরিয়েছে। বামুনের ছেলে! বামুনের ছেলে হল ত হল কি? স্বয়ং কৃষ্ণ গরু চরিয়েছেন। গাঁইটে পালে—পয়সা লাগে।

বলেই হেঁকে বলেছিল—নারানে খোল গরু খোল।

নারানের খারাপ লাগেনি। ভালই লেগেছিল। সে তৎক্ষণাৎ একগাছা কঞ্চির লাঠি হাতে নিয়ে গরুগুলো খুলে—তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—নদীর ধারের দিকে। যে দিকে ভল্লাদের ছেলেরা গরু চরায়।

* * *

নারান গোসাঁই—সুন্দর কথক। কথা বলতে বলতে তার চেহারা পাল্টেছে। সে হাসছে,

মধ্যে মধ্যে হৃদয়ের কথা বলতে বলতে বেশ রস মিশিয়ে দিচ্ছে। বলছে কিন্তু শান্ত মৃদু কণ্ঠে। হঠাৎ থেমে টেবিলের উপর থেকে জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেলে। একটি বিড়ি ধরালে। একটি দুটি মৃদু টান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালে। তারপর আশ্চর্য কণ্ঠে বললে—নীল আকাশ ঠিক আর দেখি না আমি। আকাশের দিকে আলোর দিকে তাকাতেও তো পারি নে। রাতের আকাশের দিকে তাকাই। তখন কিন্তু নদীর ধারে নীল আকাশ বড় ভাল লাগত।

জানেন—নদীর ধারের সব খুব ভাল লাগত। আকাশ ভাল লাগত, নদীর জল ভাল লাগত। বালির ওপরে হাঁটু জল তর-তর করে বয়ে যেত। দহ ছিল একটা, অনেক জল। সেখানে স্রোত বোঝা যেত না। দহতে ঝাঁপ খেতাম। সাঁতার কাটতাম। নদীর ধারে শরবন—তার আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলতাম। সবুজ ঘাস হ'ত। ঘাসে কত হরেক রকমের ফুল ফুটত। কুচি-কুচি ফুল। লাল, সাদা, বেগুনে, হলুদ। কোন দুঃখ ছিল না। দিদি দুঃখ করত—নারান করত না। দিদি কপালকে মন্দ বলত, সে বলত না। পৃথিবীতে দুখীরামদের সুখ খুঁজে নেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ক্ষমতাটা তারা অর্জন করে। তার উপর আর একটা সত্যি আছে দাদা—সেটা হল—মায়ের পেট থেকে নিয়ে জন্মানোরা শক্তি। সুখীরামরা এটা বেশীর ভাগ হারায় সুখের মধ্যে বড় হয়ে, দুখীরামদের এটা বাড়ে নারানের এটা বেড়েছিল দিন দিন। কত হুঁচোট যে খেয়েছে, কত কত যে গাছ থেকে পড়েছে, কত যে বিছে কামড়েছে, বোলতা কামড়েছে, মৌমাছি কামড়েছে—তার ঠিক নেই। হুঁচোট লেগে মধ্যে মধ্যে পায়ের আঙুল পাকত। নিজেই বাবলার কাঁটা ভেঙ্গে তা দিয়ে ফুটিয়ে পুঁজ বের করে দিত। একবার কাঁকড়া বিছেতে কামড়েছিল। সারা দিনটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। দিদি সন্ধ্যাবেলা খুঁজে ওই ভল্লাদের বাড়া থেকে নিয়ে গিয়েছিল। তখন অবিশ্যি খানিক সোর হয়েছে। এরই মধ্যে বড় হচ্ছিল—ভল্লাদের কাছে লাঠিখেলা শিখেছিল, শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া শিখছিল, মানে ভণ্ট খাওয়া। দেহ যেমন শক্ত হয়েছিল—মনও তেমনি আশ্চর্য উল্লাস, উৎসাহ-ময় হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দুঃখ-ভয় যেন দূরে পালিয়েছিল—অনেক দূরে। একবার একটা শেয়াল ধরেছিল। একদিন নদীর ধারে দেখে গর্ত—একটা লেজ বেরিয়ে আছে, বেশী নয় সামান্য খানিকটা। আর চারিপাশে অনেক সদ্য খোঁড়া মাটি। শেয়ালটা গর্তের মধ্যে খরগোশের সন্ধান পেয়ে নখে গর্তটা খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকেছে। নারান কিন্তু শেয়াল বলে বুঝতে পারেনি। সে ভেবেছিল লেজটা খরগোশেরই। বেরিয়ে ছিল লেজের ডগাটা। সে খপ করে লেজের ডগাটা চেপে ধরে টানতে শুরু করেছিল—প্রাণপণে টেনে যখন অর্ধেকটা বের করেছিল—যখন চিনেছিল শেয়াল বলে। কিন্তু তখন সে ছেড়ে দিতে পারেনি। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে অবাধ বিচরণ ক'রে প্রকৃতির শুধু রূপ-স্নেহকেই চেনে নি—তার ক্রোধ, তার হিংসাকেও জেনেছিল। গাছে উঠে পাখীর বাচ্চা পাড়তে গিয়ে পাখী মায়েরই ঠোক্কর খায়নি; বাচ্চাটাও কামড়ায়, নখ ফোটায় তা জেনেছিল। সে জানত—শেয়াল এমনি দেখলে ছুটে পালায়, কিন্তু আঘাত খেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করে।

জানত শেয়ালের নখে দাঁতে শুধু ধারই নেই, তাতে বিষও আছে। সুতরাং ছেড়ে সে দেয়নি; সকল শক্তি প্রয়োগ করে টেনে বের করেই সে সেটাকে দুই হাতের জোরে পাক দিয়ে ঘোরাতে শুরু করেছিল। বার-কয়েক পাক দিয়ে সে পাকের মুখেই সেটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা ছিটকে আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়েছিল খানিকটা দূরে। বেশ একটু দূরে। তারপরই দুই হাতে তুলে নিয়েছিল একটা মোটা পাথর। শেয়ালটা কিন্তু একটু নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে কোনরকমে উঠেই দিয়েছিল চৌ-চা দৌড়া। দুঃখের কথায় নারান গোঁসাই হেসে শান্ত কণ্ঠেই বললে—সেদিনেই দুঃখের কথায় মনে হয় কি জানেন বাবু—মনে হয় দুঃখ সেদিন শেয়ালটার মতই ছুটে পালিয়েছিল নারানের কাছ থেকে।

সুখ। নারান বললে সেদিনের সুখের কথা মনে হলে—মনে পড়ে যায় একটা বুনো লতার কথা। নদীর ধারের জঙ্গলে হয়েছিল—বারো মাস ফুল ধরত, আর গাছের মাথায় মাথায় বেড়েই চলেছিল, বেড়েই চলেছিল—আর তলায় জন্মাত হাজার চারা। চারা বের হত শিকড় থেকে। গরুতে খেতো, মানুষের পায়ে দলত, মেয়েরা কেটে কেটে খড়-কুটো করত—কিন্তু তার শেষ নেই, উপরেও নেই—তলাতেও নেই।

* * *

প্রথম বছর দুয়েক সে সকালে উঠে পাঠশালাটা যেত কিন্তু বাড়ীতে পড়ত না—পড়বার সময় হ'ত না বলে সেখানে পড়াটা পারত না। দিদি ধান-চাল বিক্রি করে মাইনে যোগাতো, তাও বাকী পড়ত। পণ্ডিত মধ্যে মধ্যে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু পণ্ডিতের কাজ সে করে দিত অনেক। দশ বছর বয়স যখন, তখন সে শক্ত হয়ে উঠেছে। ভগ্নীপতির বাড়ীর মাটির দেওয়াল পড়ে গেলে, সেটা সে তুলে দিতে পেরেছে। ঘর-দোর লেপতে পেরেছে; বাবুই সাবুই খড়ের দড়ি পাকাতে পেরেছে। খড়ের চালে ঘরামী ছাইতে উঠলে সে খড় ছুঁড়তে পরেছে, দড়ি যোগাতে পেরেছে। চালে উঠে একটু আধটু কাজ পেয়েছে। গরুর খড় কোটা, শাক-সব্জীর জন্য জায়গা কোপানো, সার দেওয়া, গাছের যত্ন করা এও শিখছে সে। আর তাতে তার ওই লতাটার মত ফুল ফোটানোর উল্লাস।

বিড়ি তামাকও ধরেছে! তামাক কাটতে মাখাতে কাঠের হামানদিস্তেতে ছেঁচতে—তাও সে পারে।

কাজেই গুরুমশাই তাকে তাড়াননি। আর মনের মধ্যে একটি অফুরন্ত সুখই বলুন, আর উল্লাস.উৎসাহই বলুন—তার জন্যে পড়তেও ভাল লাগত তার; আর দু-চারবার যা পড়ত—তা সহজে ভুলত না। দ্বিতীয়ভাগ ধারাপাত শেষ করেছিল।

দু বছর পর দিদি লক্ষ্মীর ছেলে হল। ছেলেকে নিয়ে দিদি মাতল—সঙ্গে সঙ্গে মাতল নারান। তার উল্লাস আনন্দের শেষ ছিল না। লোকে এর মধ্যে কানাকানি করছিল—করছিল—হৃদয়ের বউয়ের ছেলে আর হবে না। আর কবে হবে? আঠারো-বিশ বয়স হয়ে গেল। হৃদয়ও নাকি বিয়ে করব করব করছিল। কিন্তু বিয়ে করতে পারছিল না দুটো কারণে। প্রথম হৃদয়দের টাকা দিয়ে বিয়ে করতে হয়। কন্যাপণ লাগে। লক্ষ্মীর জন্যে তার

বাবাকে নগদ দেড়শো টাকা দিয়েছিল হৃদয়। এবার দ্বিতীয় পক্ষে আরও বেশী লাগবে। আর একটা কথা—নারানের সাত বিঘে জমি। তার ধান হৃদয় গিয়ে গিয়ে নিয়ে আসে ঘাটবলরামপুর থেকে। একটা পুকুর আছে, মাছ ঠিকে আছে জেলেদের কাছে—বছরে পঁচিশ টাকা জমা পায়। বিয়ে করলে লক্ষ্মীর সঙ্গে নারানও চলে যাবে হয়তো। ওটাও লোকসান হবে। তবে হৃদয়ের ভয় যাই এবং যতই হোক—লক্ষ্মীর ভয় উদ্বেগ তার থেকে অনেক বেশী ছিল। তাই সন্তান হতেই তার আর খুশির সীমা ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে নারানেরও।

ভল্লাপাড়ায় রাম জিজ্ঞাসা করত—ছেলে কেমন গো?

—ভাল—ভাল!

—ক দিনের হল?

—পাঁচ বছরের! দিনে বলতে নেই। যে দিনের তত বছরের বলতে হয়, তাতে ছেলের পরমায়ু বাড়ে।

ছেলে তিন মাসের হতে হতে নারান পাঠশালা বন্ধ করলে, ছেলেটির সামনে সকালে বসে সে তাকে আদর করত—বাবু-রে, বাবু-রে, বাবু-রে! কিছুদিনের মধ্যে সে যতরকম ছেলে আদর করার ছড়া আছে এখানে, তা' শিখে ফেলেছিল। ছ' মাসের হতেই সে তার কোলে উঠল, এক বছর হতেই নারান তার ঘোড়া হল। এ সমস্তের মধ্যেই আশ্চর্য উল্লাস ছিল তার। কোনদিন ভাবত না, তার এটা নেই সেটা নেই—ভাবত না সে ছোট কি বড়। ভাবত না তার ভবিষ্যৎ। সমাজ, মানুষ, ভগবান—কাউকে কিছুর জন্য সে দায়ী করে না। সামনে যা বাধা এসেছে তার যে কোন ইচ্ছার পথে, তাকে সে নদীর বন্যার স্রোত ঠেলে পরমোল্লাসে এগিয়ে যাবার মত এগিয়ে গেছে।

নারান দুখীরামই ছিল। দুঃখ ওর পায়ের তলায় পিছনে দুই পাশে ওকে জড়াতে চেষ্টা করত—কিন্তু নারান ছুটত সামনে, দুঃখকে অনবরত পিছনে ফেলে। দুঃখের সঙ্গে দেখা হত না। ক্বচিৎ দেখা হ'লে ওই শেয়ালটার মত লেজে ধরে পাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত—দুঃখ ছুটে পালাত—সে হাসত।

—একবার হয়েছিল বাবু, ওই ভল্লাদের একটা যুবতী মেয়ে নদীর ধারে পাশের গাঁয়ের বাবুদের একটা বাগানে কালজাম ফলেছিল, পেড়ে খাচ্ছিল। নির্জন নদীর ধার,পুরনো আম-জামের বাগান।

ওখানে রেশম-কুঠী ছিল সায়েবদের,তাদের লাগানো বাগান। জাম-আম খুব ভাল। জাম ছিল বিখ্যাত। মোটা কালো মিষ্টি রসে ভরা জামগুলি বেশ বড় বড়—তা দোকানে তৈরী কালোজাম মিষ্টির মত বটে। বেটি লোভ সামলাতে পারেনি; গাছে উঠেছে। উঠবার সময় ঝুড়ি নিচে রেখেছে, কাপড় ছেড়ে গামছা পরেছে। কাপড়ে জামের কষ লাগলে ওঠে না। মনের আনন্দে জাম খাচ্ছে। আমি নদীর ধারে ভল্লাদেরই এক মোষের পিঠে শুয়ে আছি। মোষের পিঠে বসার চেয়ে শোয়াতে আরাম—চওড়া পিঠ—আর মোষের গুণ হল, দৌড়ায় না—আর পিঠ ঝাড়ে না। হুঁশ রাখতে হয়—কখন বসছে, আর কখন জলে

নামছে। নইলে হেলে দুলে চলে, শুয়ে ভারী আরাম লাগে। বেটা রোদের তাপে বাগানটায় ঢুকে পড়েছে। ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। নিস্তব্ধ বাগান। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। চিঁ-চিঁ। আমবাগানে ঝিঁঝিঁদের অহোরাত্রি! দিনরাত ডাকে। মোষ বেটা বসল, আমি উপুড় হয়ে গলা জড়িয়ে ধরলাম। এমন সময় কথা শুনতে পেলাম।

—নাম বলছি—নাম। নাম। নইলে দেখেছিস বন্দুক।

ঘাড় তুলে দেখলাম—পাশের গাঁয়ের বাবুদের একটা ছোকরা জাম গাছের দিকে বন্দুক তুলেছে। এবার কথা শুনলাম—আমি চেঁচাব। মেয়ের গলা।

ছোকরা বললে—চেঁচাবি ?—আমি চেঁচাব, দাঁড়া—তুই কাপড় ছেড়ে গাছে উঠেছিস। কাপড়টা নিয়ে আমি চলে যাব! যা—ওই গামছা পরে যা বাড়ি!

ওদের গামছা তেমনি গামছা বাবু। কোন রকমে কোমরটা ঢাকে, বুকে ওঠে না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বুঝলাম মতলব। ওরে ছোকরা বাবু, অল্পবয়সী মেয়েটার খোলা বুক দেখে মদের মত গেঁজেছো।···নারান উঠল। গাছের আড়ে আড়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে বন্দুকটার নল ধরে খ্যাঁচ করে টেনে কেড়ে নিলে। জানতো না তো। ওই টানেই বন্দুকটা কি রকম ফায়ার হয়ে গেল আর গুলিটা নারানের এই বগলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। নারান হতভম্ব হয়ে পড়ে গেল কি রকম, আর বন্দুকটা পাশে পড়ল আছড়ে। বুঝলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের ছোকরা দৌড় দৌড়—দে দৌড়। মনে করেছে নারান খতম। নারান হতভম্ব হয়েছিল কিন্তু বাবু ছোকরার দৌড় দেখে তা কেটে গেল—হা হা হেসেই সারা হল। ছুঁড়িটা নেমে এল। নারান বললে—কাপড় পর—বাড়ী চল।

রামভল্লা বাবুদের বাড়ী গিয়ে টাকা আদায় করে বন্দুক দিয়ে এল। নারানের কিন্তু দুঃখ ছিল। হৃদয় দাদা বাড়ী এসে বাবুদের বাড়ী গিয়ে সব শুনে নারানকে আগাপাশতলা পিটন দিলে। ঘরে ভরে রেখে দিলে। খেতে দিলে না।

সে কিন্তু গায়ে লাগে নি। ছোকরা বাবুর ছুটে পালানো যত ভেবেছে নারান তত হেসেছে।

লোকের কাছে রটে গেল নারানের চরিত্র খারাপ।

রামভল্লা বলেছিল—ছোট্ ঠাকুর এবার নষ্ট চাঁদের রাতে তোমাকে চাঁদ দেখতে বারণ করেছিলাম। হ'ল তো!

নারান খারাপ কথা বলেছিল একটা। শিখেছিল বই কি! ওদের কাছে ওদের ঝুলিতে যা ছিল তাই পেয়েছিল—তাই শিখেছিল।

বিড়ি খেতো, তামাক খেতো। মদ ওরা চোলাই করত। এবং প্রচুর খেতো। নারান মদ চোলাই করতেও শিখেছিল। কিন্তু মদ খেতো না। কেমন গন্ধ লাগত, গা-টা ঘুলিয়ে উঠত। তা ছাড়া—ছেলেবেলা মা মারা যাবার পর যে এক বছর বাবা বেঁচেছিল—সেই এক বছর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। বাবা অবস্থাপন্ন কায়স্থ ঘরে শালগ্রামের সেবা করতেন। সুন্দর পুরুষ ছিলেন বাবা, ধর্মভীরু মানুষ ছিলেন; নারানকে যা শিখিয়েছিলেন তিনি, কিংবা

নারান তাঁর কাছে যা শিখেছিল, তাতে ঠিক মনে না পড়লেও, মদ খাওয়া যেন বারণ করেছিলেন আর মাতালকে তিনি ঘেন্না করতেন। নইলে নারান মদ খেতো। মদ চোলাই যে একটা বিদ্যা বাবু। সে বিদ্যাটা সে শিখেছিল।

রামকে বলত মধ্যে মধ্যে—এটা কেন কর? কেন খাও রাম?

রাম হা-হা করে হাসত। কিন্তু কখনও বলে নি—তুমি খাও। বরং চোলাইয়ের সময় নারান যখন অন্যদের মত প্রবল উৎসাহে কাজ করত তখন সে বলত—ঠাকুর, একি নেশা বল দেখি তোমার? মদ খাবে না অথচ—।

নারান বলত—বিদ্যে তো একটা রাম!

রাম বলত—আর বিদ্যে ঠাকুর! ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখলে না, গরু চরালে ঘরের দেওয়াল দিতে শিখলে, ঘর ছাওয়াতে শিখলে, জাল বুনতে শিখলে—জাল খেয়া দিলে, দড়ি পাকালে, কুমোরদের কাছে ঠাকুর গড়বার সময় ঘোরো—। ভগিনপোতের জমিতে লাঙ্গল চালাও, বীজ মার, ধান পোঁত, ধান কাটো। ভাগনেকে কাঁধে করে বেড়ালে—শিখলে না শুধু বামুনের কাজ, লেখাপড়া কুলকম্ম। কপাল তোমার!

নারান বলেছিল—পড়তে আমি পারি রাম। পাঠশালা যাই না। কিন্তু দিদির বাড়ীতে একটা মোটা রামায়ণ আছে সেটা আমি পড়ি।

—তবে তো মেলাই পড়লে। এবার তোমাকে জজ ম্যাজিষ্টর ক'রে দেবে।

—শুধু রামায়ণ নয় রাম, জামাই দাদা যাত্রার বই আনে, বাড়ীতে আছে, তাও পড়ি।

রামহৃদয়ের শখ বলতে যাত্রাদলে পার্ট করা। পাশের গাঁয়ের শখের যাত্রাদলে বড় পার্ট করে। সেই বই বাড়ীতে আনে। ফাঁক পেলে নারান তাও বানান করে পড়ে। বুঝতে পারে তার কারণ হৃদয় যাত্রা করতে যায়, নারানকে নিয়ে যায়। যাত্রাদলে নামলে সে মদ খায় বেশী। নারানকে সামলাতে হয়। নারানকেও দলে নামাতে চেয়েছিল। কিন্তু নারান বক্তৃতা করতে পারে না। তার উপর হেসে ফেলে। বক্তৃতা শুনে শুনে এমন হয়েছে যে, বইটায় একটা শব্দ পড়তে পারলেই বাকীগুলো মনে পড়ে, পড়া সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু রাম তাতেই হাসলে।

* * * *

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল। পোষ্টকার্ডের চিঠি। নিয়ে এল রাম। রাম গিয়েছিল যে গ্রামে সায়েবরা রেশম-কুঠী করেছিল সেই গাঁয়ে। বীটের পিওন তাকে চিঠিটা দিয়ে বলেছিল—দেখ্ রাম, ওই হৃদয়ের পরিবারের নামে চিঠি। চিঠিখানায় লিখছে শুক্রবার দিন ওদের বাড়ীতে কলকাতা থেকে কুটুম আসবে। হৃদয়ের পরিবারের মাসী! ওদের চিঠি তো কখনও আসে না, তাই পড়ে দেখলাম। তা তোদের গাঁয়ে বীট সেই শনিবার। শুক্রবার কুটুম আসবে, বাসে নামবে, এখানে লোক রাখতে বলেছে—গাড়ী রাখতে বলেছে। মাসীর হাঁপানি আছে। নেমে তো আতান্তরে পড়বে রে! তুই দিস—তোদের পাশেই তো বাড়ী।

রাম চিঠি এনে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে মুখে সব খবরটা বলেছিল।

লক্ষ্মী বলেছিল—মাসী কলকাতা থেকে আসছে? ক্যানেরে বাবা। নিজের জ্বালায় মরি! ক্যানে আসছে লেখে নাই?

রাম বলেছিল—পিওন তো তা বলেনি।

নারান ঘস ঘস করে খড় কাটছিল—লক্ষ্মী তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—ওই এক বামুনের ঘরের গরু। মুখ্যু ডাং। এত বড় ছেলে ঘরে থাকতে পরকে পড়াতে যেতে হবে চিঠি।

নারান উঠে এসে চিঠিখানা ফস করে টেনে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছিল। লক্ষ্মী বলেছিল—দে দে—চিঠি দে। পড়িয়ে আনি, ঘোষালদের বাড়ী।

—পড়তে পারছি। বেশ গোটা লেখা দিদি—সাবি—সাবি—সাবি—ত্রী সমানেষু। মা—ল—হ্যাঁ লক্ষ্মী, তুমি আমার—

—ও সবাই পড়তে পারে। দে আমাকে দে। বাচলামো করিস নে বলছি। আমার সময় নেই। বলে লক্ষ্মী চিঠিখানা টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল খানিকটা দূরে ঘোষালদের বাড়ী।

নারান রামকে বলেছিল—আমি পড়তে পারছিলাম না রাম? এই সব ছোট ছোট দুঃখ সে পেত। হৃদয়ের কাছে নয়। দিদির কাছে। ওই রামের কাছেও পেতো। কিন্তু দুনিয়া তাকে দুঃখ দিতে পারত না। রাম বলেছিল—তা পড়ছিলে তো বাপু। সাবিত্তিরি সমানেষু তো পিওন বলে দেয় নাই, আমিও বলি নাই, তুমি পড়লে। তবে গড় গড় করে পড়তে হবে তো! দিদি সেই রাগে নিয়ে গেল আর কি। আর কি বলে, কোথা কি ভুল হয়।

রাম চলে গেল। নারান খড় কাটতে বসছিল, খোকা উঠল ঘুম থেকে। কেঁদে উঠল। নারান তাকে দাওয়ার উপর পাতা বিছানা থেকে কোলে তুলে নিল। খোকা দেড় বছরের হয়েছে। সে মামার ভয়ানক ন্যাওটা। মামা তাকে ঘাড়ে করে বিষ্ণুকে বহন করে গরুড়ের মত প্রায় উড়ে বেড়ায়। মামা তাকে খড় কাটার জায়গার কাছে বসিয়ে দিয়ে খড় কাটতে লাগল। খোকার কথা ফুটেছে। কথা কয়। নারান তাকে বললে—তুই বেটা খুব লেখা-পড়া শিখবি বুঝলি! ইংরিজি পড়বি। ফরফর করে ইংরিজি বলবি। তখন তোর কাছে আমি শিখব। বুঝলি। না কি বলবি? গেট আউট, ভাগো মুখ্য কোথাকার? হুঁ হুঁ, এক চড় মারব তা হলে। তোর বাবাকে খাতির করি বলে তোকে খাতির করব না।

লক্ষ্মী ফিরে এল গজ গজ করতে করতে। আসছেন! আমাকে কেতাত্ত করতে আসছেন। মা লক্ষ্মী, আমি তোমার বাড়ীতে আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় যাইব। বড় হাঁপানিতে কষ্ট পাইতেছি। মরণও হইতেছে না। চিকিৎসার কিছু হইল না। তাই তোমাদের ওখানে বাবা কলেশ্বরের ওখানে যাইব। বাবার স্বপ্নাদ্য ঔষধ চিরকাল বিখ্যাত। তাহা ছাড়া সাধু বাবা আছেন। রবিবার ঔষধ দেন আমার মনে আছে। শুক্রবার যাইব। শনিবার থাকিয়া রবিবার ঔষধ লইয়া আবার সোমবার ফিরিব। বাসের ওখান হইতে তোমাদের বাড়ীও

হাঁটিয়া যাইতে পারিব না। গাড়ী একখানি রাখিয়ো, ভাড়া আমি দিব। আমার সঙ্গে আমার ভাসুরঝি যাইবে।

মাসীকে মেসো বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল দিদির জন্মের আগে। হিরণহাটি গাঁয়ে পোস্ট-মাস্টার হয়ে এসেছিল। ঘাটবলরামপুর হিরণহাটির পাশেই। মেসোও ছিল আচার্যি বামুন। ওদেরও বিয়ে করতে টাকা লাগত। সে কলকাতা অঞ্চলেও লাগত। কালটা তো আজকের নয়। যে সময় মাসী হাঁপানিতে ভুগে আসবে বলে চিঠি লিখেছিল—সেটাই ছিল ১৯৩৫ সাল। তারও পঁচিশ বছর আগে মাসীর বিয়ে হয়েছিল। মেসোর কাছে টাকা নেয়নি। নারানের মাতামহ কিন্তু লিখিয়ে নিয়েছিল এখানকার সম্পত্তি তারা পাবে না। মাসী সুন্দরী ছিল। মেসো রাজী হয়েছিল তাতেই। আর পাড়া-গাঁয়ে বাস করতে আসবার ইচ্ছেও ছিল না। বিয়ের পর থেকে বিদেশে বিদেশে ঘুরেছে মাসী। কখনও কখনও পত্র দিয়েছে। একবার না কি এসেছিল দাদামশায়ের মৃত্যুর পর। তখন দিদি লক্ষ্মী হয়েছে। নারান হয়নি। তারপর একবার পত্র দিয়েছিল নারানের মায়ের মৃত্যুর পর। কলকাতার পাশে দমদমে ওদের বাড়ী। তখন ওরা দমদমেই ছিল মেসোর ছুটিতে। দুটাকা নৌকুতো পাঠিয়েছিল। দিদির বিয়ের সময় মাসী মেসো দুজনেই এসেছিল। দিদিকে আশীর্বাদী দিয়েছিল, কানের দুল। বাবার মৃত্যুর পর হৃদয় পত্র দিয়েছিল, সে পত্রের জবাব আসে নি। এবং কিছুদিন পর ঘাটবলরামপুর থেকে গোবিন্দ নাপিত ওখানকার রায়েদের বাড়ীর ক্রিয়াতে নেমন্তন্ন পত্র বিলি করতে এসেছিল এ গ্রামে। সে-ই একখানা চিঠি এনে দিয়ে গিয়েছিল। গ্রামে পিওন বিলি করতে এসে—কাউকে না পেয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওখানকার বর্ধিষ্ণু বাড়ী রায়েদের বাড়ীতে। রায়ের গোবিন্দের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলেছিল, ও গ্রামে তো যাচ্ছিস—চিঠিখানা আমাদের গোসাঁইয়ের জামাই হৃদয়কে দিস। তাতে ছিল মেসো মারা গেছে। মাসী দমদমের বাড়ীতে আছে।

লক্ষ্মী একবার কাঁদতে হয় বলে কেঁদেছিল। নারানের দুঃখ-টুঃখ কিছু হয়নি। একটু আপসোস হয়েছিল, মেসো ছিল শুনেছে কিন্তু দেখতে পেলে না।

দিদি বলে মেসো যা শৌখীন লোক ছিল। পোস্টমাস্টার তো কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বড়লোকদের চেয়ে বাবুলোক ছিল। চোখে সোনার চশমা। সুন্দর শার্ট। আর সর্বদাই ফিট্-ফাট জামাতে একটু কিছু লেগেছে তা আঙ্গুলের টোকা দিয়ে এমন ঝাড়তো যে সঙ্গে সঙ্গে ময়লাটা চলে যেত। খেতো ভালো। যা-তা মুখে রুচত না। আমার বিয়ের সময়, মা, সে লুচি খেলেই না। সেই রাত্রে মাসী নিজে হাতে রুটি গড়ে দেয় তবে খায়।

ওই কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল দিদি সেদিন। পরদিন থেকে আর নাম হয় নি। মাসীরও না মেসোরও না। হৃদয় কোন পত্র দেয়নি।

এতদিন পর মাসীরও পত্র এল—মাসীর হাঁপানি হয়েছে। মাসী কলেশ্বরের শিবের ওষুধের জন্য এখানে আসছে, দু-দিন থাকবে।

আসবে থাকবে দুদিন, তাতে অন্যায় কিছু হয় না। তবে হৃদয় যে ভিন্ন জাতের মানুষ।

কিন্তু আর উপায় তো নেই, কাল শুক্রবার। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে লাগছে।

নারানের কিন্তু উৎসাহের সীমা ছিল না। মাসী আসছে, মাসীকে দেখবে। কলকাতার মাসী। আরও আশ্চর্যও লাগছে—মাসীর সঙ্গে ব্যাটাছেলে কেউ আসছে না। এক ভাসুর-ঝি আসছে।

ওই ভাসুর-ঝিকেই নাকি মাসী মানুষ করেছে। মাসীর তো ছেলে-পুলে হয়নি। মাসীর হাতে অনেক টাকা। সারা জীবন চাকরী করেছে মেসো।

* * *

মাসী সত্যিই কলকাতার মাসীর মত মাসী বটে।

ধবধব করছে রঙ। দিদি বলে—মাসীকে সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল মেসো। নারানের মাও ফরসা ছিল—দেখতে ভাল ছিল। একটা দুটো ছবি নারানের একটু একটু মনে আছে। মা তার পুকুরঘাটে চান করত। সে অল্প জলে খেলা করত। আর একটা ছবি মনে আছে—মা তার পুজোর থালা হাতে রায়েদের ঠাকুরবাড়ী পুজো দিতে যেতো দুর্গাপূজার সময়। আর কতকগুলো খুব টুকরো—মা ভাতের হাঁড়িতে হাতা দিচ্ছে। সামনের ঘরটা ঝাঁট দিচ্ছে এমনি। কিন্তু মার সঙ্গে মাসীর রঙের তুলনা হয় না। মাসীর চেহারা বলতে খুব রোগা নয়। মুখ চোখ বুড়িয়ে গেলেও খুব ভাঙেনি। চুল পেকেছে অনেক। বড় বড় চোখ। পরনে শেমিজ তার উপর থান কাপড়—ধবধবে ধোওয়া, কিন্তু হাঁপাচ্ছে। কথা বলে থেমে থেমে, মধ্যে মধ্যে কাশে। গলায় ঘড় ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ ওঠে। তার সঙ্গে একটি এগার বারে বছরের মেয়ে। মেয়েটি কালো, নাকটা টেপা। চোখ দুটি টানা নয়, কিন্তু ডাগর। মাথায় চুলগুলি সুন্দর করে আঁচড়ানো। চুলে খোঁপা বাঁধা নয়—মোটা একটা বিনুনী, তাতে ফিতে বাঁধা। গায়ে লাল রঙের জামা। পরনে ডুরে শাড়ী। সব থেকে আশ্চর্য হয়ে গেল নারান—মেয়েটির পায়ে চটি।

ছই বেঁধে রামের গাড়ীটা নিয়ে নারান একলাই গিয়েছিল বাস স্ট্যাণ্ডে। মাসী আর মেয়েটি নেমে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল। মাসীর হাতে একটা ছোট খাঁচি। শালপাতা দিয়ে মোড়া। বাসের লোকটা একটা মাঝারি সাইজের টিনের সুটকেস নামিয়ে দিলে।

নারানের চিনতে কষ্ট হল না—মাসীর আর সঙ্গের মেয়েটির পোশাক দেখে—আর চেহারা দেখে। আশ্চর্য, কালো রঙ যে মেয়ের, নাকটা যার টেপা এবং ছোট; তাকেও এমন সুন্দর লাগে!

নারান গিয়ে মাসীকে প্রণাম করে বলেছিল—আমি নারান!

—নারান। তুই! অবাক হয়ে কিছু দেখেছিল তার মধ্যে তার মাসীমা।

মেয়েটিও অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। প্রায় তার সমবয়সী। নারান কিছু বড় হবে। সে বলেছিল—তোমার বোনপো? খুড়ীমা?

—হ্যাঁ। তারপর নারানকে বলেছিল মাসী—হ্যাঁরে, গাড়ী এনেছিস তো!

—হ্যাঁ মাসী। বেশ ভাল করে খড় বিছিয়ে এনেছি। ওই যে।

—ও যে মোষ রে!

—তা হোক না। গরুর থেকে মোষ ভাল মাসীমা। ভারী শান্ত—ওর পিঠে আমি শুয়ে থাকি।

—ও মা! শিউরে উঠল মেয়েটি!—কিছু বলে না? ফেলে দেয় না?

—না। হেসেছিল নারান। খুব শান্ত। কোন ভয় নেই। একটু আস্তে যাবে। তাতে আরামে যাবে।

—কে জানে। মাসী বলেছিল, গাড়োয়ানকে খুব সাবধানে নিয়ে যেতে বলবি যেন!

হেসে নারান বলেছিল—আমিই নিয়ে যাব মাসী। আমিই গাড়োয়ান হব।

—সে কি রে? তুই গাড়োয়ান হবি কি? তবে আমি যাব না বাবা। এখানেই আমায় কোথাও একটু জায়গা দেখে দে কারুর বাড়ীতে, ভাড়া দেব।

—কোন ভয় নেই মাসী। আমি খুব ভাল গাড়োয়ানী করি। জামাইদাদার ধান আমিই গাড়ীতে তুলে আনি। ধান বেচতে নিয়ে যাই ষাঠ পলষার হাট। তুমি চড়, কিছু ভয় নেই।

বাসের ক্লীনার বলেছিল—হ্যাঁ মা, যান। ও ছোকরা খুব হুঁশিয়ার, আমরা হরদম দেখছি।

তার অভয় পেয়ে মাসী গাড়ীতে চলেছিল, বলেছিল—ভাল ক'রে ধর মোষ দুটোকে।

তবে সে ধরেছিল—সঙ্গে সঙ্গে এই ভয় দেখে অনেক কৌতুকও সে অনুভব করেছিল। মাসীর পর মেয়েটি উঠেছিল খুব সন্তর্পণে। নারান গাড়ীটা তুলে মোষ দুটোর কাঁধে চাপিয়ে অভ্যাস মত কৌশলে মোষের পিঠে হাতের ভর দিয়ে টুপ করে চড়ে বসেছিল গাড়ীতে। পেটে পায়ের টোকা দিয়ে মোষ দুটোকে জিভের ক্যাঃ ক্যাঃ শব্দ ক'রে চলতে ইঙ্গিত করেছিল। গাড়ীটা চলতে শুরু করেছিল।

মাসী এরপর তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ-রে নারান!

—মাসী!

—কোন্ ক্লাসে পড়িস রে?

—আমি পড়ি নে মাসী।

—পড়িস নে?

—না।

—তবে?

এর উত্তর দেয় নি নারান। কি উত্তর দেবে? মাসী কিন্তু ছাড়ে নি। বলেছিল—হ্যাঁ নারান!

—এ্যাঁ।

—পড়িস নে তো করিস কি?

—কি করব ? কাজকর্ম দেখি ঘরে। গরুবাছুর দেখি, চরাই, চাষবাষ দেখি। আবার হাতও লাগাই। ধান কাটি। দিদির ছেলে নিয়ে থাকি।

—কত দূর পড়েছিস ?

– ওই পাঠশালাতে দু বছর পড়েছিলাম।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? ছেড়ে দিলাম। বাড়ীর কত কাজ। ছেলে দেখা। কত হবে এক সঙ্গে ?

—হুঁ। ফেল করে ছেড়ে দিলি ?

—না, ফেলটেল করিনি। সময়ে কুলোল না। জামাইদাদা রাগ করতে লাগল। দিদিরও খুব কষ্ট হচ্ছিল। তো ছেড়ে দিলাম। দিদিও বললে।

গাড়ীটা নদীর ঘাটে ঢালে নামছিল। হুড়হুড় ক'রে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—ওকি করছ, পড়ে যাবে যে—উল্টে যাবে যে—

নারান হেসে বলেছিল—না।

মাসী বর্ধমান থেকে ছোট চ্যাঙারি ক'রে সীতাভোগ মিহিদানা এনেছিল। দিদির ছেলের হাতে দুটো টাকা দিয়েছিল। দিদির ভারমুখ একটু হাসি-হাসি হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। প্রণাম ক'রে বলেছিল—পথে খুব কষ্ট হয়েছে—না মাসী ?

মাসী বলেছিল—রেলে তো খুব কষ্ট হয়নি মা। মেয়েদের গাড়ী দেখে চড়েছিলাম, ভিড় ছিল না। বাসে কষ্ট হয়েছে—যা রাস্তা—আর যা ভিড়। তবু মেয়েছেলে দেখে বসবার জায়গাটা দিয়েছিল। কিন্তু যা তোমাদের পথ। খাল ডিং—দুম-দুম করে পড়ছিল। তার-পর এখানটুকুর কথা কি বলব মা।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল—কি বলব বাবা কলেশনাথের নাম নিয়ে এসেছি—আর এই রোগের যাতনায় এসেছি। রাত্রে বসে কাটাতে হয়। দম আর পড়ে না। নইলে ওখান থেকেই ফিরতাম তোমাদের মোষের গাড়ী দেখে। কি চাউনি মা।

দিদি খুব হেসেছিল। বলেছিল—কি করবে বল মাসী—যে দেশের যা। এ তো কলকাতা নয়। তা এইটি বুঝি ভাসুর-ঝি!

—হ্যাঁ, ওই আমার নিরু। নিরুপমা। ভাসুরের তিন তিনটে মেয়ে—ওকে আমি নিয়েছিলাম আঁতুড়ে। ওর মায়েরও খুব অসুখ করেছিল। আর সেই অসুখেই গেল। আমার কাছেই আছে।

—তা এইবার তো দায় এসেছে তোমার। বিয়ে দিতে হবে—নিরু মুখে হাত চাপা দিয়েছিল হাসি চাপতে। মাসী বলেছিল—বিয়ে কোথায় এখন মা—কলকাতায় তো পাড়া-গাঁয়ের মত নয়, দশ পেরুতেই বিয়ে। ও এখন পড়ছে। পড়ুক।

—পড়ছে ? ইস্কুল যায় ?

—হ্যাঁ। পাড়ার ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

—কলকাতার কথাই আলাদা। তা একলা ইস্কুলে যায়?

—যায় বই কি। কে নিয়ে যাবে।

দিদি নিরুকে বলেছিল—বাঃ, তুমি তো খুব বাহাদুর মেয়ে।

নিরু আবার হেসেছিল।

মাসী এবার বলেছিল—তা হ্যাঁ লক্ষ্মী, নারান পড়ে না কেন? বললে—পড়ে না—পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মী চুপ করে ছিল। একটু পর বলেছিল—কি বলব মাসী ওর কপাল!

—লেখাপড়ায় মন নেই বুঝি? না—বুদ্ধি নেই?

—বুদ্ধি ওর খুব মাসী। যা দেখে—তাই শিখে ফেলে। কিন্তু মন ঠিক নেইও বটে—আর মিথ্যে বলব না তোমাকে—তোমার জামাই—। চুপ করে গিয়ে বললে—বাড়ীতে তো আমি থাকি—সে বিদেশে—ঘরের কাজকর্ম, চাষবাস দেখবার লোক নাই—বললে। আর নারানও সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল। দেখ না—এতবড় বামুনের ছেলে, পৈতে হল না।

আবার একটু চুপ করে থেকে দিদি বললে—তুমি ওকে নিয়ে যাও না মাসী। তোমার তো অনেক টাকা। ওকে পড়াবে। তোমার ঘরে ও চাকরের মত খাটবে—দেখো।

মাসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—না—লক্ষ্মী। আমার টাকা নেই রে। সে তোর মেসোই খুইয়ে গেছে। রিটায়ার করে এসে ব্যবসা করতে গেল। তাতেই সব গেল মা; শেষ বাড়ীর অংশ—তাও গেল। ভাসুরের গেল—ওঁর দুজনের, পৈতৃক বাড়ী। ছেড়ে শেষ ভাড়ার বাড়ী। ওঁর পেনসন ছিল—কোন মতে দিন চলেছে। এখন নিজের গহনা বিক্রী করে চালাচ্ছি। ভাসুর মারা গেছেন—দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—একটা ছেলে ছিল—সে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই। এখন ওই মেয়ে ঘাড়ে। লেখাপড়া শেখাচ্ছি। শিখতে পারলে—যা হোক কিছু করবে—মাষ্টারী-মাষ্টারী। নইলে বিয়ে। তাই বা কি করে দেব তা জানি না।

লক্ষ্মী বলেছিল—কেন মাসী! আমাদের ঘরে তো মেয়ের বিয়েতে টাকা পায় গো!

হেসে মাসী বলেছিল—কলকাতায় সে সব দিন বদলে গেছে মা। সে সব আর নেই। ভাসুরের বড় মেয়ের বিয়ে—এমনি এমনি হয়েছিল—পণ লাগে নি। মেজ মেয়ের বিয়েতে আড়াই হাজার লেগেছিল। যত কাল যাচ্ছে—তত মেয়ের বিয়ের খরচা বাড়ছে। তার ওপর রঙ কালো, অনেক টাকা লাগবে।

নিরু বলে উঠেছিল—কি সব যা' তা বলছ খুড়ীমা? আমি বিয়ে করব না।

মাসী হেসে বলেছিল—ওই দেখ, মেয়ের লজ্জা হচ্ছে। থাক ও সব কথা। এরপর একটু চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—মাসী তোর বড়লোক নয় রে। গরীব। তোদের চেয়েও গরীব। তারপর মাসী একে একে সব খোঁজ নিয়েছিল। ঘাটবলরামপুরের—লক্ষ্মীদের সংসারের।

জিজ্ঞাসা করেছিল—সেখানকার বাড়ী আছে তো ?

—আছে। মধ্যে মধ্যে ছাইয়ে আসে, তবে লোক না থাকলে ভাঙা ভগ্ন হয়। তাই হয়েছে। অনেক দূর তো! বাড়ীর দরজা নিয়ে গেল চুরি করে। জানলায় উই লাগল। তখন—সেগুলো ছাড়িয়ে বিক্রী করে দিলে। যখন যাবে—তখন করবে নারান।

—জমিগুলি ?

—হ্যাঁ। ধান বছর বছর গিয়ে নিয়ে আসে।

—তা হ'লে তো ওই থেকেই ওর পড়া হয় রে। ওই জমি থেকেই তো ওর বাপের সংসার চলত। আমার বাপের চলত।

লক্ষ্মীদি এবার চুপ করে গিয়েছিল। একটু ভেবে বলেছিল—সে সব ওকে হিসেব ক'রে দেবে। তা কি দেবে না ? নিশ্চয় দেবে।

হৃদয়দা বলেছিল—কঞ্জুষ কিপ্‌টে মাগী কোথাকার! গরীব! তো গরীবের মত কথা বলে না কেন—লম্বাই-চওড়াই বাত কেন ?

কথাটা বলেছিল—মাসী চলে যাওয়ার পর। শনিবার সন্ধ্যেতে হৃদয় যেমন আসে তেমনি এসেছিল। একটু মদ খেয়েই সে আসত। পকেটে একটা শিশি থাকত। এখানে এসে চোলাই খেত। ভল্লাদের কাছ থেকে নারানকেই এনে দিতে হত।

মাসীকে দেখে—সে একটু খুশী হয়েছিল। বড়লোক মাসী এসেছে! লক্ষ্মীদের কাছে বৃত্তান্ত শুনে বলেছিল—দূর! দূর! দূর! খোকাকে কিছু দিলে ?

লক্ষ্মী বলেছিল—দু হাতে দুটো টাকা দিয়েছে।

—দু টাকা ? যা—যা! তোকে কি দিলে ?

—দেয় নি কিছু। একখানা নিজের সিল্কের শাড়ী এনেছে, দেবে।

—পুরনো! কানা কুকুর মারে সন্তুষ্ট!

লক্ষ্মী চুপ করে ছেলের কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিয়েছিল! হৃদয় আবার বলেছিল—নারানকে কি দিলে ?

—কই ? কিছু তো দেখিনি!

—এই নারানে!

নারান কাছেই দাঁড়িয়েছিল। কোঠার উপরে মাসীকে আর নিরুকে শুতে দিয়ে লক্ষ্মী নিচের ঘরে শুয়েছিল, নারান বারান্দায় শুয়েছিল।

নারান বলেছিল—কিছু দেয়নি।

—যা দেবে—দিবি দিদিকে। বুঝলি! আমি তো চলে যাব সকালে। দেবে কিছু, গাড়োয়ানী করছিস! দেবে।

তা করেছিল সে। সেই নিয়ে গিয়েছিল কলেশনাথতলা। সঙ্গে দিদি গিয়েছিল। হৃদয়ও গিয়েছিল। মতলব ছিল হৃদয়ের। কলেশনাথতলায় পাশের গ্রামের সারখেলরা অবস্থা-

পন্ন লোক—ওদের নিজেদের শ্রেণীর লোক। মানে ওরাও কন্যা-পণ দিয়ে বিয়ে করে; বিয়ে দেয়। সারখেলদের একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। সে তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে দিন খাইয়েছিল। ভাল বাড়ী ঘর। টিনের চাল, পাকা দাওয়া। উঠানে তিন চারটে বড় বড় মরাই। বড় বড় গরু। খুব আদর যত্ন করে ছিল তারা। নিরু বেড়াচ্ছিল—নারানের সঙ্গে, নারান তাকে পাড়াগাঁ দেখাচ্ছিল। কলেশনাথের মন্দির—সাধুবাবাকে দেখে সেই বলেছিল, নারানদা—ওই ওখানে কি সব ফুল ফুটে রয়েছে সাদা লাল। কলেশ-নাথের মন্দিরের দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। তার মধ্যে একটা মজা দীঘি। সেই দীঘিতে ফুটেছিল শালুক ফুল—সাদা গোলাপী আর গাঢ় লাল রক্তকমল। সময়টা ছিল চৈত্র মাস। খোলা মাঠ; মধ্যে মধ্যে তরির জমিগুলি সবুজ হয়ে আছে, কিছু কিছু জমিতে তিল ফসল হয়েছে। তাতে ফুল ধরতে শুরু করেছে আর বাকীটা সবই ফাঁকা, ধুলো উড়ছে। দূরে কটা পলাশ শিমুলের গাছে—দুটো চারটে লাল ফুল ফুটে রয়েছে। এর মধ্যখানে দীঘিটাতে ফুটেছে ফুল—অজস্র ফুল—আর মাথার উপর ঝাঁক বেঁধে উড়ছে সরালি হাঁস।

নারানের সঙ্গে নিরুর কাল অল্প কিছু ভাব হয়েছিল। কিছু ভাব। নিজেদের গ্রামটা তাকে দেখিয়েছিল। নদীর ধার, দহ, শিবতলা—তার প্রিয় স্থান ভল্লাপাড়া—এ সব দেখিয়েছিল। সে তাকে বলেছিল কলকাতার গল্প—চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, পরেশনাথের বাগান, সিনেমা, তার ইস্কুল মাস্টার, দিদিমণিদের গল্প করেছিল। ভল্লাপাড়ায় এসে—নারান নিজেও অপ্রস্তুত হয়েছে—নিরুকেও বিব্রত করেছে।

রামের স্ত্রী বলেছিল—ওমা, তোমার সিঁতিতে সিন্দুর কই গো? না বিয়ে হয় নাই?

নারান বলেছিল—কলকাতায় ছোটতে বিয়ে হয় না।

—ছোট! ছোট কিসের গো? বিয়ে হলে যে ছেলে হ'ত এতদিন!

নিরু চটে উঠেছিল—সে বলেছিল—কোথাকার অসভ্য তোমরা? নারানদা আমি চললাম। ছি! ছি! বলে সে ফিরে চলেছিল হন হন করে। নারানও খুব লজ্জা পেয়ে তার পিছন পিছন আসছিল। নিরু থমকে দাঁড়িয়ে—মা গো! বলে চীৎকার করে উঠে পিছন ফিরে নারানকে দেখে বলে উঠেছিল—সাপ!

—সাপ? কই? নারান নিরুকে পিছনে রেখে এগিয়ে গিয়ে পথের উপর একটা হেলে সাপকে দেখে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—এই সাপ।

—মস্ত সাপ।

সাপটা এঁকে বেঁকে পালাচ্ছিল—নারান হেলেটার লেজে ধরে তাকে একপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—হেলে। ওর বিষ নাই।

—কি ডাকাবুকো তুমি? যাও হাত ধোও গে

—ক্যানে? হাত ধোব ক্যানে? কিছু হবে না।

—তুমি খুব নোংরা।

ধাক্কা খেয়েছিল নারান—নোংরা সে? নিরু থামে নি, বলেছিল—তুমি ওই অসভ্যদের

সঙ্গে মেশো কেন? ওই ভল্লাদের সঙ্গে?

তারপর বলেছিল—লেখাপড়া না শিখলে মানুষ অসভ্যই থেকে যায়।

নারান ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আর কাছে যায় নি। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাও লক্ষ্মীদিকে কলকাতার নানান গল্প বলছিল যখন—তখন অবাক হয়ে শুনেছিল। শুধু চিড়িয়াখানা মিউজিয়ম নয়, কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের গল্প করেছিল। গান্ধীজীকে দেখেছে নিরু। সুভাষচন্দ্রকে দেখেছে। অটোগ্রাফের খাতায় তাঁর সই আছে।

নারান তখন অটোগ্রাফ কাকে বলে জানত না। মনে মনে একটু সম্ভ্রম জেগেছিল। তাই কলেশনাথ তলায় যখন ওই পুকুরে ফুল দেখিয়েছিল—তখন সে ছুটে গিয়েছিল ওই পুকুরে।

পুকুর থেকে এক গাদা শালুক রক্তকম্বল তুলে মন্দিরে ফিরে ওদের পায় নি। খোঁজ ক'রে সারখেলদের বাড়ী গিয়ে থমকে গিয়েছিল। নিরু কাঁদছে, উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। মাসী বিব্রত হয়ে বলছে—ওরে না? বিয়ে বললেই বিয়ে হয় না। মেয়ে থাকলে ছেলে থাকলে বলে। নিরু।

নিরু শোনে নি। সে বলেছিল—না খুড়ীমা, এখান থেকে চল। না।

সারখেলরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে নিরুর সঙ্গে ওদের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। ছেলেটির ঠাকুমা অশ্লীল কথা বলে ঠাট্টা করেছিল নিরুকে। মাসীকে বলেছিল—টাকা আমাদের মেলা। কত টাকা চাই বল? আমার নাতি ক্ষেপেছে। তা ক্ষেপবার কথাই। বলে আজ রেতেই বিয়ে হোক।

নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটির জেদ দেখে—শক্তি দেখে। মাসী চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তার সঙ্গে লক্ষ্মী। হৃদয় থেকে গিয়েছিল, কিন্তু সে কটু কথা বলেছিল নিরুকে মাসীকে দু'জনকেই। বলেছিল—আমার মেয়ে হ'লে চাবকে দিতাম।

নিরু ফোঁস করে বলে উঠেছিল—মারুন তো। দেখি। বড় লোকসান হল, না? কত টাকা দালালী পেতেন? আমি বিক্রী হ'তে এসেছি?

মাসী বলেছিল—চল—চল—মা—চল! লক্ষ্মী-মা, আমরা বরং নারানকে নিয়ে চলে যাই। বুঝেছ? আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

লক্ষ্মী অগত্যা উঠে এসেছিল। বাড়ীতে এসেও নিরু খেতে চায় নি। জেদ ধরেছিল। চলে যাবে সে এখান থেকেও। বহু কষ্টে নিরস্ত করেছিল মাসী। নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনের সম্ভ্রম আরও বেড়ে গিয়েছিল।

রাত্রে এসে হৃদয় আর একদফা গালাগাল করেছিল। নিরুকে মাসীকে দুজনকেই। মাসীকে বলেছিল—মাসী আমার! নিজের গরজে বোনঝির বাড়ী এসে তার সংসার ভাঙবার চেষ্টা।

মাসী বলেছিল—হৃদয়, এ কি বলছ বাবা?

ঠিক বলছি। আপনি বলেন নি লক্ষ্মীকে, নারানকে পড়াস না কেন?

—সে কি অন্যায় বলেছি ?

—খুব ন্যায় বলেছেন। আবার জমি জেরাতের হিসেব নিয়েছেন। একটা ভাগ্‌ড়া ছেলের খেতে পরতে কত লাগে জানেন ?

—জানি বই কি। কিন্তু ওই সম্পত্তি থেকেই তো আমার বাবার চলেছে। ওর বাবার চলেছে। ওরও চলা উচিত।

হৃদয় বলেছিল এবার—সে সব আর নেই। জমিদার নিলেম করেছে। বিঘে তিনেক ব্রহ্মত্র ছিল তাই আছে। তাও ইন্দ্রপ্রসাদী, মেঘের জল ভেঙ্গে চাষ হলে ধান হয়, নইলে হয় না।

মাসী বলেছিল—তা তো আমি জানতাম না বাবা। লক্ষ্মী আমাকে বলেছিল—জমি জেরাত সবই আছে।

চুপ করে গিয়েছিল মাসী।

নারান খবরটা প্রথম শুনেছিল।

কেমন একটা ধাক্কা খেয়েছিল। জমি সে ভালবাসে। হৃদয়ের জমিতে সে খাটে। তাই জমি নেই, বিক্রী হয়ে গেছে শুনে ভারী দুঃখ পেয়েছিল।

জমি নিলেম করে নিয়েছে ?

হৃদয়ের এখানে বড় হয়েছে, জমিদারের সঙ্গে তার কোন কারবার কোন দিন করতে হয়নি। তবু উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল—এই সময়ের জল বাতাস থেকে জমিদার-বিরূপতা তার মনে বুকে বাসা গেড়ে বসে আছে সেটা সে জানতে পারেনি, আজ প্রথম জানলে।

হৃদয়ের উপর রাগ হল। প্রথম রাগ মাসীকে আর ওই মেয়েটিকে গালিগালাজের জন্যে। দ্বিতীয় তার জমি হৃদয় নিলেম করিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা পর্দা যেন উঠে গেল। রাগ হল নিজের উপর। সে মূর্খ—সে বোকা—সে গর্দভ। নিলাম হয়ে গেলে জমির ধান সেই সমান আসছে কেন ? বোকা মূর্খ না হলে এতদিন ধান আনবার সময় সে যখন যেতে চেয়েছে ঘাটবলরামপুরে তখনই হৃদয় বারণ করেছে, তা সে শুনেছে কেন ?

—নারান !

মাসী নিচে থেকে নেমে এসে ডেকেছিল—নারান !

নারান বারান্দায় শোয় নি। ঘরে লক্ষ্মীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল হৃদয়। লক্ষ্মী বারবার জিজ্ঞাসা করছিল—সত্যি ? জমি নিলেম হয়েছে ?

দু একবার জবাব দিয়েছিল হৃদয়। তারপর আর দেয় নি।

—বল সত্যি !

—জানি না। ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নে, ঘুমুতে দে।

নারান উঠে গিয়ে বাড়ীর বাইরে গাড়ীর ওপর শুয়েছিল। মাসীর ডাকে উঠে এসে বলেছিল—ডাকছ মাসী ?

—হ্যাঁ—বাবা। খুব ভোরে একটা বাস ছাড়ে বলছিলি—সেটাই আমাকে ধরিয়ে দিয়ে আয়। আমরা বরং ওখানেই বসে থাকব। নিরু তো কাঁদছেই কাঁদছেই। আমার প্রাণটাও ছাড়-ছাড় করছে।

হাঁপাচ্ছিল মাসী। হাঁপানি উঠেছিল।

নারান বলেছিল—চল মাসী। তাই চল। তারও খুব অস্বস্তি লাগছিল।

রামের গাড়ী। হৃদয়ের নয়। হৃদয়ের গরু দুটো বুড়ো এবং রোগা বলে নারান পছন্দ করে না। প্রাণপণে সেবা ক'রে, চরিয়েও ও দুটোকে শক্ত সবল করা যায় নি। চাষের সময় ওতে চাষ চলত হৃদয়ের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হাজার বলেও হৃদয়কে নতুন তাজা কাঁচা বয়সের গরু কেউ কেনাতে পারে নি। তাই মাসীকে আনবার জন্যে রামের মোষের গাড়ী চেয়ে নিয়েছিল। তার নিজের মাসী তো! রামের ঘরে গিয়ে রামকে ডেকে বলে মোষ দুটো নিয়ে এসেছিল নারান। তারপর ডেকেছিল—মাসী, গাড়ী তৈরী! এস।

সর্বাগ্রে নেমে এসেছিল নিরু। তার হাতে স্যুটকেসটা। মাসীর হাতে আসবার সময় ছিল মিহিদানার চ্যাঙাড়ি। এবার ওষুধের পোঁটলা। আশীর্বাদী।

নিচের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাসী ডেকেছিল—লক্ষ্মী! ওরে আমরা যাচ্ছি। বাবা হৃদয়!

হৃদয় ওঠে নি। লক্ষ্মী দরজা খুলে বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মাসী বলেছিল—আমি যাচ্ছি রে। তোরা যেন কিছু মনে করিস নে। জামাইকে বলিস। কেমন?

ঘাড় নেড়ে ইশারায় লক্ষ্মী জানিয়েছিল, বলবে। আঁচলের খুঁটে সে চোখও মুছেছিল।

এখানে গাড়ীর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল নিরু। সে বলছিল নারানকে—নারানদা, তুমি যে কি উপকার করলে! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু এ কি দেশ তোমাদের! এক তোমাকে দেখলাম ভাল, তুমি ভারি ভাল। সুখী হও—ভাল হও তুমি। এখানে থেকো না তুমি। চলে যেয়ো। নইলে তুমিও এমনি হয়ে যাবে।

নারান জবাব দিতে পারে নি। সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে ছিল। নইলে বলত—মন্দই শুধু নেই নিরু। ভাল আছে। হৃদয় জামাই দু-চারজনই থাকে।

—আর এক গ্লাস জল খাব। বড় গ্লাসে। একটু জল দেন। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বললে নারান।

দেখলাম নারান বদলে গেছে। মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখের কোটর হতে রক্তের ঢেলার মত চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। হাত দুটো যেন মুঠোয় আবদ্ধ।

ডাকলাম—নারান!

মুখ তুলে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—ভুল বলেছিলাম। মানুষের চেয়ে হিংস্র—

ভয়ঙ্কর কেউ নেই। সাপও নয় বাঘও নয়। আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে—সবার মধ্যে আছে। পরাধীনতা স্বাধীনতা—কিছুতেই প্রকৃতি বদলায় না। বদলায়নি। ব্যর্থ হয়ে গেছে। গান্ধীজী ব্যর্থ, নেতাজী ব্যর্থ—সব ব্যর্থ। পুণ্য মিথ্যে, শান্তি মিথ্যে। সত্য ওসব বোকার কাছে। মূর্খের কাছে। যতদিন বোকা মূর্খ ছিলাম—।

ধীরেন জল আনলে। বললে—জল।

সে জলের ঘটিটা নিয়ে সর্বাগ্রে মাথায় ঢাললে খানিকটা। মুখে চোখে দিলে। তারপর ঘটি ভুলে আলগোছে জল খেয়ে ঘটিটা রেখে বললে—সব বিশ্বাস টুটে গিয়েছে আমার। ওঃ! কুটিল কুৎসিত বীভৎস পৃথিবী। ভয়ঙ্কর পৃথিবী। আমি ভুল বলেছিলাম নিরুকে সেদিন। আমি গড়তে চেয়েছিলাম—ভাল মানুষ—ভাল দেশ। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। সব! অভিসম্পাতে কিছু হয় না। তবু আর তো কোন অস্ত্র নেই আমার!

বললাম—চুপ কর। শান্ত হও।

সে বললে—শান্ত! অক্ষমের শান্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি? হাসলে।

উঠে পড়ল সে। পাক কয়েক পায়চারি করে ফিরে এসে বসল। তারপর বললে—সেই নম্র মৃদু শান্ত কণ্ঠ। বললে—মধ্যে মধ্যে হয়। তারপর শুনুন।

* * *

সমস্ত পৃথিবীই এমনি। তবু আমার দেশের তুলনা নেই। কারও বুক অক্ষত নেই। দগ্ দগ্ করছে ক্ষত। আর একদল মানুষ অর্থ আর প্রতিপত্তির জোরে—কলিজার দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে। সম্পদকে লক্ষ্মী কে বলে জানি না। সেই, সেই সব করায়।

হৃদয় জামাই—হয়তো অমানুষ পশু ছিল না। হল আমার সম্পত্তির স্বাদ পেয়ে। আমার জমির ধান তাকে লোভালে। প্রলুব্ধ করলে।

আপনার বন্ধুর—দুইপুরুষের মুটু মোক্তারের প্রথম বড়লোক হয়ে অমানুষ হওয়াটা সত্য। কিন্তু আবার মানুষ হওয়া, সে মরণের সময়েও—সত্যি নয়।

যাক্!

মাসীকে বাসে তুলে দিলাম। মাসী যাবার সময় বললে—নারান তুই একটু লেখাপড়া শেখ রে! সংসারে বাঁচতে হবে। বুঝতে হবে। অন্তত কিছুটা শেখ।

নিরু বললে—তুমি এখানে থেকো না নারানদা। চলে যেয়ো। লেখাপড়া শিখো। আচ্ছা—তোমার লজ্জা করে না—ওই বাড়ীতে থাকতে? ওই ভল্লাদের সঙ্গে বেড়াতে, মিশতে?

মাসী ধমক দিলেন—নিরু!

—নারানদা মন্দ কিছু করেনি। ওকে ভাল লাগল বলেই বলছি খুড়ীমা।

নারান কিছু বলেনি। বাসে ওদের চড়িয়ে দিয়ে ফিরে—ভল্লাদের বাড়ীতে গাড়ী রেখে—মোষ জোড়াটাকে বেঁধে—খড় কেটে দিচ্ছে—এমন সময়—সে চীৎকার শুনতে পেলে। হৃদয় চেঁচাচ্ছে—হারামজাদী, জুতোর বাড়িতে তোর মুখ আমি ভেঙে দেব।

লক্ষ্মীকে বকছে। লক্ষ্মীর কথা শুনতে পেলে না। হৃদয়ের কথা শুনতে পেলে—এই নে—এই নে—এই নে।

এবার দিদি চীৎকার করে উঠল। হাতের কাস্তেখানা ফেলে দিয়ে সে ছুটে গেল বাড়ীর দিকে। সামনেই দাওয়ার উপর দিদি পড়ে গেছে কাত হয়ে—আর হৃদয় তার জুতোটা দিয়ে তাকে আতালি-পাতালি পিটুচ্ছে। আর আস্ফালন করেছে—ধর্ম শেখাও তুমি, আমাকে ধর্ম শেখাও!

আবার সে জুতো তুললে।

অকস্মাৎ কি হয়ে গেল বাবু, নারানের। হ্যাঁ, কি হয়ে গেল। দিদিকে তার প্রথম মারেনি হৃদয়, প্রথম গাল দেয়নি, অনেক মার সে দেখেছে—কিন্তু আজ তার কি হয়ে গেল। —এ-ই—। বলে সে একটা চীৎকার করে উঠল।

তার নিজের কাছেও এমন চীৎকার নতুন মনে হল। নিজেই চমকে উঠল। হৃদয় জামাই ঘুরে তাকে দেখে—ওই জুতোটা হাতে নিয়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল উঠোনে—মারবে সে নারানকে। মুখে সেও চীৎকার করছিল—হারামজাদা শূয়োর কি বাচ্চা—আমাকে—

কথা তার শেষ হল না—নারান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চৌদ্দ বছরের নারানের গায়ে এত জোর—হৃদয় জানত না—নারানও জানত না। তার ধাক্কায় হৃদয় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল উঠোনে চিত্ হয়ে। নারান তার মুখে কপালে—ঘুষি কিল মেরে—উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মী তখন উঠেছে—অর্ধ উলঙ্গ সে। চীৎকার করছে—ওরে শত্রু রে! ওরে দোষমন রে! ওরে শয়তান রে। ছাড়—ছাড়—ছাড়। মরে যা! মরে যা! মরে যা তুই! মরে যা।

নারানের জীবনে রাগ বোধ হয় সেই প্রথম। রাগেরও কম বেশী আছে বাবু। আগে রাগ হয়েছে আবার তখনই পড়ে এসেছে। একটু পরেই হেসেছে—ভুলেছে। তখন পর্যন্ত হয়তো নারান ছেলেমানুষ ছিল। ছেলেমানুষের যে ভুলবার ক্ষমতা থাকে—সেটাই' হ'ল মানুষের খেলার বয়েসের ভাব। পরমহংসদেবের একটা গান আছে 'মা, আমারে দয়া করে শিশুর মতন করে রেখো'!

নারানের সেই দিন শৈশব ঘুচল। সব পাল্টে গেল। আগের কাল হলে দিদির পায়ে পড়ত—জামাই-দার পা ধরে কাঁদত। জামাই দাদা মারত—সে মুখ বুজে সয়ে যেত। মারা শেষ হলে—দাঁতে দাঁত টিপে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে—সয়ে নেওয়াটা পুরোমাত্রায় হয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলত—বাবাঃ বাঁচলাম। কিন্তু সেদিন আর তা' হল না। রাগ তার কিছুতেই পড়ল না। সে দিদিকে বলেছিল—আমি মরব আর তুমি বেঁচে থাকবে? সুখ করবে? তার চেয়ে তুমি মর! আমি সহজে মরব না। ওই হৃদয় মরুক।

প্রচণ্ড ক্রোধ—কিন্তু তার মধ্যেও খোকার নাম সে বলতে পারে নি।

দিদি বলেছিল—বেরিয়ে যা—তু বেরিয়ে যা। এখুনি বেরিয়ে যা। সে তখন হৃদয়কে ধরে তুলছে। হৃদয় উঠে বসে মাথাটা ধরে বলছে—জল, মাথায় জল!

দিদি বলেছিল—জল আন!

সে বলেছিল—না। পারব না।

দিদি পাগলের মত উঠে—আগে ছুটে এসে—তার গালে মেরেছিল একচড়। তারপর বলেছিল—চলে যা—তুই চলে যা। বলতে বলতেই জল আনতে ছুটেছিল। জল এনে স্বামীর মাথায় ঢেলে—মুখে চোখে ছিটে দিয়ে বলেছিল—আর দোব?

—না।—আমাকে ধর। লক্ষ্মীর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। নারান সে দৃষ্টির সম্মুখে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠেছিল। ঘৃণার-ক্রোধের-হিংসার আর অন্ত ছিল না,—মনে—দৃষ্টিতে—দেহের ভঙ্গিতে, সব কিছুতে।

ভয় পেয়েছিল হৃদয়। কিম্বা চতুর হৃদয় গণৎকারে যেমন লগ্ন বিচার করে অঙ্ক কষে, ঠিক সেইভাবে লগ্নটিকে আবিষ্কার করেছিল তাকে তাড়াবার—তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার। বুদ্ধিমান—খুব বুদ্ধিমান হৃদয়। লম্বা ঢ্যাঙা—রোগা হৃদয়—যাত্রাদলে শকুনির পার্ট করত। শকুনিরা ভীম অর্জুনকে ভয় করে—তাদের রোষে পড়ে না। শকুনি মরে সহদেবের হাতে। সে বুঝেছিল—নারানকে সে চিনতে পারেনি।

রাজা পরীক্ষিৎ—একটা ফলের মধ্যে একটা পোকা দেখে সেটাকে পোকাই ভেবেছিলেন। সেটাকে তক্ষক বলে চিনতে পারেন নি।

হৃদয় চিনেছিল। সে জন্তু। চালাক জন্তু—যারা ঠিক বুঝতে পারে প্রতিপক্ষ মানুষ হলেও কত ভয়ঙ্কর। তারা পিছোয়। পিছোয় না—বাঘ। তার শক্তি আছে আর দন্ত আছে। সতর্ক সে বটে। কিন্তু সামনা-সামনি হলে কি মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলে—হাঁক দিয়ে—ডেকে সে আক্রমণ করে।

বাঘ পরে দেখেছে, নারান তার সঙ্গে লড়েছে। সেদিন হৃদয় চতুর জন্তুর মতো বুঝতে পেরেছিল—এই মানুষের বাচ্চাটা যখন রুখে দাঁড়িয়েছে, তখন ওর চোখে বুকে সর্বনাশের নেশা জেগেছে। মরতে ভয় ওর নেই। শক্তিতে ওকে হারানো যাবে না। সুতরাং মরতে হবে।

দাওয়ায় শুয়ে সে বলেছিল—ওর কি আছে দিয়ে দাও, ও চলে যাক। এখুনি।

দিদি বলেছিল—তুই যদি এখুনি না যাস—তবে আমার রক্তে তুই পা ধুবি। তোর পায়ে মাথা ঠুকে—মাথা ফাটাব আমি।

নারান কোন উত্তর করেনি। বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। শুধু বাড়ী থেকে নয়, গ্রাম থেকে। রামদের পাড়া পর্যন্ত ঢোকেনি। পরনে একখানা কাপড় আর গায়ে একটা গেঞ্জি ছিল। মাথায় গামছাখানা বাঁধা ছিল—গাড়োয়ানদের মত। জামা ছিল তার একটা। সে পরত না জামা। গেঞ্জিও পরত না, পরেছিল কেবল মাসীর সঙ্গে গিয়েছিল বলে। ছাড়ার অবকাশ হয়নি। পায়ে ছিল হৃদয়ের পুরনো একজোড়া স্যাণ্ডেল। সেটা ফেলে দিয়েছিল খুলে, ছুঁড়ে। সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে দশটা টাকা—বোধ হয় তার ভাগ্যবিধাতা আগে থেকে সংস্থান ক'রে দিয়েছিলেন।

সে বললে—বলতে ভুলেছি, নিরু যখন বলেছিল—তোমাদের এ কি দেশ! দম বন্ধ হয়ে

আসছিল আমার। এক দেখলাম তোমাকে ভাল। তুমি মূর্খ হলেও ভাল। এখানে থেকো না তুমি, চলে যেয়ো—নইলে তুমিও শেষে এমনি হয়ে যাবে। সেই সময়ই, না সে সময়ও না। তারপরও ক'টা কথা হয়েছিল মাসীর সঙ্গে। মাসী বাসে উঠবার সময় তার পেটের আঁচলের খুঁট খুলে একখানা দশটাকার নোট বের ক'রে তাকে দিয়েছিলেন।—এটা রাখ বাবা নারান।

নারান আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—এ যে দশটাকার নোট মাসী!

—তা হোক রে! তুই রাখ। নিজের কাছে রাখিস। কাউকে দিসনে। দিদিকেও না। সব বুঝতে পারছি রে তোর অবস্থা। তুই—নিরু মিছে বলেনি, বাড়িয়ে বলেনি—বড় ভাল। ভালমানুষ বোকা হয়। রাখ।

—না মাসী।

—না নয়। ধর। তুই আমাদের নিয়ে গেছিস—কলেশনাথতলা নিয়ে গেছিস—নিয়ে এসেছিস—আবার নিয়ে এলি। গাড়ী ভাড়া লাগলে কত লাগত? নে ধর!

পুতুলের মতই নিয়েছিল নারান।

জানেন?—মানুষ তো! বার কয়েক সে নোটখানা দেখেছিল পথে। তারপর কাছার খুঁটে বেঁধেছিল। ইচ্ছে ছিল—মোষ বেঁধে রামের কাছে গচ্ছিত রেখে যাবে। নইলে সে জানত—হৃদয়জামাই ছাড়বে না—উলঙ্গ করে তল্লাস করবে। মনে মনে হিসেবও করেছিল কি ভাবে খরচ করবে টাকাটা। রামকে তিনটে টাকা দেবে। ওর গাড়ী নিয়েছিল। ওকে দিতে হবে। বাকীটা রেখে দেবে। সামনেই চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা। মেলা থেকে বীরেনকে একটা খেলনা কিনে এনে দেবে। বীরেন তার ভাগ্নে। দিদির ছেলে। বীরেন নাম নারানই রেখেছিল। বীরেন্দ্র নামটা ওর খুব ভাল লাগত। এসব ভাবতে ভাবতে এসে—মোষ বেঁধে খড় কাটতে গিয়ে—ভাবনার ছন্দ কেটে গিয়েছিল—হৃদয়ের ওই কুৎসিত গাল শুনে আর দিদির চীৎকার শুনে। রামকে ডেকে টাকাটা গচ্ছিত রাখা আর হয়নি।

ওই টাকাটার কথা মনে পড়েছিল। নদীর ঘাটে এসে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে বল পেয়েছিল একটা। নেমে পড়েছিল নদীর ঘাটের বালিতে। আর ফিরে তাকায়নি। নদীর বালি—এক হাঁটু জল পার হয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করেছিল। এসে নদীর ধারে ওপার পানে চেয়ে কতক্ষণ বসে ছিল তার হিসেব ছিল না নারানের। বাসের হর্নে তার চমক ভেঙেছিল।

বাস স্ট্যাণ্ডে তখন বাসখানা—পাঁচ মাইল দূরের স্টেশনে যাত্রী পৌঁছে দিয়ে যাত্রী নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েক পর আবার ছাড়বে। পাঁচ মাইলের চার মাইল বাসে গিয়ে নেমে—পূর্ব দিকে পথ ভাঙলে—তিন মাইল পথ। মাঠের পথে—সবসুদ্ধ চার-পাঁচ মাইল। ট্রেনে চড়ে একটা স্টেশন গেলে—দু মাইল পথ। যাবে? বাসে উঠবে? না। দশ টাকার কিছু খরচ করবে না সে পথ-হাঁটা বাঁচাবার জন্য। তবে—খেতে হবে। বাস

স্ট্যাণ্ডে সেই ক্লীনারকে বলে দশ টাকার নোটটা ভাঙিয়ে নিয়েছিল।

নারানের আজও মনে আছে—একখানা পাঁচ টাকার নোট নিয়েছিল। সঙ্গে চারটে টাকা, এক টাকার খুচরো।

অন্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ—গল্পে শেয়ালটা অতি হিসেবের জন্যে মরেছিল। নারান মরে নি। সে বেঁচেছিল। চার পয়সার মুড়ি আর গুড় কিনে ভিজিয়ে খেয়েছিল এক পেট।

তখন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল—জিনিসপত্র সস্তা ছিল—অনেক—অনেক সস্তা।—চার পয়সায় সত্যিই এক পেট খেয়েছিল সে।

রাম ভল্লা গল্প করে—ছেলেবেলায় তারা দুই ভাই মিলে চার পয়সা নিয়ে গাজনের মেলায় গিয়েছিল। এক পয়সায় দুটো মণ্ডা আর তিন পয়সার মুড়কী কিনে দুই ভাই পেট ভরে খেয়ে শেষ করতে পারেনি। একটা কুকুর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল—বাকীটা তাকে দিয়েছিল। সেটারও পেট ভরেছিল।

শুনে সকালে হাসে, রামকে ঠাট্টা করে। রাম বলে—ঈশ্বরের দিব্যি।

নারানও ঈশ্বরের দিব্যি করতে পারে।

মাঠের পথই সে ধরেছিল। পথ ঠিক জানে না; তবে তার একটা নিশানা আছে। একটা বিল। কোপাই নদীর মুখে—একটা বিল। বিখ্যাত প্রকাণ্ড বিল। বিলকে বাঁ পাশে রেখে গেলে পড়বে নদী—নদী পার হয়েই ঘাটবলরামপুর। গ্রামের প্রথমেই তাদের বাড়ী।

বিল বহু দূর থেকে নিশানা দেয়। সামনে চেয়ো না—আকাশ পানে চেয়ো, কথা আছে। নারানও তাই চলেছিল।

এক সময় দিগন্তহীন মাঠে দাঁড়িয়ে তার চোখে পড়েছিল—আকাশে হাজারে হাজারে পাখী—ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে।

ছেলেবেলায় দেখেছে এ পাখীওড়া। এতকাল পর—ছ বছর পর নতুন লাগল। সুন্দর লাগল। সামনে তাকালে সে। হ্যাঁ—ওই দূর জল চিক চিক করছে রৌদ্রের ছটায়। মধ্যে মধ্যে আলোর ঝিকিমিকি যেন এঁকে বেঁকে কেঁপে—ছুটে চলে যাচ্ছে। আবার একটা ঝিকিমিকি উঠছে—সেটাও ছুটছে। কোনটা পিছু পিছু। কোনটা ডাইনে—কোনটা বাঁয়ে। বাতাসের খেলা—সে কথা নারান খুব ভাল করে জানে। নদী মাটি—গাছ লতা—এদের সঙ্গে তার মিতালি কতকাল থেকে। দাঁড়িয়ে দেখছিল সে।

আকাশে মুঠো মুঠো অপরাজিতা আর সাদা টগর ছড়িয়ে দিয়েছে। ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাখী। সাদাগুলো বড় হাঁস। কালোগুলো সরালি—আরও অন্য জাতের। আশ্চর্য ভাল লাগল তার এই সমস্ত কিছুকে। এত পাখী ওখানে ছিল না। কত পাখী, কত ডাক। কত জল। জলের মধ্যে আলো আকাশ। চারিপাশে মাঠ। আহাহা!

হঠাৎ একটা উৎকট কঠিন শব্দে সে চমকে উঠল। শব্দটা ছুটে চলে যাচ্ছে চারিপাশে। দূর-দূরান্তর। কিন্তু কিসের শব্দ। এমন কঠিন শক্ত শব্দ, মন চমকে ওঠে। ও বন্দুক। ওঃ। ওই যে আকাশ থেকে পড়ছে ওই পাখীগুলোর ঝাঁক থেকে—পাখী পড়ছে মাটির দিকে।

কে রে? ওঃ, ওই মানুষগুলো কি?—পাষণ্ড, লোভী, নিষ্ঠুর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার ইচ্ছে হয়েছিল—এখানে সে থাকবে—আর এই পাখী কাউকে মারতে দেবে না। তারপর সে বিলের জলে নেমে স্নান করেছিল। গামছা পরে অনেকক্ষণ বসে থেকে কাপড়খানা শুকিয়ে নিয়ে আবার রওনা হয়েছিল গ্রামের দিকে।

নারান বললে—সেদিন সব পরিচয় জানা হয়নি নারানের। প্রতীক্ষা করেছিল। নারান গ্রামে এসে পৌঁচেছিল—বেলা তখন তিন প্রহর পার হয়েছে। একটা ট্রেনের শব্দ আসছিল দূর থেকে। খুব দূর নয়; স্টেশনটা দু মাইল হলেও একটা বাঁক আছে লাইনের, সেটা এক মাইলের মধ্যে। সে ট্রেনটা আজও আছে। এই যেটাকে তিনটের ট্রেন বলে। যায় সাড়ে তিনটের সময়। ঘাট থেকে উঠে বাড়ী চিনতে তার ভুল হয়নি। চালে খড় নামে মাত্র আছে। দেওয়ালের মাথা চালের নিচেই অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। দরজা নেই। জানালা নেই। উঠোনের চারিপাশে পাঁচিল নেই। উঠোনে জঙ্গল জমেছে। দাওয়া ভাঙাচোরা, খুঁটি চারটের মধ্যে একটা নেই, একটা মচকে গেছে। ঘাস ঠেলে সে সেই ভাঙা দাওয়ায় উঠে পলেস্তরা খসা রূঢ় দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে বসল।

তার নিজের বাড়ী! মাসীকে আর নিরুকে মনে পড়েছিল। একখানা চিঠি লিখবে সে —সে চলে এসেছে। তোমাদের কথা রেখেছে। চলে সে এসেছে। সত্যিই খুব ভাল লাগছে। হোক ভাঙা-ভগ্ন; খুব ভাল লাগছে। খুব ভাল জায়গা। সুন্দর বিল। সুন্দর মাঠ। সব সুন্দর।

তিন

জানেন। নারান বললে—নিজের এই বোধটার মধ্যে ভালবাসা আছে। দেশটা সত্যিই সুন্দর। খুব সুন্দর। ওই বিলটা হল—ওই অঞ্চলের বুকের তক্তির মত, কালচে একটা ঝকমকে বড় পাথর বসানো তক্তির মত। হাঁসগুলো যখন বসে থাকে তখন মনে হয় কুচি কুচি সাদা কালো পাথর বসানো তার উপর। ছোট নদী। গাছ-পালা—হৃদয়ের দেশ থেকে কম। হৃদয়ের ওখানকার মাটি এখান থেকে ভাল। ওদের নদীতে কুমীর নাই। এখানে কুমীর আছে। আপনি বা অন্য লোকে কোন্ জায়গাকে ভাল বললেন জানি না। কিন্তু নারানের মনে হল তার এই অঞ্চল ও অঞ্চল থেকে ভাল, সুন্দর।

মানুষগুলিকেও খুব ভাল লাগল। খুব ভাল। প্রথম দিনই সে বসেছিল সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, অনেক পথ হেঁটে ক্লান্তিতে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ কেউ ডেকেছিল—কে ওখানে বসে গো? শুনছ? ওহে!

সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিল—একজন পঁচিশ-তিরিশ বছরের কালো জোয়ানকে। তার হাতে একটা হুঁকো। কাঁধে গামছা। বাড়ীর সামনে উঠোনের ওপাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সে বলেছিল—আমি। আমার নাম নারান।

—নারান? কোন্ নারান?

—নারান গোসাঁই। এ বাড়ী আমার। আমার বাবার—

—তুমি গোসাঁই মশায়ের ছেলে?

—হ্যাঁ।

—কি আশ্চর্যি। এলে কখন গো? এ্যাঁ তুমি তো কখনও এস না।

—আমি এসেছি। আমি এখানে থাকব।

—থাকবে কি গো? রাগ করে পালিয়ে এসেছ?

—আর আমি কখনও সেখানে যাব না।

একটু চুপ করে থেকে লোকটি বলেছিল—সে তো ভাল কথা। তা ওখানে ব'সে কি করছ? খেয়েছ কিছু?

—খেয়েছি।

—না মুখ শুকিয়ে রয়েছে তোমার। এস-এস, উঠে এস, আমার বাড়ীতে এস। আমরা মোড়লরা। তোমার বাবার যজমান। আমার নাম বিপিন মোড়ল। এস—এস। ঘরে সাপ-খোপ-ইঁদুর-বিছের বাসা হয়েছে। থাকলে আমরাই সব করে দোব। এখন আমার বাড়িতে এস। কিছু খাও।

বিপিন মোড়লের বাড়ীর মেয়েরা তাকে যত্নের আর অবধি রাখে নাই। বিপিনের মা বলেছিল, আহা, কি সুন্দর চেহারা হয়েছে ঠাকুরের! যেন বলরাম। কালো হলে কেষ্ট বলতাম।

তাকে খেতে দিয়েছিল চিঁড়ে, দুধ-গুড়, কলা।

বিপিনের বউ চিনি দিতে এসেছিল, শাশুড়ী বলেছিল, না-না-না। নতুন গুড় উঠেছে, তাই দাও। হ্যাঁ বাবা, গুড় খাবে না—চিনি খাবে?

নারান গুড় ভালবাসত। বলেছিল—গুড়ই ভাল।

—এই তো! বামুনের ছেলে! আগে বামুনরা চিনি খেত না। বলত—ম্যাগো, বলত—ঘেন্না লাগে।

—বিপিন বলেছিল—না গো, সে সাদা শুনে। চিনিতে নয়।

—কে জানে বাবা! বলত তো!, তারপর বলেছিল—তা ভাল হল, তুমি এলে। ভিটেটা পড়ে কাঁদছিল। বুঝেছ? আমাদের ভাল হল পুরুত নাই গাঁয়ে। বামুনেরা সব ইস্কুলে পড়ছে। বুড়োদের দেমাক অনেক। তা হ্যাঁ বাবা—পূজো-আর্চা জান তো?

মিথ্যে বলে নি নারান। বলেছিল—না। জানি না। এখনও পৈতে হয় নাই।

—পৈতে হয় নাই! হেই মা! গোঁপ বেরুব-বেরুব করছে! ও বিপিন!

বিপিন বলেছিল—আমরা গাঁয়ে চাঁদা করে পৈতে দিয়ে দেব। এই বৈশাখেই দিয়ে দেব।

খাওয়ার পর বিপিন বলেছিল—চল। গাঁয়ের সব দেখা করে আসবে চল। সে গোটা গাঁ

ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছিল। সবাই—সবাই তাকে সাদরে আহ্বান করেছিল। বলেছিল—এস থাক। ভাবনা কি?

বড়লোক রায়েদের বাড়ীও গিয়েছিল। রায় বুড়ো লোক, চশমা চোখে দিয়ে তাকে দেখে বলেছিল—তাই তো এলে, কিন্তু দেরি করে এলে যে। তোমার ভগ্নিপতি যে সব একরকম শেষ করে দিয়েছে। তা যাক্। বুঝলে বিপিন, একটা কিছু তো করে দিতে হয়। রাঁধতে পারবে? জান রান্নার কাজ?

নারান একটু ধাক্কা খেয়েছিল। রান্না? রাঁধুনী বামুন?

মনে পড়েছিল নিরুকে। সে বলেছিল—না।

বিপিন বলেছিল—পৈতেটা দিয়ে দেন সকলে মিলে। তারপর ওর বাবা আমাদের পূজো-আর্চা করত। তাই করবে।

বুড়ো রায় বলেছিল—পৈতে হয় নি? এ যে গাঁদা মিনষে হয়ে গেছে। তা দাও পৈতে। আমি কিছু দোব।

ওখান থেকে ভট্‌চাজ-বাড়ী গিয়েছিল। তার মনে পড়েছিল বিশুকে। বিশ্ববন্ধু। ছেলেবেলায় দুজনে খুব বন্ধু ছিল। বিশ্ববন্ধুকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে পরিচয়ের আগেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববন্ধু দাওয়ার উপর হ্যারিকেনের আলোয় ইংরেজী কবিতা পড়ছিল। সেদিন নারান একটা দুর্বোধ্য ভাষাই শুনেছিল—বুঝতে পারে নি।

বিশু বিপিনের কাছে তার পরিচয় শুনে বলেছিল—নারান! সেই নারান! তুমি নারান?

—হ্যাঁ। ফ্যাল ফ্যাল করে নারান তার পানে তাকিয়েছিল।

বিশু বলেছিল—বোস।

—তুমি কি পড়?

—ক্লাস নাইনে পড়ি।

—ক্লাস নাইন?

—তুমি?

—আমি তো পড়ি না।

—পড় না?

—না।

—সে কি? বড় হয়ে করবে কি?

নারান বলেছিল—চাষ করব। আমি চাষ করতে খুব ভাল পারি।

বিপিন বলেছিল—আর আমাদের পুরুতের কাজ-টাজ করবে।

বিশ্ববন্ধু চুপ করে বসেছিল। বিশ্ববন্ধুর বাবা বেরিয়ে এসে খুব স্নেহ করে বলেছিল—বেশ করেছ। নিজের গাঁয়ে এসেছ, খুব ভাল করেছ। থাক, কোন ভাবনা

নেই। সব হবে।

* * *

সংসারে দুখীরামদেরই হোক আর সুখীরামদেরই হোক—যা হয় তা নিজেরাই করে। সুখীরামরা সবের চেয়েও বেশী করে—তাও নিজেরাই করে। সুখীরামের অল্প যেটুকু হয়—তাও তারা নিজেরাই করে। যা হয় না, তা কিছুটা বুদ্ধিদোষে হয় না—বাকীটা অন্যে হতে দেয় না। এটা নারান বুঝত না তখন, কিন্তু অন্যের উপর ভরসাও সে করেনি। নিজেই করতে শুরু করেছিল, পরদিন সকালেই বিপিনকে বলেছিল—আমাকে একটা কোদাল আর একটা দা' দেবে মোড়ল ?

—কি করবে গো ?

—উঠানটা পরিষ্কার করব।

হেসেছিল বিপিন।—তুমি পরিষ্কার করবে ? পারবে ?

—পারব, তুমি দাও।

—উ বেলায়। উ বেলায় আমি পাঁচজনকে জুটিয়ে নিয়ে ক'রে দোব।

হেসে সে বলেছিল—আমি খানিকটা করি—

—তা বেশ নাও। কিন্তু সাবধানে বাপু। দু চারটে সাপ-খোপ থাকবে।

দু চারটে নয়, একটা গোখরা, দুটো চিতি, একটা লাউডগা সে একবেলাতেই মেরেছিল। এবং ওবেলা হতে হতে প্রায় অর্ধেক সে পরিষ্কার করে ফেলেছিল। ঘাস-পাতাগুলো ফেলেছিল একটা গর্তে, সার হবে, ছোট কয়েকটা গাছ ছিল আঁকড়ের আকন্দের—সে-গুলোকে কেটে আলাদা রেখেছিল, শুকুলে জ্বালানি হবে।

সেদিন নেমন্তন্ন করেছিল বিশ্ববন্ধু। সে রাত্রে শুয়েছিল মোড়লের বাড়ীতে। সকালে যখন সে কাজে লেগেছে, তখন বিশ্ববন্ধু নিজে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে।

—নারান! তাকে দেখতে পায় নি—দেখতে পেলেও ঘাস-পাতার ধুলোয় মাখা নারানকে চিনতে পারেনি। ভেবেছিল মজুর। নারান ডাক শুনে উঠে দাঁড়াতেই বিশ্ববন্ধু সবিস্ময়ে বলেছিল—তুমি নিজে পরিষ্কার করছ ?

—হ্যাঁ। সে হ্যাঁ অত্যন্ত সহজ সাধারণ একটি হ্যাঁ। না তার মধ্যে পৌরুষের অহঙ্কার, না তার মধ্যে ক্ষীণমাত্র মজুরের কাজ করার লজ্জা।

—ওটা কি ? সাপ! তখন প্রথম সাপটা মেরেছে নারান।—ও তো লাউডগা। চোখ খেয়ে নেয়।

—হ্যাঁ একটা লাউডগা। আকন্দ গাছটায় জড়িয়েছিল। চোখ খায় না। মিছে কথা। আমি মেরেছি আগে।

—কি ক'রে মারলে ? ও তো উড়ে যায়।

—এক ঢেলাতে। লাঠি মেরে মারা যায় না ওগুলো। উড়ে যায় না—লাফায়। সট করে লাফ দেয় এগাছ থেকে ওগাছে। মানুষ বলে ওড়ে। পাখা না থাকলে উড়তে পারে ?

তার আপাদমস্তক ভাল ক'রে দেখে বিশ্ববন্ধুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার উপর-হাতে হাত দিয়ে বলেছিল—মাসেলগুলো কি শক্ত হয়ে উঠেছে! তোমার গায়ে খুব জোর! না?

এবার বেশ অহঙ্কৃত হয়ে হেসেছিল নারান।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—তুমি আমাদের বাড়ীতে খাবে আজ। মা বললে।

বেলা দুটো নাগাদ সে চান করে খেতে গিয়েছিল। বিশ্ববন্ধু বাড়ী ছিল না। সে কোশখানেক দূরে হিরণহাটির হাইস্কুলে পড়তে যায়। বিশ্ববন্ধুর বাবা তখন খেয়ে শুয়েছে। মা বসে ছিল। তাকে আদর ক'রে খাইয়ে অনেক পুরনো কথা বলেছিল। তার মায়ের কথা। তার ছেলে-বয়সের কথা। তার মায়ের সঙ্গে বিশ্ববন্ধুর মায়ের সই পাতানো ছিল। মনে পড়ে তাকে সইমা বলে ডাকতে শিখিয়েছিল।

সইমা তার সঙ্গে এসে—বাড়ী পরিষ্কার কতটা হয়েছে—কেমন হয়েছে—দেখে গিয়েছিল। এবং দেখে অবাক হয়েছিল। শুধু তাই নয়—তখন দুটো মরা মাঝারি গোখরো পড়ে ছিল এক পাশে, তার সঙ্গে লাউডগাটা আর একটা চিতি দেখে সভয়ে বলেছিল—তুমি মারলে?

হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—ওরে বাপরে!

তখনই বিপিন মাঠ থেকে কলাই কেটে গাড়ী নিয়ে ফিরছে। গাড়ীর উপর থেকেই সে উঠোনটা প্রায় অর্ধেক পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখে বলেছিল—বলিহারি বলিহারি বলিহারি! ঠাকুর তো সামাজ্যি লয় মা ঠাকরুণ!

বিশ্ববন্ধুর মা বলেছিল—হাঁ বাবা। দুর্ধর্ষ ছেলে।

* * *

গোসাঁই গল্প বলতে বলতে বন্ধ করে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা মানুষ দুর্ধর্ষ হয়ে জন্মায়, না দুর্ধর্ষ হয়ে গড়ে ওঠে বলতে পারেন?

একটু ভেবে আমি বলেছিলাম—দুই-ই।

—হ্যাঁ। দুই-ই। দুর্ধর্ষপনা নিয়ে যে না জন্মায় সে অবস্থা-গতিকে খানিকটা দুর্ধর্ষ হয়—তার বেশী হয় না। কামুক কাম নিয়ে জন্মায়, লোভী লোভ নিয়ে জন্মায়, সাপের বিষ নিয়ে জন্মানোর মত।

নারানের কাম ছিল না, লোভ ছিল না, একটা কি ছিল। খুব একটা হৈ হৈ করার, আনন্দ করার এমন একটা কিছু ছিল তার মধ্যে, কোথাও একটু গোলমাল হলেই ছুটে যেত। ভিড় জমলে—ঠেলে ঠুলে 'দেখি'—বলে ঢুকে পড়ত। সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াত এমনি একটা কিছু ছিল।

বাহাদুরি দেখানোর একটা স্বভাব। কাঙালপনা থেকে হয়েছিল? না। কাঙালপনা নারানের ছিল না।

হ্যাঁ, দুখীরামরা কাঙাল হয় সুখীরামদের ঐশ্বর্য দেখে, ভীতুও একটু হয় তাদের প্রতাপ দেখে। নারান দুখীরাম হলেও দুটোর একটাও তার মধ্যে ছিল না।

তারপর হেসে গোসাঁই বলেছিল—যাক গে। কি হবে সে হিসেব করে? নারানের হিসেব ছিল না—এইটেই নারানের হিসেব।

দুদিন পর। ঠিক দুদিন পর।

নারানের উঠোনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে—সে মাটি কেটে জল দিয়ে কাদা করে পায়ে পায়ে হাঁটছে, তার সঙ্গে বেনাঘাসের কুচি মিশিয়ে দিচ্ছে। এবার সে ঘরের ভাঙা ভগ্ন জায়গাগুলিতে মাটি ধরাবে। যে সব জায়গা একেবারে ছেড়ে ভেঙে পড়েছে, সেসব জায়গা বেশ ভাল করে ভেঙে আবার দেওয়াল দেবে। এমন সময় একটা গোলমাল উঠল।—গেল—গেল—গেল। তার সঙ্গে হেই—হেই—হেই শব্দ।

ছুটে গেল নারান। গ্রামে বেটাছেলে—চাষীরা নেই; আছে ভদ্রলোকেরা—আর দু চারজন বুড়ো আর নারানের মত অল্পবয়সী চাষীর ছেলে। গিয়ে নারান দেখে একটা ষাঁড় একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর শিঙ নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে। গলিটা দুই বাড়ীর মধ্যে পানিপাতনের গলি—আর ও মুখটা পাঁচিল দিয়ে বন্ধ। গলির ভিতর দুটি বউ ষাঁড়টার তাড়া খেয়ে ছুটে ঢুকেছে, খেয়াল হয়নি যে ওমুখ বন্ধ। ষাঁড়টা রায়বাবুদের কার শ্রাদ্ধের ধর্মের ষাঁড়; অত্যন্ত বদমেজাজী—যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনি দুখানা শিঙ! এর আগে একটা ষাঁড়কে যুদ্ধ করে প্রায় মেরে ফেলেছে। এক চাষীর একটা বলদ সত্যিই মেরেছে। যখন লেজ উঁচু করে রাস্তা দিয়ে ছোটে তখন দশ-বারো জন লাঠি নিয়ে না দাঁড়ালে রোখা যায় না। তখন তারা মারতে মারতে গ্রামছাড়া করে দিয়ে আসে। থাকে সে ওই বিলের ধারে মাঠে, ওখানেই প্রচুর ঘাস এবং ফসল খেয়ে রাজার মত ঘোরে; গ্রামের গরু চরাতে গেলে তাদের মধ্যে ঘোরে। মধ্যে মধ্যে এক একটি গাভী তার সঙ্গিনী হয়—তখন তাকে আর বাড়ী আনে না চাষীরা, আনলে ওই বৃষরাজ সঙ্গে সঙ্গে আসবে। কয়েক দিন মাঠে থেকে গাইটা একদিন আপনিই ফেরে। ষাঁড়টা তখন বিলের অন্য দিকে চলে যায়। হুঙ্কার ছাড়ে। কখনও কখনও ঢুকে পড়ে গ্রামে। সেদিন ওইরকম করে গ্রামে ঢুকেছিল। যারা গ্রামে ঢোকা দেখেছিল—তারা তাড়া দিয়ে তাড়াতে চেয়েছিল—তাতে ফল হয়েছিল উল্টো। সে লেজ তুলে হুঙ্কার ছেড়ে ছুটেছিল তাদের তাড়া করে। তারা পাশে সরে বেঁচেছে। কিন্তু সামনে পড়েছিল বউ দুটি। তারা ঢুকে পড়েছে এই বন্ধ গলিতে। ষাঁড়টা গলিতেই ঢুকতে গিয়েছিল—কিন্তু গলিটা এমন সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে সে কিছুটা ঢুকে আর ঢুকতে পারছে না। এদিকে বেরও হবে না। কঠিন আক্রোশে আগলে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর শিং নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে।

নানান গবেষণা চলছে। ওদিকে থেকে মই নামিয়ে মেয়েদের তুলতে গিয়েছিল—একটি মেয়ে পড়ে গিয়েছে। হৈ হৈ চলছে। পিছন থেকে এরা যত খুঁচছে তত সে সামনে এগুতে চেষ্টা করছে। নারান এসে দেখেই হিসেব করলে না—নিকেশ করলে না। একবার দেখেই ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে এক আঁটি খড় নিয়ে বন্ধ মুখের পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে

পড়ল। তারপর তার কোঁচড় থেকে দেশলাই বের করে খানিকটা খড়ে আগুন ধরিয়ে সামনে এগুতে লাগল। এবার ষাঁড়টা পিছু হটল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগল নারান। জলন্ত খড়ে আরও খড় যোগান দিলে। ষাঁড়টা বোধ হয় এমন করে আগুনের সামনে কখনও পড়েনি। গলি থেকে বেরিয়েই সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পিছু পিছু নারান। এতক্ষণে পিছনের লোকেরাও যোগ দিল লাঠি নিয়ে। গোটা জনতার উল্লাসের সীমা ছিল না। কিন্তু সব চেয়ে বেশী উল্লাস হয়েছিল নারানের।

লোকে বলেছিল—আচ্ছা বুদ্ধি।

কেউ বলেছিল—ডাকাত ছেলে। কি সাহস।

বিশ্ববন্ধুর মা সেদিন তাকে বলেছিল—এমন অসম সাহস করো না বাবা, কোন্ দিন বিপদ হবে।

নারান বলেছিল—না। অর্থাৎ হবে না।

সেই দিন সে খেয়ে দেয়ে গিয়েছিল হিরণহাটি। খাচ্ছিল ক'দিন বিশ্ববন্ধুর বাড়িতে। বিশ্ববন্ধুর মায়ের সইয়ের ছেলে—তা ছাড়া তিনি এই বিচিত্র ছেলেটিকে দু তিন দিনেই ভালবেসেছিলেন। সকাল থেকে ঘর মেরামত করছিল—তারপর ষাঁড় তাড়িয়ে আর কাজ হয়নি; অপরিমেয় উল্লাসে হেসেছে—নিজে হেসে তৃপ্ত হয়নি—অন্যদের সঙ্গে হেসেছে। তারপরই মনে হয়েছিল—সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে—ও বেলায় সকাল সকাল আবার কাজে লাগবে। খেতে বসে শুনেছিল—বিশ্ববন্ধুর বাবা যাবে হরিণহাটি। কাজও আছে, এখানকার লোকের কাজ হিরণহাটিতে প্রায়ই থাকে। হাট বাজার পোষ্টাপিস ইস্কুল ডাক্তার বদ্যি সবই হিরণহাটিতে। বিশ্ববন্ধুর বাবার কাজ—বিশ্ববন্ধু ইস্কুলে পড়ে—সেই করে। আজ কিন্তু নিজেকে যেতে হবে। বিশ্ববন্ধুর মামা বিদেশে চাকরী করেন। তিনি চারটের ট্রেনে এই এই স্টেশন হয়ে দেশে যাবেন। এখান থেকে আরও চারটে স্টেশন পর। সেই বিশ্ববন্ধুর মামা লিখেছেন ভগ্নীপতিকে, স্টেশনে এসে দেখা করতে। কাজও আছে একটু।

বিশ্ববন্ধুর বাবা তাই যাচ্ছেন। তা ছাড়া আজ হাটও বসে। নারানের ইচ্ছে হল সেও যাবে—দেখে আসবে হিরণহাটি। হিরণহাটি প্রায় শহর। বড় বড় পাকা বাড়ী আছে। বাবুদের একটা হাতী আছে। হাতী নারান দেখেনি। শহরও দেখেনি। তা ছাড়া একখানা কাপড় না হলে চলছে না। একখানা কাপড় শুকিয়ে পরায় অনেক কষ্ট। লোক দেখবে। তাতে কেমন লজ্জা হয়। সে চলে যায় বিলে। গামছা পরে কাপড়খানা কেচে পাড়ে মেলে দিয়ে জলে নামে। এক কোমর জল—এক বুক জল—সাঁতার জল—খানিকক্ষণ তোলপাড় করে—হাঁসগুলোকে তেড়ে বেড়িয়ে খেলা করে। পাড়ে মেলে দেওয়া কাপড় খানা শুকুলে তবে ওঠে। পরে গ্রামে ফেরে। তাই ইচ্ছে হল—কাপড়ও একখানা কিনবে। বললে—সইমা—কাকার সঙ্গে আমিও যাব। কাপড় কিনব একখানা।

—টাকা আছে তো রে?

—আছে। ন'টাকা ক'আনা আমার আছে। আর বিড়ির পাতা তামাক সুতো কিনে

আনব। পাকিয়ে বিক্রী করব।

—তুই বাবা অদ্ভুত। তা রায়েরা বলছে রান্নার কাজ করতে পারিস তো কর না। ওদের জামাই বিদেশে থাকে—তার কাছে পাঠাবে।

—না সইমা। উ কাজ আমি করব না।

কেমন করে যে ওই রান্নার কাজটা তার খারাপ মনে হয়েছিল—তা নারান আজও বলতে পারে না। অথচ সেইদিনই সে বিশ্ববন্ধুর বাবার মোট হিরণহাটি থেকে বলরামপুর পর্যন্ত মাথায় বয়ে নিয়ে এসেছিল। বিশ্ববন্ধুর মামা স্টেশনে ভগ্নীপতিকে নতুন কাপড়ে চোপড়ে ভর্তি একটা স্যুটকেস দিয়েছিলেন। নতুন চামড়ার স্যুটকেস। গত পুজোর সময় বিশ্ববন্ধু মামার বাড়ী গিয়ে মামার চামড়ার স্যুটকেস দেখে ভারী মুগ্ধ হয়েছিল। বার বার হাত বুলিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—কত দাম মামা?

মামা হেসে বলেছিলেন—এবার যদি ফার্স্ট ক্লাসে ওঠো তা হলে একটা স্যুটকেস নতুন কিনে দেব। কথা রইল।

বিশ্ববন্ধু ফার্স্ট হয়েছিল এবং চিঠিও লিখেছিল মাঘ মাসে। মামা লিখেছিলেন—স্যুটকেস নিশ্চয় পাইবে। চৈত্র মাসে বাড়ী আসবার সময় স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন—ভর্তি করে। ভগ্নী ভগ্নীপতি ভাগ্নের জন্যে কাপড় জামা বোঝাই করে নিয়েছেন। বিশ্ববন্ধুও সঙ্গে ছিল স্টেশনে। স্যুটকেসটা নিতে গিয়ে বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল—এ যে খুব ভারী হে! কি আছে?

বিশ্ববন্ধুর মামা বলেছিল—শিল-নোড়া। দিদির বরাত। বাড়ীতে মির্জাপুরের শিল দেখে বলেছিল—এবার যখন আসবি—আমার জন্যে একটা শিল আনিস ভাই। সুন্দর শিল। সেটাই আছে তলাতে। আর খানকয়েক কাপড়জামা।

বিশ্ববন্ধুর মামা রেলে কাজ করে—থাকে মোগলসরাইয়ে।

ট্রেন চলে গেলে বিশ্ববন্ধুর বাবা বকেছিল স্ত্রীকে—দেখ দেখি, মেয়েদের আহম্মকিটা বোঝ দেখি। এই শিল—নাও এখন কুলী কর। ডাক রে বাবা—কুলী ডাক।

নারান এসে সেটাকে তুলে দেখে বিশ্ববন্ধুকে বলেছিল—দাও—তুলে দাও আমার মাথায়, চলুন কাকা আমি নিয়ে যাই।

—তুমি?

—হ্যাঁ। এই তো এইটুকু পথ। এর চেয়ে আমি আরও বেশি ভারী বইতে পারি। দিদির বাড়ীতে বইতাম।

বিশ্ববন্ধু লজ্জা পেয়েছিল। বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল—বেশ তো, তুই-ই নিবি পয়সা ক'টা। চল।

বাড়ী এসে পয়সাও দিতে চেয়েছিলেন—চার আনা। কিন্তু সে নেয়নি। সে মুখ নিচু করে হেসে বলেছিল—না সইমা। নিজের ঘরে পয়সা নেয়? ব'লে পালিয়ে গিয়েছিল ছুটে।

সেদিন রাত্রে খেতে এসে সে বসেছিল—বিশ্ববন্ধুর কাছে। বিশ্ববন্ধু পড়ছিল। সেদিন তার পড়ায় অনুরাগ ছিল খুব গাঢ়। ফার্স্ট হয়ে সে স্যুটকেস পেয়েছে—জামা পেয়েছে। দুটো জামা।

সে বসে শুনছিল।

মনে আছে সেদিন বিশ্ববন্ধু ইতিহাস পড়ছিল। পলাশীর যুদ্ধ। ইংরিজী নয়, বাংলায় পড়ছিল। 'নবাব আলিবর্দীর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা মুরশিদাবাদের নবাব হইলেন।' সিরাজউদ্দৌল্লার নাম সে জানে। আর একটা নামও তার চেনা ঠেকেছিল—মীরজাফর। কিন্তু গল্পটা সে জানত না। বিশ্ববন্ধু পড়ে যাচ্ছিল—সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল।

বিশ্ববন্ধুর মা—তাকে বিশ্ববন্ধুর একটা জামা এনে দিয়ে বলেছিল—নারান, এটা তোমার গায়ে হবে?

জামাটা নতুনই বটে। তবে মামার দেওয়া নয়। সম্ভবতঃ ঘরে ছিল। নিতে দ্বিধা হয়নি নারানের। নিয়ে কিন্তু দেখে বলেছিল—হবে না সইমা। বুকে টান হবে।

—তা হোক না একটু টান।

—তাই হোক। সে পরেছিল। সত্যিই টান হয়েছিল—বেশ টান।

সইমা বলেছিল—নারান—আমার ভাইকে দেখলে।

—দেখলাম। সাহেব লোক।

—হ্যাঁ। রেলে বড় চাকরী করে। এখন কাশীর কাছে আছে। মোগলসরাই মস্ত ইষ্টিশান। ওর সঙ্গে যাবে? বলব ওকে? এখন এটা-সেটা রান্নাবান্না করবে—তারপর একটা চাকরি তোমার রেলেই হয়ে যাবে। তোমার কাকাও বলছিল।

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল—না সইমা। এ গাঁ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। না।

* * *

একই পৃথিবী—বাবু। কিন্তু একই পৃথিবী দিনের আলোয় একরকম, রাত্রের অন্ধকারে আর একরকম। দিনের আলো ফুটতে ফুটতে ফুল ফোটে—পাখীরা কলকল করে গান গায়। মানুষ জাগে, কাজ করে, গান গায়, জল—খালে বিলে নদীতে—আলোর ছটায় ঝিকিমিকিতে ভরে যায়, কোন ভয় থাকে না। রাত্রে সেই পৃথিবীই আর একরকম। অন্ধকার হতে হতে ফুলগুলো শুকোয়, ঝরে পড়ে, পাখীরা ডালে বাসায় বসে থাকে, চোখে দেখতে পায় না; চুপচাপ। ওই এতবড় বিলটাতে ওই এত পাখী—যারা ওই আকাশের অনেক উঁচুতে ওড়ে—উড়তে পারে, তারা অসহায় হয়ে ভাসে জলের বুকে। জ্যোৎস্না রাত্রে ওরা অবিশ্যি ধানক্ষেতে নামে—ফসল খায়। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে নিঝুম। মানুষ আরও পাল্টায়। সে ঘুমোয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। অতৃপ্ত কামনার স্বপ্ন। যারা জেগে থাকে তাদের প্রায় সবাই দুশ্চিন্তায় জেগে থাকে, ক্রোধে জেগে থাকে, হিংসায় জেগে থাকে; আর জেগে থাকে কামে। কাম নিন্দার নয়, তা থেকেই সৃষ্টি—কিন্তু কামার্ত পুরুষ নারী দুইই প্রায়

জন্তু। ওখানে আদিম পৃথিবী। পৃথিবীর বুকে দিনে যারা ঘুমোয় রাত্রে তারা বের হয়। সাপ —শেয়াল জন্তু জানোয়ার—চোর ডাকাত। খুনে—

—ওঃ।

বক্তা গোসাঁই অকস্মাৎ একটা যেন কিছুকে তিরস্কার করে উঠল। তিরস্কার ঠিক নয়। তার মধ্যে আর্তনাদের একটি রেশ আছে। সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন সূচীমুখের মত অতর্কিতে বিদ্ধ করে।

তার দিকে তাকালাম আমি।

গোসাঁই বললে—রাত্রি যে কত ভয়ঙ্কর হয়—। ওঃ।

তারপর তিক্ত হেসে বললে—প্রকৃতির নিয়ম—করবে কি মানুষ। কিন্তু অন্ধকারের সবটাই পাপ নয়, অন্যায় নয়। না। কালীপুজো অন্ধকার রাত্রে। মহাফল মেলে। মহাফল।

বুঝতে পারলাম কি বলছে সে। কিন্তু কথা বলতে হল না। হ্যাঁ, সাহসই হল না।

মহাফল ও পেয়েছে কিনা জানি না। একটা মহামুহূর্তের কথা ওর মনে পড়েছে রাত্রির কথায়—অন্ধকারের কথায়।

আত্মসম্বরণ করে—একটু পর সে বললে—রাত্রে ঝিলের জলটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যেত। চাঁদ উঠলে চমকাতো। শীতকালে জ্যোৎস্নারাতে কুয়াশা জমত। সে অপরূপ দৃশ্য। সেও তো প্রায় দিনের মত।

প্রথম গিয়ে নারান ওই অঞ্চলটিকে গ্রামকে—দিনের পৃথিবীর চেহারায় দেখেছিল। দেখে সে এমন ভালবেসেছিল যে যেন তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল। মাটি-গাছপালা-বিল-নদী—সব কিছুর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হয়েছিল তার। তার সঙ্গে মানুষ। এখানকার সবের আগে পরিচয় বিলের সঙ্গে। বিলের থেকে আর কিছু বেশী ভাল লাগেনি। বিলে স্নান সে ছাড়েনি। আর হাঁসের সঙ্গে খেলা। তারপর মানুষ—তারপর মাটি। ঘর গড়তে গিয়ে মাটির পরিচয় পেয়েছিল—ওখানকার মাটিতে বড় বেশী বালি। এখানে বালি কম। মাটির রাগ বড় ভাল। মানুষদেরও ভাল লেগেছিল। বিপিন সব থেকে ভাল। তারপর সইমা, বিশ্ববন্ধু, বিশ্ববন্ধুর বাবা। তারপর আরও সব। রতন মোড়ল, দেবু মোড়ল, বারু মোড়ল, ঘোঁতন নন্দী, ঠানু পাল—এরা সব মোড়লপাড়ার। ভটচাজপাড়ার সনু ভটচাজ, ঝন্টু ঠাকুর, বাদল চাটুজ্জে, পারু মুখুজ্জে, শিবু রায়, সকলেই বেশ লোক। বড়লোক রায় মশায়ও বেশ লোক। হ্যাঁ, বেশ লোক। তাকে সহজ স্নেহে গ্রহণ করে—প্রথমটা দুদিন চারদিন করে খাওয়ালেন। তারপর বৈশাখ মাসে তার পৈতেও দিয়ে দিলেন। গোপেশ্বর তলায় বিশ্ববন্ধুর বাবাই তার বাপের কাজ করে পৈতে দিয়ে নিয়ে এলেন। দণ্ডী হাতে মাথা নেড়া করে গেরুয়া কাপড় প'রে গ্রামে ফিরল—বিপিনের মা মুখ দেখলে। সোনার আংটি ছাতা জুতো কাপড় জামা থালা গেলাস বাটি, পূজোর বাসন কোশাকুশি দিলে ভিক্ষে—মা। গাঁয়ের মেয়েরা বাড়ী এসে ভিক্ষে দিয়ে গেল। বামুনেরা—তারপর শূদ্ররা। চাল কলা হরিতকী পৈতে—টাকা আধুলি সিকি; সে অনেক। রায়বাড়ী থেকে রাঁধুনি বামনী—সে

রায়েদের নিজের লোক—সে ভিক্ষে দিয়ে গেল—একটা টাকা দিয়েছিল রায়বাড়ী থেকে। সইমা একটা আংটি দিয়েছিল সোনার।

বিশ্ববন্ধু পাশে ছিল—টাকা-রেজগী হিসেব করে সেই গুনেছিল—তিরিশ টাকার উপর হয়েছিল। কলা সে অনেক, তার সঙ্গে বাতাসা, কদমা, আর আতপ চাল—তা আধমণ।

এরপর আর একদফা ব্রহ্মচারী নিমন্ত্রণ। সে খুব পরিপাটি ক'রে খাওয়া। তাতেও চলে গিয়েছিল দেড় মাস। শূদ্ররা সিধে দিয়েছিল।

প্রথম মাস তিনেকের মত এমন উৎসবময় জীবন তার আগেও আসেনি—পরেও না—আর কখনও আসবে না।

ওর জমি, ওর পুকুর নতুন ক'রে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বিপিন। দিদি কি হৃদয় ওরা পৈতের খবর পেয়েও খোঁজ করেনি। নারানও করেনি। শুধু ভাগ্নে বীরেনের জন্ত মধ্যে মধ্যে মনটা কাঁদত।

কাঁদত সন্ধ্যেবেলা। যে সময়টায় দিনের হৈ-হৈ শেষ হয়েছে—রাতের আসর বসেনি, সেই সময়টা। ও চলে যেত বিলের ধারে। বসে থাকত। মন কাঁদত।

বিলের ধারে যেত তিনবার, একবার ভোরে।

ভোরবেলা হলেই সে উঠে ছুটত। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত। গিয়েই সে—বিলের ঘাস-বনে লুকনো একটা টিন আর একটা লাঠি নিয়ে—প্রাণপণে পিটত। ঘুম ভাঙিয়ে উড়িয়ে দিত হাঁসগুলোকে? হাঁসগুলি তখন নিথর হয়ে ভেসে থাকত জলের উপর—গলা আর পাখার মধ্যে মুখটা গুঁজে। এই সময়টাই শিকারীদের শিকারের প্রশস্ত সময়। নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত হাঁসগুলোর পিছন থেকে জলে জলে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে রেঞ্জের মধ্যে পেলেই গুলি করত।

এরপর বেলা হ'লে হাঁসেরা চলে যেত মাঝখানে—চকিত দৃষ্টি সজাগ রেখে সাঁতার কাটত, খেলত, উড়ত, বসত; কোথাও কোন দিকে একটি ছায়া দেখলে—কি একটি টুপ শব্দ-হলে—কি একটু বিড়ি সিগারেটের গন্ধ-মেশানো বাতাস নাকে ঢুকলেই—ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দ করে আকাশে পাখা মেলত। পাক খেতো। এদিক থেকে ওদিক—সে দেড় মাইল দু মাইল। অথবা বসত ঠিক মাঝখানে—সেখানটা চারিদিকের কিনারা হতেই অন্তত পৌনে এক মাইল—আধ মাইল। বন্দুকের গুলি যায় না।

এ নিয়ে দু-চারজনের সঙ্গে বচসাও হয়েছে তার। সে ঠিক বচসা করেনি, সে বলেছে—আমি মশায় টিন বাজিয়ে গান করি বিলের ধারে ব'সে। তাতে আপনার কি!

বিশিষ্ট লোক দেখলে প্রশ্ন করেছে—বাবু, একটা কথা বলব? ওরা কি করেছে আপনার?

গ্রামে কথাটা এসেছে। রায়ের কাছে এসেছে। ভটচাজ-বাড়ীতেও এসেছে। তাঁরা হেসেই বলেছেন—ওর একটু ছিট টিট আছে। তা, বলবে ও ওরকম কথা। কারণ, এই তিন মাসেই গাঁয়ের লোক জেনেছে—রাত্রে কারুর অসুখে রাত জাগতে হলে—নারানকে ডাকতে হবে; কারুর বাড়ীতে আঁতুড় হয়েছে—দোরে বামুন শোয়াতে হবে—সে নারানকে ডাকলেই হবে। রাত্রিতে সেদিন খুজ্জেদের বাড়ীতে বিধবা পিসী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে বাবামু

গোপেশ্বর, বাবা গোপেশ্বর বলে চীৎকার করছিল—কিছুতেই জ্ঞান হচ্ছিল না, ডাক্তার ডাকতে লোক গিয়েছিল, কিন্তু একজন প্রবীণ বলেছিলেন—এ বাবু, বাবা গোপেশ্বর তলার অপরাধ। ওখানকার মৃত্তিকে পুষ্প আনাও। কে আনবে। বাবার স্থানে রাত্রে কে ঢুকবে? পুষ্প আনবে—

ব্রাহ্মণ না হলে হবে না। নারান বলেছিল, আমি যাব।

—পারবি তুই?

—হ্যাঁ। একটা লণ্ঠন দাও। চলে যাব। এই তো পাঁচপো পথ।

তাই সে চলে গিয়েছিল এবং ডাক্তার আসবার আগেই ফিরেছিল। ডাক্তার এসেছিল এক ক্রোশ দূর হিরণহাটি থেকে, গাড়ীতে। সে পাঁচপো পাঁচপো আড়াই ক্রোশ পথ তার আগেই মেরে দিয়েছিল।

এ তো মাথার ছিট নইলে হয় না। এবং এমন ছিট যার থাকে—তাকে ভালও মানুষ না বেসে পারে না।

শূদ্রদের পাড়ায় আরও খাতির। সেখানে স্নেহ শ্রদ্ধা দুই। বলতে গেলে তাদের মধ্যেই বাস। তারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে আচারে আচরণে ব্যবহারে খাটো নয়। ওই রায়মশায় আর বিশ্ববন্ধুর বাবা বাদে। তবু তারা তখনও ব্রাহ্মণের ছেলে বলে শ্রদ্ধা করত। সে সেখানে প্রায় অবাধ উল্লাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যায় কীর্তনের দলে গাইতে না পারুক, সামনে থাকত। ওদের বিবাদে বিচারে থাকত। ওদের হুঁকোর মাথা থেকে কল্কে নিয়ে খেতো। কারুর বাড়ী সাপ বেরুলে ছুটত লাঠি নিয়ে।

সন্ধ্যায় বিলের ধার থেকে সে একবার এসে বসত বিশ্ববন্ধুর পাশে। সে পড়ত, নারান বসে থাকত। তার বই ওল্টাতো।

এরই মধ্যে কখন যে সে ওদের ভালবেসে প্রতিষ্ঠার মূলধনের আস্বাদন পেয়েছিল—তার হিসেব ঠিক দিতে পারে না সে—তবে ওই তিনটে মাসের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল।

বেহিসেবী নারান হিসেবে যতই অক্ষম হোক বাবু, এই হিসেবটা আজ তার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভাবের ঘরে সে চুরি করেছিল—সেই জন্যে বিড়ি বেঁধে ব্যবসা করবার মতলবটা আর ভাল লাগেনি; সে ঠিক করেছিল—একটা বই কিনে পূজোর মন্তর শিখে সে এই চাষীপাড়ায় পুরুতগিরি ক'রে বেড়াবে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী তার অনেক মনে আছে শুনে শুনে।

"সমুচিত মূল্যে হার কিনিলাম দোকানে—হস্তে পদে বাঁধি রাজা আন কি কারণে?" তার পর সেই নৌকো ফিরে আসার খবরে বণিকের কন্যা-প্রসঙ্গে "পাক দিয়ে ফেলে বামা হস্তের প্রসাদ।" এসব তার মুখস্থ আছে। কয়েকটা মন্ত্র তাও কিছু জানে।—ওঁ বিষ্ণু। না, শূদ্রদের বলাতে হয় নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু,। নম অপবিত্র পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা—য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তর শুচি।" হৃদয় জামাই বলতো—তর্পণের সময়—বাপের মায়ের শ্রাদ্ধের শেষে—'জানি না জানি—নে গোসাঁই ফুল পাণি।' বই পেলে বানান

করে ঠিক মুখস্থ করে নেবে। এবং ভাল করেই মুখস্থ ক'রে কাজ করবে সে।

নিজের একটি পুরুত-রূপও কল্পনা করেছিল সে।

গোঁফ-দাড়ি তখনও ঠিক ওঠে নি। উঠলে কামাবে। গলায় পৈতে থাকবে। কোঁচা উল্টে কোমরে গুঁজে কাপড় পরবে। গ্রামে কাঁধে গামছা, ভিন্ন গ্রাম হলে চাদর, বগলে ছাতা। টিকিও একটি রাখবে, তাতে ফুল বাঁধা থাকবে। এ কল্পনায় আশ্চর্য একটি আনন্দ পেয়েছিল সে। তার বাবাকে মনে পড়েছিল। তাঁর এই পোশাক ছিল। এমনি ধরন ছিল। জমিদারের কাছারীতে তাকে বসতে আলাদা আসন দিত। মোড়লপাড়ায় মোড়া দিত। বামুনপাড়া থেকেও পাঁজি দেখাতে আসত।

ওই মানুষকে ভালবাসায় মানুষেরাই কখন তাকে একটি আলাদা আসন দিয়েছে সেটিকে শক্ত কায়েমী করে নেবার ইচ্ছে তাঁর অজ্ঞাতসারেই মনে উঁকি মেরেছিল। এ একটা আশ্চর্য নেশা।

সে একদিন বিশ্ববন্ধুকে বললে—বিশু। তোদের ঘরে পূজোর বই আছে?

তখন তারা দুজনে তুই তুই হয়েছে। বিশু বললে—পূজোর বই?

—হ্যাঁ, যাতে মন্তর আছে। পূজাপদ্ধতি আছে।

—কি করবি?

—মন্তর শিখে পূজো-টুজো করে বেড়াব বাবার মতন। করতে তো কিছু হবে। ভিক্ষেমা —মানে বিপিনদার মা—প্রায়ই বলছে, বাবা বামুন হলে, এবার আমাদের পূজো টুজোগুলি কর। 'জানি না' বলতে লজ্জা লাগে রে!

বিশু বলেছিল—বাবাকে শুধোব। আজকাল তো উসব করি না আমরা। বাবাও করেন নি কখনও। তবে থাকতে পারে। আমার পৈতের পর আমাকে একখানা পড়তে দিয়েছিল। শুধোব তাঁকে।

পরের দিন সন্ধ্যেতে সইমা নিজে এসে তাকে দিয়েছিলেন।—এই নাও বাবা। বই চেয়েছিলে। পূজোর বই। বিশুর বাবারও ঠিক ছিল না, আমি কুলুঙ্গীতে তুলে রেখেছিলাম ঠাকুরঘরে। শেখো বামুনের ছেলে।

পরদিন সকালেই সে কোশাকুশি নিয়ে বই খুলে প্রাতঃসন্ধ্যা করতে বসেছিল। কিন্তু বই পড়ে একবর্ণ বুঝতেও পারেনি—অনুস্বার-বিসর্গ-রেফ যুক্ত বানানগুলো অধিকাংশই পড়তে পারেনি। পড়তে কোন রকমে পারলেও উচ্চারণ হয়নি জিভে।

সন্ধ্যেবেলা বিশুর কাছে পড়িয়ে নিয়েছিল। তাতেও সুবিধে হয়নি। বিশু বলেছিল, দ্বিতীয় ভাগ পড়েছিলি বলছিস—ভুলে গিয়েছিস। আর একবার পড়।

একটু ভেবে সে বলেছিল—হিরণহাটি থেকে একখানা প্রথম ভাগ, একখানা দ্বিতীয় ভাগ, আর একখানা ধারাপাত, একটা শ্লেট-পেন্সিল আমাকে কাল এনে দিস।

বাড়ী গিয়ে একটা টাকা নিয়ে আবার ফিরে তাকে দিয়ে গিয়েছিল।

চার

হঠাৎ—! যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। তা ছাড়া কি বলব? সেই খাটো কাপড়-জামা-পরা সেই মানুষটি, বিনীত শান্ত, আমাকে 'বাবু' বলা মানুষটি বললে—

Of man's first disobedience, and the fruit of that forbidden tree.

গোসাঁই ওই লাইনটা বলে বললে—এর পর এই বাবু! আর কি! ওই যে আরম্ভ হল —প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, আর সামনে বিশ্ববন্ধুর মোটা মোটা বই—বাংলা ইংরেজী তাতে আর রক্ষে থাকে? থামা যায়? জ্ঞান-বৃক্ষের ফল।

অন্যে থামতে পারত—নারান পারলে না। তিন মাসে সে পুজো-পদ্ধতির মন্ত্র পড়তে পারলে ঠিক—কিন্তু বুঝতে পারলে না।

বিশু বললে—আপও একটা দুটো ক্লাসের বইগুলো পড়ে ফেল। বড় হয়ে বুদ্ধি পাকলে পড়তে ক'দিন লাগে, যদি নেশা লাগে!

তার উপর একাল। খবরের কাগজের যুগ। ওই কাগজ নেশা লাগিয়ে দিলে বেশী। তাকে পাকিয়ে দিলে শরৎবাবুর বই। ওঃ, কি নেশা, কি নেশা।

ছ মাসে তখন পুঁজি ফুরিয়েছে—তবে আউস ধান উঠেছে। চার বিঘে জমির দু বিঘে আউশ ধান ভাল হয়েছিল। পেট চলতে লাগল। বিপিনদা বললে—নারানভাই, দু বিঘের এক বিঘেতে ছোলা দাও। পাঁচ কাঠা আলু দাও। বাকীটাতে তরিতরকারি লাগাও। আলু তোমার আমি ভাগে ক'রে দেব।

নারানের চাষে ঝোঁক ছিল, সে উৎসাহ করে লেগে গেল। চাষ আর পড়া। মাঠেই বই হাতে করে গিয়ে পড়ে।

বিপিনদার মায়ের তাগিদে সত্যনারায়ণ ষষ্ঠী লক্ষ্মী মনসা পুজোও করে, কিন্তু মনে একটা খচ্ খচ্ করে, সব মানে এখনও পরিষ্কার নয়।

সে ভর্তি হল হিরণহাটির টোলে—আদ্য পড়বে। টোলে মাইনে লাগে না; কিন্তু ভোরে উঠে যেতে হয়। টোলের পণ্ডিত সকালে টোলে পড়ান, দশটার সময় ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি করেন।

নরঃ নরৌ নরাঃ। শুরু হয়ে গেল।

রাত্রে বিশ্ববন্ধুর কাছে বসে—One morn I met a lame man পড়ে। দুপুরে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র। উনিশশো ছত্রিশ সাল পড়েছে তখন। কিন্তু আর কেউ আসেন নি তখনও। বিভূতিভূষণের নাম শুনেছে সবে। একদিন বিশ্ববন্ধু পথের পাঁচালী আনলে। নারান বইখানা বিলের ধারে বসে পড়েছিল; খুব ভাল লেগেছিল। ওই বিলের জলে আকাশের ছায়া পড়েছিল; ওধারে কিনারার কাছে—কিনারার সবুজ ঘাস বনের ছায়া কাঁপছিল। মধ্যে মধ্যে আকাশে-ওড়া পাখীগুলোর ছায়া জলের হাল্কা ঢেউয়ে বেঁকেচুরে লম্বা হয়ে মিশে গিয়ে ভেসে-যাওয়া মালার মত মনে হচ্ছিল। আমার মনে পড়েছিল দিদির বাড়িতে

আমার ছেলেবেলার কথা।

তারপর বিশু এনেছিল অপরাজিত।

অপরাজিত আমার সঙ্গে মেলে নি।

মনে হয়েছিল, বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে মেলে। সে পরীক্ষা দিচ্ছে—পাশ সে করবেই, ভাল ছেলে। কলেজে পড়তে যাবে। অপুর মতই শান্ত বুদ্ধিমান। তবে এত গরীব নয়। না—তাও মেলে না।

মিলবার সব থেকে বড় বাধা কালটা। অপুর কাল আর আমার বিশুর কালটা আলাদা। বিশুর সঙ্গে অপুর প্রকৃতির কিছুটা মিল থাকলেও সঙ্গে একেবারে মেলে না। অপু রাত্রিতে ঘুমুত। নিশ্চিন্ত নিদ্রা। আমার ঘুম ছিল না। ঘুমের কাল আমার তখন শেষ হয়েছে। জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেলে ঘুম বোধহয় ভাল হয় না। তার উপর ওই কালটা যেন গুমোট গরমের কাল। বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ—দূরে দিগন্তে মেঘ ডাকছে, হাওয়া বয় না—গাছের পাতা স্থির। বাইরে রাত্রে জন্তু-জানোয়ারের কোলাহল, সাপ অবাধগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গর্জন করছে, ব্যাংও চেঁচাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে সাপের দাঁতের জাঁতাকলে পড়ে কাতরাচ্ছে।

উনিশশো ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ সাল। নারানের সে কাল আজও কালকের মত স্পষ্ট। শুধু নারানের ওই গ্রাম, ওই অঞ্চলটিতে নয়—সমস্ত দেশে, বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে—তাই বা কেন—সারা পৃথিবীতে।

দিনের আলোয় ফুলফোটা পাখীর গান-গাওয়া আপন আপন খেয়ালে-খুশিতে কাজে মগ্ন মানুষময় যে অঞ্চল, যে পৃথিবীকে সে দেখেছিল, তার রাত্রির চেহারা দেখতে পেল সে। দেখল মানুষের মধ্যে জানোয়ারের—সাপের ব্যাঙের খরগোশের চেহারা। ব্যভিচার-চুরি-ডাকাতি-মাতলামিতে তারা যেন সবাই মত্ত।

নারান চল্লিশ সাল পর্যন্ত জ্ঞান-বৃক্ষের ফল কেবলই চিবিয়েছে, কেবলই চিবিয়েছে। সংস্কৃতে আদ্য পাশ করেছে, মধ্য পাশ করেছে। কিন্তু উপাধিটা দেয়নি। ভাল লাগল না সংস্কৃত, ভাল লাগল না পুরুতগিরি, পূজকগিরি সংকল্প। সংস্কৃতের সঙ্গে শুধু বাংলা উপন্যাস-গল্প পড়েনি, হাইস্কুলের ক্লাস সেভেন-এইটের পাঠ্য পুস্তকগুলোও পড়েছে। আর খবরের কাগজ। নিত্য নিয়মিত পড়ত। ওদিকে তখন তার জীবনের প্রয়োজন বেড়েছে। পড়ার বই, জামা-কাপড়-স্যাণ্ডেল দরকার হয়েছে, মধ্যে মধ্যে এখান-ওখান যাচ্ছে-আসছে, দু চারজন তার বাড়ীতেও আসছে, কংগ্রেসের কাজ করেন পাশের গ্রামের ধনদাবাবু, তখন গ্রামে এসেছেন—নদীর ওপারে দেবীপুরে শিবডাক্তার কংগ্রেসী থেকে বামপন্থী হয়েছেন। ডিস্ট্রিক বোর্ডের মেম্বারী নিয়ে ঝগড়া করে কংগ্রেস ছেড়েছে ডাক্তার। তার সঙ্গে অজয় হাজরার একদল জমেছে। মধ্যে মধ্যে শহর থেকে হীরালালবাবু আসেন, হরিপদ আসেন, এঁরা মধ্যে মধ্যে আসেন, সেও তাঁদের কাছে যায়। খরচ বেড়েছে, উপার্জন চাই। পুরুতগিরিতে

কুলোয় না, মনও ওঠে না। সে ভেবে-চিন্তে পাঠশালা খুলে বসল।

হেসে গোসাঁই বললে—গণদেবতার দেবু পণ্ডিত একসময় নারানের আদর্শ ছিল।

এতদিনে সে দেখতে পেলে চারিদিকে অন্যায়, চারিদিকে পাপ, পদে পদে মিথ্যাচার, দিনের প্রতিটি ক্ষণ কুটিল চক্রান্তের পাকেপাকে ঘুরছে, প্রবলের গর্জনে, দুর্বলের কান্নায়, হতাশার আক্ষেপে, বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি বাড়ে, ব্যভিচারের উল্লাস প্রমত্ততার কোলাহলের মধ্যে। দুর্বলের কান্নার মত অসহায় মেয়ের অস্ফুট কান্নাও ভেসে আসে, দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপ কালের গুমোটকে বাড়ায়।

এ তো ছিল। কিন্তু এতকাল দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি নারান।

অম্বুবাচীতে লড়াই হয়, কুস্তি। তাতে একটা নারকেল কি একটা কিছু থাকে—সেটা কুস্তি করে জিতে নিতে হয়।

সাঁওতাল মাঝিদের বিয়ের একটা মজার নিয়ম আছে। বিয়ের সম্বন্ধ হল, কথাবার্তা হল। কিন্তু বিয়ে কথাবার্তার পাকা-পাকিতে হয় না। বরপক্ষকে একদিন মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যেতে হয়। ওই কলেশনাথের চড়কের মেলায় নারান প্রথম যেবার দেখে, সেবার তার ভয় লেগেছিল প্রথমটা। লাগবারই কথা। মেলার এক ধারে নাগরদোলায় চড়বে বলে সে দাঁড়িয়ে আছে। নাগরদোলাটা থামল—একটা দোলা থেকে নামল তিনটে সাঁওতাল মেয়ে। তাদের তখন একটু ঘুরনপাক লেগেছে, টলছে আর খিলখিল করে হাসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে সবে। হঠাৎ কোত্থকে দু-তিনটে সাঁওতাল ছুটে এল—তার মধ্যে থেকে একটা জোয়ান মাঝখানের লম্বা মেয়েটাকে ধরে কাঁধে ফেলে ছুটল।

অন্য মেয়ে দুটো চিৎকার করে বাকী মাঝি দুটোর সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিলে—আর চেঁচাতে লাগল। দেখতে দেখতে আর মাঝিরা ছুটে এসে জমল। দুটো দল। একদল এদিকে, আর একদল ওদিকে। কিছুক্ষণ হৈ-চৈ বচসা মারপিটও বটে—হয়ে থেমে গেল। তারপর বসল দুদল মিলে। সেই ছেলেটা মেয়েটা এল। বিচার হল। ওরা ওই ছেলেকে বললে, তু যখন নিয়ে গেলি জোর করে মেয়েটাকে, তখন তু উকে বিয়া কর। কিরে বিটি—বিয়া করবি উকে?

মেয়ে বললে—হুঁ।

ছেলে বললে—হুঁ।

তখন সকলে উঠল—একপক্ষের নিমন্ত্রণে দু'পক্ষ মিলে মদ খেতে, ভোজ খেতে চলে গেল।

নারান সেদিন দেখে খুশী হয়ে খুব হাততালি দিয়েছিল। ভারী ভাল লেগেছিল। কিন্তু তখন আর ভাল লাগত না। সে নারান আর ছিল না। কৌতুক সে তখনও বোধ করত, কিন্তু ওতে প্রেম কোথায়?

লোকের উপকার সে তখনও করত, আগের থেকে বেশী করত। বুদ্ধির সঙ্গে করত। কিন্তু সত্য বলছি বলে নারান আজ বলে, বেশ বিচার করে সমস্ত চিরে চিরে দেখে বলে,

তফাৎ একটু হয়েছে।

এই সব মানুষ, যাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছদ্মবেশে এক একটি জন্তু লুকিয়ে আছে, তাদের মধ্যে সেই যে একা মানুষ, তা হতেই পারে না, সেও জন্তু। কিন্তু সে সিংহ। সিংহ রাজা কিনা, সে বিচারক। সত্যিকারের সিংহের যে প্রকৃতিই হোক, যে স্বভাবই হোক আমাদের শাস্ত্রে তাই বলে।

আমাদের টোলের পণ্ডিতমশায় একটা গল্প বলতেন। ওই, সিংহীর মামা ভোম্বলদাস বাঘ মেরেছি গণ্ডা দশ, হাতীর ভেঙ্গেছি পাশ, ভিজে বাঘ খাবার তরে বনে করেছি বাস। সেই গল্পটা।

একটা লম্বা দাড়িওয়ালা ছাগল—বনে একটা উঁচু পাথরের উপরে বসে ছিল, বর্ষার সময় একটা বাঘ ভিজে গায়ে শীতে এবং ক্ষিধেতে কাতর হয়ে এসে ছাগলটাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। ছাগলটার লম্বা দাড়ির মত এত লম্বা দাড়ি আর সে দেখেনি। তাই সন্দেহ হল। তখন সে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল হুঙ্কার দিয়ে—এত উঁচু পাথরের বাড়ী, অতিঘন চাপদাড়ি, নির্ভয়ে যাস নাড়ি; তুই বেটা কে রে? তখন ছাগলটা বলেছিল—আমি সিংহীর মামা। ভিজে বাঘ খাবার বাসনায় এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বাঘটা নিজে ছিল ভিজে, সুতরাং ভয়ে পালিয়েছিল, কারণ সিংহের মামা! যেতে যেতে ফিরে সিংহের কাছে গিয়ে বলেছিল সমস্ত ঘটনাটা। মহারাজ, আপনার মামার এক অন্যায় বাসনা, ভিজে বাঘ খাবেন। কেন, শুক্‌নো বাঘ খান না। সিংহ ঘটনা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললে—আমার মামা! চল তো দেখি! এসে ছাগলটাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলেছিস তুই বাঘকে? তুই কে? তখন ছাগলটা বলেছিল—মহারাজ, মহতের কর্তব্য দুর্বলকে রক্ষা করা, দুর্বলের একমাত্র আশ্রয় মহদাশ্রয়। শেষ বলেছিল—"বনে সিংহ প্রভাবেন অজাঃ চরন্তি নির্ভয়ে।"

নারান সেদিন মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে দুর্বল মানুষের আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে সিংহ মনে করেছিল।

ঘাড় নেড়ে নেড়ে গোসাঁই বলেছিল—তার ভিতরে শক্তি একটা ছিল। বলেছি তো, ওই শক্তি জিনিসটা মানুষ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু তার তারতম্য যে কেন ঘটে, এ নারান জানে না। কারুর কোন তথ্যই তার মনে লাগে না। উত্তরাধিকার সূত্র ধরেও মূলে যাওয়া যায় না। শক্তি শুধু নয়—তার সঙ্গে প্রবৃত্তি, চরিত্র। নারান শক্তি ও চরিত্রে এমনি হয়ে উঠেছিল। অন্য রকম হতে সে পারে নি। অথবা যার জীবনে দুর্যোগ আসবে কালবৈশাখীর মত, তার এই রকমই হয়।

একটু হেসে গোসাঁই বললে—নারান সে সময় সিংহের কেশরের মত লম্বা লম্বা চুল রেখেছিল, দাড়ি-গোঁফ—তাও রেখেছিল।

* * *

আমি বললাম—গোসাঁই একটা কথা বলব?

সে বললে—বলুন।

বললাম—নারান কি হেরে গেছে?

—তা কেন বলছেন?

আমি বললাম—সে রেড সিগন্যাল জ্বালিয়ে বসে আছে। সে আলোর জ্বলা—বা জ্বলতে লাগা তো এই শুরু হয়েছে। তুমি তাকে ব্যঙ্গ করছ কেন?

একটু চুপ করে থেকে ভেবে নিয়ে সে বললে—না।

—না? জিজ্ঞাসা করে নিলাম আবার—।

সে বললে—ব্যঙ্গ ঠিক করছি না। তবে নারান সম্পর্কে ঠিক কথা বলতে হবে তো? নারান তো সে নারান আর এখন নয়। সে পাল্টালো। একবারে পাল্টালো! সেই পাড়াগাঁয়ের নদী আর বিলের ধারের যে ছেলেটি মাঠে বেড়িয়ে জলে সাঁতার কেটে মোষের পিঠে ঘুমিয়ে বালির উপর শুয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে পরমানন্দে দিন কাটাতো—কোন কিছুতেই দুঃখ পেতো না—এ তো সে নারান নয়। বুদ্ধু-ভুতুমের মত আদিম কালের মানুষের যে খোলসটা তার ছিল—সেটা জ্ঞানের আলো আর যুগের মনের মশালের আগুনে পুড়ে গেল। এখন সে এ যুগের মানুষ, তার কথাবার্তার সুর আলাদা, চোখের চাউনি আলাদা, চলতে গিয়ে পা-ফেলা আলাদা। সব বদলালো। তবে একটা জায়গায় সে পাল্টায় নি—সেটা হল সেই ছেলেবেলায় কাজ করার অভ্যাস। ওতে তার আনন্দ ছিল।

নিজের বাড়ীতে সে একখানা বাইরের বাড়ী গোছের করেছিল। ভিতরের বাড়ীটা ভেঙে চুরে বদলে নতুনই করেছিল এক রকম। তার সব নিজের করা। দেওয়াল, চাল, এমন কি মেলা থেকে তৈরী দরজা-জানালা কিনতে গিয়ে পছন্দ হয় নি, সাইজ করা কাঠ আর ছুতোরের যন্ত্র নিয়ে এসে সুন্দর ক'রে লাগিয়েছিল। একটা পুকুর ছিল, সেটাকে জমা থেকে ছাড়িয়ে মাছ ফেলেছিল; নিজে জাল বুনে নিজেই মাছ ধরত। তবে—।

একটু ভেবে নিয়ে গোসাঁই বললে, তবে বলতে বলতে বিচারও করছি তো নারানের। মানুষের শক্তির সীমা আছে একটা—সেই সীমাই তার অধিকার। তার বাইরে যাওয়াও তো অপরাধ। অপরাধ না হোক, চুক তো বটেই। সেই চুকে তো মার খেতেই হবে। হবে না?

মানুষ অহঙ্কারে ওই জ্ঞানটা হারায়। নারানও জ্ঞান হারিয়েছিল অহঙ্কারে। সেটা না বললে তো সত্য বলা হবে না। নারান যখন সে চুক-ভুল করেছিল, তখন সেটা না বললে চলবে কেন? জ্ঞান মানুষ ইচ্ছে করে হারায় না, আপনার অজ্ঞাতেই হারায়, ভুল করে হারায়। অথবা নারানই ঠিক করেছিল, বিবেচক লোকেরা বা শাস্ত্রে যে বলে নিজের শক্তির পরিমাণ ক'রে তবে শক্ত কাজে পা বাড়িয়ো, প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে সামনে দাঁড়িয়ো—ওই কথাটাই ভুল। মানুষ দাঁড়িয়ে পড়বে, তারপর শক্তি কম হয় হারবে কিম্বা মরবে, এইটেই স্বাভাবিক।

ভুল হোক ঠিক হোক, মানুষের স্বভাবে সে এটা করেছিল। অন্যায় যখন দেখতে পেলে,

তখন সর্বত্র সকল মানুষের মধ্যেই অন্যায় দেখতে পেলে। রায় মশায় থেকে ডোম-বাগ্দী সকলের মধ্যেই দেখলে এই অন্যায়। ঘাটবলরামপুর থেকে সারা দেশে দেখলে এই অন্যায়, এই অধর্ম ছড়ানো রয়েছে। কোথা থেকে শুরু—।

গোসাঁই একটু চুপ ক'রে ভেবে নিয়ে বললে—হৃদয়ের অন্যায়টা প্রথম। তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শুরু। না—তার থেকেও আগে সেই আম-জামের বাগানে বাবুদের ল্যাংপেণ্ডে কামুক ছেলেটার বন্দুক কেড়ে নিয়ে শুরু। তবে ও দুটো ঘটনা ঠিক নতুন নারানের নয়। এমন কি এখানে এসে কিছু দিন যে ভোরবেলা উঠে গিয়ে বিলের ধারে টিন বাজিয়ে হাঁসগুলো জাগিয়ে দিতো, উড়িয়ে দিতো, সেটাও নয়। এই সময় দু-চার দিন দু-দশজন শিকারীর সঙ্গে তার ঝগড়াও হয়েছে। সে বলেছে—আমি টিন বাজিয়ে গান করছি।

তারা বলেছে—গ্রাম ছেড়ে এখানে টিন বাজিয়ে গান করতে এসেছ—।

সে বলেছে—আপনারা নিজের বাড়ী ছেড়ে এখানে বন্দুক ছুঁড়ে হাঁস মারতে এসেছেন—আমিও এখানে গান করতে এসেছি। দেখুন না—কেমন চারদিকে বাজনাটা বাজাতে বাজাতে চলে যায়।

সেও ঠিক পড়ে না এর মধ্যে।

পড়ল যখন, তখন আর টিন বাজাতো না। তখন শিকারী এসেছে খবর পেলেই সে দৌড়ে আসত এবং তাঁদের কাছে গিয়ে গম্ভীরভাবে বলত—আপনাদিগে একটা কথা বলব?

তারা তার দিকে তাকাতো। সে বলত—কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—সে অনেক দূর থেকে।

—অনেক দূর থেকে এই নিরীহ পাখীগুলোকে মারতে এসেছেন, এরা আপনার তো কোন ক্ষতি করে নি!

শিকারীরা প্রথমেই হতবাক হয়ে যেত। সত্যি তো তেমন অভিযোগ তো করতে তারা পারে না। তারপর বলত—হাঁসগুলো কি তোমার?

—না। আমার কেন হবে।

—তবে?

—তবে ওদের মারবেন কেন?

—বেশ করব।

তখন সে মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে হাঁসগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে বলত—আমিও তা হ'লে উড়িয়ে দিলাম।

কত জনেরা ফিরে যেত; কত জনেরা ওরই মধ্যে শিকার করত। দু দলে তিন দলে ভাগ হয়ে দু তিন দিকে ভাল হয়ে গিয়ে এদিক থেকে ওদিক হাঁসগুলো গেলে—আকাশে উড়ন্ত ঝাঁকে গুলি করত। অনেক মিস্ যেত। দু-চারটে গুলিতে দু-চারটে মরত, আবার দশ-বারোটাও মরত।

একবার সায়েব, মানে সদর থেকে সার্কেল-অফিসার এস্ ডি. ও. এসেছিল, সঙ্গে ছিল থানার

দারোগা। সে খবর পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলতে সাহস হয় নি। সারাক্ষণই কিন্তু একটু দূরে থেকে পাশে পাশে বেরিয়েছিল। মনে মনে অনুশোচনার শেষ ছিল না নিজের কাপুরুষতার জন্য।

ঘণ্টা দুই ঘুরে সায়েবরা বসেছিল চা খেতে। ফ্লাস্কে চা ছিল, টিফিন কেরিয়ারে বিস্কুট ছিল, খাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় এস ডি ও. বার-কতক তার দিকে তাকিয়ে ডেকেছিল—এই শোন।

সে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেছিল—বুকের ভিতর একটা ধড়পড়ানির শেষ ছিল না। এস. ডি ও. বলেছিল—দেখছি সেই গোড়া থেকেই সঙ্গে ঘুরছ। কেন? কিছু বলবার আছে?

এস. ডি. ও. ভেবেছিল কোন দরকার আছে ব্যক্তিটির। এমন থাকে।

সে বলেছিল, স্যার! যদি মনে না করেন তো বলি?

চমকেছিল এস ডি. ও.।—কি মনে করব?

—আজ্ঞে, এই নিরীহ জীবগুলিকে মারছেন—কি অপরাধ করেছে ওরা?

—হোয়াট! কি? কি? তারপর হেসে উঠেছিল হা-হা শব্দে। তারপর নিজেই উচ্চারণ করেছিল—সে যা বলেছে—তাকে আর হোয়াটের উত্তরে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সায়েবের সঙ্গীরা এবার হা-হা শব্দে হাসতে শুরু করেছিল। একজন বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল! নিরীহ জীব—হা-হা হা-হা।

সে আর থামে না। কিন্তু এস.ডি ও. গলা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিতেই সে ইঙ্গিত বুঝে থেমেছিল। সায়েব এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম?

ভয় হয়েছিল নারানের। অনুশোচনা হয়েছিল—কেন সে বলতে গেল? তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল—আজ্ঞে, শ্রীনারায়ণ গোস্বামী।

—গোস্বামী! বৈষ্ণব? তিলক-কণ্ঠী কই?

—আজ্ঞে না।

—তবে গান্ধাইট? গান্ধী-শিষ্য?

—আজ্ঞে না। তবে ভক্তি করি তাঁকে। নমস্কার করেছিল সে। কথা বলতে বলতে ভয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই হয়। কেউ কথা বলতে বলতে ভেঙ্গে যায়। কেউ সাহস পায়। নারান ভাঙ্গার মত ধাতুতে গড়া নয়। সে সাহস পেয়েছিল। তাই নমস্কারও করতে পেরেছিল।

এস. ডি. ও. বলেছিল—হুঁ। কি করা হয়?

—আজ্ঞে, একটি পাঠশালা করেছি। আর, এই পুরুত-টুরুতের কাজ-টাজ করি।

—মাছ মাংস খাও?

—মাছ খাই। মাংস খাই না।

—কিন্তু মাছ কেন খাও? তারা কি অপরাধ করেছে? এস. ডি. ও-র কথা বলার ভঙ্গি দেখে সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠেছিল। দারোগার হো-হো শব্দে হাসতে মানা—সে

মুখ ফিরিয়ে মুচকে হেসেছিল।

সে হাত জোড় ক'রে বলেছিল—আজ্ঞে, ওটা দেশে এমন চলিত হয়ে গিয়েছে যে, মনে থাকে না—মনে হয় না। তবে অন্যায় বটে স্বীকার করছি। আজ থেকে মাছ আর খাব না, আপনার সামনে বললাম।

সে উঠে চলে এসেছিল একটি নমস্কার ক'রে। কিন্তু সেই দিন থেকে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেছিল।

এখানেই নারানের জীবনের ভবিষ্যতের বীজটি তার অজ্ঞাতসারেই বিধাতা টুপ করে ওই বিলের ওই উর্বর জমিতে ফেলে দিয়েছিলেন; বীজটি হয়তো তারই পায়ের চাপে মাটিতে বসে গিয়েছিল।

ওই বিলের ধারেই পরিচয় হয়েছিল ভূতনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে। সেদিন সে ভোর রাত্রে উঠে বিলের ওপাশের গাঁয়ে গিয়েছিল। সীতাহাটির মফেজ সেখের কাছে। কার্তিকের শেষ। রবিফসলের জন্যে জমি চাষ দিয়ে বীজের ভাঁড় হাঁড়ি দেখতে গিয়ে কাল দেখতে পেয়েছে ভাল মটরশুঁটির বীজগুলি সব আরসোলায় খেয়ে নষ্ট করেছে। এফোঁড়-ওফোঁড় করে করে কুরে কুরে খেয়েছে। বড় আপসোস হয়েছিল। এ বীজ সে গতবার বিশ্ববন্ধুকে লিখে কলকাতা থেকে এনে পত্তন করেছিল। এবার বেশী জমিতে দেবে। কিন্তু বীজ শেষ। বিশ্ববন্ধুকে লিখে কলকাতা থেকে আনিয়ে বোনা—সে অনেক দেরি হয়ে যাবে। মনে পড়ল—আধ সের বীজ সে সীতাহাটির মফেজ সেখকে দিয়েছিল। সেখ বড় ভাল চাষী। সে চেয়েছিল, ও-ও দিয়েছিল। রাত্রে শুয়ে মনে হয়েছিল শেষ রাত্রে উঠে মফেজের কাজে যাবে—যদি আধ পোয়া এক পোয়াও দেয়, তবে যত্ন কার খানা করে দেবে। পত্তনটা থাকবে। তারপর বিশ্বরন্ধুকে লিখবে—যদি সময়ে বীজ পাঠায় তখন দেখা যাবে। মফেজের কাছে বীজ নিয়েই সে ফিরছিল। সকাল সাতটা তখন। সূর্য উঠেছে। মিষ্টি রোদ আধ-পাকা আধ-কাঁচা আমন ধানগুলির উপর পাতলা সোনালী চাদরের মত পড়ে আছে। ধানগাছগুলির শীষে পাতায় শিশির লেগে রয়েছে, বিন্দু বিন্দু হয়ে রোদে ঝরছে। আকাশে হাজারে হাজারে পাখী উড়ছে। কালো-সাদা বিন্দুর মত। পঙ্গপালের ঝাঁক মনে হচ্ছে। এবার হাঁস এসেছে বেশী। এই হাঁস আসার সময়। আশ্বিনের শেষ হতে আসে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল সে। একটা কঠিন শব্দের রেশ ছুটে চলে আসছে ক্ষীণ হ'তে হ'তে, তাকে পার হয়ে চলে গেল; চলে ওই যাচ্ছে, সীতাহাটির বাইরের জঙ্গলের গাছপালার পাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে।—ওই—ওই আবার।—ঠু-ই।—একটা শনশনানির সঙ্গে শব্দটা ছড়িয়ে চারিদিকে ছুটছে—তার দিকেও আসছে। আবার।

তার রাগ হল। আবার আজ ব্যাধ এসেছে। ব্যাধই বটে। না, ব্যাধের থেকেও খারাপ, ঘৃণ্য। ব্যাধের হল জীবিকা—বৃত্তি। এই করেই খায়। মাংস বিক্রী করে। আর এরা—পেট ভরাবার জন্য নয়, ক্ষুধার দায়ে নয়—রসনার তৃপ্তির জন্যে আর হিংসার কৌতুকে এদের হত্যা করে। মনে তার জোরটা এবার বেশী। মাছও সে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং

বলবার অধিকারটা তার যেন বেড়েছে। হন-হন করে পা চালিয়ে এসে সে বিলের ধারে দাঁড়াল। আকাশে পাখীগুলো আর বিন্দুর মত বা পঙ্গপালের মত মনে হচ্ছে না। কিন্তু কই ? ব্যাধেরা কই ?

—দু-ম। শব্দ উঠল, ছড়াচ্ছে শব্দটা জলের বুকের উপর দিয়ে। ওই—ওপারে বড় বড় ঘাস জঙ্গলের মধ্যে মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে।

আকাশ থেকে নীচের দিকে মুখ করে তিনটে পাখী পড়ছে। ঝাঁকের পাখীরা ক্যাঁও-ক্যাঁও শব্দ করে পাক দিয়ে বাঁক নিচ্ছে।

—দু-ম। আবার।

ওঃ—এবার আট-দশটা পাখী নীচের দিকে পড়ছে। যেন ঝরে পড়ছে। সে ছুটল। ছুটে এসে ঘাস জঙ্গলটার সামনে এসে দাঁড়াল। তখন বাবুরা বেরিয়ে এসে সিগারেট খাচ্ছে—আর কয়েকজন লোক জলে নামছে, ক'জন মাঠে মাঠে ছুটছে পড়ে-যাওয়া পাখীগুলোকে কুড়িয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল, এ যে বেশীর ভাগ ঘাটবলরামপুরের লোক। রায়বাড়ীর কর্মচারী, তাদের পাইক, বড় রায়ের সম্পর্কে ভাইপো হরেন রায়—ভট্চাজবাড়ীর বিশ্ববন্ধুর জাঠতুতো ভাই দীনবন্ধু, ওপারের অজয় হাজরা—থিয়েটার করে, কংগ্রেস করে, এমন কি ডাক্তার শিবু চাটুজ্জে, বামপন্থী লীডার—সেও রয়েছে।

অজয় হাজরা বললে—এই এসেছে। আমরা বলাবলি করছিলাম। তোমার বাড়ী হয়ে এসেছি, ভেবেছিলাম—পারমিশনটা নিয়ে আসব।

সে তাকিয়েছিল কেন্দ্রের লোকটির দিকে। একটু কালো—হ্যাঁ, কালোই বলতে হবে, কালো দোহারা পরিমার্জিত চেহারা একটি তিরিশ-বত্রিশ বছরের যুবা, পরনে মিহি ধুতি, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, শহরের সভ্যতা অনুযায়ী লম্বা রুক্ষ চুল, বন্দুক হাতে, সিগারেট মুখে—দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

অনুমানে চিনতে তার দেরি হল না। ইনি তা হলে বড় রায়ের জামাই। ভাল ঘরের ছেলে, শিক্ষিত মানুষ, গ্র্যাজুয়েট, কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন। রায়ের অনেক সম্পদ, অনেক সম্পত্তি, এবং সন্তান ওই একমাত্র কন্যা। এঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এঁকে ঘরের ছেলের মত রাখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা থাকেননি ভূতনাথ। রায়ের গ্রাম্য স্বভাব এবং অতিহিসাবী সংসারের মধ্যে থাকতে পারেননি। তিনি কলকাতায় ছিলেন। আগে মধ্যে মধ্যে আসতেন জামাইয়ের মত। কিন্তু মধ্যে কি হয়েছিল—যার জন্য কয়েক বৎসর একেবারেই আসেননি। জামাই কলকাতাতে যখন থাকতেন, তখন মেয়ে এখানে থাকত, দেশে এলে—মেয়ে যেত শ্বশুরবাড়ী। কয়েকবার মেয়েও কলকাতা গেছে। এবার শ্বশুরের সঙ্গে মিটমাট হয়েছে, ভূত-নাথ শ্বশুরবাড়ী এসেছেন। কথাটা সে শুনেছিল। এঁরই কাছে থাকবার জন্য বলেছিলেন রায় মশাই। সে তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকল—কিন্তু গ্রামের জামাই অনেক দিন পর এসেছেন—তাকে কি বলবে—কি বলা উচিত, বুঝতে পারছিল না।

শিবু ডাক্তার তার দৃষ্টি দেখে বললে—কে জান ?

সে একটু হেসে বললে—তা চিনেছি। রায় মশায়ের জামাই। নমস্কার করল সে।

ভূতনাথ বললেন—আমার নাম ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনি রায় মশায়ের জামাই, আমাদের ঘাটবলরামপুরের সবারই আদরের মানুষ। জামাইবাবু।

শিবু ডাক্তার বললে—এর ওপর আপনার কিছু বলার নেই।

হেসে ভূতনাথ বলেছিলেন—তা নেই। তারপর বলেছিলেন—তুমি নাকি এখানকার হংসরক্ষক। কিন্তু কেন? হাঁসের উপর এত মায়া কেন?

হেসে সে বলেছিল—নিরীহ পাখী। আপনার আনন্দে থাকে, কলকল করে—মায়া হয়, দেখতে ভাল লাগে। কোন অনিষ্টও করে না। এই আর কি।

—তুমিও মাছও ছেড়ে দিয়েছ শুনলাম। মাছ-পাঁঠার কথা তোমার সঙ্গে চলবে না। কিন্তু কত ধান ওরা খায় বল তো? এই তো সারা রাত টিন বাজিয়ে হাঁস তাড়ায় লোকেরা।

তা বটে। এটা এতদিনেও ভাবেনি নারান। কিন্তু উত্তর সে সঙ্গে সঙ্গেই পেলে—এবং দিলে—তা খায়। বলছি না। কিন্তু কতটুকু খায় বলুন? কত খায়? এই এত বড় মাঠ, শুধু এ মাঠই নয়—দেশের মাঠে দু-চার মুঠো করে খেয়ে বাঁচে।

—বাঃ! বেশ বলেছ। আমি আরও খুশী হতাম—যদি বলতে মানুষ যেভাবে নানান কৌশলে আইনের জোরে গরীব মানুষগুলোকে সর্বস্বান্ত করে, চাষ করে ফলানো ধান কেড়ে নেয়—তার তুলনায় এরা কতটুকু খায়? তাদের কি করছেন?

নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভূতনাথবাবু কি শ্বশুরের কথা বলছেন?

ভূতনাথ হেসে আবার বলেছিলেন—গোসাঁই অবাক হয়েছে শিববাবু।

নারান বলেছিল—তা একটু হলাম স্যার।

—কিন্তু আমি তো জামাই—ছেলে তো নই। তা ছাড়া মানুষ যখন, তখন সত্যি কথাটা বলতে হবে।

—আপনি প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ।

—তুমিও ছোট মানুষ নও গোসাঁই। সব শুনেছি আমি। খুব ভাল লেগেছে। তা হাঁস মারতে বারণ তুমি করতে পার। অন্তত আমি আর মারব না। তবে কি জান গোসাঁই জীবে দয়ার মানেও হয় না, পরিণামও ভাল নয়। ন্যাড়া-নেড়ীর দল বাড়ে। ক্ষাত্রশক্তি না থাকলে চলে? না, থাকলে এই আমাদের অবস্থা হয়? বিদেশীর পায়ের তলায় থাকতে হয়?

এই সময়ে রায়বাড়ীর পাইক এবং স্থানীয় মজুরশ্রেণীর লোকেরা ফিরে এসে মরা হাঁস-গুলোকে নামিয়ে দিলে। গোটা কুড়ি হাঁস। কয়েকটা হাঁস তখনও জীবিত ছিল—মিট-মিট করে তাকাচ্ছিল।

তাদের দিকে তাকিয়ে নারান বলেছিল—আমি যাই। নমস্কার।

—যাবে? কষ্ট হচ্ছে? তা যাও। ও দেখে আমারও কষ্ট হয়। যাও। হ্যাঁ শোন, রাত্রে আমার ওখানে—না খেতে হবে না—এস। বুঝেছ? কথা বলব। আমার বাচ্চা দুটোকে পড়াবার লোক খুঁজছিলাম। তুমিই পড়াও। এস, বুঝলে।

মানুষটিকে ভাল লেগেছিল নারানের। বেশ মানুষ। বড়লোকের জামাই হয়েও একালের মানুষ। এবং বেশ খোলা মানুষ। রাত্রে মদ নিয়ে বসেছিলেন ভূতনাথবাবু—নারানকে দেখে সংকোচ করেননি। বলেছিলেন—নারান, আমি বাপু মদ খাই, নিয়মিত একটু করে খাই। বন্ধুবান্ধব জমলে কোন কোন দিন বেশীও খাই। কিন্তু লুকনো আমার নীতিবিরুদ্ধ বুঝলে। কংগ্রেসকেও ভালবাসি, মেম্বরও বটে—জেল যেতে প্রস্তুত আছি, জেল কেন ফাঁসি যেতেও ভয় নেই; গান্ধীজীকেও ভক্তি করি। কিন্তু মদ খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়, তা মানি না। তোমার যদি ঘেন্না হয়, বসতে বলব না, কাল সকালে এস। তা যদি না হয়, তবে বস। কথা বলি।

সে হেসে বলেছিল—না-না—না। ঘেন্না হবে কেন? তা করব কেন? বলে সে বসেছিল।

সেইদিনই ভূতনাথ চাটুজ্জে পাঁচ টাকা মাইনেতে তাকে ছেলে দুটির প্রাইভেট মাস্টার নিযুক্ত করেছিলেন—মাইনে আমি দেব—আমার স্ত্রীর কাছে পাবে। ওই সুদের টাকা, মানুষ-চোষা ধানের দাম থেকে নয়। পরিষ্কার টাকা, কোথাও তার লালচে দাগ নাই।

অজয় হাজরা এবং আর ক'জন ভাম হয়ে বসেছিল।

* * *

বুনো হাঁস নিয়ে যেচে পরের সঙ্গে—যে এস. ডি. ও. পর্যন্ত—ঝগড়া না হোক, ওই জাতীয় কিছু করতে পারে এবং হাঁস মারা বারণ করবার জন্যে মাছ পর্যন্ত ছাড়তে পারে—লোকে তাকে বলে পাগল। অর্থাৎ অসুস্থমস্তিষ্ক। আর, পাগলই যদি হয়, তবে সে সেই ঝগড়াটে পাগল, যে শুচিবাইগ্রস্তের অশুচি বস্তু খুঁজে বেড়াবার মত অন্যায় খুঁজে খুঁজে ঝগড়া করে।

সে অসাধারণ মানুষ হতে পারে—আবার, সম্বলহীন প্রতিষ্ঠাকামীও হতে পারে। ন্যায়-বাদী হওয়ার মত এমন প্রতিষ্ঠার সোজা পথ তো আর নেই। ওটা অন্তর থেকে অকৃত্রিমও হতে পারে। আবার প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা থেকেও ওটা জন্মাতে পারে। নারানের কি হয়েছিল—তা আপনি বিচার করে নেবেন।

নারানও ভেবে ঠিক করতে পারে না। সময় সময় ধাঁধা লাগে। তবে শালগ্রাম ছুঁয়ে সে অনেকবার নিজের কাছেই নিজে বলেছে—না, প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা থেকে নয়—নয়—নয়। তবু সন্দেহ আছে। প্রতিষ্ঠা-কামনাও ছিল বই কি—নিশ্চয় ছিল।

মানুষকে ভালবাসত—তা থেকে তার ইচ্ছা হয়েছিল, মানুষকে ভাল করবে। মানুষের উপর—নিরীহ মানুষের উপর যে যেখানে অন্যায় করবে—তার প্রতিবাদ সে করবে—করবে—করবে। সেটা প্রতিষ্ঠা-কামনা থেকেও হতে পারে—কিছুটা তো বটেই। তা থেকেই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। দোষ না গুণ তা নিয়ে সে আজ মিছে মাথা ঘামায়। হয়তো দুঃখে। কিম্বা রাগে।

সে সময় এ বিচার করবার সময় তার ছিল না—একটা প্রবল বন্যার মত আবেগের বন্যায় চলেছিল সে। তখন ভরা যৌবন তার। বয়স পূর্ণ কুড়ি। ১৯৪০ সাল। কাল অনুকূল। দৃকপাত করে নি। নইলে সে বিপিনের সঙ্গে ঝগড়া করে? সেদিন সকালে উঠেই বিপিনের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে সে ছুটে গিয়েছিল—কি হ'ল? বিপিনের সঙ্গে মায়ের আজকাল প্রায় ঝগড়া হচ্ছে। বিপিনের মা আজকাল ক্রমাগত আক্ষেপ করছে—আমার কিছু হ'ল না। জীবনটা বৃথাই গেল। রাঁড়ী-কুঁড়িরা তীর্থ করে এল—কাশী গয়া পেরাগ বিন্দাবন মথুরা পর্যন্ত। একশোটা টাকা তাদের জুটল—আমার জুটল না।

গ্রামের কয়েক জন মেয়ে তীর্থের সেথো-পাণ্ডার সঙ্গে তীর্থ করে এসেছে; তার মধ্য দুজন সন্তান-সন্ততিহীনা বিধবা ছিল; তারা সারাটা জীবন খেটে-খুটে কিছু জমিয়ে তীর্থ করে মাথা কামিয়ে বাড়ি ফিরেছে—কিন্তু বিপিনের সঙ্গতি থাকতেও তার মায়ের যাওয়া হয় নি। বিপিনের মায়ের হাতের টাকা পর্যন্ত সে ছেলেকে দিয়েছে। তাতে বিপিনের দোষ নেই। তীর্থ যাওয়ার হজুগ উঠবার দু'মাস আগে জমি বিক্রি করেছিল বিপিনেরই জাঠতুতো ভাই হরিশ। বিপিনের পিতামহের জমি। বিপিনের মা বউ হয়ে এসেছিল দশ বছর বয়েসে—তখন এক সংসার। সে সময় বিপিনের মা ওই জমি থেকে কাঁকুড় খেঁড়ো তুলে এনেছে। জমিটায় খেঁড়ো কাঁকুড় ভাল হয়। ওই জমি হরিশ বিক্রী করবে শুনে, বিপিনের মা নিজেই ছেলেকে বলেছিল—ওটা যেমন করে হোক কেন্। জমিটা বড় বাকুড়িও বটে, মাপে দেড় বিঘের উপর। হরিশ জ্ঞাতিকে দিতে চায় নি। খদ্দেরও দাঁড়িয়েছিল পাঁচটা। ফলে দেড়বিঘে জমির দাম উঠে গেল চারশো টাকা। তার উপর তখন রেজেস্ট্রী অফিসে জমিদারের প্রাপ্য শতকরা কুড়িটাকা সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করতে হবে। রেজিস্ট্রী-খরচা আছে। পাঁচশো টাকার উপর চলে যাবে। বিপিনের হাতে তিনশো টাকার বেশি ছিল না। মা নিজে থেকে তার সম্বল দুশো টাকা বের করে দিয়েছিল। জমি কেনা হল। কিন্তু এর ঠিক মাস দুয়েক পরেই ঝুলনের সময় বৃন্দাবনের পাণ্ডা এসে যাত্রী সংগ্রহ করতে লাগল, এ গ্রামের ওই দুটি বিধবাই হল অগ্রণী—তারা আর কয়েকজনকে জোটালে। বিপিনের মা তখন টাকা চাইলে—ছেলেকে। ছেলে বললে—এখন এই বর্ষার সময় টাকা কোথা পাব আমি?

—ধান বেচ।

—ধান বেচব তো খাব কি? তা ছাড়া ক'বিশ ধান আছে? বেচলে তো একশো টাকাও হবে না।

মাকে তখন নারানই বুঝিয়েছিল! নারান বিপিনের মায়ের ভিক্ষেপুত্র তার উপর পূজো-আর্চা করে দেয়। সব থেকে বড় কথা—নারানের এখন মান্য হয়েছে। সকলে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভালবাসে। আগে যেটা স্নেহ ছিল, এখন সেটা সম্ভ্রম।

মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—আসছে বছর ধান উঠলেই বিপিন টাকা দেবে। এবং সে নিজে ব্যবস্থা করে তাকে তীর্থে পাঠিয়ে দেবে।

মা বলেছিল—তার আগেই যদি মরে যাই বাবা।

নারান বলেছিল—তা যাবে না—আমি বলছি।

—তুমি বললেই যদি হয় বাবা তাহলে তো হতো। তা তো হয় না। আমার মন বলছে—এ বছর আমি পার হব না।

নারান বলেছিল—তার এবার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল,—বলেছিল—তাই যদি হয় ভিক্ষেমা, মরেই যদি যাও, তবে স্বগ্‌গে গিয়ে পাথরের ঠাকুরের বদল সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখবে।

অবাক হয়ে গিয়েছিল ভিক্ষেমা।

অভিমানে বৃদ্ধার চোখে জল এসেছিল, সজল চোখে বলেছিল—তুমি এই কথা বললে বাবা?

—কেন? কি অন্যায় বললাম? আমি বলছি দেখতে তুমি ভগবানকে পাবেই, দেখবেই।

খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল। বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—ছেলে ভুলাচ্ছ বাবা?

—না, ছেলে ভোলাই নাই। শোন। শাস্ত্রের কথা। এক গ্রামে দু'জন লোক ছিল। একজন বড়লোক—অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি। অনেক টাকা সম্পত্তি সহজে হয় না, সোজা পথে হয় না—সে দেখতে পাচ্ছো। তার জন্যে লোক ঠকাতে হয়। পরের পাওনা ফাঁকি দিতে হয়; নিজের পাওনা সুদের সুদ তস্য সুদে বাড়িয়ে অঙ্ক ভুল ক'রে দেনাদারকে সর্বস্বান্ত ক'রে আদায় করতে হয়। অনেক কিছু করতে হয়। দু টাকা গরীবকে ধার দিয়ে দশ টাকা দাবী করে—পঁচিশ টাকার গাইটা নিয়ে পাইকারকে বিক্রী করতে হয়।

ওই বিধবাদের একজনের কথা কৌশলে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নারান।

গল্পের উপর ভিক্ষেমার প্রত্যয় তাতে বেড়েছিল। তার সঙ্গে আরও অন্য বিত্তশালীদের প্রতিও ইঙ্গিত করেছিল। সে রায়বাড়ী থেকে ভটচাজবাড়ী পর্যন্ত।

তারপর বলেছিল—আর একজন ছিল—ধার্মিক গৃহস্থ। সংসার কর্ম করত, নিজের ন্যায্য পাওনাটিই নিত। ন্যায্য দেনাটি পাই পয়সা মেটাতো। যথাসময়ে ভগবানকে ডাকত। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিত। মিষ্টি কথা বলত। গরীব দুঃখীর দুঃখে-কষ্টে চোখের জল ফেলত। খাবার সময় ক্ষুধার্ত এলে—নিজের ভাতটি—তাকে দুমুঠো দিয়ে নিজে একমুঠো খেতো।

এখন বড়লোক বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করলে, পুরুত রেখে দিলে, কিন্তু নিজে বড় যেত না—দেখত না। ঘরে গরু আছে, মান্দের আছে। আস্তাবলে ঘোড়া আছে, সহিস আছে—ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর আছে, পুরুত আছে। আর এ লোকটি ঘরে ঘট পেতে পট টাঙিয়ে নিজে ফুল দেয়, চন্দন দেয়, জল দেয়। নিজে যা খাবে—তাই ঠাকুরকে আগে ভোগ দিয়ে খায়।

বড়লোক শেষ বয়সে তীর্থে গেল। এর আর যাওয়া হল না। তা ঘরের পটেই প্রণাম ক'রে বলল—তুমিই আমার সর্বতীর্থ।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা হব-হব, এমন সময় একটি অনাথ ছেলে এসে ওই বড় বাড়ীতে গিয়ে বললে—বাবা, সারা দিন কিছু খাইনি—আর আমার আশ্রয় নাই। দুটো খাবার—আর রাত্রে একটু থাকতে পাব?

বড়লোক বললে—না না, কোথাকার চোর না ছ্যাঁচড়। রাত্রের জায়গা হবে না। আর, খাবার এ অসময়ে সন্ধ্যেবেলা কোথায় পাব? যাও ভাগো।

অনাথ ছেলেটি মুখ চুন করে ক্ষিদেতে কাতর হয়ে আসছে, পথে সেই গৃহস্থটির সঙ্গে দেখা। গৃহস্থ বলল—হ্যাঁ বাবা মানিক, এমন মুখ চুন কেন রে? ছেলে বললে—বাবা, আমি অনাথ, এই চেয়ে-চিন্তে খাই, লোকের দাওয়ায় রাত কাটাই; তা, আজ আর আহারও জোটে নি, আশ্রয়ও না। রাত্রে যে কোথায় থাকব, কি খাব—তা জানি না।

গৃহস্থ বললে—এস বাবা, আমার বাড়ী এস। এইখানে থাকবে। এইখানে খাবে। নিয়ে গিয়ে একটু গুড়, একঘটি জল দিলে। বললে, ব'স বাবা, রান্না হোক, খাবে। রান্না হ'ল—খাওয়ালে ছেলেটিকে ডেকে—তারপর বিছানা করে দিলে। ছেলেটি শুলো।

ওদিকে বড়লোকের বাড়ীতে এল—ঠিক সন্ধ্যের মুখে এক হিন্দুস্থানী, হাতে লাঠি, এই গোঁফ, এই পাগড়ি। বললে—আমি গয়ার পাণ্ডার লোক, সেখানে আপনি গিয়েছিলেন, এই আংটিটা ফেলে এসেছিলেন, পাণ্ডাজী পাঠিয়ে দিলেন। নিয়ে আসছি।

আংটি দেখে চমকে উঠল বড়লোক—এ যে হীরের আংটি! কিন্তু তার নয়। তবু লোভ সামলাতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ। তা, ব'স। থাক। ওরে পাণ্ডাজীর লোককে থাকবার জায়গা দে, ময়দা দে, ঘিউ দে। কাঠ দে। মিঠাই এনে দে।

রাত্রি দুপুর, তখন গৃহস্থের মনে হল, যেন কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে, পদ্মগন্ধ উঠছে—আর একটা খুব জ্যোতি চোখে লাগছে। চোখ খুলে ফেললে, দেখলে সেই অনাথ ছেলে—মাথায় চূড়া, হাত বাঁশী—হাসছে, বলছে—চল, আমি যে নিতে এসেছি তোমাকে। ওঠ, রথ এসেছে। চল। গৃহস্থ রথে চড়লেন। রথ চলল। গাঁয়ের ওপাশে রথটা গিয়েছে—তখন গৃহস্থ দেখছেন—বড়লোকের বাড়ী থেকে একজন এই জোয়ান এই গোঁফ, এই পাগড়ী, হাতে লাঠি—বড়লোকটির চুলের মুঠো ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলছে—অন্ধকারের দিকে।

গৃহস্থের সঙ্গে ভগবান ছিলেন। তিনি হাসলেন। বললেন—গয়ার প্রেতশিলা থেকে যম প্রেতদূত পাঠিয়েছে।

গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করলে—কেন ভগবান, ও তো অনেক তীর্থ করেছে, বাড়ীতে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছে—আর আমি—

ভগবান বললেন—আমি স্বর্গেও থাকি না—বৈকুণ্ঠেও না—তীর্থেও থাকি না। ভক্ত, আমি তোমার মনেই যে চিরকাল বাস করছি। এবার চল তুমি আমার মনে আমার বুকে বাস করবে।

বৃদ্ধা একমুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল। সব সত্য বলে মনে করেছিল।

নারান?

গোসাঁই যেন নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিল—নারান? উত্তর দিয়েছিল নিজেই—নারান তখনও নিজে ঠিক নাস্তিক হয়ে ওঠেনি, কিন্তু এ গল্পটা সে বানিয়ে বুড়ীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিল। তবে—। হ্যাঁ। তবে মিথ্যে বলার পাপ কি প্রতারণা সে করেনি। ছেলেকে

চাঁদ দেখিয়ে, চাঁদকে আয় আয় বলে ডেকে আঙুল দিয়ে কপালে চিৎ দিলে যা হয়, তাই হয়েছিল।

থাক সে কথা। বুড়ী সেদিন ভুললেও কয়েক দিন পর আবার সুর ধরেছিল। এবার ঝগড়ার সুর নয়, দুঃখ পাওয়ার কান্নার সুর। যখন-তখন বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠত—আহা হা-রে! ওঃ! এমন কপাল! মর্ত্যলোকে মানুষ-কুলে জন্মে—! আঃ, কিছু হ'ল না। কিছু হ'ল না। শুধু নরক। নরকই ঘেঁটে গেলাম।

এতে বিপিন মৃদু প্রতিবাদ করে। কিন্তু যে মুহূর্তে বুড়ী বলে—লোকের ছেলেতে মজুর খেটে মা-বাপকে তীর্থ করায়। আমার এমন গর্ভ! এমন পোড়া পেট! হায়রে! হায়রে! হায়রে! অমনি বিপিন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ হয়তো তাই হয়েছে। এবং আজকের ক্রোধ তার মাত্রা ছাড়িয়েছে। হয়তো এর পর একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে বসবে: নারান একটা বাখারি ছুলছিল—একখানা বাঁটুল ছোঁড়া ধনুক তৈরী করবে। হনুমানের উৎপাত বড্ড বেড়েছে। সে কাটারিটা ও বাখারিখানা রেখে ছুটে গেল। গিয়ে দেখলে সত্যিই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে বসে আছে। বিপিনের বাড়ীর পুরনো মান্দের কানাই বাউড়ী—চুপ করে গালে হাত নিয়ে বসে আছে। চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে। বাড়ীটা নিস্তব্ধ। বিপিনের কপাল ফেটেছে, ফুলে উঠে একটা আবের মত দাঁড়িয়েছে এবং সেটা ফেটে রক্ত গড়িয়েছে একটা শীর্ণ রেখায়। বিপিন ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করছে—বেরোও, নিকালো, আভি নিকালো। এই মুহূর্তে। চাই না—নেহি মাংতা।

কানাই কোনরকমে বলছে—তা তো যেতেই চাইছি। আমিও আর থাকব না। ভগমান বললেও থাকব না। কিন্তু আমার মাইনে মিটিয়ে দাও।

—দোব না, দোব না, দোব না।

নারান মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। কানাই বলে উঠল—দেখ দেখ, ঠাকুরমশাই দেখ, ব্যাভারটা দেখ মোড়লের। আমাকে ঠেসে এক চড় মারলে—বলে কেঁদে ফেললে সে।

বিপিন বলে উঠল—বেশ করেছি, খুব করেছি, এখুনি যদি না বেরোও তুমি তবে ঘাড় ধরে বার করব। কার ক্ষ্যামতা আটকায়! ঠাকুরমশায়! ঠাকুরমশায়কে টানিস কেন? আমি কারুর ধার ধারি?

ঘটনাটা মায়ের সঙ্গে বিপিনের ওই ব্যাপার নিয়েই আরম্ভ। মা আজও সেই গর্ভকে দোষ দিচ্ছিল। আর আক্ষেপ করছিল। বিপিন তামাক সাজছিল, সে গর্জে উঠেছিল—মা!

মা ভয় খায় নি। সে বলেছিল—কেনে রে, মারবি না কি?

—মারব না, মরব। গলায় দড়ি দোব।

—তা নইলে ষোল কলা পূন্ন হবে কি করে? তা তুই গলায় দড়ি দিবি ক্যানে? আমিই দোব। বলেই তুলসীতলায় গিয়ে 'ঠুই ঠুই' শব্দ করে মাথা ঠুকে বলতে শুরু করেছিল—আমার মরণ নাই? নেবে না তুমি আমাকে?

বিপিনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল—সেও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তুলসীতলায় এসে মায়ের সামনে ওপাশে মাথা ঠুকতে শুরু করেছিল—মরণ দাও, মরণ দাও—আজ রাত্তিরে—ওর আগে আমাকে মরণ দাও। না দিলে কাল তোমাকে তুলে বিলের জলে ফেলে দোব। মরণ দাও।

বিপিনের মা স্তব্ধ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তার বউ এসে তাকে ধরে বলেছিল—ওগো তুমি এ কি করলে গো! ওগো, রক্ত পড়ছে গো!

বউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল বিপিন। ওপাশে উঠোনের ওধারে কানাই ছুটে এসে তাকে জাপ্‌টে ধরেছিল।—মোড়ল!

কানাই বিপিন থেকে বয়সে বড়। তার বাপের আমলের লোক। চুল পেকেছে, কিন্তু, দেহে সামর্থ্য আছে। সে এমন জোরে জাপ্‌টে ধরেছিল যে, বিপিন আর মাথা ঠুকতে পারে নি। তা না পারলেও সে তরুণ জোয়ান—সে ঝাপটা দিয়ে কানাইয়ের হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়েই সজোরে তার গালে এক চড় মেরেছিল।—হারামজাদ!

কানাই 'বাপ' বলে বসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ মুহ্যমান হয়ে বসে ছিল। বিপিনের মা এসে তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডেকেছিল—কানাই! কানাই! ও কানাই!

বিপিন ওতেই থমকে ছিল। কিন্তু মুখের আস্ফালন সে ছাড়ে নাই। বলছিল—এত বড় বাড় তোর! ছোটলোক চাকর হয়ে আমার গায়ে হাত! চলে যাও, তুমি চলে যাও। জবাব দিলাম। চাই না।

কানাই সামলে নিয়েও বসে ছিল, ওঠে নি, ওঠবার ঠিক অবস্থা ছিল না। দুরন্ত অভিমানে ক্ষোভে সে অধীর হয়ে পড়েছিল। এতকাল সে এ বাড়ীতে কাজ করছে, মনিবের এত হিত সে করেছে। মনিবও তাকে ভাল বেসেছে—সেই মনিব আজ—।

সে বসেই বলেছিল,—বেশ, আমার মাইনে মিটিয়ে দাও—আমি চলে যাচ্ছি।

—কিসের মাইনে? কার মাইনে? দোব না। আমি দোব না।

—দেবে না? আমি খেটেছি তার মাইনে দেবে না?

—না—না—না। বেরোও, নিকালো, আভি নিকালো! নেহি মাংতা। এখুনি চলে যাও। যা-ও!

—আমার মাইনে দাও।

—না। দোব না। দোব না। দোব না।

এই মুহূর্তে গিয়ে পড়েছিল নারান।

গোসাঁই বললে—নারান যাবার পর যে কটা কথা হয়েছিল—শুনেছিল। বিপিন আরও একটু সরে গিয়ে তামাক সাজতে বসল আবার।

নারান একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারও মাথার মধ্যে একটা রাগ জমছিল। বিপিন তার কিছু ধারে না, কিন্তু কানাইয়ের ধারে এ কথাটা ভুলে যাচ্ছে। ভুলেই যাচ্ছে না শুধু—দেবে না বলে আস্ফালন করছে। মানুষ এমনিই বটে। বিপিনের কিছু আছে কিনা,

কানাইয়ের নেই—তাই এত আস্ফালন।

সে বললে, গম্ভীরভাবেই বলে বসল—বিপিনদা, ওর মাইনেটা তুমি মিটিয়ে দাও। বরং কাল আসতে বল। দুদিন পর আসতে বল। না বলো না। ওটা তোমার অন্যায় হচ্ছে।

—অন্যায়! চম্‌কে উঠল বিপিন।—আমার অন্যায় হচ্ছে! হুঁ!

—তার মানে?

—তোমার মুখেও এই শুনতে হল নারান!

—কেন? আমার উপকার করেছ ব'লে তোমার অন্যায়কেও আমাকে ন্যায় বলতে হবে নাকি?

—তাহ'লে নিয়ে যাও ওকে আদালতে। আমার নামে ওকে দিয়ে এক নম্বর ঠুকিয়ে দাও, ন্যায় হোক।

—না, তা করব না। তুমি আপনা থেকে দেবে। শুধু মাইনে নয়, এই চড় মারার খেসারৎ দিতে হবে, কানাইয়ের হাত ধরে বলতে হবে—দোষ হয়েছে।

—নারান!

—উঠে এস কানাই। আমার সঙ্গে চলে এস।

সন্ধ্যেবেলা সে কানাইদের পাড়ায় গিয়ে ব'সে এপাড়া-ওপাড়ার আরো মান্দেরী রাখালী যারা করে তাদের ডেকেছিল।

* * *

সনাতন পৃথিবী, মাটি, জল আকাশ-বাতাস—সেই পুরাতন। মানুষও তার মধ্যে পুরাতন। কিন্তু তার পরিবর্তনের শেষ নেই। মানুষ জন্মায়, শৈশবে-বাল্যে, কৈশোরে-যৌবনে-বার্ধক্যের পথে মৃত্যুতে পৌঁছয়—তা-ও সনাতন। কিন্তু তবু মানুষ কালে-কালে নতুন। পুরাতনকে যে আঁকড়ে ধরে থাকে প্রাণপণে জড়িয়ে। নতুনের আসবার পথ বন্ধ করে দেয়—তবু কাল কোন্ পথে যে তার মধ্যে নতুনকে সঞ্চারিত করে দেয়—তা মানুষ জানতে পারে না। যখন জানতে পারে, তখন নতুনের উল্লাসের মধ্যে পুরাতনের মমতা এবং পুরাতন বিচিত্রভাবে কর্পূরের মত উড়ে গেছে; রেখে গেছে মাত্র একটি গন্ধ। তার নাম স্মৃতি।

এ কথাগুলি নারান গোসাঁইয়ের কথা নয়। সে এসবের খুব ধার ধারে না। এ কথা ক'টি কথকরূপী আমার। কথক তো ব্যাখ্যা করে থাকেন। যা হল এর পর—তা আমি জানি—এ গল্পের শ্রোতারা বুঝতে পারছে। কাল, সকল কালেই বিরাট এবং প্রধান, কিন্তু একালে তিনি শিঙা হাতে বাঘছাল প'রে উদ্যত ত্রিশূল-ধারী। তিনি মুক্তি-বিধাতা এবার।

গোসাঁই বললে—তাই-ই বললে। সে বললে, নারান মনে করেছিল, বেগ পেতে হলে তাকে। এই নিরক্ষর, পায়ের-তলায়-চাপা মানুষগুলি উঠতে বললে আদৌ উঠতে চাইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ওরা তো উঁচু জাত, ভদ্রজাতের পায়ের চাপেই চাপা নেই, নিজেদের বিচিত্র মমতায় ওরা নিজেদের বেঁধে রেখেছে; তার উপর মাথার মধ্যে আছে এক

জটিল অপরাধ-বোধ। সব তাতেই ওদের অপরাধ হয়। ভদ্র উঁচু জাতের সঙ্গে উত্তর করলে অপরাধ হয়, ছুঁয়ে ফেললে অপরাধ হয়, তাদের খাবারের দিকে দৃষ্টি পড়লেও অপরাধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য! সেদিন সন্ধ্যেতে নারান অবাক হয়ে গেল যে, এক কথায় তারা রাজী হয়ে গেল। হিতোপদেশের গল্পের সেই বুড়োর কঞ্চি—আঁটি বাঁধা হয়ে একখানা লোহার কড়ি হয়ে দাঁড়াল। কঞ্চির আঁটি বাঁধা মুখে বলা যত সোজা, কাজে তত সোজা নয়; কঞ্চির গড়নই হ'ল বাঁকাচোরা, সেগুলো আঁটি বাঁধতে গেলে গায়ে-গায়ে লাগে না। এ যেন এক মুহূর্তে কঞ্চিগুলো সোজা হয়ে গায়ে-গায়ে সেঁটে লেগে এক হয়ে গেল। কথা হ'ল—বিপিনের বাড়ীতে কেউ আর কাজ করবে না। কানাই ছাড়ছে—তার জায়গায় কেউ যাবে না, তা ছাড়াও রাখালটা ছাড়বে—তার এঁটো-কাঁটা উঠোন পরিষ্কার করা বাউড়ী ঝি ছাড়বে; তার গরু কোন গাঁইটে পালের রাখালও চরাবে না।

একদিনেই—বিপিনই শুধু নয়—গোটা গাঁয়ের লোক চমকে উঠল।—এ কি!

শুধু ভদ্রলোকই নয়, ওই কানাইরাও চমকে উঠল। তাই তো! এ কি!

নারান নিজেও চমকালো।—তাই তো! এ কি!

কিন্তু পিছুবার কারুর উপায় নেই। শিবু ডাক্তার এল—বাহবা দিয়ে গেল। ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন ধনদাবাবু। লোকটির ভাষা মিষ্ট, মানুষের মত মানুষ। তিনি মিটিয়ে দিলেন নিজের ঢঙে। নারানকে পর্যন্ত বিপিনের কাছে দোষ স্বীকার করালেন। বললেন—হোক শূদ্র, তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ভিক্ষেদাদা—তার সঙ্গে এরকম কথা ঠিক হয়নি। এ কাজ একদিন অপেক্ষা করে ওকে ঠাণ্ডা হতে দিয়ে বুঝিয়ে করাতে হ'ত। ও তা করত। নিশ্চয় করত। স্বীকার কর—দোষ স্বীকার কর।

করলে তা নারান। বিপিনও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু কানাই শুধু শুনলে না কথা, সে মাইনে মিটিয়ে নিয়ে বললে—আমি আর কারুর বাড়ীতেই কাজ করব না বাবু। আমি দিন-মজুর খাটব। আর, এই টাকায় গাড়ী-গরু ক'রে ইষ্টিশানে ভাড়া-টাড়া বইব। আমাকে মাফ করেন।

আর ওই জোটটি আল্‌গা হয়েও রয়ে গেল। তার বাঁধনের দড়িটা রয়ে গেল—নারানের হাতে। যেন সে-ও তার সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে।

•

পুরো একটা বছর সে গ্রামে ছিল না। সেটা একচল্লিশ সাল। সে গুরু-ট্রেনিং পড়তে গিয়েছিল। এক বছর পড়ে সে খুব ভালভাবে পাশ করে বাড়ী ফিরল—সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। ম্যাট্রিকের কোর্স সে মোটামুটি পড়েছে। সংস্কৃত বাংলায় সে কলেজের পরীক্ষা দিতে পারত। ফিরে এল একচল্লিশ সালের শেষে। তখন পৌষ মাস।

বিশ্ববন্ধু তখন এম-এ পাশ করে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরীতে ঢুকেছে। ভাল চাকরী। সে বিয়েও করেছে। করেছে—তার অনুপস্থিতির সময়, সে গুরু-ট্রেনিং পড়ছিল যখন, তখন—বউ দেখে সে খুশী হল। বিশ্ববন্ধু তার খুব তারিফ করলে। আর বললে—বিয়ে কর।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাকিয়ে ছিল বিলের দিকে।

হ্যাঁ, বিয়ের কথা মনে হয় বই কি। হয়। বিলের ধারে দুটো সারসের মত বড় পাখী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। একটা এক পা গুটিয়ে ঘাড়টা নিচু করে লম্বা ঠোঁটটা নামিয়ে আধবোজা চোখে দাঁড়িয়ে, যেন ভ্রূক্ষেপহীন—আর একটা চঞ্চল—তার লম্বা ঠোঁটটা এর ঘাড়ের উপর দিয়ে ওর পিঠের উপর প্রসারিত। মধ্যে মধ্যে পিঠে মৃদু আঘাত করছে।

নিষ্ক্রিয়টা মাদী। হঠাৎ সেটা পাখা মেলে উড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মদ্দটাও। ক্যাঁকক্যাঁক শব্দ করে অনুসরণ করলে।

ওগুলোর নাম মানিকজোড়। ও পাখী সচরাচর মারে না কেউ, মারতে নিষেধ আছে। এরই নাম ক্রৌঞ্চমিথুন। কিন্তু মানিকজোড় নামটা বড় মিষ্টি। ওই পাখী দুটোর দিকে তাকিয়েই বিশ্ববন্ধু বললে—তুইও এইবার বিয়ে কর।

সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিয়ে! হ্যাঁ, বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় বই কি। কিন্তু—!

বিশ্ববন্ধু বললে—ঘরদোর করেছিস, সুন্দর ঘর হয়েছে। এবার গুরু-ট্রেনিং পাশ করে এলি, পাঠশালাতে গভর্নমেণ্ট গ্র্যাণ্ট পাবি। পাঠশালাতে আজকাল ছেলেও হবে। রায়দের বাড়ীতে টিউশন আছে। এবার বিয়ে কর। আমি বিয়ে করলাম। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

নারান বললে—সব সত্যি। কিন্তু এও তো বললি—আয় কত হবে বল্ দেখি? সব মিলিয়ে তিরিশ। আর, জমি তো পাঁচ বিঘে। এতে কি হবে? এদিকে যুদ্ধ লেগে তো বাজারে আগুন লেগেছে। বাজার তো চড়ছে দিন দিন। তুই ভাই মোটা মাইনে পাস। মাইনে বাড়বে। উন্নতি হবে। কিন্তু আমি? আমি তো এত ক'রেও পাঠশালার পণ্ডিত রয়ে গেলাম। কি করব বিয়ে করে?

—তুই বিয়ে করবি না?

নারান বলেছিল—নাঃ।

তার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিল বিশ্ববন্ধু। মুখ-দেখে-মন-খোঁজা দৃষ্টি। তারপর হঠাৎ বলেছিল—একটা কথা সত্যি বলবি?

—কি বল্? তোকে কোন্ কথা না বলি?

—তুই কি পলিটিক্স্ করছিস? মানে দলে জুটেছিস?

বিশ্ববন্ধুর সন্দেহটা ভিত্তিহীন ছিল না বাবু, সে আপনি জানেন, বেশী তো আপনাকে বলতে হবে না। উনিশশো তিরিশ সালে—আমাদের থানাতে আপনাদের গ্রামের তিনজন জেল গিয়েছিল। আর গিয়েছিল ডেটেন্যু নরেনবাবু—তিনি এখানে বাস করেছিলেন। তাঁকে ধরছি এখানকার। বান আসে বাবু—গ্রামের ধারের বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামে জল ঢুকে বালি ফেলে মাটি খুলে তার কাজ ক'রে ফিরে যায়, কিন্তু ওই বাঁধের ভাঙ্গন দিয়ে অনেক সময় এমন নালার সৃষ্টি ক'রে যায় যে, তাকে আর বন্ধ করা যায় না, সেটা নালাই হয়ে যায়। ক্রমে বছরে বছরে সেটা গভীর হয়, চওড়া হয়। তাই হয়েছিল এখানে। জেলাতে ষড়যন্ত্র মামলা হয়ে গেল। এ থানার পাঁচ-সাতটা ছেলে জেল গেল, আন্দামান গেল। একটা নালা হাতের

আঙুলের মত দাঁড়া মেলে ছড়িয়ে গেল। রাজনীতি তখন ওই হাতের আঙুলের মত দাঁড়া মেলে ছড়িয়েছে দেশময়। ধনদাবাবুর কথা বলেছি—শিবু ডাক্তারের কথা বলেছি, বড় বড় পাকাপাকা রাজনীতিক কর্মী এ অঞ্চলে আসেন, যান। হীরালাল দাশগুপ্ত আন্দামান-ফেরৎ। হরিপদ ভার্গব—সেও জেলখাটা লোক। এ অঞ্চলটা ওই বিল আর নদীর জন্যে দুর্গম বলে এখানে সকলে ঘাঁটি গাড়তে চেষ্টা করছিল।

কাল—তখন আপনি নিজে বলছিলেন—বাঘছাল প'রে ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে, নাচবে।

শুধু কাল নাচলে তো হয় না! কালীকে নাচতে হয়। কাল নাচায়—মানুষের বুকের মধ্যে তার প্রকৃতি কালী হয়ে নাচে। তখন কান থাকলে বাতাসে ভেসে আসা গান শোনা যায়—ও মা দিগম্বরী, নাচ গো!

ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, ইংরেজ হারছে; এ দেশে যুদ্ধ আসি-আসি করছে। সুভাষচন্দ্র এ দেশ থেকে নিরুদ্দেশে ভেসেছেন। কংগ্রেস ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ করেছে—কাজ তেমন হয় নি। তবে একটা কিছু হবে। তার ইশারা যেন মানুষের চোখে ফুটে উঠেছে—গাছ-পালার ফিস্-ফিসিনিতে ভাসছে; আশঙ্কা আর উল্লাস দুই মিলে দিনরাত্রি জুড়ে একটা কি থম্‌থমে ভাব। কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন।

নারান ক্ষুদিরাম নয়, প্রফুল্ল চাকী নয়, সে শিক্ষিত নয়—কিন্তু সে পাগলও বটে, বেপরওয়াও বটে; গ্রামের ধনী অবস্থাপন্ন সমাজ সকলকে দাবিয়ে নিজের মধ্যে একটা অসম্ভবের ক্ষুধাও জাগিয়েছে। সে কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেয় নি—তবে তার প্রীতি সকলের প্রতি। ধনদাবাবু, শিবু ডাক্তার, অজয় হাজরা এদের যেন আপন বলে মনে করে। হীরালাল দাশগুপ্ত, হরিপদ ভার্গব—এদের উপর শবসাধক তান্ত্রিকের প্রতি আকর্ষণের মত একটা আকর্ষণ অনুভব করে।

তার বেশী যোগ নয়। তবে সেটাও কম নয়। যোগ এতদিন সে দিত, কিন্তু কোথায় একটা সঙ্কোচ আছে।

বিশ্ববন্ধু আবার তাকে প্রশ্ন করেছিল—নারান!

—কি?

—চুপ করে রয়েছিস্? তাহলে—

নারান বলেছিল—না রে! তবে ভাই যদি কিছু আরম্ভ হয়, তবে 'মালক্‌বাজী' খেয়ে পড়ব লাফিয়ে; যা হয় হবে।

মালক্‌বাজী—উল্লাসে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে ডিগ্‌বাজী দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—বুঝে-সুঝে চলিস নারান! এবার এই যুদ্ধের সময় ইংরেজ গুলি-খাওয়া বাঘ হয়ে গিয়েছে। এবার ওরা ছিঁড়ে ফেলবে। মুভমেণ্ট হলে একেবারে গুলি চালিয়ে

শুইয়ে দেবে।

বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠেছিল নারানের—গুলি চালিয়ে শুইয়ে দেবে?

—নিশ্চয়! রাইটার্স বিল্ডিংএ শুনি তো। তার উপর দেখি সাহেবগুলো গান্ধী-টান্ধীর নাম করলে দাঁত কিস্‌কিস্ করে। ভীষণ রাগ। তার থেকে বিয়ে-টিয়ে কর—ঘরকন্নায় মন দে—

—উঁহু! উঁহু! উঁহু!

রাত্রে সে সেদিন বিয়ের কথাই ভেবেছিল। ভেবেছিল, ইচ্ছে করে ভাবে নি, ভাবনা আপনা-আপনি ঘুরে-ফিরে মনের মধ্যে এসেছিল। ভাবতে গিয়ে অনেক মেয়ের মুখ ভেসে গিয়েছিল মনের মধ্যে।

তাদের মধ্যে জাতি-বিচার ছিল না। নানান জায়গায় নানান সময়ে দেখা এবং ভাল-লাগা মুখ। চেনাও বটে—একখানা মুখ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, কয়েকবারই মনে করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্পষ্ট হয় নি। নামটাও অনেক চেষ্টা করে মনে পড়েছিল। নিরু। মাসীর ভাসুরঝি। কালো মেয়ে, কিন্তু কি তেজ! আর কি সুন্দর চুল এবং এবং সাজপোশাক। কথাবার্তা। একখানা অতি সুন্দর মেয়ের মুখ যেমন বার বার মনে পড়েছিল। তাকে সে স্টেশনে ট্রেনে যেতে দেখেছে। কয়েকবার দেখেছে। এই লাইনে হয় বাপের বাড়ী, নয় শ্বশুরবাড়ী—সিঁথিতে সিঁদুর আছে। তবু মনে পড়ছে।

হঠাৎ এমনই মুহূর্তে তাকে সেদিন কানাই বাউড়ী ডেকেছিল—ঠাকুরমশাই! মাস্টারমশাই!

সে বুঝেছিল কিছু ঘটেছে পাড়ায় কিম্বা গ্রামে, তার জন্য ডাকছে তাকে। বৎসর খানেক বাইরে থেকে তার কানাই-এর গলা শুনে চিনতে দেরি হয়েছিল। এমনই মুহূর্তে ডাক শুনে মনও ভরে গিয়েছিল বিরক্তিতে, তিক্ততায়।

গোসাঁই বললে—অন্য অন্য যারা সারাজীবন বিয়ে না করে থাকে, তাদের সবাই ব্রহ্মচারী নয়, তবে দু-একজন শুনেছি যাকে ভালবেসেছে, তাকে না পেয়ে আর বিয়ে করে নি। দেশ-সেবকরা আছেন—তাঁরা দেশকে ভালবেসে বিয়ে করেন নি; বিয়ে করে তাঁদের জড়িয়ে পড়তে হয়, জেলে দুর্ভাবনা হয়, মরতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রণা হয় মনে। যাঁরা বিয়ে করেন না তাঁরা মুক্ত—কষ্ট পান না। এ কথা ঠিক। কিন্তু তাঁরা কি মনে মনেও এমনি নিষুতি রাত্রে কিম্বা নির্জন অবসরে নারানের মত ভাবেন না?

নারান তাঁদের মত দেশসেবক ছিল না।

সেটার প্রমাণ সে পরে পেয়েছিল। বলব সে কথা যথাসময়ে।

ওদিকে আবার তাকে ডেকেছিল—ঠাকুরমশাই গো! ও ঠাকুর!

বিরক্ত হয়েই সে এবার সাড়া দিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কে?

—আমি গো—কানাই।

—কানাই? কি হল?

—একবার উঠতে হবেন গো।

কানাই-ই তার প্রধান চেলা। বিপিনের বাড়ী কাজ সে ছেড়েছে—সেক্ষেত্রে নারানের কথা সে রাখে নি, কিন্তু নারান ঠাকুরের প্রতি আনুগত্যের তার শেষ নেই। সেদিন নারান গিয়ে না দাঁড়ালে তার মানটা থাকত না—এ সে জানে। জমিদারের কাছে গেলে তার মাইনে সে হয়তো পেতো—কিন্তু বিপিনের জরিমানা হত, লাঞ্ছনা হত; তাকেও লাগত জমিদারের নজর—গোমস্তার পাওনা—পেয়াদার রোজ। তাছাড়া এই যে প্রতিকারটি তাদের নিজেদের জোটবাঁধার শক্তিতেই হয়েছে—তার গিঁঠটি যে নারান ঠাকুরের বাঁধা, তা অস্বীকার করবে কি করে? এতে তারা খুশী হয়েছে বেশী। অথচ, ঠাকুর তাদের কাছে একটি পয়সা নেয় নি এবং ঠাকুরের সব থেকে বড় গুণ—ঠাকুর ওদের মেয়েদের দিকে তাকায় না।

না। তা নারান তাকাতো না।

অথচ—

গোসাঁই বললে—অথচ, জানেন, সেদিন রাত্রে যখন তার মনের চোখের উপর দিয়ে অনেক মেয়ের মুখ ভেসে চলছিল—তার মধ্যে ওদের পাড়ার দু-একটা মেয়ের মুখও ছিল।

নারান ওদের দিকে তাকাতো না—তার প্রতিষ্ঠার জন্য।

সেটা কি ছোট কথা বাবু? বলুন?

প্রতিষ্ঠা পুণ্য তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত নারানের নেই। স্বর্গে গিয়ে মর্ত্যের মানবীর জন্য মানুষের মন উতলা হয়—সে নামতে চায় মাটিতে। কিন্তু পুণ্য তাকে নামতে দেয় না। বেঁধে রাখে। প্রতিষ্ঠাও তাই। প্রতিষ্ঠা পুণ্য। পুণ্যফলকে বিষাক্ত করে তোলে যারা, তারা অসুর, তারা দৈত্য। আপনি বিচার করে দেখুন—যতগুলো বড় বড় অসুর-দৈত্য-রাক্ষসকে বধ করতে শক্তিকে কি নারায়ণকে মর্ত্যে আসতে হয়েছে—তারা গোড়ায় বড় বড় যোগী তপস্বী। তপস্যা করে সিদ্ধি যে-ই পেয়েছে, অমনি তার বলে—তারা অনাচার অত্যাচার শুরু ক'রে অমৃতকে বিষ করেছে।

নারান তা করেনি। করেনি বলেই—ভাগ্যচক্র বলুন, নিয়তি বলুন, নারানকে দিয়েই এই অসুরের মত বিকৃত মানুষটিকে ধ্বংস করার সংকল্প গ্রহণ করিয়েছিল। নারান সংকল্প করেছিল ওকে মারবার, কিন্তু সেই সংকল্প গ্রহণ করিয়েছিলেন উনি।

উপরের দিকে হাত তুলে দেখিয়েছিল সে।

বিকৃত মানুষ। মানুষটার শক্তি ছিল—শিক্ষা ছিল—তেজ ছিল—কর্মশক্তিও ছিল—তবুও বিকৃত হয়ে গেল; প্রবৃত্তি-দোষে আর কর্মচক্রে।

থাক সে কথা।

না—থাকবে কেন? কথাটা অবান্তর আমি বলিনি। কানাইকে সেদিন নিয়তিই বোধহয় পাঠিয়েছিল। এখান থেকেই সে পালার শুরু।

নারান তাড়াতাড়ি নেমে এসে বলেছিল—কি কানাই? সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসেই

বিশ্ববন্ধুর বউ দেখতে গেলাম। তারপর ওরই সঙ্গে বিলের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নইলে, তোমাদের পাড়ায় গিয়ে দেখা করে আসতাম।

কানাইয়ের সঙ্গে আরও তিন-চার জন। কানাই বললে, তা আমরা ভাবছিলাম। আসবেন, নিশ্চয় আসবেন ঠাকুর। এলেন না, আমরাও একটুকুখানেক বেস্ত ছিলাম। বুয়েছেন। সে কাজ সফল হয়েছেন। এখন আপনার কাছে এসেছি। এর বিচার করেন।

—কিসের ?

—চোর ধরেছি, চোরের।

—চোর ?

—আমার জমি থেকে ধান কেটে এবার ফাঁক করে দিয়েছিল। কাঁচাধান কেটে নিয়েছিল। কি করব ? এ জমি ভেঙে কার্তিক মাসে কলাই বুনেছিলাম। ঠিক ধরতে আরম্ভ করেছে ; আর চুরি। দিন ছয়েক আগে একবার চুরি হয়েছিল। তখন থেকে পাহাড়া দিছিলাম। ক'দিন আসে নাই। আজ ঠিক এসেছে। এসেছে—জমিতে নেমে টেনে তুলতে লেগেছে কুঁজো হয়ে, আমরা চারজনাতেই ছিলাম—একবারে চাবুলে চেপে ধরে ফেলাল্‌ছি। কিন্তুক—

—কিন্তুক কি ?

—রায়মশায়ের পাইক—আর তার ছেলে।

—রায়মশায়ের পাইক আর তার ছেলে ?

—হ্যাঁ, ডোমন লগ্‌দী আর তার বেটা পরান।

নারানের সন্দেহ হল—তাহ'লে কি এটা বিষয়ী জমিদার রায়মশায়ের নির্দেশ ? জমি সামান্য। সামান্য জমির জন্য রায়মশায় এমন করবেন ?

কানাই তার সন্দেহ ভেঙে দিলে। বললে—বিলের মুখে ওই টুকুন জমি—আমার বাবা মজানালা ভেঙে করেছিল। এখন আশে-পাশে আরও জমি উঠেছে। বিল সরেছেন। সে সব ভেঙেছে ডোমন। এখন এই আমার টুকুন চাই। জানে, আমি দোব না। গমস্তা ওকে কানে মন্তর দিয়েছে—উ ফসল লাগাক, তু কেটে কেটে লে। দেখ না—দু বছর বড় জোর তিন বছর যেতে-না-যেতে যেচে এসে বলবে—ডোমন, তুমি ভাই লও জমি। চালাক কেমন, শুধু আমার জমির কাটে না, নিজের জমির খানিক-খানিক কাটে।

—কোথায় তারা ?

—বেঁধে রেখেছি বেটাদের।

—মেরেছ নাকি ?

মাথা চুলকে কানাই বললে—তা, দু-চার ঘা দিয়েছি বই কি।

—বেশী নয় তো ? দাগটাগ করনি তো ?

—না। তা হয় নাই।

—তবে নিয়ে যাও সকালবেলায় রায়মশাইয়ের কাছে। যেমন আছে তেমনি থাক।

গোসাঁই বললে—সকালবেলা পর্যন্ত যেতে হল না। নিয়ে যেতেও হল না তাঁর কাছে। তাঁর দুই দারোয়ান এসে হাজির হল—তার সঙ্গে গোমস্তা। রূঢ়কণ্ঠে হুকুম হল—খোল বাঁধন। এবং সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ৎ দাবী হল—বেঁধে রেখেছ কেন?

নারান ফিরে শুতে যাচ্ছিল—কণ্ঠস্বর শুনে ফিরল। কানাইয়ের বাড়ী অল্প দূরে। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতিটি কথা স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছিল। সে ফিরে কানাইয়ের বাড়ী গিয়ে ঢুকে বললে—কানাই, ধ'রে ওদের থানায় নিয়ে যাও। চৌকিদারকে ডাক।

গোমস্তা বললে—গোসাঁই, আগুনে খোঁচা দিয়ো না—আগুন খোঁচা খেলে জ্বলে ওঠে। পোড়া আঙরা, ছাই ঘেঁটে-ছড়িয়ে তোমার পাখা গজিয়েছে।

—পিদিমের শিখে পোকার পাখা পোড়ে, বাজপাখীর পাখা পোড়ে না, ঝাপ্‌টায় উল্টে গিয়ে পিদিম ওল্টায় রূপলাল।

জনতাটি বেশ জমাট ছিল—আর সকলের বুকে ছিল চাপা রাগ। তার আঁচ রূপলাল গোমস্তা অনুভব করছিল। সে বললে—বেশ, তাই গিয়ে আমি বলি রায়মশায়কে।

নারান বলেছিল—ধাপ্পা দেবার জায়গা পেলে না রূপলাল? রায়মশায়ের অসুখ। আমরা জানি।

—হুকুম দেবার আরও লোক আছে। ডোমনের পরিবার দিদিঠাকরুণের কাছে এসেছিল—তাঁর হুকুম তিনি পিসীঠাকরুণকে দিয়ে আমাকে বলে পাঠিয়েছেন।

পিসী বললে—উঠিয়ে নিয়ে এস আর কানাইকে নিয়ে এস। শুধু নিয়ে এস নয়, গলায় গামছা দিয়ে নিয়ে এস।

বাক্যগুলি এদেশের জমিদার-ঘরের বাক্য বটে। জমিদার-ঘরের কন্যাদের দর্প নারান জানে। অবিশ্বাস হ'ল না। তার উপর নারান ওদের বাড়ীতে ছেলে পড়ায়। সে ভাল করে জানে।

হেসে গোসাঁই বললে—আপনি নারানের চেয়েও ভাল ক'রে জানেন। দিদিঠাকরুণ শুধু কন্যা নন—উত্তরাধিকারিণী। তার উপর পিসীঠাকরুণ বহ্ন করে এনেছেন। মশালের আগুন—পাতকাটিতে লেগে বেশী একটু জ্বলে থাকবে—কিন্তু আগুন এখানে ভয়াল, আরতির আলো নয়, তার উপরে হাত দিয়ে কপালে তাপ নেওয়া চলে না। হাত পোড়ে, কালো ধোঁয়ায় হাতে-মুখে দাগ ধরে।

নারান উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভয় সে করে না। সে জানে তার শক্তি। সে জানে অন্যায় তার নয়। সে জানে—লড়াই দিলে জিতবে। জানে—পিছুলে তার মর্যাদাই শেষ হয়ে যাবে না—এই গরীবদের বুক ভেঙে যাবে। তাদের বুক বাঁশ দিয়ে ডলা যাবে। সে বললে—বল গে—যিনি হুকুম দিয়েছেন, তাঁকে বল গে—চুরি করেছে—চোর থানায় যাবে—জমিদার-বাড়ী যাবে না। একালে মানুষ আর জমিদারের হুকুমে দারোয়ানের লাঠির ভয়ে চলে না। সেটা ওরা ভুলে গেছে।

রাত্রে শুয়ে ভাল ঘুম হল না। মেয়েদের মুখ আর বারেকের জন্যও মনের চোখে ভেসে

উঠল না। ভাবলে—ভালই হয়েছে, ব্যাপারটা আজ রাত্রেই ঘটেছে। এক বছর সে বাইরে ছিল। ছেলেদের অন্য কেউ পড়াচ্ছে। সে-ই পড়াক। সে আর যাবে না।

বিশ্ববন্ধু তার আয় হিসেব করছিল—এই মাইনের টাকা নিয়ে।

ভোরবেলা কান্নার রোল উঠল। সে উঠে পড়ল। কি হল? কান্নার দিক লক্ষ্য করে ছুটে গেল। রায়বাড়ীতে কান্না। রায় মারা গেলেন। শরীর অসুস্থই ছিল—উঠেছিলেন বাইরে যাবেন ব'লে—উঠেই পড়ে গেলেন। লোকজন ছুটে এসে দেখলে—রায় নেই।

নারানের সর্বাগ্রে মনে হল ডোমনদের কথা। রায় মারা গেছেন, এখন ঝগড়ার সময় নয়। ফিরে এল সে কানাইয়ের বাড়ী। বলবে—দে, দে, ওদের আজ ছেড়ে দে। চল, সব ওখানে চল। কিন্তু তার অনেক আগে ওরা দল বেঁধে ডোমনদের নিয়ে চলে গেছে থানায়। দল বেঁধে গেছে পাছে পথে আবার রূপলাল লোকজন নিয়ে ডোমনদের ছিনিয়ে নেয়।

* * *

বড় বড় কল চলে উমানাথবাবু, চাকার দাঁতে পাকে পাকে। ঘোরাটা শুরু হয় আস্তে, ক্রমে দ্রুততর হয়। যে চালায়, সে একটার পর একটা ঘাট বদল করে দেয়; শক্তির সঞ্চয় বুঝে নারানের জীবনেও তাই হ'ল। তার যে চলা শুরু হয়েছিল—বিপিনের সঙ্গে কানাই বাউড়ীর ঝগড়ার সূত্র ধরে, সেই সূত্রের টানে এসে সে রায়দের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াল। তাতে তার ভয় ছিল না। কিন্তু একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।—যে, হয়তো শুনবে—রায় কথাটা শুনে রেগে উঠেছিলেন এবং তা থেকেই উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন এমন করে।

শবযাত্রার সঙ্গে সে গিয়েছিল। রায়বাড়ীর ব্যাপার—লোকজনের অভাব হয়নি, কিন্তু এসব কাজে নারানের মূল্য অপরিসীম। শত্রুতা যার সঙ্গে যতই থাকুক, নারান শ্মশানে বন্ধু সকলের এবং তার চেয়ে সেখানে বড় বন্ধু আর সে-সময় ও অঞ্চলে কেউ ছিল না। তাকে ডাকতেও হয় না, সে নিজেই আসে। এখানেও সে নিজেই এসেছিল এবং অগ্রণীর মত সব কাজই সে করেছিল—সেখানে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেন নি—সে রূপলালও না, রায়বাড়ীর কন্যাও না। যদি ভেবে থাকে নারানের কাছে এ বেগার পাওনা—তা ভাবুক—নারানের মনেও সে প্রশ্ন জাগেনি। শব গিয়েছিল কয়েক ক্রোশ দূরে গঙ্গা-তীরের ঘাটে। গ্রামের শ্মশানে মুখাগ্নি ক'রে কন্যা বাড়ী ফিরেছিলেন। নারানরা শব নিয়ে গিয়েছিল। ফিরল পরদিন সকালে। ফিরে রায়বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে নিমপাতা মুখে দিয়ে বসে ছিল—এখানে চা এবং মিষ্টির বন্দোবস্ত ক'রে রাখা হয়েছে। খেয়ে সকলে বাড়ী যাবে। বেরিয়ে এলেন ভূতনাথ-বাবু—গায়ে গেঞ্জি, সবল-স্বাস্থ্যবান মানুষ, পরণে কাঁচি ধুতি, খালি পা, মুখে-চোখে কালো রঙেও সেই পরিচ্ছন্ন মার্জনা, হাতে সিগারেট। এসে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন, সেখানে কষ্ট-টষ্ট হয়নি তো আপনাদের? শ্রীমান রূপলালের তো গুণের অবধি নেই। বড় হিসেবী লোক। আধ পয়সায় সিকি পয়সা কাটে।

ভট্‌চাজ্যিদের গোবিন্দপদ বললে—না-না। কষ্ট কিছু হয়নি।

—দাহ সুশৃঙ্খলে হয়ে গেছে ? ভাল হয়েছে ?

—একেবারে শেষ করে দাহ হয়েছে। সুন্দর পুড়েছে। ওদিকে নারানের পারঙ্গমও যেমন, তেমনি যত্নের সঙ্গে করে।

—গোসাঁই একটা মানুষ এখানকার মধ্যে। তারপর, ভাল তো গোসাঁই ? গত দুবার এসে দেখা হয়নি, শুনলাম গুরু-ট্রেনিং পড়তে গিয়েছ। খুব ভাল পাশ করেছ নাকি ?

হেসে নারান বলেছিল—তা করেছি। কবে এলেন ?

—কাল সন্ধ্যেবেলা।

বাড়ীর নায়েব এসে বললে—দিদি বললেন আপনাকে ভিতরে যেতে।

—ভিতরে ? চলুন।

বারান্দা থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—না। আমার যাবার প্রয়োজন নেই। ও আমি যা বলেছি—শেষ কথা। শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ করুন, দানসাগর করুন, তিলকাঞ্চন করুন,—কোন আপত্তি নেই আমার। খাওয়ান-দাওয়ান যেমন করবেন। আমার কথা—ধানের খাতকদের কাছে যা সুদ পাওনা আছে, সেটি সব ছাড়তে হবে। শুধু আসল নেওয়া হবে। বলবেন—তাতে কর্তার অক্ষয় স্বর্গ হবে। এ যদি হয়, আমি আছি। নইলে কুটুম্ব এসেছি, কুটুম্বের মত থাকব, তার বেশী কোন কিছুতে নেই।

নারান অবাক হয়ে গেল। মনে মনে নমস্কার করলে সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতনাথ হাঁকলেন—কই, এদের চা-জলখাবার কই ? চা কি আসাম থেকে আনতে গেছে ?

চা, জল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে বাড়ী এল নারান। রায়বাড়ীর যে সম্পদ-সম্পত্তি মানুষকে, গরীবকে আইনের ফাঁক দিয়ে শোষণ করে জমা হয়েছে, সে সম্পদ, সে সম্পত্তি এবার একটি উদার মানুষের হাতে পড়ে মানুষের কল্যাণ করবে। শুধু নারান নয়, সারা গ্রামে, আশে-পাশের গ্রামে কথাটা ছড়িয়ে যেতে দেরি হল না। নারান ঠিক করলে—থানায় কানাইদের নিয়ে গিয়ে ওই মামলাটা যা হোক করে চাপা দেবে, বিচার করাবে এই লোকটিকে দিয়ে।

কানাইকে ডেকে সে বললেও সে-কথা। কানাই বললে—আপনি যা বলবেন তাই হবেন। আপনিই তো জোর গো।

বিকেলবেলা সে গেল রায়বাড়ী। কন্যা শ্রাদ্ধ করবেন। ত্রি-রাত্রির শ্রাদ্ধ। এখন অবশ্য সংক্ষেপেই হচ্ছে। পরে সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গ হবে। তখনই বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম যা হবার হবে। তবুও রায়বাড়ীর এই কৃতী সম্পত্তিশালী ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সামান্য আয়োজন—অনেক। আশপাশ গ্রাম থেকে নানান্ ভদ্রজন এসেছেন। মাঝখানে বসে আছেন ভূতনাথবাবু। খালি পা—গায়ে চাদর। শ্রাদ্ধের কথাই হচ্ছিল। সে নমস্কার করে দাঁড়াল। তাকে দেখেই তিনি বললেন—এস গোসাঁই, বলো। অশৌচ—নমস্কার তো করতে নেই, কিছু মনে করো না। বসো। কথা হচ্ছিল কাঠের ; রান্নার জন্যে কাঠ। তেঁতুলগাছ কাটা হয়েছে। গাছটা একটা প্রকাণ্ড গাছ এবং বাড়ীর খিড়কীতেই গাছটা ছিল

—ভট্‌চাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকটা আড়াল করে নয়—অন্ধকার করে। বহু বলা-কওয়া, অনুরোধ, প্রতিবাদ করেও রায় ওটা কাটেন নি এতদিন। ওটাতে তেঁতুল হয় প্রচুর। এবার কাঠের জন্য ওটাকেই কাটিয়েছেন ভূতনাথবাবু রায়-কন্যার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ভূতনাথবাবু বলছিলেন —সংসারে তো তেঁতুলের অভাব নেই, অভাব যত মনের মিলের। তেঁতুল কিনলে মিলবে। এ তো দোকানে মেলে না। টকের বদলে মধুর ব্যবস্থা করলাম।

এরই মধ্যে শ্রীপতি গোমস্তা এসে নমস্কার করে দাঁড়াল। কোথায় গিয়েছিল, ট্রেন থেকে নেমে আসছে। বগলে গামছা-বাঁধা একটা পোঁটলা। ভূতনাথ বললেন—ফিরলে? সব কাজ হয়ে গেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সব জিনিস পেয়েছ?

—হ্যাঁ। দাম বেশী নিলে, তবে জিনিস ভাল। উত্তম জিনিস।

ডোমন আর পরান দুটো বড় বোঝা মাথায় নিয়ে হাজির হল এবার। একটু চকিত হল নারান। বুঝতে পারলে, জামিন নিয়ে ফিরছে ওরা এবং শ্রীপতি গোমস্তার সঙ্গেই যখন ফিরছে, তখন এর সঙ্গে কিছু যোগও আছে।

—যা, বাড়ির ভিতর নিয়ে যা। তারপর নারানের দিকে তাকিয়ে বললেন—দাঁড়িয়ে রইলে গোসাঁই, বসো। ওঃ, জায়গা নেই! তা—ওরে একটা কিছু আন।

—না-না, আমি এই দাওয়াতেই বসছি।

—না। তুমি লীডার লোক। মান্য তোমার প্রাপ্য। ওরে, আন কিছু। এই হারামজাদারা, শুনতে পাচ্ছিস না?

কাকে বললেন বুঝলে না নারান, তবে বুঝলে, ভূতনাথবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। এবং ঐ মানুষটির জাত আলাদা।

একটু অপেক্ষা করে সে হঠাৎ উঠে বললে—নমস্কার। আমি আজ যাই।

—না হে। বসো, বসতে বলছি বসো।

—আমার কাজ আছে।

—তোমার সঙ্গে আমার কাজ আছে। বসো।

—কি কাজ বলুন?

—বলব। বসো।

বসল নারান। ভূতনাথ ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁদের সামনেই বলব? আচ্ছা, তাই বলি। প্রথম ব্রাহ্মণ-ভোজনে পরিবেশনের ভার তোমার। ছেলে-ছোকরা-দের নিয়ে—

নারানের কপালে এতক্ষণ একটির পর একটি কুঞ্চন-রেখা ফুটছিল—এবার তার সব ক'টিই এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সে হেসে বললে—নিশ্চয়। যা বলবেন তাই করব। দেখবেন—এতটুকু বিশৃঙ্খলা হবে না।

—তা জানি। তুমি মস্তবড় লীডার একজন। বাউড়ী-ডোম বাগ্দী—এরা তোমার কথায় ওঠে বসে। তা, কাল সব তাদের ডেকে ঘাসটাস চাঁচা-ছোলার কাজ করিয়ে দেবে। মুড়ি পাবে, ভাতের চাল পাবে—চারটে পয়সা পাবে।

—বেগার ?

—হ্যাঁ বেগার। শুনেছি—বেগার দেওয়া বারণ হয়েছে।

—তাই ওরা ঠিক করেছে।

—ওরা নয়, তুমি।

নারানের কপালের যে কুঞ্চন-রেখাগুলি মিলিয়ে গিয়েছিল, সেগুলি এবার একে-একে নয়, এক মুহূর্তে একসঙ্গে জেগে উঠল। বুকটা দ্রুত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে লাগল—মাথার মধ্যে একটা উত্তপ্ত কিছু যেন ঘুরছে বলে অনুভব করল। কান দুটো তখন গরম হয়ে উঠেছে। এত-গুলি লোকের দৃষ্টি যেন তাকে ছুঁচের মত বিঁধছে বলে মনে হল তার। সে প্রাণপণে নিজেকে স্থির রেখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেই বললে—সে কি আমি অন্যায় করেছি ? 'বাবু' বলা সে তখন ছেড়েছে, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারলে না। একটু থেমে সে আবার বললে—অন্ততঃ আপনার কাছে এটা শুনব আশা করি নি।

—কেন ? তোমার কথায় হাঁস মারব না বলেছিলাম ?

—হ্যাঁ।

—হাঁস আর মানুষ এক নয় গোসাঁই। হাঁস বুনো জাত। তাদের নিয়ে ঘর করতে হয় না। তাদের গুলি না ক'রে টিন বাজালেও পালায়। মানুষ নিয়ে ঘর করতে হয়। শোন, বড়লোকে গরীবদের চুষে খায় এও যেমন আমি পছন্দ করি না, তেমনি গরীবরা ভদ্রলোকের, সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান করে মাথার উপর দিয়ে চলতে চায়—এও আমি পছন্দ করি না। যাদের জ্ঞান আছে, তারা কেউ করে না।

—তারা কারুর অপমান করে না, আর মাথার উপর দিয়েও যেতে চায় না।

—চায়। কানাই বাউড়ী তাই গিয়েছে। রায়বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে। আর, লীডার সেজে তুমি তাদের যেতে বলেছ।

—রায়বাড়ীর চাকর চোর হলে তাকে ধরে থানায় দেওয়া আর রায়বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে যাওয়া এক কথা ?

—জিজ্ঞাসা কর পাঁচজনকে। কি বলেন তাঁরা। সমস্ত লোকের আজ চলতে বিপদ হয়েছে রাখাল মান্দের নিয়ে।

—যদি হয়ে থাকে, তবে দশজনের তাতে সুবিধে হয়েছে। দশজনের কেন বিশজনের।

—বিশজনের না-হোক তোমার হয়েছে।

—আমার ? না।

—ভাল ক'রে ভেবে দেখো। তুমি যা উপকার তাদের করছ, তার থেকে পাঁচজনে অনেক বেশী উপকার করে তাদের।

—উপকার? হাসলে নারান।

—নয়? যার নেই তাকে দেয় না পাঁচজনে? তুমি যখন এসেছিলে তখনকার কথা ভাব।

—আমি কিছু করি নি?

—তুমি করলেই আমাকে করতে হবে; মানুষ কেন—জানোয়ারেও তা ক'রে পোষ মানে। শোন—পোষা জানোয়ার বদমেজাজী হলে তাকে মানুষ বেচে দেয়। শেষ পর্যন্ত মারে। ওদের বদমেজাজ ক'রে দিয়ো না।

—ভেবে দেখব। বলে সে উঠে চলে এসেছিল, আর দাঁড়ায় নি।

বাড়ী এসে যত ভেবে দেখেছিল কথাগুলো, তত তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠেছিল। তারপর সে নিজে গিয়েছিল বাউড়ীপাড়া। সেখানে বসে অন্য পাড়ার লোকদেরও ডাকিয়ে এনে বলেছিল—দেখ তোরা ভেবে, কি করবি! যাবি বেগার দিতে?

কানাই বলেছিল—না। কিন্তু অপর সকলে চুপ ক'রে বসে ছিল মাথা হেঁট করে। চুপ ক'রে থাকাটা সংসারে সম্মতি-লক্ষণ বটে, কিন্তু তার সঙ্গে মাথা হেঁট করলে হয় উল্টো। নারান বুঝলে, ওরা তার দিকে তাকাতে পারছে না, লজ্জা হচ্ছে।

আবার সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি রে? বল!

এবার একজন বলেছিল—উনি তো এগেই ধানের বাকী ছেড়ে দিলেন গো। তার ওপর রায়মশায়ের কাজ বলে কথা। ছেরাদ্দ। রায়মশায় তো ফিরবেন না আর।

নারান চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—বেশ, যাবি।

কানাই বললে—আমি যাব না আজ্ঞে।

এরপর হয়তো মিটে যেত। সে তাই আশা করেছিল। কানাই সত্যিই যায় নি বেগার দিতে। অন্য সকলে গিয়েছিল। সে নিজে শ্রাদ্ধে যথাসাধ্য খেটেছিল। নারানের যথাসাধ্য কম নয়, অনেক। পরিবেশনের ভার সে-ই নিয়েছিল, ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ভোজন, সৎ শূদ্র-ভোজন শেষ হয়ে যখন গরীবের দল খেতে বসল, তখন রাত্রি দশটা। তখন ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকজন পালিয়েছে। বাকী সব বসে পড়ে বললে—আর পারছি না। তখনও নারান কাজ করছে। সে কিছু সৎজাতির ছেলে নিয়ে পরিবেশন চালাতে লাগল। পরিবেশনের মধ্যেই সে পড়ল আছাড় খেয়ে। একটা জায়গায় ডাল পড়ে পিছল হয়েছিল—একটা ভাতের বালতি হাতে হনহন করে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল। এবং এমন পড়ল যে, নারান যে নারান সে-ও কিছুক্ষণ উঠতে পারল না। কোমরে লেগেছিল তার। সেই আঘাত সামলাতে তাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল তিন দিন। প্রথম দিন নিজে এসেছিলেন ভূতনাথবাবু তাকে দেখতে। বাড়ী থেকে হোমিওপ্যাথিক বাক্স এনে তাকে আর্নিকা খাইয়ে গিয়েছিলেন। বাকী ক' দিন অজয় হাজরা এসে খোঁজ করে গেল ভূতনাথবাবুর হয়ে। সে বললে—ভূতনাথবাবু পাঠালেন। খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত, আসতে পারলেন না। মনটাও ভাল নেই।

তার কাছেই শুনলে—ঢপের কীর্তন এসেছিল। তাই নিয়ে একটা অশান্তি হয়ে গেছে। বুঝলি না—শ্বশুরের সম্পত্তিতে সুখ নেই।

নারান হেসেই বলেছিল—তা ভাই, রায়-কত্তে নিশ্চয় রাগ করতে পারেন। ব্যাটাছেলের দল আনলেই পারতেন।

—ঢপের জন্যে আমরা ধরেছিলাম। বুড়োরা পর্যন্ত। উনিও তখন মত দিয়েছিলেন। ভূতনাথবাবু রসিক লোক। গান-বাজনা বোঝেন। ঝগড়া, ভূতনাথবাবু কেত্তনের পর ওদের বাসায় গিয়ে বৈঠকী গান শুনেছিলেন। একলা নয়—আমরাও ছিলাম।

অজয় হাজরাদের জানে নারান। সে হাসলে।

অজয় বুঝলে হাসির অর্থ। সে বললে—তাছাড়া ঝগড়া ও নিয়েও নয়। আসল ঝগড়া—ভূতনাথবাবু বলেছিলেন কাল স্ত্রীকে যে, রায়মশায়ের নামে একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা করা হোক। স্ত্রী বলেছিল—ওসব নয়, ওই শিবতলা বাঁধিয়ে দাও, আর মন্দির মেরামত করিয়ে মার্বেল ট্যাবলেট বসিয়ে দাও। ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—পাড়াগেঁয়ে সেকেলে ওইসব ইয়েগুলো ছাড়। ব্যাস্, অমনি হয়ে গেল—হ্যাঁ শহরে আধুনিক মত হলে তোমার সুবিধে হয়। ঢপ আসে—ফুর্তি করা হয়। তারপর আর কি? আমার বাবার টাকা!

নারানের কোমরে সেঁক দেবার জন্য বুড়ী বিপিনের মা, তার ভিক্ষে-মা এসেছিল। অজয় বলেছিল—আমি উঠি।

নারান জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার কথা কিছু বলছিলেন? অজয় বললে—এই তো আমাকে পাঠালেন। নারান ঘাড় নেড়ে বললে—না—সেই কানাই-টানাইয়ের কথা নিয়ে? অজয় হাসলে—কি বলবেন? মিটিয়ে নিলেই মিটে যাবে! চলে গিয়েছিল অজয় হাজরা। নারান ভাবছিল, মিটিয়ে নেবে। ভাবনাটা ভাবতে ভাবতেই মিটবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। ডোমনাদের মামলার দিন এসে গেল। সেও সাক্ষী ছিল। আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা সে-ও বলতে পারলে না, কানাইরাও না। ডোমনের এক মাস জেল হয়ে গেল।

রূপলাল গোমস্তা সঙ্গে সঙ্গে আপীল করে জামিনে খালাস করে তাদের সঙ্গে এককঙ্গেই বাড়ী ফিরল। এবং আস্ফালনের আর বাকী রাখলে না। কানাইরা এবং তাদের সঙ্গে সে চুপ করেই ফিরে এল। গ্রামে ঢোকবার সময়ে ঘুরপথে রায়বাড়ী এড়িয়ে অন্য পথে গাঁয়ে ঢুকল।

গোসাঁই বললে—না, নারান ভয় পায়নি। না। কানাইরা পেয়েছিল। পাবারই কথা। নারানের চক্ষুলজ্জা হয়েছিল। ভূতনাথবাবুর কাছে চক্ষুলজ্জা। লোকটি বিশ্রী মানুষ। সুদের ধান ছেড়ে দেয়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা করতে চায়, সে তার বাড়ীতে পড়া কোমরে দরদ হয়ে পড়েছিল বলে নিজে দেখতে এসেছিল, ওষুধ দিয়ে গেছে। অজয়কে পাঠিয়েছে দেখতে। মিটমাট করতে করতে করা হল না।

* * *

তবু নারান ভাবছিল। মিটমাট কি করে হয়—এ নিয়ে চিন্তা সে করছিল। ভয়ে নয়,

ভূতনাথবাবুর বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণে শুধু অজয় হাজরাই আসে না, ধনদাবাবু আসেন, শিবু ডাক্তারও আসে। দু-একদিন হীরালালবাবুর আসার খবরও পেয়েছে সে।

তখন বিয়াল্লিশের প্রথম। জানুয়ারীর শেষ। ডোমনের জেল হয়েছে। বাউড়ীরা দল ভেঙেছিল, আবার জোট বাঁধছে। খবরের কাগজে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি নিয়ে নানান্ জল্পনা-কল্পনার কথা বেরুচ্ছে। যুদ্ধের কালোমেঘ পুব দিকে সাইক্লোনের চেহারা নিয়ে শন্ শন্ করে উঠছে। ভূতনাথবাবুর কাছে কাগজ আসে হিরণহাটি থেকে। হিরণহাটিতে কাগজের এজেন্সী হয়েছে, সেখানে কলকাতার সকালের কাগজ বেলা দুটোয় আসে, ভূতনাথবাবুর লোক সে কাগজ নিয়ে আসে। তাই নিয়ে আলোচনা হয়। নারান যেতে পারে না। সে নিত্য দুপুরে যায় হিরণহাটি, সেখানে বাজারের কাগজ পড়ে আসে।

জীবনে একটা অস্বস্তি এসেছিল। ধনদাবাবু তাকে ডেকেছেন, সে যায়নি। শিবু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল—বড় ভাল করছ গোসাঁই। আমার ওখানে যেয়ো না! অনেক কথা আছে। বুঝছ তো—একটা মহামারণ ঘটবে এইবার।

তবু সে যায়নি।

একটা নেশা। একটা নেশা তাকে ধরেছিল।

মাঠে চাষ করতে করতে তেষ্টা পায়। হয়তো জমিতে টানাটানি জল—চাষটা কোনরকমে সেরে পুঁতে না ফেললে সব খারাপ হয়ে যাবে, সে সময়ে ক্ষিধে মনে থাকে না—কিন্তু তেষ্টা মানে না; লাঙল থামিয়ে সামনের দিকে ছোটে, ওই চাষী-বউ দূরে খাবার জলের ঘটি নিয়ে আসছে।

নারানের জীবনে সেই সময়টায় সেই তেষ্টা পেয়েছিল। হিরণহাটিতে সে শুধু কাগজ পড়তে যেত না, ট্রেন দেখত। ট্রেনে দেখতে মেয়েদের মুখ। যতদূর মনে পড়ে—কালো সুন্দর মাঝারি দেখতে যেমনই হোক—সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দেখত।

পাপ কামনা—? না। না—নয়ই বা কেন, আংশিক বটে। পুরো নয়, সে বলতে পারি। বিয়ের কল্পনা করত। বিয়ের জন্যে অনেকেই তাকে তখন বলছিল—নারান, এর একটি মেয়ে আছে রে,—বলছিল—তুই যদি বিয়ে করিস। তখন কাল পাল্টেছে—বিয়েতে টাকা লাগবার কথা নয়। আর, তার রোজগার তখন সামান্য বটে, কিন্তু ওই সামান্যতে তাদের ও অঞ্চলে সবাই বিয়ে করে। কিন্তু বিচিত্র কথা—বিয়ের কথায় মন সায় দেয় না। মনের সামনে এসে দাঁড়ায়—তার দেখা মার্জিত রুচির আধুনিকা মেয়েদের মুখ, তারা তাকে বারণ করে। শুধু তাই নয়—গ্রামের কয়েকটা ব্রাত্য স্বৈরিণী মেয়ে তার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তখন আকর্ষণ করতেও চেষ্টা করে। ওই কানাইয়ের একটা মেয়ে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল—দেখতে মেয়েটার মধ্যে একটা লালসা জাগানো কিছু ছিল, কি তা বলতে পারব না, নারান তার দিকে ভালো করে তাকায় নি। নাম ছিল—সুরো, সুরধুনী কি সুরবালা,

তা জানতে চেষ্টা করেনি সে। কানাইয়ের সম্পর্ক ধরে সে ছুতোয়-নাতায় প্রায় আসত। হাসত। রসিকতা করবার চেষ্টা করত। আরও কয়েকটা মেয়ে—তারা সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে করে বিলের ধারে যেত, নারান যেখানটিতে বসে থাকত বিলের দিকে তাকিয়ে—ওই মানিক-জোড়দের দেখত, ওই হাঁসেদের দেখত, সেইখানটার কাছাকাছি ঘুরত; জমি থেকে দুটো ছোলার শাক কি কলমী-শুষনীর ডগা খুঁটে খুটে তুলে আনত। তুলত আর গলা মিলিয়ে একসঙ্গে গান করত। ওদের পুরুষরাও থাকত, মাঠে কাজ করত; তাদের সামনেই তার দিকে তাকাত, কটাক্ষ হানত, রসিকতা করত; তার সঙ্গেও বটে, নিজেদের মধ্যেও বটে। কিন্তু পুরুষদের ওসব গা-সওয়া; কতকাল ধরে সয়ে সয়ে এটাতে ওরা প্রতিবাদের বা শাসনের কিছু দেখতে পেত না। তার উপর নারানের উপর বিশ্বাস ছিল তাদের। হয়তো বা তাদেরও লোভ ছিল—এই ঠাকুরটিকে একটু বেশী আপনার করে পেতে।

নারানের বয়স তখন বাইশ-তেইশ। লম্বা গৌরবর্ণ, সবল শক্ত দেহ, বুকের প্রশস্ত ছাতি, মাথায় লম্বা চুল; মেয়েদের দেখে পুরুষের তৃষ্ণা জাগে, হিসেবমত নারানের ধারণা—মেয়েদেরও তাকে দেখে তৃষ্ণা জাগত। কিন্তু ওদের প্রতি তৃষ্ণা জাগতে পেত না নারানের, ট্রেনে দেখে আসা কোন একটি সুন্দর মুখ তার মনে জেগে থাকত। তাছাড়া প্রতিষ্ঠার পুণ্যে বাঁধন। তাকাতে গেলেই বাঁধনটা যেন কষে যেত—পীড়া দিত তাকে।

থাক, হয়তো বেশী বকছি। বেলা দেখে গোসাঁই বলেছিল—বেলা ফুরিয়ে আসছে। সুয্যিঠাকুরের মেসিন—ও তো মাপ করা, একটু বাড়াও বললেও বাড়াবে না।

৬ই ফেব্রুয়ারীর কথা বলছিল—।

৬ই ফেব্রুয়ারী ট্রেন দেখবার জন্যে স্টেশনে সে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে পড়ল আশ্চর্য সুন্দর একটি মেয়ে। তার চোখে লাগল আশ্চর্য সুন্দর। যেমন রূপ, তেমনি রুচি। ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছিল। নারান লোলুপের মত দেখছিল; চমক ভাঙল গার্ডের হুইসিলে। তারপর যা করলে, তা নিজেও জানত না যে, সে তা করতে পারে। টিকিট-চেকারের কাছে ছুটে গিয়ে বললে—আমি এই ট্রেনে যাচ্ছি, টিকিট কাটা হয়নি, ট্রেনে নেবেন। জংশন যাব। ইণ্টার ক্লাসেই উঠে বসল সে। জংশন পর্যন্ত তাকে দেখতে দেখতে গেল। সে-মেয়ে তার স্বামী এবং বোধহয় ননদের সঙ্গে কথা বলছিল—তার দিকে তাকালেও না। না তাকাক, ক্ষতি নেই নারানের, সে দেখতে দেখতে গেল।

জংশনে হঠাৎ যেন নাটক হয়ে গেল। কলকাতার ট্রেন থেকে নামল বিশ্ববন্ধু।

বিশ্ববন্ধু বললে—তুই? সে-ও বললে—তুই?

এরই মধ্যে সে মেয়েরা ওই ট্রেনে চলে গেল। বিশ্ববন্ধু বললে—কাজ আছে সদরে। সেক্রেটারিয়েট থেকে স্পেশাল মেসেঞ্জার হয়ে কাগজ নিয়ে আসছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেবে। বললে—ওরে, ভালই হল, তোর সঙ্গে দেখা হল। খুব সাবধান ভাই। দেশ জুড়ে যা হবে, তা ভাবতেও প্রাণ শিউরে ওঠে। বার্মা চলে গেছে, আমাদের প্রভুরা হটছেন—একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। এদিকে দেশে—। চুপ করে গেল সে। তার

মনে ছিল প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এ-কথায় ছেদ টেনে বলেছিল—কিন্তু, তুই কোথায় এখানে?

সে বিশ্ববন্ধুকেও মিথ্যে কথা বলছিল। বোধহয় বলা যায় না এই কথা কোন মানুষকেই। সে বলেছিল—ভাই, ভাল লাগছিল না কিচ্ছু। ভারী খারাপ লাগছিল, তাই চড়ে বসলাম ট্রেনে। যাই, জংশনে মেন লাইনের ট্রেন দেখে আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে আসব।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—চল, আমার সঙ্গে চল, আজ সন্ধ্যেতে কাজ সেরে রাত্রিটা ওখানে থাকব ডাকবাংলোতে, কাল সকালে আমি চলে যাব কলকাতা, তুই যাবি বাড়ী—।

তাই করেছিল সে। বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে সদরে গিয়েছিল। সন্ধ্যের পর থেকে অনেক গল্প করেছিল। বিশ্ববন্ধু তাকে বার বার বলেছিল—দেখ্, তুই অনেক ভাল কাজ করিস। মন্দ ভেবে কোনটা করিসনে আমি জানি, বিশ্বাস করি। তবু এ-পথ কাদের জানিস? যারা সারাটা জীবন পুড়তে পারবে, তাদের।

সে বলেছিল—হুঁ। তা তো বুঝি। কিন্তু—

বিশ্ববন্ধু প্রশ্ন করলে—কিন্তু কি?

—থাকতে পারি না যে। আমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আচ্ছা তুই বল—ওইভাবে চোখ রাঙাবে আর তাই সইতে হবে? একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—বেশ, তুই মিটিয়ে দে।

—দোব। আমি এবার যখন বাড়ী আসব, তখন নিশ্চয় দোব। লোকটিরও দোষ আছে, আবার গুণও আছে। করিয়ে নিতে পারলে অনেক কাজ হবে। তাছাড়া—

—কি?

—বড় দুঃসময় আসছে রে। ও যা করবে করুক, বড়লোকের জামাই—সামলাবে। কিন্তু তুই—আমি বুঝতে পারছি নারান, তোকে তো জানি—একটা ঝোঁকের মাথায় যা-তা করে নিজেকে শেষ করে ফেলবি। নারান, ভী-ষণ সময় আসছে।

পরদিন বাড়ী ফিরল সে। ফিরেই দেখল—ভীষণ সময় তারই ঘরের উঠোনে এসে হাজির হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তার। পুলিশের দারোগা বসে আছে, দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে রূপলাল। আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের কিছু লোক, বাউড়ীরা, বিপিন; বিপিনের মা বসে আছে তার দাওয়ায়।

খবরটা সে পেয়েছিল স্টেশন থেকে গ্রামে ঢুকবার পথেই। সুরো—কানাইয়ের মেয়ে—ছুটছিল হিরণহাটির দিকে। কানাইয়ের বাড়ীও সার্চ হয়ে গেছে। সে তারই খবর নিয়ে যাচ্ছিল কানাইয়ের মনিব হিরণহাটির চালের ব্যবসাদার দত্তমশায়কে দিতে। কানাই এখন তার দোকানে চাল-ধান বয় গাড়ীতে। সে থমকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে বলেছিল—ঠাকুর, তুমি পালাও। বাড়ী যেয়ো না। সবিস্ময়ে সে বলেছে—কেন? সুরো বলেছিল—থানা পুলিশ তোমার বাড়ীতে। রূপলাল গমস্তা নিয়ে আইচে ডেকে।

থানা পুলিশ রূপলাল ডেকে এনেছে তার বাড়ীতে! মাথার মধ্যে মুহূর্তে আগুন জ্বলে

উঠেছিল। সে হন-হন ক'রে গ্রামের দিকেই ছুটেছিল। সুরো—বলেছিল ঠাকুর। বাবাকে ধরেছে। তুমি আর যেয়ো না।

নারান তা শোনেনি। ভয়ের কোন কথা তো নেই তার। তার উপর তার ক্রোধ। সে নির্দোষ, সে সৎ। তার সুনাম আছে। তার সম্পত্তি নেই, টাকা নেই—কিন্তু তার মান আছে। দুনিয়াতে টাকার জোরে পাষণ্ডেরা এই অত্যাচার করবে, আর সে তাই সইবে।

বাড়ী এসে ঢুকেই সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল—কি? কী ব্যাপার আমার বাড়ীতে?

—চোর। এই চোর। আমি রাত্রে বাইরে উঠেছিলাম—পুকুরপাড় দিয়ে চলে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কে? সাড়া দিলে না। চলে গেল। সে ওই। ওই চুরি করেছে। রূপলাল গোমস্তা বলে উঠল।

নারান যা করলে, সে নিজেও তা ভাবেনি। জীবনে কখনও মাথায় আগুন জ্বলেছে আপনার? জ্বললে বুঝতে পারতেন। নারান এক চড় মেরে বসল রূপলালের গালে। প্রচণ্ড চড়। 'বাপ' বলে বসে পড়ল সে, মুখখানা রক্তাক্ত হয়ে গেল। দুটো দাঁত ভেঙে পড়েছে। চীৎকার ক'রে উঠল। মিথ্যেবা-দী?

দারোগা হেঁকে উঠল—পাকড়ো, এই—। সঙ্গে সঙ্গে একটা কনস্টেবল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। নারান তখন জ্ঞানশূন্য, সে তাকেও মারলে এক ঘুষি। তখন আরও একজন কনস্টেবল তাকে এসে ধরেছে। কিছুক্ষণ পর তার সম্বিৎ ফিরল। এতক্ষণে সে জানতে পারলে—রায়েদের ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরের গহনা চুরি হয়েছে। ঠাকুরের গহনা, শালগ্রামের সোনার পৈতে, সোনার ছাতা, রূপোর সিংহাসন।

রূপলাল গোমস্তা বলেছে—সে রাত্রে বাইরে উঠেছিল, পুকুরপাড়েই যাচ্ছে; পুকুরটা ঠাকুরবাড়ীর খিড়কী। সে দেখেছে একজন লোক চলে যাচ্ছে পুকুরপাড়ের প্যাশর রাস্তা ধরে। সে ডেকেছিল—কে? কে? লোকটি সাড়া দেয়নি। রূপলালের দৃঢ় ধারণা, সে নারান গোসাঁই। অন্ধকার রাত্রি—তবু তার চলন-গড়ন দেখে চিনেছে।

তাছাড়া শালগ্রামের পৈতে, তার সিংহাসন, ছাতা—এ ব্রাহ্মণ ছাড়া কে নেবে? শূদ্রে কি স্পর্শ করতে পারে? পারে না। পারা সম্ভবপর নয়। এক, অন্য ধর্মাবলম্বী চোর চুরি করতে পারে—কিন্তু সে শালগ্রামটিকে পাশে নামিয়ে রেখে যাবে না। তাহলে সে ওটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতো। কিম্বা আছাড় মেরে ভেঙে দিত।

এ চোর ব্রাহ্মণ। এবং সে চোর ব্রাহ্মণের ঘরের নাস্তিক কালাপাহাড়—নারান গোসাঁই।

ভূতনাথবাবু নাকি বলেছিলেন—আমি কোন কথা বলতে পারব না। বুঝতে ঠিক পারছি না। তবে রূপলাল বলছে, তাই বা অবিশ্বাস করি কি ক'রে? পুলিশ যা হয় করুক।

পুলিশ রূপলালকে নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তার অপেক্ষা করছিল। কানাই বাউড়ীর বাড়ীও তল্লাশ করেছে পুলিস। কারণ, কানাই নারান গোসাঁইয়ের অনুগত লোক।

নারানের মাথার চুল তখন উস্কোখুস্কো। চুল ধরে তাকে টেনে তুলেছে, সরিয়ে এনেছে কনস্টেবল। সে তবুও দৃপ্ত। বুক তার তখনও জ্বলছে।

একটু থেমে গোসাঁই বললে—আগুন নারানের বুকে কবে লেগেছে—তা নারান জানে না। হয়তো হৃদয়ের বাড়ী থেকে লেগেছে। হয়তো গাঁয়ে এসে গ্রামের লোককে ভালবাসতে গিয়ে তাদের মনে তাদের অঙ্গে মৃদু উত্তাপের স্পর্শ দিতে, ঘরে উনোনশালে ভালবাসাকে পাক করতে আবেগের আগুন জেলেছিল, লোকে সেটাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে—সেটা উনোনের আগুন থেকে ঘর-জ্বালানো অগ্নিকাণ্ড হয়ে বুকের ঘরে লেগে গেল। ওই দিনই বোধ হয় লাগল। হয়তো বা নিজেও সে ছিটিয়েছিল। এই বাউড়ীদের নিয়ে দল বাঁধতে গিয়ে অসাবধানে জ্বলন্ত আগুন ফেলেছিল—সেটা লাগল। জ্বলল।

নারান জ্বালায় জ্বলন্তের মতই বলেছিল—কাল বিকেল থেকে আমি গ্রামে ছিলাম না। কাল পাঁচটার ট্রেনে গিয়েছিলাম জংশন। সেখান থেকে সদর শহর। আজ সকালে সেখান থেকে দশটার সময় হিরণহাটিতে নেমেছি। আমাদের গ্রামের সরকারী চাকরে বিশ্ববন্ধু আমার সাক্ষী। তার সঙ্গেই কাল রাত্রি কাটিয়েছি। আমি চোর!

গোসাঁই বললে—চোর নারান নয়, চোর অপবাদ তার টেঁকে নি। কিন্তু নারান অধীর, নারান ক্রোধী। মানুষের উপকার করার যে আনন্দের স্বাদ তাকে মাতিয়েছিল, সেটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে তখন প্রমত্ত করেছে। তাছাড়া—হেসে গোসাঁই বললে—মানুষকে চোর সন্দেহ করলে অপরাধ হয় না—সাধুকে বললেও হয় না। কিন্তু সাধুর তার প্রতিবাদে কোন শাস্তি দেবার অধিকার নেই। দিলে অপরাধ হয়।

নারানেরও হল—রূপলালের দাঁত নড়াই ছিল, তবু দাঁত ভাঙলে হাড় ভাঙার অপরাধ হয়; তার উপর কনস্টেবলকে মেরেছিল। সরকারী কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল। দুই অপরাধে তার জেল হয়ে গেল দেড় বছর!

পাঁচিল-ঘেরা জেলের মধ্যে বুকের আগুন জাগিয়ে সে বসে রইল।

* * *

১৯৪২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। তা একরকম ভালই হয়েছিল—নইলে আগস্ট আন্দোলনেই গুলি খেয়ে মরত। নয়তো সেপ্টেম্বরের বানে ভেসে যেত, নইলে অক্টোবরের সাইক্লোনে বাউড়ীদের বাঁচাতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে মরত। সেবার নদীতে প্রবল বান হয়েছিল। বিপিনের ঘর ভেঙেছিল—তার ঘরের দেওয়াল ভেঙেছিল, বাউড়ীপাড়াটা তিন দিন ডুবে থেকে পরিণত হয়েছিল মাটির স্তূপে। দু'-তিনটে বাচ্চা, একটা মেয়ে ভেসে গিয়েছিল। ওরা বসেছিল চালের উপর। মজার কথা কি জানেন—আগে পাড়ায় বান ঢুকলেই ওরা ঘটিবাটি, মাটির হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, গরু-বাছুর নিয়ে ভদ্রলোকদের পাড়ায় গিয়ে ঢুকে আনাচে-কানাচে গোয়ালে, চালায় আশ্রয় নিত। এবার তা যায়নি। কারণ জানেন? ওই নারানের ছড়ানো বিষ বা অমৃত যাই বলুন। ওদের

জোটটা আবার বেঁধে উঠছিল। উঠছিল—আগস্ট আন্দোলনের হাওয়া বা উত্তাপে।

গোসাঁই বললে—কালের কথা বলছি এর আগে, কাল এক-একটা সময় এমন চেহারা নেয় যে, তার মধ্যে মহাকালকে প্রত্যক্ষ করা যায়। দুনিয়াসুদ্ধকে এক করে এক মহাকালই দিতে পারে। খণ্ড কাল পারে না। সে শুধু কাঠ পাতা জড়ো করেই যায়, মহাকাল তাতে আগুন লাগিয়ে মাটি থেকে আকাশ আগুনে-আলোয়, উত্তাপে-ধোঁয়ায় এক ক'রে দেয়। শুধু ঘাস পোড়ে না—বন পোড়ে, গাছ পোড়ে—কীটপতঙ্গ জন্তুজানোয়ার সব পোড়ে।

উনিশশো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন তাই। পৃথিবী-জোড়া যুদ্ধ এগুতে এগুতে বার্মা হয়ে চট্টগ্রাম ফেণীর ধারে এসেছে—উপরে কোহিমা মণিপুর। এ দেশ কাঁচা ঘাস আর সবুজ পাতার বন হয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে হেলতে দুলতে পারে। তাতেও আগুন লাগল। আগস্ট আন্দোলন হয়ে লাগল। তাতে ওই বাউড়ীগুলো দুব্বো ঘাস হলেও ওরাও জ্বলল। না জ্বলুক, আগুনের আঁচে শুকনো হয়ে ডাব পাকিয়ে গেল। ওরা বানের সময় গেল না। কিন্তু সাইক্লোনের সময় গেল। ওরা বানের পর ঢিবির উপর বাঁশের কাঠামোর চালা করে তালপাতা দিয়ে ছাইয়ে বাস করছিল। সাইক্লোনের সময় সে তালপাতা প্রথমেই উড়েছিল। নারান বাইরে থাকলে—নিশ্চয় যেত ওদের ওখানে—কি করত তা জানে না, তবে যেত। কারণ, না গেলে অন্য ভদ্রলোকেরা এসে নিয়ে যেত। মানুষ সবাই। মানুষ আসে। কিন্তু বিপন্ন মানুষের আনুগত্য পাবার লোভও আছে। অজ্ঞাতে আছে। নারান সবার আগে যেত—হয়তো গাছচাপা পড়ে মরত। জেলখানায় সে বেঁচে রইল। কিন্তু ভেবেছিল বাউড়ীদের কথা—শুধু বাউড়ী কেন, গ্রামের কথাও ভেবেছিল। ভাবতে পারে নি কেবল রায়বাড়ীর কথা, আর রূপলালের কথা। না, সে ভাবে নি। আক্রোশ। আক্রোশ। আক্রোশ তার জমে ছিল, জমছিল। মধ্যে মধ্যে উদ্বেগ হত—ওই ভূতনাথের কাছে গিয়ে ওরা শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে পড়বে। পড়ত। কিন্তু তার আগেই সাইক্লোনের দ্বিতীয় দিন মহাষ্টমীর সকালে সে গিয়ে ওদের ডেকে নিয়ে এসেছিল—খাইয়েছিল, থাকবার জায়গা ক'রে দিয়েছিল। ওরা হরিবোল দিয়ে হরির জয়ধ্বনি দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে রায়বাড়ীর জয়ধ্বনিও দিয়েছিল। রাত্রিকালে আবার ওদের ক'টা স্বৈরিণী মেয়ে রায়বাড়ীর চাপরাসী গোমস্তার সঙ্গে ফিসফাসও করেছিল। ওরা উচ্চবাচ্য করে নি। রায়বাড়ীর অন্দরে কর্তা-গিন্নীতে কথান্তর হয়েছিল। গিন্নী বলেছিলেন—এ কি হচ্ছে? এ যে ছুঁতপবিত্র রইল না, একাকার হয়ে গেল। যেখানে-সেখানে ছেলেগুলো বেড়াচ্ছে। মেয়েগুলো হি-হি করে হাসছে।

কর্তা বলেছিলেন—হলই বা—কত বড় বিপদ, আর মানুষ তো!

—না। যা নিয়ম, তা ভাঙতে দোব না। কিছুতে না। অন্য পুজো নয়—দুর্গাপুজো। ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়েছিল ব্যাপারটা। শেষরাত্রে মদ্যপান ক'রে ভূতনাথ একজন বাউড়ীকে প্রহার করেছিলেন। লোকটা মূত্র-ত্যাগ করেছিল মন্দিরের এলাকার মধ্যেই।

জেলখানায় নারান ছিল সাধারণ কয়েদী। রাজনৈতিক কয়েদীদের এবার বিশেষ বিশেষ জেলে রাখা হয়েছিল, তাদের সঙ্গ সে পায় নি। তাদের ওখানকার ধনদাবাবুকে ধরার খবর

পেয়েছিল—হিরণহাটির বিধু ডাক্তারকে ধরেছিল পুলিশ—কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। হীরালাল দাশগুপ্ত ফেরার হয়েছিলেন। কালীপদ ভার্গব, শিবু ডাক্তার শুধু বাইরে ছিল। তাদের দল এতে নামে নি।

নারান অন্যদিনের মত সেদিন, অর্থাৎ মহাষ্টমীর রাত্রে সাইক্লোনের গোডানীর মধ্যে তাদের সঙ্গেই ছিল—অন্য দিন তারা নিজের নিজের গল্প করে, চোর চুরির কথা, ডাকাত ডাকাতির কথা—ঘটিবাটি চোর খুব হেসে ঘাট থেকে ঘটি তোলার কথা বলে। নিজের নিজের ঘরের কথা বলে। নারান কথা বলে না—ভাবে। সেদিন কয়েদীরাও পৃথিবীর জন্যে ভেবেছিল—সে ভেবেছিল। ওদের জীবনে একটা সহজ স্বচ্ছন্দ আনন্দই থাকত—অন্য দিন তার থাকত আক্রোশ। এই দিনটিতে এক হয়ে ছিল।

আর হয়েছিল যেদিন কলকাতায় বোমা পড়ার খবর আসে, সেই দিন। খুব খুশী সকলে সেদিন। সেও খুশী হয়েছিল। মহাকালের চেহারা, মহাকালের হাওয়া জেলখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে আসে।

বিপিনকে সে পত্র দিত। বিপিন উত্তর দিত। মাসে একখানা। তাতেই খবর পেত। বিপিন সব চিঠির জবাব দিত না। তেতাল্লিশের প্রথমে সে সংবাদ দিলে—'দেশে মড়ক লাগিয়াছে। গত বৎসর ধান একেবারেই হয় নাই। এক মাস দু-মাসের খোরাক—তাও না। লোকের কি অসুখ হইতেছে—বুঝা যাইতেছে না। পড়িতেছে মরিতেছে। অনেক বসিয়া বসিয়া মরিতেছে। ধান কেবল রায়বাড়ীতে। দিতেছেও তাহারা। কিন্তু লোকে লইতে চাহিতেছে না।' তারপর কি লিখেছিল—খুব যত্ন করে কেটেছে নিজেই—কারণ, লাইনটা পুরো লাইন নয়, কয়টা শব্দে একটা অসমাপ্ত লাইন।

তারপর একখানা চিঠি এল ফেব্রুয়ারী মাসে—তোমার দিদি লক্ষ্মী মারা গিয়াছে।

নারান খুব আঘাত পেয়েছিল। মর্মান্তিক। বার বার মনে হয়েছিল তার বীরেনের কথা। দিদির ওই একটিই ছেলে বেঁচে আছে, তার পর তিন-চারটি ছেলে হয়ে আঁতুড়েই মারা গেছে। হৃদয় বিয়ে করবে সে জানে। বীরেন? তার কি হবে? ঠিক পরদিন হৃদয়ের পত্র পেয়েছিল সে। হৃদয়ও তাকে দিয়েছিল কি মনে ক'রে, লিখেছিল—ভাই নারান, তোমার দিদি আমাকে অকূলে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। আমি আতান্তরে পড়িয়াছি। বীরেনের মুখ দেখিয়াই বুক ফাটিয়া যাইতেছে।—সে অত্যন্ত বিষাক্ত হাসি হেসেছিল।

* * *

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গোসাঁই বললে,—মমতা বড় পবিত্র বস্তু, বাবু। মন প্রাণ মমতার সুখেও বটে দুখেও বটে—মানুষকে বদ্‌লে দেয়। যেমন মানুষ হোক—সাধুই হোক আর পাপীই হোক—বদ্‌লে, একরকম করে দেয়। কেমন জানেন—কাগজের ফুল ম্যাজিকে যেমন আসল ফুল হয়ে যায়, তাই হয়। নারানও এই মমতার মধ্যে জেলে বাকী ক'টা দিন যেন আসল ফুল হয়ে গিয়েছিল। একটু ফুটে শুকিয়ে ঝরে যায়, মধ্যে মধ্যে ভাবনাটা ভোলে—আবার হঠাৎ দিদিকে মনে পড়ে, বীরেনকে মনে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কুঁড়ি দেখা

দেয়, আস্তে আস্তে ফোটে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, বীরেনের এখন কি অবস্থা, ভাবে। বুকের আগুনটা জল হয়ে যায়। আবার হৃদয় বিয়ে করেছে বা করবে কল্পনা করে তার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে সে বাড়ী যায় নি। গিয়েছিল দিদির বাড়ী। দীর্ঘকাল পর গ্রামের মুখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এসেছিল সে স্টেশন থেকে হেঁটে। গ্রামখানা দেখে শিউরে উঠেছিল। প্রথমেই চোখে পরেছিল নদীর ভাঙ্গন। ভাঙ্গনটা ভল্লাপাড়ার ধার পর্যন্ত চলে এসেছে। বেলা তখনও ছিল—অপরাহ্ণ বেলা। সেই নদীর ধারের গাছপালাগুলোর কি অবস্থা। তবে ওরা বীর বটে। বড় অর্জুন গাছ উল্টে পড়েছে—তুটো একটা শিকড় লেগে আছে—ডালাপালা শুকিয়েও মরেনি—তু-চারটে কচি ডাল বেরিয়েছে, তাতে কিছু পাতা বাতাসে তুলছে। অশথগাছ সমূলে উপড়েছে। বটগাছ জরাসন্ধর মত তুফালি হয়ে গেছে, কিন্তু তুফালিই বেঁচে আছে। লম্বা গাছগুলো মাঝখানে ভেঙ্গে কবন্ধের মত হয়ে গেছে। ঘাস নেই, বন্যার বালিতে চাপা পড়েছে। ভল্লাপাড়ায় ঢুকল নারান—কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারলে না। যারা আছে, সব যেন ধুঁকছে। ক'জন কঙ্কালসার পুরুষ সেই গাছতলায় বসে ছিল। গাছটার অনেক ডাল ভেঙেছে। ছায়ার পরিধি সংকীর্ণ হয়েছে। তারা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নারানের মুখের দিকে চাইলে। জেলখানায় ধরাবাঁধার মধ্যে থেকে খেয়ে নারান আরও সবল হয়েছে, সুন্দরও হয়েছে দেখতে। রংটা গৌরবর্ণ, সেটা আরও ফরসা হয়েছে তখন। নারান জিজ্ঞাসা করলে, রাম কোথায়? রাম ভল্লা?

তারা আশ্চর্য হল।

রাম ভল্লা—সে তো অ্যানেক দিন গত হয়েছেন গো। গেল বছর। ঝড়ের সময় ডাল চাপা পড়েছিল। ক'টি মেয়ে ভেঙে-পড়া বাড়ীর ভাঙ্গা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে মড়ার মত তাকিয়ে আছে।

সে আর প্রশ্ন করলে না। মন তার বীরেনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। সেই তু-আড়াই বছরের বীরেনকে ফেলে সে চলে গিয়েছিল। আজ কত হবে? দশ-এগারো বছরের। কেমন হয়েছে? কত বড় হয়েছে? বাড়ী কাছেই হৃদয়ের। কই, কই? সেই উঁচু কোঠাটা? ওই যে ভেঙেপড়া তালপাতা দিয়ে ছাওয়ানো চাল—ওইটে? হ্যাঁ, ওইটেই তো।

হায় মহাকালের কোপ।

বাড়ীর সামনের দরজা ভাঙা। খোলা। সে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বুকটা যেন ধড়ফড় করছে। উঁকি মেরে সে চমকে উঠল। ঘৃণায় ক্রোধে মুহূর্তে মনটা কঠিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভাঙা দাওয়ায় একখানা শাড়ী মেলে দেওয়া রয়েছে। শাড়ী! তা হ'লে—! তবুও আত্মসম্বরণ ক'রে সে ডাকলে—হৃদয়দা!

আবার ডাকলে—হৃদয়দা! বীরেন!

মেয়ে-কণ্ঠে কে সাড়া দিলে—কে?

নাম বলতে ইচ্ছে হ'ল না। বললে—হৃদয়দা আছেন ?

উত্তর এল, আছেন—তার অসুখ। কে আপনি, ভিতরে আসুন না।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে ঘরে ঢুকল। কথাবার্তার সুর স্বর ভঙ্গি এখানকার সঙ্গে এমনি বেমানান যে, সে বিস্মিত না হয়ে পারলে না কোথাকার মেয়ে।

সে ঘরে ঢুকে বললে—আমি বীরেনের মামা।

একটি কালো রোগা লম্বা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়। অবাক খুব হল না, সে এমনিই প্রত্যাশা করেছিল। কোন অঙ্গে গঠননৈপুণ্যের কোন চিহ্ন নেই, অথচ একটি শ্রী আছে। বয়স অনেকটা। বুড়ি তো হবেই। মেয়েটি সবিস্ময়ে বললে—নারানদা !

নারান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করলে তাকে।—কে ? কে ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও তার স্মৃতিকে আবিষ্কার করতে পারলে না সে। কিন্তু মনে হল—এ চেনা, একে তো চেনে।

সে নিজেই চেনা দিল। দাওয়া থেকে নেমে এসে তাকে প্রণাম ক'রে বললে, আমি নিরু।

নিরু ! একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। নিরু এখানে ! এই শীর্ণ শরীর, সেই কালো মাজা রংয়ের মার্জনার উপর অমাজা কাঁসার বাসনের মত একটা ছোপ পড়েছে। এই জীর্ণ কাপড় পরনে, দু-হাতে দু-গাছা শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুর। নারান হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরু বললে, লক্ষ্মীদি মারা গেছেন। তাঁর শূন্য স্থান আমি পূর্ণ করেছি। সে দিন কলেশ্বরে উনিই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন দালালির লোভে। আমি রাগ করে কেলেঙ্কারি ক'রে চলে এসেছিলাম। এখান থেকেই চলে গিয়েছিলাম তেজ দেখিয়ে। মানুষের কপাল ! সেদিন কি জানতাম যে, ওঁর হাঁড়িতেই চাল দিয়েছিলাম আমি ! হাসলে সে।

প্রহেলিকা মনে হচ্ছিল সব। মাথার ভিতর, বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছিল। সে কি বলবে বুঝতে পারছিল না। হে ভগবান ! বীরেন কই—কথাটাও মনে এল না তার।

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ এল, খোনা আওয়াজ—নি-রু ! ওঁ কে ?

নিরু বললে—উনি ! আমার কপাল দেখ—উনিও যাবার জন্যে সেজেছেন।

—নি—রু !

নিরু ঘরে গেল, দোরে দাঁড়িয়ে বললে—নারানদা, লক্ষ্মীদির ভাই।

—নাঁ-রা-ন। একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল। আঁ-য় ভা-ই ! আঁ-য়। নিরু বললে—ডাকছেন তোমাকে। নারান বললে, না। নিরু হেসে বললে, না নয়, এস।

নারনের বুক ধড়ফড় করে কাঁপছিল। ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। তবু সে পায়ে পায়ে এসে দোরে দাঁড়াল। দেখলে কঙ্কালসার হৃদয় পড়ে আছে ছেঁড়া ময়লা বিছনার উপর। দুর্গন্ধে বমি আসে মানুষের। হৃদয় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ক্ষমা—ক্ষমা—আমি আর বাঁচব না।

নারান বিছানার পাশে গিয়ে বসল। দুই হাত তার জড়িয়ে ধরে হৃদয় কাঁদতে লাগল—ওরে আমি মহাপাপী। মহাপাপী। কি করলাম—ছি-ছি-ছি! সব্বস্বান্ত হয়েছি—আর ওই মেয়েটার—

নারান বললে—শান্ত হও হৃদয়দা। শান্ত হও—। কি করবে? মানুষ যা করে তার উপর কি তার হাত থাকে? আমি যে মারপিট করে জেল খেটে এলাম।

—কবে খালাস পেলি? ওঃ, তুই এঁকটা বীঁর রে! গায়ে হাত দিল সে সস্নেহে।

—আজই। সোজা আসছি জেল-ফটক থেকে। নারান বললে একটু হেসে।

হঠাৎ বালক-কণ্ঠের মা-মা-ডাক শুনে নারান চমকে উঠল।—বীরেন!

হৃদয় বললে—হ্যাঁ। ওঁই, ওঁই একমাত্র সান্ত্বনা রেঁ। মা-হারা ছেলেটা সঁত্যি মা পেয়েছে। নারান বেরিয়ে এসে দেখলে—সত্যিই—নিরুর কোল ঘেঁষে বীরেন—ঠিক মায়ের কোল ঘেঁষে বসার মত বসে দোরের দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখবার জন্য। সুন্দর ছেলে, সুন্দর বীরেন! রোগা হাড়-জিরজিরে, কিন্তু মুখখানি টস টস করছে। অবিকল দিদির মুখ।

* * *

গোসাঁই বললে—ভাগ্য? তাই সত্যি। অর্থনৈতিক অবস্থা? তাই সত্যি। মহাকালের কুরুক্ষেত্রে একটি নারী-বলি? তাই সত্যি। যা অজুহাত দেওয়া যাবে তাই সত্যি।

নিরু রাগ করে চলে গিয়েছিল—খুড়ীমা নারানের মাসীর সঙ্গে। সে পড়ছে—পড়বে, তারপর ভাল ঘরে বিয়ে হবে, সুন্দর বর, সুন্দর ঘর—নগরে মহানগরে তাদের বাড়ী। তখনই তারা ভাড়ায় খোলার চালের বাড়ীতে থাকত—দমদমে। কেরোসিনের আলো জ্বালত। কিন্তু ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান—এর সাধ ছিল বৈকি। বিয়ে না হয়—পড়বে, পাশ করবে—ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ। ইস্কুলে মাস্টারী করবে। কিন্তু বিয়েও হয় নি—পাশও করতে পারে নি। ষোল বছর পার করেও যখন ক্লাস নাইন পৌঁছুতে পারল না, তখন পড়া ছাড়লে। খুড়ীমা হাঁপানির রোগী, সম্বল কিছু তখনো ছিল, কিন্তু তার মধ্যে বিয়ে দিতে পারলেন না। বরেরা কালো মেয়ে পছন্দ করে না, পছন্দ করলে টাকা চায়, সে টাকা নেই। দুটো একটা বাউণ্ডুলে মেলে, যারা বিয়ে করতে চায়—তাদের নিরু পছন্দ করে না। বলে—বিষ খাব। নয় তো চলে যাব ঘর থেকে। তখন চল্লিশ সাল এসে গেছে। একচল্লিশে নিরুর অপবাদ রটল পাড়ায়। খুড়ীমা বলেছিলেন—তুই মর—তুই মর—তুই মর!

নিরু মালিশ খেয়েছিল মরবার জন্যে। কিন্তু খেয়েই ছুটে এসেছিল খুড়ীমার কাছে—মা গো, আমি বিষ খেয়েছি! নিরুর ভাগ্য! ভাগ্যই ভয় দেখিয়ে তাকে করিয়েছিল। নইলে এমনটা করবে কেন? স্থানীয় ডাক্তারের দয়ায় বেঁচেছিল, সামান্য পুলিশ হাঙ্গামা হয়েছিল। তাও সামান্য ঘুষেই মিটেছিল। এর পর খুড়ীমাও কিছু বলেন নি, নিরুরও বিয়ে

হয় নি। কলকাতায় বিশ-চব্বিশ-তিরিশ বছরের অবিবাহিতা মেয়ের তো অভাব ছিল না। নিরু পাড়ায় দুটো তিনটে বাচ্চা ছেলেকে পড়াতো। পনেরো টাকা পেত। তাও সব মাসে পেত না। তাগাদা করলে জবাব দিত। কিম্বা তিন মাস বাকী রেখে তারপর থেকে এক মাসের করে পেত। সেটা কম ছিল না তখন—তখনও বিয়াল্লিশ আসেনি। না আসুক—নিরুর সতেরো পার হচ্ছে। পাড়ার বখা ছেলেরা ঠাট্টা করত, ইশারা করত। নিরু তা সহ্য করে মুখ বুজে চলে এসে উপেক্ষা করবার কৌশল নিজেই আবিষ্কার করেছিল। তবে পাড়ার লোকে, প্রবীণেরা এবং আরও দু-চারজন তাকে স্নেহ সহানুভূতির চক্ষে দেখতেন। যে মেয়ের রূপের অভাবে, অর্থের অভাবে বিয়ে হয় না—মিথ্যা কলঙ্কের জন্য যে দুঃখে বিষ খেতে যায়—সে স্বাভাবিক ভাবেই স্নেহ পায়; সেও পেয়েছিল।

তারপর এল কাল—বিয়াল্লিশ। মহাকালের আগুন ছড়ানো বাতাস মাথায় করে সর্বনাশা বৎসর। বন্যা—সাইক্লোনে কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় মানুষ মরে নি—তাদেরও মরণ হয় নি। কিন্তু তখন চালের দর ডালের দর চড়ছে। কাপড়ের দরে আগুন লোগছে। খুড়ীমার সম্বল শেষ হয়ে শ-দুই-তিনে ঠেকেছে। গহনা সবই তার আগে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে—যা হয় হবে বলেই তবুও পড়েছিল। তখন কলকাতায় লোক কমেছে। রেঙ্গুনের পতন হতেই লোক পালিয়েছে। যাদের বাড়ীতে নিরু ছেলে পড়াতো—তাদের একজনরা চলে গেছে। দু বাড়ীর দশ টাকা আছে। তারাও বলতে শুরু করেছে—আর পারব না। আয়ে কুলুচ্ছে না।

এমন সময় বিশে ডিসেম্বর বোমা পড়ল। সকাল থেকে কলকাতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল। একুশে বাদ দিয়ে বাইশে। হাতীবাগানে বোমা পড়ল। নিরুর খুড়ীমা আঁ-আ-শব্দ করে আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নিরু থর থর করে কাঁপছিল—সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ—তারপর ছুটে এসে কাছে বসে চীৎকার করে ডাকলে—মা-গো-মা! মা! না, খুড়ীমা মরে নি। মরলে তার এ ব্যবস্থা করত কে? চব্বিশে বোমা পড়ল আবার। কলকাতার লোক পালাল ভয়ার্ত ভেড়া-ছাগলের পালের মত। যে যেখানে পারে, যার চলবার শক্তি আছে—সেই পালাল। যার সামান্য অর্থ আছে সেই পালাল। যার কোথাও কোন আত্মীয় আছে, সেই পালাল। তাদের খুড়ীমার চলবার শক্তি ছিল না—অর্থও ছিল না—আপনার জনই বা কোথায়? নিরুর দিদিরা এরা পালিয়েছে। ভাই কোথায় তা জানত না। তারা কোথায় যাবে? নারানের কথা মনে হয়েছিল—কিন্তু সে তো দিদির বাড়ী পোষ্য—কোথায় যাবে সেখানে? খুড়ীমার বাপের বাড়ীর ঘরদোর পড়ে গেছে শুনেছিল। সেখানেই বা কোথায় যাবে। অন্ধকার। না—সব শূন্য। মাথার উপরে আকাশ। সেখানে উড়ছে বম্বার প্লেন। খুড়ীমা হাঁপাতেন আর বলতেন—মরে যাব। নিরু—মরে যাব।

এরই মধ্যে একদিন নিরুর হাত ধরে কে টেনেছিল। চীৎকার করে উঠেছিল সে। ভাগ্যক্রমে লোক এসে পড়ায় বেঁচেছিল। সন্ধ্যে থেকে ব্ল্যাক আউটের রাত্রি ঠুঙ্গি পরা

আলো যেন হিংস্র কামার্ত দাঁত মেলে হাসে। ঘরে সন্ধ্যেবেলা থেকে খিল দিয়ে বসে থাকত তারা।

হঠাৎ একদিন হৃদয়ের চিঠি এল। "লক্ষ্মী তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।" যেমন নারানকে চিঠি লিখেছিল হৃদয়—তেমনি লিখেছিল মাসীকে।

ক'দিন পর মাসী বলেছিলেন—চল নিরু, হৃদয়ের ওখানে যাই।

—সে-খা-নে! কে-ন? ভয় সেই মুহূর্তে পেয়েছিল নিরু। মাসী বলেছিলেন—ওরে এখানে, বুঝতে পারছিস তো আমার দিন নেই, মরব। তখন—

—মা! খুড়ীমা! আরও আতঙ্কিত হয়েছিল নিরু। সেই মুহূর্তটি কল্পনা করে তার আতঙ্কের আর সীমা ছিল না। খুড়ীমা থামেন নি, বলেছিলেন—আমি মলে তুই কি করবি? তোকে যে টেনে ধরে নিয়ে যাবে! খাবি কি করে? ভাড়ার বাড়ী। আমার হাতে এখন একশো টাকাও নেই। ক'দিন চলবে? বাড়ীওলা বের করে দেবে। একটা আশ্রয় তো চাই তোর। সেখানে নারান আছে—লক্ষ্মী মরেছে—হৃদয় আছে। আর কিছু বলেন নি, বলতে পারেন নি, খুড়ীমা হাপরের মত হাঁপিয়ে ছিলেন।

নিরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল—তাই চল খুড়ীমা। পরদিন তারা এখানে রওনা হয়েছিল। মহাকালের বলি দিতে এসেছিল। নিরুর তবু আশা ছিল—যদি নারান থাকে! নারানদা! মনে মনে তাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিল।

নিরু গভীর রাত্রে নারানকে বলছিল সব। হৃদয় কাতরাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, জাগছে, কাতরাচ্ছে। নিরু ভিতরে যাচ্ছে—তার মুখে জল দিচ্ছে, বাতাস দিচ্ছে; সে ঘুমিয়ে পড়ছে—নিরু বাইরে আসছে। নারান চুপ করে দাওয়ায় বসে আছে। শুনেই যাচ্ছে। নিরু বললে—এমন কল্পনা তোমাকে করিনি। করতে পারি নি। তুমি আশ্চর্য হয়েছো নারানদা! প্রথমে—। হেসে বললে—আমরা এলাম আমাদের দেখে প্রথমটা অবাক হল—তারপর হাউ হাউ করে কাঁদলে লক্ষ্মীদির জন্যে।

—লোকটি খুব আঘাত খেয়েছিল। সত্যিই খেয়েছিল। বদলেছে ও। সত্যিই বদলেছে। ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে বলছি না! হাসলে নিরু।

নারান নির্বাক। শুনেই যাচ্ছে। নিরু বললে—মানুষ তো! লক্ষ্মীদিকে যত লাঞ্ছনা করুক, ভালবাসত। হয়তো নিজেও জানত না। তা ছাড়া তখন ও সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে। যুদ্ধের বাজারে বড়লোক হবার জন্যে সর্বস্ব বিক্রী করে মিলিটারী কণ্ট্রাক্ট নিতে গিয়েছিল। চোরা-কারবার করতে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই তো বড়লোক হয় না, ফকীরও হয়—ও ফকীর হয়েছিল। কিন্তু স্বভাব যেটা, অভ্যাস যেটা সেটা বদলের মধ্যেও বোধহয় মরে না। নইলে···।

হেসে বললে—খুড়ীমা এসেই সোজাসুজি বলেছিল—বাবা, আমি তো মরব। হয় এক মাস। নয় দু মাস! তার বেশী নয়। আমি এসেছি মেয়েটার জন্যে, বাবা। ও তো ভেসে যাবে। নয় তো চরম দুর্গতি হবে—মেয়ে-জীবনের সর্বনাশ হবে। তাই খবর পেয়ে এসেছি। তোমার ঘর খালি—ওই ছোট ছেলে। হয় তোমার হাতে, নয় নারানের হাতে—

তা নারান তো বলছ জেলে! ও বলেছিল—সে বড় সাংঘাতিক লোক হয়েছে মাসীমা, ভীষণ লোক। ভয়ঙ্কর। বুঝেছেন? খুড়ীমা চুপ করে থেকে বলেছিল—সে তো জেল থেকেই প্রমাণ, বাবা! তা তুমিই দয়া করে মেয়েটাকে নাও।

দয়া করে নয়, খুব আগ্রহ করেই নিয়েছিল আমাকে। আমি আপত্তি করি নি। আমার আপত্তির কি ছিল? তেজ? শক্তি? আশা? কার আশা করব? এক তোমার।

চুপ করে গিয়েছিল নিরু। নারান বলেছিল—থাক নিরু। নিরু বলেছিল—লজ্জা তুমি কেন পাচ্ছ নারানদা? দেখ, প্রেম তোমার সঙ্গে আমার তো সেই দু-তিন-দিনের। সত্যি বলতে ভাল লেগেছিল। এমন করে কোন ছেলের সঙ্গে তার আগেও বটে পরেও বটে, মিশিনি। কেউ এমন করে ফুল তুলে দেয় নি। কারুর এত সাহসও দেখি নি। তাকে ঠিক প্রেম বলে না। আর তুমি লেখা-পড়া জানতে না বলে—একটা অবজ্ঞাও ছিল। তবু ওর তুলনায় সেদিন তোমাকেই কামনা করেছিলাম। কিন্তু ও মিথ্যে করে বলেছিল, তুমি গুণ্ডা। আজ দেখে মনে হচ্ছে আমি ঠকেছি। ঠকিয়েছে ও-ই। সে কথাও ওর সঙ্গে হয়েছে আমার।

বিয়ে হয়ে গেল দশ দিনের মধ্যে। খুড়ীমার অসুখ বেড়ে উঠল। তিনিই ধরলেন। হয়ে গেল বিয়ে। আশ্চর্য! কটু কথা বলে নি আমাকে। সে পুরনো কথা তোলে নি। শুধু হেসে বলেছিল—মজা দেখ, সেদিন কি রাগটাই করেছিলাম। তা, তখন কি জানি যে, আমার হাঁড়িতেই চাল দিয়ে তুমি বসে আছ? আমি বলেছিলাম—চাল কি চুলো দুটোর যে কিছুই নেই আমার। ভাতের চাল তো দূরের কথা। থাকলে সে আমি দিতাম না। বিধাতা দিতে গেলেও হাত চেপে ধরতাম। দুটো ভাত—আর এই ভাঙ্গা চাল-এর দাম এত, তা জানতাম না। ও চুপ করে ছিল কিছুক্ষণ। আমার বলে ভয় হয়েছিল। কিন্তু ও বলেছিল—আমার অন্যায় হয়ে গেল, নয়? হুঁ, লক্ষ্মীকে বলেছিলাম। তাছাড়া—। হঠাৎ বলেছিল—নারানের সঙ্গে। তা মানাতো তোকে। ছোঁড়া উপযুক্ত হয়েছে। তা? কি করব!

একটা ভয় ছিল ওর। লক্ষ্মীদির প্রেতাত্মার ভয়। এটা তাই কি কি জানিনে। হয়তো দুটোই। ওর অসুখ তা থেকেই। খুড়ীমা মারা গেল মাস দেড়েক পর। শ্মশানে গেল—ফিরে এল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে। বললে—শ্মশানে না কি লক্ষ্মীদি ওকে ডেকেছে। মদ অবিশ্যি খেয়েছিল। শরীর ভাল ওরও ছিল না। এদেশের সর্বনেশে জ্বর তখন হচ্ছে। ওকেও ধরেছে। সেদিন আমাকে বললে—আঁকড়ে ধরে থাক। থর থর ক'রে কাঁপছিল ভয়ে। বলেছিল—নারানের সঙ্গে বিয়েটা দিলেই ভাল হত। তুমিও সুখীও হতে। শুধু ছেলেটার জন্যে, বুঝেছে—। ঠিক এর এক মাস পরে জ্বরের মধ্যে লক্ষ্মী-লক্ষ্মী বলে ভয় পেয়ে মূর্ছা গেল। শুয়েছে তারপর থেকে।

তা—নিরু বলেছিল—তা, বীরেনকে পেয়ে আমার দুঃখ আমি ভুলেছি নারানদা। বড় ভাল ছেলে। বড় মায়াবী। বড় স্নেহকাঙাল। ঠিক তোমার মত। আমার বুক ও ভরে

দিয়েছে। সব দুঃখ আমি ভুলে যাই। ওকে একবার দেখে আসি আমি, দাঁড়াও।

নিরু উঠে গিয়েছিল বীরেনকে দেখতে। স্বামীকে দেখতেও বটে।

নারানের সারা অন্তরটা নিরুর প্রতি স্নেহে—হেসে গোসাঁই বলেছিল—প্রেমে যদি বলেন, প্রেমেই—যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, তেমনি হৃদয়ের উপর আক্রোশে ঘৃণায় ভরে উঠেছিল। সে ঘৃণা, সে আক্রোশে তাকে অধীর করে তুলেছিল। নারান বলে—তার স্পষ্ট মনে আছে সে রাত্রির কথা—সে অধীর হয়ে উঠে চলে এসেছিল নদীর ধারে। ভয় তো নারানের ছিল না। নদীর ধার বালুচর শরতের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। দেড় বছর জেলে বন্ধ ছিল। সেদিন এমনি সুন্দর রাত্রিতে এত সুন্দর বালুচরে দাঁড়িয়েও তার মন শান্ত হয় নি—সে আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। বেশ চীৎকার করেই বলেছিল—তুনি মর, তুমি মর, তুমি মর।

—নারানদা! পিছন থেকে মিষ্ট কণ্ঠে ডেকেছিল নিরু। সে চমকে উঠেছিল। ফিরে তাকাতেই নিরু বলেছিল—উঠে চলে এলে? এস, বাড়ী এস। কেন মিথ্যে ওকে অভিসম্পাত দিচ্ছ। নিজের সুখ, তার জন্যেই তো মানুষ দুনিয়ায় আসে। ও দুর্ভাগা মানুষ। জান—লক্ষ্মীদির ভয়ে আমাকে ও ছুঁতে পারে না। মরতেও আর বেশী দেরি নেই। ডাক্তার একজন আসে। সে বলছে—হার্ট জখম হয়ে গেছে।

* * *

পালা যত শেষ হয়—চাল তত দ্রুত হয়। মহাকালের তাণ্ডবেও তাই। তেতাল্লিশে সে মাঝখান। ঝম্ ঝম্ ক'রে বাজছে পায়ের ঘুঙুর। করতালে ঝনো-ঝনো-ঝনো শব্দ বাজছে। তার মধ্যে মানুষের হৃৎপিণ্ডের তাল রেখে চলা সোজা নয়। দিন চারেক পরই হৃদয় মারা গেল। মারা গেল বসে বসে। সকাল বেলা পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসত। একটু কড়া মেজাজ হ'ত। রাত্রের ভয়টা কাটতো তো। তা ছাড়া বিশ্রামের জন্য সুস্থও একটু থাকত। চায়ের জন্য, খাবারের জন্য চেঁচাত। নারান চলে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু হৃদয়ই দেয় নি। বলেছিল—ওরে, দু দিন থাক। তুই য' দিন এসেছিস—লক্ষ্মীর আঁচলের খসখসানি আর পাই নি। তা ছাড়া তোর কাছে অনেক অপরাধ আমার। মরতে বসেছি রে। বুঝতে পারছি আমি আর বাঁচব না। না। থাক দু দিন। তা ছাড়া ভাই—

তার হাত ধরে বলেছিল—আমি মরে গেলে ওদের ভার যে তোকেই নিতে হবে ভাই।

—হৃদয়দা—

—চুপ কর নারান। শোন। আমার বিষয় সম্পত্তি ক'বিঘে জমি ছিল তা বেচেছি। ব্যবসা করতে গিয়েছিলাম। ওরা কি খাবে? তা ছাড়া ছেলেটাকে পড়াতে হবে। আর ওই মেয়েটা! মাসী ওকে তোর হাতে দেবার জন্যেই এনেছিল। তুই জেলে তখন। তার উপর আমার দুর্মতি লোভ, আর ওর ভাগ্যি। তাই বা কি ক'রে বলি। লক্ষ্মী বলেছিল—গা ছুঁয়ে বল আমায়, তুমি বিয়ে করবে না। আমি বলেছিলাম—করব না, করব না, করব না। সে বলেছিল—আমি তা সইতে পারব না। মরেও পারব না। তা হলে ফিরব আমি

তোমাকে নেবার জন্যে।

—ও তোমার মনের ভ্রম হৃদয়দা। ও ভ্রম। নারান বলেছিল।

—না রে। ঘাড় নেড়েছিল হৃদয়। তারপর বলেছিল—যাক গে সে কথা। সে আমার কথা। তোর নয়। তুই না মানিস, আমি মানি। এখন—ওই মেয়েটা। বীরেন তোর ভাগ্নে, তুই ছেলেবেলায় ভালবাসতিস—তুই মানুষ ভাল, ওকে ফেলবি না—তা জানি। কিন্তু ওই মেয়েটা? ওরে, এর মধ্যেই নদীর ওপারের গুণ্ডারা ওর দিকে তাক ক'রে রয়েছে। রাজ্য তো দেখছিস, অরাজক। ওরাই রাজা। ওকে যে তোকেই রক্ষে করতে হবে ভাই! একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আমি অন্যায় করে বিয়ে করেছি রে। ও তোকেই কামনা ক'রে এসেছিল।

তিন দিন ধরেই এই সব কথা হচ্ছিল। সেদিন সকালে বসে বললে—জানিস, একটু ভাল মনে হচ্ছে রে। কাল রাতে লক্ষ্মীকে দেখেছি। মুখখানা রাগ রাগ নয়, হাসি হাসি।

হঠাৎ বলেছিল—শোন। হ্যাঁরে—আজকাল তো বিধবা বিয়ে করছে লোকে—

নারান বলেছিল—ছিঃ হৃদয়দা।

হৃদয় বলেছিল—ওরে, এ চারদিন ওর যে আনন্দ দেখছি রে।

নারান দৃঢ়স্বরে বলেছিল—আজই তা হ'লে চলে যাব আমি।

—কিন্তু আমার মৃত্যু-সংবাদ পেলে আসিস। নইলে মেয়েটাকে বেজাতে লুঠে নিয়ে যাবে।

নারান বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গিয়েছিল। গিয়ে বসেছিল নদীর ধারে। কিছুক্ষণ পর ভল্লাদের একজন ছুটে এসে বলেছিল—শিগ্‌গির আসেন। হৃদয় ঠাকুর গেলেন।

—সেকি! চমকে উঠেছিল নারান।

—হ্যাঁ। বসেছিলেন ঠেসান দিয়ে। ওষুধ এনে বউ ডাকলে—খাও। রা' নাই। নেড়ে দেখে মরে গিয়েছে। তেতাল্লিশের মড়কে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পড়ে মরেছে, বসে মরেছে, গাছে চড়ে চালে চড়ে হঠাৎ মারা গিয়ে নীচে পড়েছে ফলের মত।

একটু জল খেলে গোসাঁই। তারপর বললে—মমতা মধুও বটে, মদও বটে। মমতা সোনার সুতো, কিন্তু লোহার শেকলের চেয়ে শক্ত আর জীবন্ত সাপের মত পাকে পাকে কষে বাঁধে। ছিঁড়তে যারা পারে, তারা হয় দেবতা—মহাবীর, নয় তো, জানোয়ার। সাধারণ মানুষের ওই পাকের মধ্যে যত কষ্ট, তত আনন্দ। হৃদয়ের শ্রাদ্ধের শেষে নারান ওই বাঁধন পরেই ফিরল। দশ দিনে শ্রাদ্ধ গেল। দশ দিনের মধ্যে অন্তত বিশবার ওপারের গুণ্ডারা ছুতো-নাতায় এপারে এসে পাক দিয়ে গেল। তখন লীগের রাজত্ব। জাত হিন্দু তখন বড় অসহায়। ইংরেজ হাড়ে হাড়ে চটা। দেশের নেতারা জেলে। গুণ্ডারা তখন অবাধে অত্যাচার করে অসহায় দুর্বল হিন্দু যারা, তাদের ওপর। হৃদয়ের গ্রামটি ছোট গ্রাম—ঘর পনেরো ব্রাহ্মণের বাস—সবাই দরিদ্র, দুর্বল, ভীরু। গ্রামের বল ছিল ভল্লারা। রাম ভল্লা নেই। যারা আছে—তারা কঙ্কালসার। ওপারের গ্রামখানা প্রকাণ্ড। কতকগুলো দুর্দান্ত

লোকের বাস। তাদের পৃষ্ঠপোষক আছে কয়েক ঘর সম্পত্তিশালী লোক। নিরু সংকল্প করেই রেখেছিল—সে যাবেই, নারান পড়েছিল সোনার সুতোর বাঁধনে। বীরেন তার ভাগ্যে। তার প্রতি মমতা তার সেই বাল্যের। আর নারান মিথ্যে বলে না। সত্য বলে সে। সে নিরুকে ভালই বেসেছিল। তবে জানোয়ার সে নয়। না নয়। সংসারে নারীর প্রেম মানেই যারা বলে দেহ-কামনা—তারা কামুক—বিকৃত মন—ব্যাধিগ্রস্ত মন—সে তাদের দলের নয়। নিরুর সঙ্গে সে খোলা কথাই কয়েছিল। বলেছিল—নিরু, আমি তোমার অপমান করব না। তবু মানুষের মন—যদি চঞ্চল হয়, বলব তোমাকে; তুমি রাগ না ক'রে চলে যেয়ো।

নিরু তার হাতে একটা টিনের বাক্স দিয়ে বলেছিল—এটা রাখ। এইটে তার বিছানার তলায় মেঝেতে ছিল। আমাকে বলেছিল আগে। কিছু থাকবে, মরলে তুলে নিয়ো। ওতে সাতশো টাকা আছে আর গয়না আছে কয়েকখানা, বোধহয় লক্ষ্মীদিদির। ওটা—যে দিনের কথা বলছ, সেদিন খরচ শেষে যা থাকবে, তাই দিয়ে ফেরত দিয়ো। দেখ, সে আমাকে বলে গেছে বিধবা বিয়ে উঠেছে, লোকে করছে, তুমিও করো। কিন্তু বীরেনকে ছেড়ে তার মনে ধাক্কা দিয়ে তা তো পারব না আমি। চল।

ভল্লাদের গাড়ী নিয়ে রওনা হয়েছিল। কিছুদূর এসে নারানের মনে হয়েছিল তার নিজের গ্রামের কথা। ঘাটবলরামপুরের কথা। সে কথা দুঃস্বপ্নের মত, দুশ্চিন্তা। চঞ্চল হয়ে উঠবে গ্রাম। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে নিরুকে। রুখু চুল; ছোপধরা কাঁসার বাসনের মত হলেও কালো মেয়েটির মুখে ছোপের তলা থেকে একটি মার্জনার আভাস। দীর্ঘাঙ্গী। হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দু'গাছি ক'রে সোনার পাতমোড়া ব্রোঞ্জের চুড়ি পরেছে। একটি উদাসীন নিশ্চিন্ততার নির্লিপ্ত প্রশান্ত। একটা স্বস্তিতে সে ক্ষুব্ধ, একটু বিষণ্ণ। বীরেন মাথা কামিয়েছে। সে কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। নিরু তার দৃষ্টি দেখে একটু হেসে বললে, কি?

হেসে নারান বলেছিল—তোমাকেই দেখছি।

বিচিত্র হেসে মাথায় ঘোমটা টেনে নিরু বলেছিল—আমাকে কি দেখে? দেখতে নেই।

নারান বলেছিল—দেখছি আর ভাবছি আমি দেখব না, কিন্তু সেখানকার লোক? তারা কি বলবে?

—বলুক, যা বলবে বলুক।

—কিন্তু তারাও তো দেখবে!

নিরু স্থির প্রসারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সেখানেও দেখবে?

—এ তো সর্বত্র নিরু। তাই ভাবছি।

নিরু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—তুমি রক্ষা করতে পারবে না? আমি কি করি বলতে পার?

—সে ভাবনা আমিই ভাবছি, তুমি ভেবো না।

আমি নিশ্চিন্তি। বলে সে টাপরের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ মুদেছিল। নারান দুঃস্বপ্নের মত দুশ্চিন্তাগুলোকে বার বার মনে মনে বিদ্রোহ করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। কার্তিকের প্রথম। এবার মাঠে ফসল অপর্যাপ্ত। ধানের এবার আর শেষ নেই, পরিমাপ নেই। আশ্চর্য। প্রকৃতিরই হোক আর সেই বিধাতারই হোক, কি ভাঙ্গা-গড়া? গত বৎসর এত বড় প্রলয়ের পর—দুর্ভিক্ষ-মড়কে যখন দেশ শ্মশান হয়ে উঠেছে, তখন এ কি খেলা। একটি সুন্দর সুবর্ষা। মাঠ জুড়ে ধান, ধান আর ধান। কিন্তু সব জমি চাষ হয় নি। কঙ্কালেরা বুক দিয়ে চাষ ঠেলতে পারে নি। তা না পারলেও এবার অনেক ধান—অনেক ধান। বিচিত্র মানুষের মন। কিম্বা হয়তো মানুষের মন সুখের সামান্য আভাসেই, প্রত্যাশাতেই সব দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্ন ভুলে যায়। রাত্রির অন্ধকারে জেলখানাটা বুকে চেপে বসত। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বাইরের গাঢ় অন্ধকার আর কালো গাছপালার মাথাগুলো তার দুঃস্বপ্নকে বাস্তব বলে ভ্রমে ফেলত। কিন্তু সকালের আলোর আবছা উন্মেষেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত। স্বপ্ন মনে থাকত না। এবারে মাঠভরা অপর্যাপ্ত ফসল তার দুশ্চিন্তা, তার বিদ্রোহ কল্পনাকে ঢেকে দিল একটি রোদ-পড়া সবুজ পর্দা দিয়ে। ঝলমল করতে লাগল। সেই পর্দা পিছনে রেখে নতুন কল্পনা গড়ে উঠতে লাগল তার মনে। গাড়ীর ঝাঁকানিতেও ভাঙল না। পথের মানুষ দেখে বিক্ষিপ্ত হল না। দূরে দিগন্তেও হারিয়ে গেল না। এরই মধ্যে সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়ীতে বসে বসেই ঘুমুচ্ছিল; ভাঙছিল, জুড়ছিল; চোখ মেলছিল, আবার বুজে আসছিল আপনি। দুপুর গড়াচ্ছে, ঘুমের সময় এটা।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙ্গল। সামনে চেয়ে দেখলে···তাদের গ্রামের ধারের বিল। হাঁস আসতে শুরু হয়েছে। মানুষেরও ব্যাধবৃত্তি জেগেছে।

হাঁসগুলো উড়ছে। বন্দুকের পাল্লার বাইরে পালাচ্ছে। সামনের শরবনের মাথায় ধোঁয়া উঠছে বন্দুকের নল থেকে। এরই আড়াল থেকে লুকিয়ে মেরেছে। সেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাটা একবার বিদ্যুৎচমকের মত চমকে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করলে সে। বেলা অনেক হয়েছে। গাড়ীতে বীরেন-নিরু। দেরি হবে। ওদের দিকে সে তাকালে। তারাও জেগে উঠে ঘাড় উঁচু করে বিল দেখছে। বীরেন বলে উঠল—ওঃ, কত পাখী! ওরে বাবাঃ। দেখ মা, দেখ, ওই-ওই-ওই।

নারান বললে—আমাদের গাঁয়ের বিল। হাজার হাজার হাঁস আসে।

বীরেন সোৎসাহে বললে—পোষা যায় না? নারান হাসলে—না। বুনো হাঁস এরা।

নিরু বললে—আহা, বড় সুন্দর বিল। স্নান করতে ইচ্ছে করছে। জান, আত্মহত্যা করলে এখানে বিলে ডুবে মরাই ভাল।

—কেন? ও কথা কেন? বীরেন রইল। মানুষ করতে হবে। আমাদের স্নেহের সম্পর্কে ভরা একখানি সংসার গড়তে হবে। আমি সুখের উপকরণ আনব। তুমি শান্তির ঘট ভরবে। বীরেন আশা আমাদের—

—কোথাকার গাড়ী ? গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মালিকানার আমেজ সে স্বরের সর্বাঙ্গে। চমকে উঠল নারান—নিরুর মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালে। সে চিনেছে। হ্যাঁ সেই। বড় ঘাসবনটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ভূতনাথবাবু। সঙ্গে একজন পাইক। আর দুজন লোক। চাষী শ্রেণীর। সে অবাক হয়ে গেল। না, তার থেকেও বেশী। স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কথা বললে না। মনে হল ভূতনাথবাবু কিছু বলতে চাচ্ছে—কিন্তু নারান দাঁতে দাঁতের পাটি চেপে বসে রইল। দৃষ্টিটা সামনে প্রসারিত করে দিলে। তার মনে অকস্মাৎ এক মুহূর্তে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার ক্ষোভ। তার আক্রোশ। কিন্তু একি ? এও সম্ভব ? সেই ভূতনাথবাবু ? মার্জনার ছাপ সর্বাঙ্গে, একটি অভিজাত লাবণ্য সর্বাঙ্গে। সেই এই ? একটা বীভৎস-ভয়ঙ্কর স্থূলকায় মানুষ। চোখ লাল। তাতে কি উদ্ধত উগ্র রুষ্ট দৃষ্টি। গায়ে মাত্র এক গেঞ্জি, এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে দুটো মরা হাঁস। ঠোঁটের দুপাশে পানের রস উপ্‌চে পড়ছে। সঙ্গের পাইকটার হাতে বোতল। পাইকটা ধমকে উঠল—এই গাড়োয়ান। শুনতে পাস না ? কোথাকার গাড়ী ?

ভূতনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বললে—যাক। নিরু প্রশ্ন করলে—ও কে নারানদা ?

—ও ? ও সেই। ভূতনাথবাবু। যার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে জেল গিয়েছিলাম। নিরু শিউরে উঠল—মা গো ! কি ভয়ঙ্কর লোক।

—ভয় করছে ? হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিল নারান। বদলে গেল নিরু—না, ভয় করবে কেন ? তুমি রয়েছ, আমি কেন ভয় করব ?

গাড়ীটা গ্রামের মধ্যে ঢুকল ; সম্মুখেই বাউড়ীপাড়া—পাড়াটার পাশ দিয়ে রাস্তাটা গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে। বাউড়ীপাড়ার পরে কাঠা-কয়েক ফাঁকা জায়গার পরেই তার বাড়ী। বাড়ীটার দিকে তাকালে নারান। বাড়ীটা আছে, গোটাই আছে। তবে অনেক মার খেয়েছে। অনেক ঝাপটা খেয়েছে। সামনে যে একতলা মাটির ঘরটা নতুন করেছিল—সেটার দাওয়ার চালটা নেই। ভেঙে পড়ে দাওয়ার উপরেই কঙ্কালের মত পড়ে রয়েছে। বিপিন এসে দাঁড়াল সাড়া পেয়ে।—নারান ভাই। এলে ? নারান বললে—হ্যাঁ। নাম্ নিরু। বীরেন, নাম্।

নামল ওরা। বিপিন বললে—ভাগ্নে ? নারান বললে—হ্যাঁ। খবর জান তো ? খবর তো পাঠিয়েছিলাম। সেটা পাঠিয়েছিল সে। বিপিন বললে—হ্যাঁ। আঃ। এক বছরের মধ্যে। তা—ইনি ? নারান বললে—ওই নিরু। মাসীমার ভাসুরঝি—পালন করা মেয়ে। হৃদয়দার সঙ্গে এই আষাঢ়ে বিয়ে হয়েছিল। তারপর নারান বললে—কিন্তু এ কি হয়েছে গাঁয়ের চেহারা বিপিনদা ? বিপিন বললে—সব মরা নারান ভাই, স-ব মরা আর আধমরা। মেরে দিয়ে গিয়েছে ভগবান। যেটুকু জান ছিল—তাও থাকবে না। গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভূতনাথ চাটুজ্জে। নারান বললে—দেখে এলাম। দেখা হয়ে গেল গাঁ ঢুকতে। কিন্তু ও

কি চেহারা হয়েছে বিপিনদা।

—চুপ করো। বলো না। মুখের দিকে তাকাবারও সাহস হয় না কারু।

* * *

সত্যি। অক্ষরে অক্ষরে বিপিনের কথা সত্যি। ভূতনাথের মুখের দিকে তাকাতেও কেউ সাহস করে না, কথা অমান্য করবে কি? তার কোন কাজের প্রতিবাদ করবে কি? প্রথম পরিচয় সেই দিনই পেলে। সে বাড়ীটা পরিষ্কার করবার জন্য বাউড়ীদের ডাকতে গেল। তারা মাথা চুলকে বললে—আজ্ঞে মশাই। নারান জিজ্ঞাসা করলে—কি? আমি পয়সা দেব। তারা বললে—আজ্ঞে, পয়সার জন্যে নয়। দেহ তো কারুর ভাল নয়। নারান বললে—বেশ তো, দশজনে আয় পাঁচজনের জায়গায়। কানাই বললে—আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, রায়বাড়ীতে না শুধিয়ে কি করে যাই বলেন। একটা ঝগড়া—কি বলে তো রয়েছেন আপনার সঙ্গে। নারান স্তম্ভিত হয়ে গেল। কানাই আবার বললে—উনির এখন পেবল পেতাপ। সরকার হাতধরা। তেমুনি শাসন। তার ওপর দেখেন, উনিই ধানটান দেন। গরীবদের জন্যে আজ সাত-আট মাস নোঙ্গরখানা চালাইচেন।

ফিরে এল নারান। নারান নারান, বিপিনকেও ডাকলে না। কোদাল নিয়ে সে শুরু করলে কাজ। নিরুকে বলল—তুমিও লাগ। খুশী হয়ে নিরু বীরেন দুজনেই লেগে গেল।

বিপিন বেরিয়ে এল। বললে, তোমরা বস মা। আমরা দু ভাইয়ে করছি।

নারান বললে—তুমি লাগবে বিপিনদা?

—লাগব। পিথিমীতে সবাই মরে না, ভাই। বেঁচে থাকে বই কি কতক কতক, নইলে পেলয় তো হয়েছে অনেকবার। ছিষ্টি রয়েছে কি ক'রে?

সন্ধ্যেবেলা বিপিন বললে সব কথা। রান্না ছিল না। বিপিনের মা রোগশয্যায় শুয়ে আছে, নারানের ভিক্ষে-মা সে। সে-খাবার নিমন্ত্রণ করেছিল। আয়োজন বিপিনের বউ করে দিলে—রান্না করে নিলে নিরু। বিপিন বললে সব কথা। বন্যা-সাইক্লোন-দুর্ভিক্ষ-মড়ক এক বছরে প্রলয়ের মতই এসে দেশটাকে যেন মাথায় মুষল মেরে অজ্ঞান আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল। যাবার সময়ে যেন মুষলটা দিয়ে গেল ভূতনাথের হাতে। সেই মুষল হাতে প্রলয়ের প্রহরী হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে পাগলের মত।—তা ছাড়া কি বলব?

না, বলবার কিছু নাই। তারপর কয়েক দিন সে অঞ্চলটা ঘুরে বেড়াল। দেশ সত্যই মরার দেশ। নিষ্ঠুর আঘাতে আঘাতে প্রাণশক্তি শুধু ধুঁকছে। মানুষ যারা ছিল—তারাও মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। অজয় হাজরা কঙ্কাল হয়ে গেছে। শিবু ডাক্তার লোঙরখানা চালাচ্ছে তার গ্রামের দিকে। দু-চারটে মিটিং করে। লাল-ঝাণ্ডা তাদের। বড় বড় চাষীরা স্তব্ধ। গরীব ভদ্রলোকদের চোখে অসহায় আতঙ্কিত দৃষ্টি। ভাষা নাই। শক্তি নাই। গরীবের মেয়েরা পেটের জ্বালায় দেহ বিক্রী করছে। এরই মধ্যে মুষল হাতে মহাকালের তাণ্ডবের অনুচরের মত ভূতনাথ চাটুজ্জে। সে এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট; সরকারের ঘরে তার দহরম-মহরম; সরকারী কর্মচারীরা তার ঘরে আসে; দারোগা তাকে খাতির করে।

সে গরীবদের খেতে দেয়, শাসন করে। দান করে—আবার উৎপীড়ন করে আদায় করে। বন্দুক নিয়ে বিলে হাঁস মারে। তার লোকে মদ চোলাই করে—সেই মদ করে আকণ্ঠ পান। গোটা অঞ্চল তার খাতক—গোটা অঞ্চলের সে শাসক, গোটা অঞ্চলে সে উৎপীড়ন করে আদায় করে। আবার এই অঞ্চলে সে দাতা। গ্রামে থাকে না, এক ক্রোশ দূরে একটা মহলে একখানা বাগানবাড়ী করেছে—সেইখানে যায়। থাকে। আবার আসে। সকল ভদ্রলোককে সে ছেড়েছে। তার সঙ্গী আছে লাঠিয়াল দুজন, আর কয়েকজন দুর্দান্ত চাষী। মদ খায়।

বিপিন বললে—ওই মদ! মদেই এমন হয়ে গেল! আর বুঝেছ—মদের সঙ্গে যা জোটে তাই। তার সঙ্গে ক্ষ্যামতা। শুধু আগুন নয়—আগুন বাতাস—তার সঙ্গে খড়-কাঠ-ঘি—যা নিয়ে আগুন জ্বলে তাই সব মিলে—সেই মানুষটা। মানুষটা রাগী ছিল, অহঙ্কারী ছিল—কিন্তুক খুব মন্দ তো ছিল না। এ সেই—সেই ধানের সুদ ছেড়ে দেয়া তো মনে আছে!

নারান বলেছিল—হ্যাঁ। সেও ভাবছিল। বিপিন বলেছিল, বিয়াল্লিশেও লোকটা স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়েছিল—আগস্ট মাসে। মদ খেয়েছিল বলে কংগ্রেসীদের সঙ্গে ঝগড়া হল। তো চলে এল—বললে দূর তোর আন্দোলন! তার পরেতে রূপলাল ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর ছিল, তাকে বোর্ডে জবাব দেওয়ালে—নিয়ে নিজে মেম্বর হল। তা' পরে পেসিডেন হ'ল। নিজে খুব খয়রাত করলে। খরচের দিকে তাকায় নি। একটু চুপ করে থেকে বললে—বুঝলে, সম্পত্তি-টম্পত্তি যদি শ্বশুরের না হয়ে ওর বাপের হ'ত—তা হলে হয়তো এমনটা হ'ত না। বুঝলে! টাকাপয়সার ওপর এত টান, অত্যাচার করে আদায়—বুঝলে, এটা এই জন্যে। তার ওপর মেয়ের নেশা ধরিয়ে দিলে রূপলাল। কোথা থেকে এক খেতে-না-পাওয়া বিধবাকে নিয়ে এল—। নিজেই এনেছিল। তাকে দেখে খেপল। তারপরে লড়াই। রূপলালকে খালে পুঁতে দিয়েছে। মেয়েটা কেড়ে নিয়েছে।—রূপলাল এখন ওর শত্রু। কিন্তু কি করবে ওর!

নারান তখনও ভাবছিল—শুধু ছোট একটি হুঁ-ই পুরেছিল। ভাবছিল নিজের কথা। ভগবানকে ডেকে বলেছিল—একটু সহ্যশক্তি দিয়ো। না-হলে একটা ছেলে আর ওই মেয়েটা—ওরা ভেসে যাবে! কিন্তু—। আশ্চর্য লাগছে—এই দেড় বছরের মধ্যে এমন ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়ে গেল! পৃথিবীর মালিক কি শয়তান হয়েছে! শয়তান ভগবানকে বধ করেছে—না বেঁধে বুকে পাথর চাপিয়ে হতচেতন করে দিয়েছে!

—কি করে হয়েছি? তা জানি না। ভাবি না তো কখনও। তবে হয়েছি। চোখে দেখ। বলেছিল ভূতনাথ নিজেই। নারান শুনেছিল। হিরণহাটি ইস্টিশানে একদিন সে ট্রেনে উঠেছে, সদরে যাবে, ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল্স্-এর কাছে। পাঠশালাটা খুলেছে আবার। এডের দরখাস্ত করবে। তার কামরার পাশেই ইন্টার ক্লাস। তার ইন্টার ক্লাসের একজন বাবু লোকের সঙ্গে কথা বলছিল ভূতনাথ চাটুজ্জে। তাকে ডেকে ভদ্রলোক

সবিস্ময়ে বলেছিল—এ কি চেহারা হয়েছে! ভূতনাথ হা হা করে হেসে বলেছিল—খুব খারাপ। ভীষণ ভয়ঙ্কর। নয়? দেখেছি আয়নাতে। ভদ্রলোক বলেছিল—কি করে হ'ল? সেই চেহারা তোমার! আবারও হেসেছিল ভূতনাথ, বলেছিল—কি করে হয়েছে জানি না। ভাবি না কখনও। তবে হয়েছি। চোখে দেখ। সে হাসিতে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেছিল নারান। নারানকে ভূতনাথ দেখেছিল। একবার তাকিয়েও ছিল তার দিকে। তারপর বলেছিল—দেখ, এক বিখ্যাত চিত্রকর একটি সুন্দর ছোট ছেলেকে দেখে তার ছবি এঁকেছিলেন। ছবিখানাও খুব সুন্দর হয়েছিল। নাম দিয়েছিলেন দেবদূত। খুব খ্যাতি হল তাঁর। কিছু দিন পর তাঁর ইচ্ছে হল—এর ঠিক উল্টো ছবি আঁকবেন। পিশাচ তিনি খুঁজতে লাগলেন। মনের মত কুৎসিত ভয়ঙ্কর তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি জেলখানা খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে পেলেন একজন ভয়ঙ্কর কয়েদী। ভীষণদর্শন। তিনি অনুমতি নিয়ে তার ছবি আঁকতে লাগলেন। একদিন কয়েদীটা হাসছিল। তিনি বললেন—হাসছ কেন বল তো? সে বললে—দেখ, আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন একজন আমার সুন্দর চেহারা দেখে ছবি এঁকে নাম দিয়েছিল দেবদূত। চিত্রকর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বললেন—তুমি সেই? সে হেসে বললে—আমিই সেই। তিনি বললেন—কি করে হলে তুমি এমন? সে বললে—তা তো জানি না। তবে হয়েছি। আমি সেই! তা বন্ধু, আমিই সেই।

বন্ধু স্তম্ভিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারানও। বন্ধু বললে—কিন্তু, কেমন আছ নিজে? ভূতনাথ হেসে বলেছিল—দোর্দণ্ডপ্রতাপে হৈ হৈ করে বেশ আছি। মদ খাই। দেশের লোকে ভয় করে, মৃত্যুকামনা করে, আমি মরি না। খবর পাই, আমাকে মারবার পরামর্শ হয়, কিন্তু আমি নির্ভয়ে ঘুরি। আমি মরব না।

ট্রেনখানা ছেড়ে দিয়েছিল—ভূতনাথবাবু মাস্টার-মাস্টার বলে হাঁকতে হাঁকতে স্টেশনের ভেতরে ঢুকেছিল। নারান ভাবতে ভাবতেই গিয়েছিল সারা পথ।

কি করে হয়েছি জানি না, তবে হয়েছি। হয়। আর গল্পটাও সমস্ত পথ সে ভেবেছিল। কি ভয়ঙ্কর! হ্যাঁ, ঠিক বলেছে—হয়েছে। কি করে হয়েছে, কেন হয়েছে—সে নারান জানে না, বুঝতে পারে না, তবে হয়েছে। আরও বিস্ময় লাগল তার এই যে, ভূতনাথ জানে দেশে তার শত্রুও অনেক হয়েছে। রূপলাল তার শত্রু, ফেলা মোড়ল তার শত্রু, ঐ ভূষণ পাল তার শত্রু, কেষ্ট দাস তার শত্রু, কানাই বাউড়ী তার শত্রু। শত্রু তার অনেক। শিবু ডাক্তারও তার শত্রু—শত্রু না হোক, তার বিরোধী—সক্রিয় শত্রু হয়তো নয়। তার মধ্যে সে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনে নয়, রাত্রেও সে চলে গ্রাম অতিক্রম করে নদী পার হয়ে শস্য-ক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে বন-জঙ্গলের ভিতরের পথ ধরে তার সেই প্রমোদ-ভবনে—কিম্বা প্রমোদ-ভবন থেকে ফেরে গ্রামে। পদব্রজেই বেশী—কখনও গাড়ীতে। সঙ্গী তার কখনও একজন, কখনও দুজন, কখনও চারজন। নিস্তব্ধ রাত্রি তার ভারী পায়ের আওয়াজে চমকায়, তার স্খলিত কণ্ঠের শাসনবাক্যে শিউরে ওঠে। মানুষ এমন ভাবে ভীষণ হয়ে ওঠে সে শুনেছিল,

দেখে নি। ডাকাতদের সে জানে, রাম ভল্লাদের সে জানত। তারা অনেক ভীরু এর চেয়ে। মানুষের সাড়ায় তারা লুকোয় —এ মানুষকে তাড়া দিয়ে সাড়া দেয়।

কাল—একমাত্র কাল ছাড়া এর আর কৈফিয়ৎ নেই। বহু যুগের, হয়তো কয়েক শতাব্দীর গ্লানি জমে জমে একটা কাল আসে—বিষাক্ত কাল, ভয়ঙ্কর কাল, কাল—সেই কাল এমনই মানুষ তৈরী করে দিয়ে যায়। এ মরে। কিন্তু মারে কে? সে মানুষ কোথায়? সে? না। সে ভার নিয়েছে বীরেনের—নিরুর। সে শান্তি চায়। শান্ত জীবন। ভাবতে-ভাবতেই সে গিয়েছিল সদরে—ভাবতে ভাবতেই সে ফিরেছিল বাড়ী। পাঠশালার এড হয় নি। জেল খেটেছে মারপিট করে। মনটা তিক্তই ছিল, তবু তার সঙ্কল্প তিক্ত হয় নি, শিথিল হয় নি। শান্ত জীবন, শান্তি চায় সে। নিরু বীরেনকে নিয়ে শান্ত সংসার।

* * *

বেলার দিকে তাকিয়ে গোসাঁই থামল। জলের জাগ আর গেলাস টেবিলের উপর ছিল। সে জল খাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। এবার ঢক ঢক করে সব জলটা নিঃশেষ করে ফেললে। আমি ধীরেনকে বললাম—জল দে।

গোসাঁই স্থিরদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালে, আকাশে সূর্য দিগন্তে নেমেছে, গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি তির্যক গতিতে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশে শুক্রাচার্য এরই মধ্যে খুব স্তিমিতভাবে হলেও দেখা দিয়েছে। গোসাঁই বললে—চোখ এতক্ষণে জুড়ালো। আঃ!

আমি বললাম—তারপর গোসাঁই? আমি শুনেছি, তাকে মরতেও হয়েছিল। কাল তাকে এনেছিল—কাল তাকে এমন করেছিল বলছ—তা ঠিক, তা মানি। আবার কালই তাকে শেষ করে। মানুষ চিরজীবীও নয়; আবার তাকে ধ্বংস করবার আয়োজন কালই করে। সে কথা থাক। কিন্তু সে তোমার কি করেছিল? তোমার কিছু করেছিল, না—। কথাটা বলতে আমার বাধছিল।

আমার কথা গোসাঁই বুঝেছিল, সে বললে—করেছিল। নারান পাপীকে বধের জন্যে ভগবানের অংশ থেকে জন্মায় নি। সে সাধারণ, ছোট মানুষ। তবে বিচার-বুদ্ধি তার আছে। সে বিচার-বুদ্ধি তার তখন ছিল না। সে তার বুকে ছুরি মেরেছিল, মাথায় লাথি মেরেছিল। এখন বিচার করে সে দেখেছে। দেখেছে—ওই মাথায় লাথিটা আগে মেরেছিল, তার আক্রোশ তার ছিল। দেখুন, নারানের প্রতিষ্ঠা—তা সে কেড়ে নিয়েছিল—মানুষের দুঃখের সুযোগে উপকার করে। নারান তখন জেলে। বলতে গেলে সেই তার কারণ। নিজের রাগ তার মূল—সেই রাগেই সে চড় মেরে রূপলালের দাঁত ভেঙেছিল। তবু তার বিচারে দোষ থেকে ওই লোকটাকে সে রেহাই দিতে পারে নি। আক্রোশ ছিল। নিরু আর বীরেনকে পেয়ে তার মন ভরেছিল। বুক ভরেছিল। কাকে সে বেশী ভালবাসত তা বলা কঠিন। বীরেনকে না নিরুকে। হয়তো নিরুকেই। কিন্তু সংসার যাকে পাপ বলে, তা সে করেনি—করেনি—করেনি। আর পাপ যাকে বলে—তা নেই যে ভালবাসায়, তার স্বাদ

আলাদা, জোর আলাদা। গরীব বড়লোক হয়ে গেলে পৃথিবীর উপর আক্রোশ তার যেমন কমে যায়, মুছে যায়—তেমনি করেই মুছে গিয়েছিল—ওই ভূতনাথের উপরেও আক্রোশ কমেছিল। বরং তার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে এদের ক্ষতি হয় এই জন্যে সে ভয়ও পেয়েছিল। বললাম তো ট্রেনের কথা। নারান ভাবতে ভাবতে গিয়েছিল সদরে, ডি আই তাকে এড্ দেন নি। ভেবেছিল ফিরে ভূতনাথের কাছেই যাবে। তার এখন উপর-মহলে খুব খাতির—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—ওকে ডি আই-কে অনুরোধ করবার জন্যে বলবে। একটা কথা বলি নি। বলি। আগস্ট মুভমেণ্টের সময়—এখানে তখন তিন-চার দল কাজ করছিল, বলেছি। তারা ঠিক করেছিল মুভমেণ্টের সময় তিনটে ইউনিয়ন নিয়ে এরা একটি স্বাধীন এলাকা গড়বে। ভূতনাথও তার মধ্যে ছিল। একটা ইউনিয়নের সে প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রথমেই ধনদাবাবুকে ধরে নিলে পুলিশে। হীরালালবাবু এখান ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন। তিনি একটা আগুন—এখানে জলবার মত খাদ্য তাঁর ছিল না। ঘাস—শুধু ঘাস এখানে। তিনি চলে গেলেন মহাবনের দিকে। শিবু ডাক্তার থাকল। কিন্তু তার দলের হুকুম এল—ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ভূতনাথের সঙ্গে মদ খাওয়া নিয়ে বনল না কংগ্রেসের। তাকে পেলে ইংরেজ। তার খাতির করতে তখন সরকারী কর্মচারীরা বাধ্য। ভূতনাথবাবু ডি আইকে বলে দিলে কাজ হত। তাই বলবে বলেই নারান ফিরল সেদিন। সন্ধ্যের সময় সেদিন আকাশে ওই তারাটি নীল হয়ে ঝলমল করছিল। সে দেখে ভাবছিল—ওই তারাটির মতই একটি শান্ত মিষ্টি, চোখ-জুড়ানো সংসার পাতবে আকাশের এক কিনারার মত সংসারের এক-ধারে।

স্টেশনে থেকেও ভাবতে ভাবতে এসে গাঁয়ে ঢুকল নারান, একটু ভাবলে—কোন্ পথে যাবে? সদর পথটায় গেলে প্রথমেই রায়বাড়ী, রায়-পাড়া, তারপর ভটচাজপাড়া, তারপর সদ্গোপপাড়া, তার ওধারে তার বাড়ী। ওদিকে ক'ঘর বাউড়ী বাগদীর বাস। তারপর মাঠ—মাঠের পর বিল। আর একটা পথ গাঁয়ের বাইরে বাইরে—দুটো পুকুরের পাড় ভেঙ্গে বড় বাউড়ীপাড়ার ভিতর হয়ে বিপিনের বাড়ীর পরই তার বাড়ী। রাস্তাটায় বাউড়ীরা হাঁটে, লোকে মাঠে যায়; নির্জন। যে গ্রাম এড়াতে চায়, সেও যায়। এখানে এসে অবধি নারান ওই পথেই হাঁটছিল। জেলখাটার লজ্জায় নয়। লজ্জার কাজ সে করেনি তো। মনের ক্ষোভ। লোকের ভালবাসা সে হারিয়েছে বিনা অপরাধে—সেই জন্যে। আর লোকে, বিশেষ ক'রে অবস্থাপন্নেরা, তাকে ঠাট্টা ক'রে বলত—বাউড়ীপাড়ার মালিক। বাউড়ীদের জোট—তাদেরও তো অসুবিধে ছিল। সেই মালিকানি যাওয়ায় নারানেরও মনে হত সে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তার যে ক্ষোভ, সেই ক্ষোভের জন্য কারুর কাছে যায় নি, দেখা করে নি; ওই বাইরের পথ ধরেই হাঁটত। যাবার সময়ও সে ওই পথে ইস্টিশনে গিয়েছিল। ফেরবার সময় সে গ্রামে ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলে। তারপর ধরলে সদর পথ। গ্রামের মধ্য দিয়ে রায়বাড়ীর সামনে হয়ে ভট্চাজপাড়ার মধ্যে দিয়ে যাবে, ক্ষোভ তার থাক, দু-চার জনের সঙ্গে দেখা হবে; তাদের সঙ্গে কথা বলা যাবে। বিশ্ববন্ধুদের বাড়ীতে কেউ নেই, মা-

বাপ-স্ত্রী নিয়ে বিশ্ববন্ধু কলকাতায় বাসা করেছে। তবু অন্তেরা তো আছে। কথাবার্তা বলে —তার কথাটা বলবার গৌরচন্দ্রিকা করে যাবে। যদি ভূতনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়? থমকে আবার দাঁড়িয়েছিল।—হ্যাঁ, তার সঙ্গেও কথা বলে যাবে। বলে সে ঢুকল গ্রামে। এবং দেখা হয়েও গেল। ভূতনাথবাবু তার সঙ্গী পাইক-গোমস্তা-মোড়ল নিয়ে বসে ছিল। ভট্চাজপাড়ারও দু'জন ছোকরা ছিল। তার বুকটা মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল ফেরে। আবার মনে হল—সম্ভাষণ না ক'রে হন হন করে চলে যায়। কিন্তু তার আগেই প্রশ্ন হল—কে? স্বয়ং ভূতনাথবাবু। এবার এগুলো নারান। একটি সম্ভাষণেই প্রীত হল। গিয়ে নমস্কার ক'রে বললে—আজ্ঞে, আমি গোসাঁই। ভূতনাথ বললে—গোসাঁই? হুঁ। তা, দুটো কানই তো রয়েছে তোমার! নারান বুঝতে পারলে না। বললে—আজ্ঞে? ভূতনাথ বললে—এত বোকা নও গোসাঁই। কথায় আছে—এক কান-কাটা গায়ের বাইরে বাইরে যায়। দু কান-কাটাদের লজ্জার বালাই নাই—তারা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়। তা তোমার তো দুটো কানই রয়েছে হে। একখানা চাবুক তার পিঠে যেন সপাং করে আছড়ে পড়ল আচমকা। মুহূর্তে নারান সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে—তার মানে? ভূতনাথ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আমারই ভুল। তোমার দুটো কানই নেই। ও দুটো মেকী কান। একটা কান জেল খেটে গেছে—একটা গেছে রাখ্‌নী রেখে। তুমি গাঁয়ের মধ্যে সমাজের বুকে—ঘরে রাখ্‌না রেখেছ? টান হয়ে উঠল নারান। তবুও রাগকে সে যথাসাধ্য দমন করলে। করতে হল। এ তো রূপলাল নয়। রুদ্ধরোষে সে বলে উঠল—এ কথা যে বলে তার মাথায় বজ্রাঘাত হবে। হা-হা করে হেসে ভূতনাথ বললে—বজ্র ইন্দ্রের হাতে এবং ইন্দ্র তোমার ভৃত্য নয়। লোকে বলছে—আমার কাছে বলেছে সকলে—তুমি বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক পুষেছ। তুমি যেদিন গ্রামে এস, সেদিন আমিও তাকে দেখেছি। সে কে? নারান বললে—সে বীরেনের, আমার ভাগ্নের মা। ভূতনাথ বললে—সৎ মা। তোমার কে? বোনের সতীন বোন হয় না। নারান এক মুহূর্তে উত্তর খুঁজে পেলে না, তারপরই বললে—সে আমার ছোটমাসীর পালিতা কন্যা। ভূতনাথ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, পালিতা কন্যা। মাসতুতো বোন নয়। তোমার সঙ্গেও তার বিয়ে হতে পারত। নারান চুপ ক'রে গেল। সত্যই এর উত্তর নেই। ভূতনাথ বললে—শোন গোসাঁই, ও মেয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস তোমার চলবে না। সমাজ তা সইবে না। শোন—ওকে এনেছ, আলাদা বাড়ীতে রাখ। আমি দিচ্ছি বাড়ী। শুনেছি মেয়েটি লেখাপড়াও জানে—মেয়েদের একটা পাঠশালা করে দিচ্ছি—ও পড়াক। কিন্তু এ সব চলবে না।

ঘৃণায় রাগে নারান অধীর হয়ে উঠেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার মনের কাছে তখন তুচ্ছ-ক্ষুদ্র হয়ে গেছে, সে বললে—সমাজকে আমি মানি না। আপনার কথাও আমি বুঝি। আমি ঘেন্না করি। শুনুন—আমার জীবন থাকতে আমি ওকে বাঘ-সাপের মুখে ছেড়ে দিতে পারব না। যা পারেন করুন। বলেই সে হন হন করে চলে এল।

নিরু সমস্ত শুনে একটু হেসে বললে—এরই মধ্যে নিজের কথাটা ভুলে গেলে নারানদা?

নারা.নর ভুরু কুঁচকে উঠল, বললে—কোন্ কথা ? নিরু বললে—আসবার দিন গ্রামে ঢুকবার মুখে আমাকে দেখছিলে, আমি বললাম—দেখতে নেই। দেখো না। তুমি বলেছিলে—গাঁয়ের লোক দেখবে এবং দেখে কি বলবে তাই ভাবছি। আমি বলেছিলাম—যা বলে বলুক। এ তো জানা কথা। বীরেন না থাকলে আমি সইতে তোমাকে বলতাম না—আমিও সইতাম না। তোমাকে রেহাই দিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু বীরেন—সে তোমার, সে আমার। তার জন্যে যা সইতে হয় আমি সইব, তুমিও সহ্য কর। নারান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—সইব। তাই সইব নিরু। বলে উঠে গিয়ে মাথায় এক ঘটি জল ঢেলেছিল সেই অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে—তখন অল্প অল্প শীত পড়েছে। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে বীরেনকে পড়াতে বসেছিল। বীরেনের বয়স ন বছর হল, কিন্তু দেখতে সে ক্ষয়া—ছোট। চেহারা তার মায়ের মত, খানিকটা নারানের সঙ্গে মিল আছে।

বুদ্ধি খুব প্রখর নয়, কিন্তু ভারী মিষ্টি ছেলে। বাপ অর্থাৎ হৃদয় থাকতে পড়াশুনা তার হয়েছিল, কিন্তু ভাল হয়নি। নিরুর সঙ্গে হৃদয়ের বিয়ের পর থেকে নিরু ওকে কিছু পড়িয়েছিল ; নিরু পড়াতে ভাল পারে না—তবে গল্প বলে ভাল—ওদের দুজনের বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি ওখানেই। বীরেন পাঠশালা শেষ করেছে, পড়ছে ক্লাস থ্রিতে। বই কম নয়। নারান ওকে আবার দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু করিয়েছে। সে তাতে ভারী বিরক্ত। বলে—না মামা, পুরনো বই ক্যানে পড়ব। মামা অনেক বুঝিয়ে থাকে ; সে খুন-খুন করতে করতেই পড়ে। হঠাৎ নারান ওকে ছুটি দিয়ে দিলে। বললে—থাক, আজ থাক। বীরেন বাঁচল। সে বসল গিয়ে মায়ের কাছে।—মা গল্প বলো। নিরু বললে—পড়া হয়ে গেল এর মধ্যে ? বীরেন বললে—হ্যাঁ, এক পাতা পড়েছি। "কদাচ কাহাকেও কুবাক্য বলিয়ো না। কখনও কাহারো হিংসা করিয়ো না। মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ। যে মিথ্যা কথা বলে—তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।" সব পড়েছি। মামা তবে বললে—ছুটি। নিরু একটু চুপ করে থেকে বাইরে এল। নারান চুপ ক'রে উঠোনে অন্ধকারে গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিরু ডাকলে—নারানদা। নারান মুখ ফেরালে, বললে—বল। নিরু বললে—মাথা এখনও ঠাণ্ডা হল না নারানদা ? আমাদের আর অকূলে ভাসিয়ো না। ওই ওই বাচ্চাটার কথা ভাব। নারান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নিরু, মাথা ঠাণ্ডা করতে চাচ্ছি, হচ্ছে না। নিরু চুপ করে রইল—উত্তর খুঁজে পেলো না। হঠাৎ বললে—এক কাজ কর না নারানদা ? নারান বললে—কি ?—আমি বরং চলে যাই। তার কথায় বাধা দিয়ে নারান বলে—না। স্বর তার গম্ভীর, রূঢ়। আবার একটু ভেবে নিরু বললে—তা হলে চল, এ গ্রাম থেকে চলে যাই। এবারও বাধা দিয়ে নারান বলেছিল—না। বার কয়েক পায়চারি করে বলেছিল—এতটা হার মানতে পারব না। পরদিন সকালে নিরু তাকে দেখে বলেছিল—তোমার চোখ লালচে হয়েছে নারানদা। কাল রাত্রে ভাল ঘুমোও নি। না ?

সেই তার চোখ লাল হওয়া শুরু।

গোসাঁই বললে—অগ্রহায়ণ মাস তারপর পোষ মাসের অর্ধেক। এর মধ্যে নারান অনেকটা শান্ত হয়েছিল—কিছু ঘটে নি। বিশ্ববন্ধু চিঠি লিখেছে—"আর ঝগড়া বাড়াইয়ো না। আমি যাইব। মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। ধৈর্য হারাইয়ো না। মহাত্মাজীর দিকে তাকাইয়া দেখ।" সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে চলেছে বিশ্ববন্ধু। তার উপযুক্ত চিঠি। সে হেসেছিল। কিন্তু নিরু বলেছিল—কেন, কি অন্যায় লিখেছেন? সে বলেছিল—একটু, বেশী নয়, একটু অন্যায় আছে। নিরু বিরক্ত হয়ে বলেছিল—কি সেটা শুনি? সেটা নারান বলেছিল—মহাত্মাজী মহাত্মাজী, আমি নারান। সংসারে বেকার। পাঠশালার পণ্ডিতি গিয়েছে। এখন ধানের সময় ধান তুলছি; দুটো ফসল লাগাচ্ছি নিজে হাতে। এর পর কি করব তাই ভাবি। ধৈর্য আমি মহাত্মাকে দেখে শিখতে পারি?

তবু সে ধৈর্য ধরেই ছিল। কারুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে নি। সকলকে এড়িয়েই চলে। বিলের ধারে বসে থাকার সময় বেড়েছে। কিন্তু পাখী মারলেও সে কিছু বলে না, চুপ করে বসে থাকে। আকাশ থেকে পাখীগুলো গুলি খেয়ে পড়ে—সে দেখে। সে বুঝেছে—মেনে নিয়েছে—মানুষের গুলিতে মরবার জন্যেই ওদের সৃষ্টি। তিনটে গুলিতে পাখা-ভাঙা পা-ভাঙা হাঁস সে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। চুন-হলুদ দিয়ে তাদের দুটোকে বাঁচিয়ে একটা বাঁশের খাঁচা করে রেখে দিয়েছে। বীরেন সেগুলোকে নিয়ে আনমন থাকে। সেই খাওয়ায়। এই সময়ের মধ্যে চোখের লাল তার অনেকটা কেটেছে; মাথার যন্ত্রণা হ'ত—কমেছে।

সে দিন সরস্বতী পূজো। এক ক্রোশ দূরের সাহারা অবস্থাপন্ন লোক। তারা এবার সরস্বতী পূজো করছে। সেও কালের বাতাস। গ্রামে সরস্বতী পূজো আছে ব্রাহ্মণদের। তাদের ওখানে গত বৎসর সাহাদের ছেলেরা ঘরে ঢুকে ব্রাহ্মণদের ছেলেদের সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দিতে চেয়েছিল—কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তা দেয় নি। এবার সাহারা-বাড়ীতে পূজো এনেছে। তারা তাকে পূজো করবার জন্যে চিঠি লিখেছিল। ওখানকার ব্রাহ্মণেরা রাজী হয় নি। নারানের খুব ভালো লেগেছিল। সে উৎসাহিত হয়ে নিমন্ত্রণ নিয়েছিল। ভোরে উঠে সে সেখানে চলে গিয়েছিল। পূজা সেরে সন্ধ্যার আরতি সেরে বাড়ী ফিরে এসে উঠোনে পাথর হয়ে গেল। নিরু দাওয়ার উপর পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তার মাথার গোড়ায় বসে বিপিনের মা—বললে—ওঠ মা, ওঠ। সারা দিন খেলে না। উপোস দিয়ে এমন করে পড়ে থেকে কি করবে বল। একপাশে বীরেন যেন শোকার্ত দিশাহারার মত বসে আছে।

নারান কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখেও কিছু বুঝতে পারলে না। বিপিনের মা বললে—এস বাবা! দেখ কুলুচ্ছুদ্দি! জানলে আমরা বারণ করতাম—তা—।

নারান বললে—কি হল?

তার কণ্ঠস্বর শুনে নিরু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠে বসল, বললে—আমি বলেছিলাম—চল—চল—এখান থেকে পালিয়ে চল। গেলে না। হল—হল মনস্কামনা পূর্ণ।

—কি হল? নারান অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

—এই দেখ কি হল। নিরু তার কপাল দেখালে। সেখানে একটা ক্ষতচিহ্ন দগ্‌দগ করছে। বিপিনের মা বললে—আমরা আসবার আগে নোড়া দিয়ে ঠুকেছে বাবা।

নারান মাথা ঝাঁকি দিয়ে চীৎকার করলে—কেন? কি হল?

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিরু প্রশ্ন করে উঠল—আমি বেশ্যা? আমি বেশ্যা? আমি—। আর সে বলতে পারলে না—হা-হা করে কেঁদে আবার লুটিয়ে পড়ল।

বিপিনের মা বললে—বীরেনকে নিরু যেতে দেয় নি, বীরেন ধরেছিল সরস্বতী পূজোর ওখানে যাবে। কিন্তু বীরেন এক ফাঁকে সেখানে গিয়েছিল—পুষ্পাঞ্জলি দেবে। বামুনের ছেলেদের সঙ্গে বসেছিল সে—তাকে ধরে তুলে দিয়েছিল। যা। ঘরের বাইরে যা। ওই ছোট জাতের ওখানে দাঁড়াগে, কান ও মলে দিয়েছিল। বীরেন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসেছিল। নিরু ওকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পথেই বেরিয়েছিল। পথের উপর নিরু জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল? বীরেন বলতে পারে নি, কিন্তু ওর সঙ্গে আসছিল ক'টি বাউড়ীর ছেলে, তাদের একজন বললে—ওগো, ও পূজো করতে গিয়েছিল—তা ওর কান ধরে টেনে আমাদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, যাঃ, তু বামুন নস। পূজো করতে পাবি না। তাই—ও কাঁদতে কাঁদতে—।

নিরুর মাথায় আগুন জ্বলত না—কিন্তু সেদিন সইতে পারে নি—মাথায় আগুন জ্বলেছিল—হয়তো কপালের আগুন মাথায় ধরেছিল। সে বীরেনের হাত ধরে হন হন করে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী-পূজো তলায়। একেবারে সামনে গিয়ে বলেছিল—কে কে আপনারা আমার ছেলেকে পূজো করতে দেন নি? কান মলে নীচে নামিয়ে দিয়েছেন? কেন? কেন দিয়েছেন? কেন? তার তখন জ্ঞান ছিল না। মাথার কাপড় খসে পড়েছে—চোখে জ্বালা—অনাবৃত মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম্য মেয়ে নয়, শহরের মেয়ে। তাকে দেখে শুধু লোকে বিস্মিতই হয় নি—ওই প্রশ্নের উত্তরও তাদের যোগায় নি।

অকস্মাৎ একটি রূঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল—নেমে দাঁড়াও। ওখান থেকে নেমে দাঁড়াও, বলতে বলতে পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভূতনাথবাবু। তাকে দেখে সম্বিত ফিরেছিল নিরুর। মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে সে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—কেন? এ পূজো তো গ্রামের সকলের, কারুর একার নয়।

—হ্যাঁ। গ্রামের হিন্দুর। পতিতের নয়, সোনাগাছি রামবাগানের বেশ্যাদের নয়। নান। নাম! নাম!

সে ধমকের মুখে নিরু দাঁড়াতে পারে নি। সে যেন এক একটি নিষ্ঠুর আঘাত। সমবেত মানুষের জোড়া জোড়া চোখ যেন সহস্র ধিক্কারে ধিক্কৃত করেছিল—সে ছুটে বাড়ী পালিয়ে এলো—মাটিতে বসেই লুটিয়ে পড়েছে। একবার মাথা ঠুকেছিল। কপালটা ফেটে গেছে। জলস্পর্শ করেনি—ওঠেনি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে।

আবার নেভানো আগুন দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল নারানের মাথায়। সে হাতের জিনিসগুলো সেইখানে ফেলে তখনই ছুটেছিল।

বিপিনের মা ডেকেছিল—নারান—নারান! ও বাবা!

নারান শোনে নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে উঠেছিল নিরু, কেন উঠেছিল সেই জানে—উঠেই সে জ্ঞান হারিয়ে সশব্দে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল বীরেন—মা গো! মা—মা!

নারান এবার ফিরেছিল। না ফিরলে—সেই দিন সেই সন্ধ্যাতে নারান মরত। ঘটনাটা এমন হ'ত না।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত নারান বসে ছিল জেগে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। অসহ্য যন্ত্রণা। মনের মধ্যে চিন্তা তাল পাকিয়ে একটা বজ্রপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। সব কল্পনা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল—সেগুলো ওই একটা সঙ্কল্পে, আকার-অবয়বহীন সঙ্কল্পে পরিণত হয়েছিল—'খুন। ওকে খুন করবে সে!' নিরুও অন্য ধারে বসে ছিল। স্তব্ধ স্পন্দনহীনের মত। যেন এ বাড়ীতে সদ্য কেউ মরেছে। তার সৎকার করে এসে তারা দুজনে বসে আছে। বীরেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

একসময় পেঁচা ডেকে গেল কর্কশ কণ্ঠে। দূরে মাঠে শেয়ালেরা ডেকে উঠল। নারান নড়ে বসল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার পর বললে—এর শোধ আমি নেব নিরু, ওর রক্তে আমি এর শোধ নেব। দুঃশাসনের বুকের রক্ত নেওয়ার মত। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। ওঠ, যাও, শোও গে!

নিরু উঠে ঘুমন্ত বীরেনকে কোলে তুলে নিয়ে অকম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—সেদিন আমি নিজেকে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব। বলে সে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল।

নারান বার বার মাথা নেড়েছিল—না—না—না!

পাঁচ

—জল! গোসাঁই বললে—জল। আমি বললাম—ওই যে। গোসাঁই এবার জাগটা তুলেই আলগোছে জল খেলে। তারপর বললে—এর পর আর কিছু মনে নেই। মাথার যন্ত্রণা—অহরহ যন্ত্রণা, চোখে জ্বালা—চোখ লাল, মন অস্থির—বুকের ভিতরটায় একটা অসহনীয় উদ্বেগ। হ্যাঁ। উদ্বেগ ছাড়া কি বলব? শুধু ওই ওক চিন্তা। সময়ের সঙ্গে সব কমে। কিন্তু কমলো না নারানের। বাড়ল। চার মাস—মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ। চার মাস—।

থামল গোসাঁই, বলল—না, একটা কথা মনে পড়ছে, বলতে হবে। হ্যাঁ, বলতে হবে। নইলে নারানকে বুঝতে পারবেন না। নারানের জোরটা বুঝতে পারবেন না।

নিরু সেদিন বলেছিল—যেদিন ওর রক্ত দেখে নারান এই অপমানের শোধ নেবে সেদিন নারানের পায়ে নিজেকে ঢেলে দেবে। নারান সেইদিনই ঘাড় নেড়ে বলেছিল—না-না-না।

ওইটাকে পরম সত্য করে তুলেছিল। নিরু হয়েছিল তার ভাগ্যে বীরেনের মা। কল্পনায় একবারের জন্যে অন্য কল্পনা করেনি। কথায় সে একবারের জন্যও এর সীমা লঙ্ঘন করে নি। মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে একেবারের জন্যেও তার দিকে তাকায় নি। বিলের শোভা, পাখীদের কলকল শব্দ তার কানে পৌঁছুতো না। মাঠে ফসল লাগিয়েছিল, নিজের হাতে, তার কৃষাণ কিম্বা ভাগীদার হওয়ায় বিপদ ছিল—সে ডাকে নি কাউকে। তা ছাড়া সবটা নিজে পাবে—এর জন্যও বটে···সে নিজে লাগিয়েছিল ফসল। ফসলগুলো মরে গেল না-দেখার জন্য। বীরেনকে পড়ানো ছাড়লে। কথা কইতে তার ভাল লাগত না। মানুষ উন্মাদ হয় প্রতিশোধ কামনায়—ও তাই হয়েছিল। ওর প্রতিষ্ঠা কেড়ে নিয়ে সে ওর মাথায় মেরেছে লাথি, নিরুকে তার নারীত্বের চরম অপমান করে সে ওর বুকে মেরেছে ছুরি। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় পাগল হওয়ারই কথা। হয় নি কিন্তু—এর মধ্যে সে আর একটা জোর পেয়েছিল। নিরুর উপর লোভ থাকলে সেটা সে পেত না। নিরুকে শুধু বীরেনের মা করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে অনুভব করলে—এই অত্যাচারিত অঞ্চলটার প্রতিটি অত্যাচারিত মানুষ তার দিকেই তাকিয়ে আছে প্রতিকারের জন্য। পাড়াগাঁয়ের মানুষ অতি অল্পশিক্ষিত মানুষ। নারান—সে নিত্য ভগবানকে ডাকতে শুরু করলে। আমাকে বল দাও। আমাকে বর দাও আমি ওকে মারব। শুধু তাই নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার কাছে লোক আসতে লাগল। রূপলাল, ফেলা মণ্ডল, কেষ্ট দাস, ভূষণ পাল। তারাও সুযোগ খুঁজছে—ঠাকুর, তুমিও এস। কিন্তু সে তা গেল না। ওদের সে জানে—চেনে। ওদের সঙ্গে ভূতনাথের প্রভেদ নাই। ভূতনাথ ওদের তাড়িয়েছে তাই ওদের শত্রু। মিল এক জায়গায় আছে—ওরাও অত্যাচারিত, সেও অত্যাচারিত। তবে সে শুনেছে ওদের হত্যার কল্পনা। নানান কল্পনা ওরা করে। মদ খায় ভূতনাথ। মদ চোলাই করে তারা তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ওর কাছে পাঠাতে চায়। সাপ ধরে বাঁশের চোঙায় পুরে জানলার ফাঁক দিয়ে নিষুতি রাত্রে ওর ঘরে সেই প্রমোদ-ভবনে ছেড়ে দিতে চায়। আরও বিচিত্র অনেক কিছু। অনেক মন্ত্রতন্ত্র বাণমারা এ-সবও করেছে। কিন্তু নারান তো তা পারবে না। সে তার মুখোমুখি দাঁড়াবে। অস্ত্র তুলে বলবে—এই নাও শোধ। শোধ। শোধ।

তিন মাস নারান ঘুরল তার পিছন পিছন। সে চলে আগে তার সঙ্গী প্রহরী নিয়ে, সে চলে তার পিছন বা পাশে—খানিকটা দূর দিয়ে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে। নদী ওখানে গেছে এঁকে-বেঁকে—সে জলশূন্য নদীর গর্ভে গর্ভে কিনারার গা ঘেঁষে আড়াল দিয়ে চলে। সে বিলের ধারে যায়, নারান বিলের ঘাসবনে প্রতীক্ষায় থাকে। একলা সামনা-সামনি তাকে চায়। তা ছাড়াও ওই সঙ্গী—বিছে বাগদী তো সামান্য নয়। একলা দুজনকে পারবে না সে। কখনও নদীর এপার ধরে চলে—নারান ওপার ধরে চলে। রাত্রে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা—তাও সে পারবে না।

রাত্রেই এ অনুসরণ চলত। দিনে নয়। দিনে ভাবত। প্রতিদিনের ব্যর্থতার কথা ভেবে

দেখতে কেন পারলে না। নিরুও স্তব্ধ ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। হাসি ছিল না, রহস্য ছিল না, কৌতুক ছিল না—দিনের কোন একটি ক্ষণেও তার পদক্ষেপে ঈষৎ একটি চঞ্চলতা—তাও প্রকাশ পেত না। বীরেনকে গল্প বলতে বলতে থেমে যেত। বীরেনও বুঝত কিছুটা। মধ্যে মধ্যে এসে বলত—মা, ওরা বলছিল—! নিরু বলত—বলুক। সে চুপ করে যেত। মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসত—কেউ বাড়ীর পাশ থেকে বলে যেত—আজ রাত্রে। কোন দিন কেউ পাঁচটা কথা বলে বলত—আজ রাত্রে ফিষ্টি হবে গো। যেয়ো যেন। ওরা ফাঁদ পাততে। নারান ঠিক আপনার পথ ধরে চলত। কিন্তু দেখা যেত ফাঁদ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাত্রির বাঘ-পুরাণের নিশাচর ঠিক চলে গেল আপনার পথে। নারান নিজের চুলের মুঠো ধরে টানত, ছিঁড়ত। তারপর একদিন—।

—আঃ—বলে একটা চীৎকার করে উঠল গোসাঁই।

আমি ডাকলাম—গোসাঁই, গোসাঁই। গোসাঁই বলে—হ্যাঁ। এই রকম হয় কখনও কখনও। নইলে আমার তো মনে কোন অনুশোচনা নেই, খেদ নেই। কিছু নেই।

আমি বললাম—রাত্রে একদিন ভূতনাথ খুন হল। মাঠের মধ্যে। খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিল তাকে। সে তো জানি।

—হ্যাঁ। অন্ধকার রাত্রি সেদিন। সে চলেছিল ওই প্রমোদ-ভবনে। বৈশাখ মাসের রাত্রি—সন্ধ্যেবেলা ঝড় হয়ে গেছে প্রচণ্ড। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি! ঝড়ের পর সে বের হয়েছিল। আমি নদীর ঘাট থেকে পিছু নিয়েছিলাম। যাচ্ছি—সে আগে চলেছে—দম্ভের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। ভয় তার ছিল না। বীর ছিল সে। অসুরের মত বীর, বিক্রমশালী। সেদিন ফাঁদে পড়ল। রূপলালদের দল যে জায়গায় চারিপাশে লুকিয়েছিল, ঠিক সেইখানেই এসে পড়ল। সেটা আমার ওই জমির টুকরো—যেটার জন্যে আমি এসেছি। সে যেমন এসেছে অমনি তারা চারিপাশ থেকে এসে ঘিরে দাঁড়াল। সে হাঁকলে—কে? কে একজন বললে—যম। সে হা-হা করে হেসে উঠল। ওর সঙ্গী বিছে লাঠি ধরে দাঁড়াল। কে একজন পিছনে থেকে ছুঁড়লে দা। বিছের কাঁধে বসে সে পড়ে গেল। একজন তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়াল। ভূতনাথের তখনও ভয় ছিল না। হাতে সে বন্দুক রাখত না। রাখত একটা গুপ্তি। গুপ্তিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—আয়। কিন্তু যাই হই, আমি বামুন—এটা বৈশাখ মাস মনে রাখিস। সে কৌতুক করছিল তখনও। আয়! ফলও হয়েছিল—বৈশাখ মাস—সে ব্রাহ্মণ। কে আঘাত করবে? নারান তখন এসে পড়েছে—সে হাতের দা-খানা দৃঢ় মুঠিতে ধরে—আমি! বলে এসে দাঁড়াল। ভূতনাথ চমকে উঠল। মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বোধহয় আমার থেকে নির্দোষ কারুর উপর আমার মত অত্যাচার করে নি।

তারপর আর মনে নেই। আমি দা তুলতে অনেকগুলো দা উঠেছিল। এক সঙ্গে পড়েছিল। যদি আমারটা পড়ে থাকে—তাই পড়েছে—তবে আমি বীর, আমি তপস্যায় সফল হয়েছি। কিন্তু সে মুহূর্তটি ভয়ঙ্কর। অতি ভয়ঙ্কর। মহাকালকে যেন সাক্ষাৎ দেখেছিলাম।

কাল দৈত্য অসুর সৃষ্টি করে, অনুকূল হয়ে তাদের বর দেয়, তারা সেই বরের বলে সৃষ্টিকে জর্জরিত করে তোলে প্রহারে প্রহারে। তখন মহাকাল চিরকালের ধর্মে জাগেন—সঙ্গে সঙ্গে জাগে মানুষ। তারা তাঁর সঙ্গে নাচে তিনি যখন ওই দৈত্য অসুর নাশ করেন। বহু লোক যাকে ধ্বংস করে সে ঈশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত, সেখানে হত্যাকারীরা মানুষ নয়, শক্তি। মহাশক্তি এই ভাবেই মহিষাসুর বধ করেছিলেন।

নারান তাই বলে। বললে গোসাঁই। নারানও সেদিন নেচেছিল। সেও মহাকালের অনুচরের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান ঠিক ছিল না। জ্ঞান থাকলে সে ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে ঘুমন্ত নিরুকে টেনে তুলে দেখাতে আনত না। রক্তাক্ত হাতেই সে তাকে টেনে তুলেছিল—ওঠ। এস। নিরু তার মূর্তি দেখে বিহ্বল ভয়ার্ত হয়ে বলেছিল—কোথায়? সে বলেছিল—'অসুর' বলি হয়েছে, দেখবে এস। এস। সে ভয়াল মূর্তির কাছে নিরু মূক, নিরু পুতুলের মত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার রাত্রে—পথ অনেকটা, সন্ধ্যার ঝড়ে বিপর্যস্ত পথ,—সেই পথে পথে সে পুতুলের মতই অনুসরণ করেছিল। না বলবার মত মন ছিল না—তার সত্তা ছিল না।

—ওই দেখ। নিরু দেখে আর্তনাদ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি। বিশালকায় মানুষটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে। নারানও এতক্ষণে—কি হয়েছে সঠিক করে দেখেছিল। ওঃ, কি আক্রোশ মানুষের। ওঃ। তার মুখখানা দেখে শিউরে উঠে নিরুকে টেনে ছিল—চল। চল। সে এক বীভৎস-অশ্লীল দৃশ্য। সে বলা যায় না। নারান বলতে গিয়ে পারেনি। পারে না।

নিরুকে নিয়ে সে ফিরল। বাড়ী ফিরে নিরু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে—তুমি কি ভয়ঙ্কর নারানদা। উঃ। নারান অবাক হয়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তটিকে পাঁচিলের ওপাশ থেকে কে বলল—কেঁদো না ঠাকুরুন। চুপ করে মুখ বুজে থাক। নইলে ঠাকুরের ফাঁসি হবে। যাও, হাত-পা কাপড়-চোপড় ভাল করে ধোও। ওগুলো বিলে পুঁতে দিয়ো।

কে সে—আজও নারান জানে না। নিরু চুপ হল না, পাথর হল।

* * *

জেলখানায় এ চোখ সাদা হয়ে এসেছিল, মাথার যন্ত্রণা কমেছিল। ক'দিন পর পুলিশ নারানদের ধরে চালান দিলে। রূপলাল, ফেলা মোড়ল, কেষ্ট দাস, ভূষণ পাল, নারান—এক দল। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি। নারান ওই রাত্রের পর সকালে শ্রান্ত, একটু উদ্বিগ্ন মন নিয়ে উঠেছিল—কিন্তু তার গ্লানি ছিল না। পুলিশ লাশ চালান দিলে সদরে। ভূতনাথের আত্মীয়রা যায়নি। তারা কুশপুত্তলীটুত্তলী কি করেছিল। মর্গ থেকে ভূতনাথের দেহ নিয়ে যারা সৎকার করেছিল—তাদের মধ্যে নারান ছিল। সৎকার করে মনে মনে বলেছিল—আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। হেসে গোসাঁই বললে—ওটা নারানের সাফাই বলেন আপত্তি করব না। থাক। পুলিশ চালান দিলে। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে সেসন্‌স্ কোর্টে বিচার হল। বিচারের সময় নারান বলেছিল—আমি নির্দোষ। সে সেটা

অন্তর থেকেই বলেছিল। তিনজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। নারান আর রূপলাল আর ভূষণের। বাকী সব খালাস পেল। নারান টলে নি। সে প্রসন্নমনে দণ্ড নিয়েছিল। বীরেন নিরুর জন্যে ভাবে নি। নিরু এই চেয়েছিল। সে তাই দ্বীপান্তর হাসিমুখেই যাবে। নিরু অসংখ্য নিঃসহায় মা যেমন সন্তানকে বুকে করে থাকে, তেমনি থাকবে। নিরুও দেখা করতে আসেনি। বিচারের সময় রূপলালরা উকিল দিয়েছিল—তার জন্যে সরকার থেকে উকিল দিয়েছিল। কিন্তু রূপলালরা আপীল করলে। তাকেও সই করতে বললে—সেও করলে সই। সবসুদ্ধ পাঁচ মাস। পাঁচ মাস পর হাইকোর্ট থেকে সকলে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। যখন জেল থেকে বেরুল, তখন নারানের চোখ প্রায় সাদা। বাড়ী ফিরল নারান।

বাড়ী শূন্য। ঘর তালা দেওয়া। সে ডাকলে—বিপিনদা! ভিক্ষে-মা! বিপিন বেরিয়ে এল। কথা বললে না—তার দিকে তাকালে না—সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সে তার কাছে গিয়ে ডাকলে—বিপিনদা! নিরু বীরেন কই? বিপিনদা?

বিপিনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল। নারান আবার পাগলের মত তাকে ঝাঁকি দিয়ে ডাকলে—বি-পি-ন-দা!

বিপিন বললে—নাই।

—না—ই! চীৎকার করে উঠেছিল সে।

—বীরেন নাই। মারা গেছে। ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মারা গেছে।

সে হিরণহাটি স্টেশনে গিয়েছিল মামলার রায়ের খবর আনতে। সেখানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের খবর নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটেই এসেছিল সারা পথ। পথে হুঁচোট খেয়ে নখ উঠে গিয়েছিল। বাড়ী ফিরে সেও কেঁদেছিল, নিরুও কেঁদেছিল। একদিন পর পা পাকল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। ধনুষ্টঙ্কার। তৃতীয় দিন মারা গেল বীরেন। নিরু প্রথমটা বুক চাপড়ে কেঁদেছিল। তারপর পাথর হয়ে গেল। তারা পতিত। নিরুর নামে অনেক অপবাদ, তার সৎ-ছেলের সৎকার করতে তো কেউ আসবে না। ভূতনাথ নেই। রায়-বাড়ী আছে। কে আসবে? হয়তো বা ভয় সবার নয়। ঘৃণা! নারান খুন করেছে। খুনী।

বিপিন বললে—সারাদিন কেউ এল না। নিরু মরা বীরেনকে নিয়ে পাথরের মত বসে রইল। বিপিনও প্রথমটা আসতে পারেনি। ভয় তো তারও আছে। মানুষের মন—তারও মনে হয়েছিল এতটা করা নারানদের ঠিক হয়নি, ওকে পঙ্গু করে দিলেই পারত। দুইই বটে। কিন্তু শেষে রাত্রি যখন ভোর হল, তখন সে গিয়ে বললে—চল মা! আমার যা হবার হবে। চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি বীরেনকে, তুমি সঙ্গে চল। কি করব—চল, নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি, কিম্বা মাটি খুঁড়ে সমাধি দিয়ে আসি। নিরু নীরবে নিঃশব্দে তার সঙ্গে গিয়েছিল। নদীতে ভাসায়নি, নদীর গর্ভে সমাধি দিয়েছিল। স্নান করে ফিরে বাড়ী এসে বিপিন বলেছিল—মা, আমার বাড়ীতে এস। একলা ও বাড়ীতে থাকতে হবে না তোমায়। আমি তা দেব না। নিরু নীরবে তাই শুনেছিল। সারা দিন একটাও কথা বলেনি, কাঁদেনি।

রাত্রেও এই বাড়ীতেই শুয়েছিল। কিন্তু সকালে উঠে কেউ তাকে দেখেনি। দোরটা খোলা ছিল।

বিপিন খুঁজেছিল নদীর ধার—বিলের চারিপাশ। হিরণহাটি স্টেশনে খোঁজ করেছিল—তাও খোঁজ পায়নি।

নারান স্তব্ধ হয়ে শুনেই গিয়েছিল। তার পর দিন থেকে আবার তার চোখ লাল হল। সেও খুঁজেছিল নিরুকে অনেক—পায়নি। রৌদ্রে-জলে-শীত-গ্রীষ্মে অনেক খুঁজেছে। খুঁজতে খুঁজতে চোখ হয়ে গেল রক্তের ঢেলা। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এ নারানের রক্ত-সংকেত। আমার কাছে এস না। কিছুদিন পলিটিক্স করব ভেবে শিবু ডাক্তারের দলে ঢুকেছিলাম। কিন্তু বন্যার সময় ওরা প্রথম খোঁজ করেনি, খোঁজ করেছিল শ্যামাপতিবাবু—শ্যামাপতিবাবুর সঙ্গে শিবু ডাক্তারদের বিরোধ—তাই শিবুদের দল ছেড়ে দিয়েছি। কোন দল আমার নেই। আমি শুধু মানুষ। আমি যা করেছি, তার জন্যে আমার খেদ নেই। ভেবে ভেবে শেষ দেখলাম—ও ভূতনাথ আসে, নারান আসে। এই হয়। হয়তো কালের একটু রকমফের আছে। কিন্তু নিরু বীরেন? বীরেন চলে গেল। কি করব? মানুষ মরে। কিন্তু নিরু?

আমি ভাবতে পারি না—নিরু সেদিন মরা ছেলে নিয়ে বসে ছিল—কেউ আসে নি। আমার চোখ তাই বলে—কেউ এস না—কেউ এস না আমার কাছে—আমি চাই না কাউকে। ঈশ্বর আমার কাছে মৃত, সমাজ আমার কাছে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন। আমি একা রক্তচক্ষু নিয়ে বসে আছি। শুধু সান্ত্বনা—আমি লড়েছি। আমি শোধ নিয়েছি। তবে ওতে মন ভরে না।

একটু থেমে নারান বললে—বিশ্ববন্ধু এখন অনেক উন্নতি করেছে—সে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে নিয়ে গিয়ে চোখ মাথা দেখিয়েছিল। কিন্তু কিছু হয়নি।

ছয়

হয়েছিল। সেটা দেখে এসেছি। কিছুদিন আগে ধনদাবাবু এম-এল-সি ফোন করেছিলেন। তোমার সঙ্গে নারান গোসাঁই একবার দেখা করতে চায়। চমকে উঠে বললাম—নারান গোসাঁই? ধনদাবাবু বললেন—আমার বাসায় রয়েছে। সে নিরুর খোঁজ পেয়ে এসেছিল। আবার চমকে উঠলাম—নিরুর খোঁজ? বলতে বলতে বুকটা ধড়ধড় করে উঠল। তবে কি শেষ পর্যন্ত—ধনদাবাবু ওদিক থেকে বললেন—কাল সন্ধ্যায় দাহ করে আমার বাসায় এসেছে গোসাঁই। বললাম—দাহ করে? নিরু নেই? ধনদাবাবু বললেন—না। শেষটা নাকি সজ্ঞানে খুব ভাল গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় ছিল এতদিন। ধনদা বললেন—পাগল হয়ে গিয়েছিল—প্রায় উন্মাদ। ওখান থেকে এসেছিল কলকাতা। সোজা গিয়েছিল দমদম। ওদের ওখানে বাড়ী ছিল, শুনেছ তো? সেখানে গিয়ে ওই সেই বাড়ীর আশে-

পাশে ঘুরত। হাতে একটা ছোট খেঁটের মত নিয়ে বলত—খুন করে দীপান্তর যাব। সে কুকুরকেও বলত। মানুষকেও বলত। গাছকেও বলত। পড়ে থাকতে ওদের পুরনো চেনা প্রতিবেশীর বাড়ীর বাইরে। ধুলো-কাদা মাখত। ঘুরত। দিলে খেতো। না দিলে খেতো না। তারপর এই দিন পনেরো আগে অসুখ হল। পড়েই থাকত। হঠাৎ জ্ঞান ফিরল ক'দিন আগে। তখন একখানা চিঠি বিপিনকে লিখিয়েছিল যে, যদি নারানের খোঁজ জান তো জানিয়ো। মরণের আগে জেনে যেতে চাই।

চিঠি পেয়ে নারান এসেছিল। দুদিন সেবা করে ওর শেষকৃত্য করে আমার বাসায় এসেছে।

ছুটেই গেলাম। নারান নিরুর খোঁজ পেলে—পেলে মৃত্যু-শয্যায়। পৃথিবীকে সমাজকে সে অভিসম্পাত কি দেয়—শুনতে গেলাম। কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম। সৌম্য শান্ত নারান উদাস প্রসন্ন মুখে বসে আছে।

নারান বললে—আসুন, আসুন, আসুন। নিরুর খোঁজ শেষটা পেলাম জানেন—

বললাম—শুনেছি।

সে বললে—আর আমার কোন নালিশ রইল না, বুঝলেন? দুঃখ তো বড় কথা নয়—সেও দুঃখ পেয়েছে, অনেক পেয়েছে, আমিও পেয়েছি। তবু সেও অন্যায় কিছু করেনি। আমিও করিনি। বাস, এই জানলাম, দেখা হল—সব পাওয়া হল। আবার কি? তবে সুখ-শান্তি পেলে আরও ভাল হত। ভূতনাথ এমন না হয়ে গেলে আরও ভাল হত। কিন্তু সব ভাল সুখের হয় না। যুগের যে একটা যন্ত্রণা আছে, প্রতি যুগেই যে তা পেতে হয় মানুষকে। যে সইতে পারে, মুখ বুজে যুঝতে পারে—সে পার হয় যুগ-যন্ত্রণার সীমানা। তখন আর চোখ লাল থাকে না, কোন যন্ত্রণা থাকে না।

হঠাৎ থেমে বললে—এই দেখুন আবোল-তাবোল বকছি। একটা খবর বলি। মাথার যন্ত্রণা আর নেই। চোখ দুটো একটু সাদা হয়নি? হয়ে যাবে। একেবারে গ্রীন।

আমি তার রক্তের ঢেলার মত চোখ দুটোর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। প্রশ্ন করলাম নিজেকে, হয়েছে কি? হয়েছে?—নারান বলছে—হয়েছে।

মণি বউদি

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

সম্মানভাজনেষু

এক

পরিণত বয়সে জীবনের শেষাঙ্কে এসে বিচিত্র-চরিত্রের পালা ধরে অতীত-সমুদ্র মন্থনে যে আনন্দ পেয়েছি তা কল্পনা করিনি। আমার পাঠকেরাও সাড়া দিয়েছেন। প্রথম চরিত্র ক্ষ্যাপা বাউল থেকেই সাড়া পাচ্ছি। হঠাৎ এক পাঠিকা অনুযোগ করলেন—বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে নারীচরিত্র নেই কেন? প্রশ্নটা তাঁর ঠিক হয় নি, কারণ নারীচরিত্র ছিল বই কি! পার্শ্বচরিত্র হিসেবে পুরুষ চরিত্রের সঙ্গে নারীচরিত্র এসেছে। সে চরিত্র পুরুষ চরিত্র থেকে কম বর্ণাঢ্য নয়। আবার মূল চরিত্র হিসেবেও নারীচরিত্র তার আগে এসেছে। মানে পত্র-লেখিকার পত্র আসবার আগেই এসেছে। তার মধ্যে 'কালবউ' সম্পর্কে বেশ সাড়া পেয়েছিলাম। তবুও পত্রলেখিকার পত্র পেয়ে অবধি বিচিত্র নারীচরিত্রের কথাই লিখে চলেছি। শুরু করেছিলাম 'মলিকে' নিয়ে। মলির পর কৃষ্ণা। বলা বাহুল্য তারা আমার অন্তর বৃন্দাবনের কল্পযমুনা তটবর্তী কুঞ্জবন-বাসিনী। ভেবেছিলাম হয়তো বা এর পর তিরস্কার-মধুর পত্র পাব। কিম্বা মিষ্ট সম্ভাষণ ভরা একছত্রের পত্র। হয়তো লিখবে—বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে—এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে? অথবা লিখবে—"বহুদিন পরে—"। কিন্তু না, তা পাই নি। হয়তো তাদের কাছে লেখা পৌঁছোয় নি। অথবা তারা তিক্ত বিরক্তির সঙ্গে কাগজের সংখ্যাটা বন্ধ করেছে।

তা তারা করুক। তারা পত্র না লিখুক, অন্যে অনেকে এই নারীচরিত্রের বৈচিত্র্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পত্র লিখেছে আমাকে। নতুন নারীচরিত্রের কাঠামো বা রেখাচিত্র বা ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দিয়ে অনুরোধ করেছে, এবার আপনার তুলি ও রঙে এদের ছবি সম্পূর্ণ করে করে তুলে ধরুন। 'ক্লীন মুন' নির্মলচন্দ্র লিখেছে টুনুবিবি বা কাজলরেখার কথা। সুরঞ্জন জানিয়েছে বিচিত্র মা—কাত্যায়নীর কথা।*

আরও অনেক পত্র পেয়েছি। মেয়েদের লেখা চিঠিও আছে এর মধ্যে। কেউ লিখেছেন —"আমার কথা লিখুন। আমি অকপটেই আপনাকে আমার জীবনের কথা লিখছি। এর মধ্যে একটিও বানানো কথা নেই জানবেন। তবে আমার নাম ঠিকানা সত্য নয় একথা অকপটে কবুল করেই তার জন্যে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

বানানো গল্প আছে। একটা গল্পের মধ্যে পরিচিত চরিত্রের আভাস পেয়েছি। তবে মনে হয়েছে অতিরঞ্জনে বিকৃত করে অন্য কেউ চরিত্রটিকে নিজের নামে চালাতে চেয়েছে। সে সব পত্রের দুচারখানি যে বৈচিত্র্যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার উপর ঠিক আস্থা স্থাপন করতে পারি নি এবং মনও যেন আকৃষ্ট হয় নি। সাহিত্যে ঘটাতে পারলে সবই ঘটে : যেমন মহাভারতে সাবিত্রী যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছে অথবা রাবণের দশ মুণ্ড যতবার কেটেছে ততবার গজিয়েছে। এবং ভূতেরা চিরকাল গল্পের মধ্যেই বসবাস করে—গাছে বা বাড়ীতে থাকে না এ জেনেও গল্প বলার গুণে ভাঙা পড়ো বাড়ীতে বা ঝাঁকড়া গাছের

* লেখকের 'নারীরহস্যময়ী' দ্রষ্টব্য

তলায় আমরা ভূতের ভয়ে শিউরে উঠি। সুতরাং বৈচিত্র্য এবং অভিনবত্বের লোভে ওসব থেকে চরিত্র নেব না। যে গল্পের লক্ষ্য কেবলমাত্র জীবন-সত্যের ব্যাখ্যাকে বিকৃত করবার জন্য বা কতকগুলো স্বাস্থ্যহীন দেহধারীর অসুস্থ মনের অশ্লীল আকাঙ্ক্ষা পূরণের পল্‌তেকে উস্কে দেবার জন্য, তা নিয়ে ছবি আঁকতে বা মূর্তি গড়তে আমার ইচ্ছে নেই।

সংসারে এককালে মেয়েরা পণ্যবস্তুর মত বিক্রী হয়েছে। এমন কি সুপবিত্র ধর্মশাস্ত্র থেকে মন্ত্র পাঠ ও শপথ করে ঈশ্বর সাক্ষী রেখে বিয়ে হওয়া মেয়েদের বন্ধন-যাতনা বা জীবনদুর্দশা থেকে মুক্তি দেওয়া যায় নি একথা কঠোর সত্য। এখানে শাস্ত্র ঈশ্বর দুই সাক্ষীকেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার দায়ে অনায়াসে অভিযুক্ত করা যায়। কিন্তু এ-কালে—যে-কালে আইন-বলে মেয়েরা মুক্তি পেয়েছে—যে-কালে সমাজ ভেঙেছে মানুষের বোধের বলে, সে-কালে পেটের দায়ে বা সুখ-সংস্থানের সঙ্গতি অর্জনের জন্য মেয়েরা যেখানে দেহ নিয়ে কারবার করার খাতে নিজেদের জীবনস্রোতকে বইয়ে দেয়, সেখানে ওই প্রবাহিনীকে নদীও বলব না ঝরনাও বলব না, বলব কলঙ্কিনীর খাল। স্নান পান দূরের কথা, ও জলে পা ডোবালেও আবার পা ধুতে হয়। কিন্তু যে মেয়েরা জীবনে দেহের বা মনের তাগিদে সব বাধাবন্ধ বা বেড়াকে উপেক্ষা করে বা ভেঙে বা ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়ে পুরুষের হাত ধরে, তাদের আমি সেকালের স্বয়ম্বরার মত সম্ভ্রম করি।

পুরুষদের বেলাতেও তাই। যে পুরুষেরা সবল, বীর্যবান তারা নারীকে অর্থমূল্যে কিনতে চায় না। তারা নারীচিত্তকে জয় করে স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের মত, এবং দেশ থেকে দেশান্তরে এক বাসর থেকে আর এক বাসরে বাসি মালার বদলে নতুন মালা গলায় প্রবেশ করে। তাদেরও আমি নিন্দা করি না। একালে তো ব্যাপারটা আরও সরল হয়ে এসেছে। বিবাহের চেয়ে বড় নতুন-সম্পর্ক-ক্ষেত্রের দোর খুলে গিয়েছে। কিন্তু যে-দুর্বল ভীরুরা হ্যাংলামি বা চোরামি করে নারীমহলে ভিক্ষুকের মত বা গাঁটকাটার মত কারবার চালাতে চায় অথবা কয়েকটা রজত মুদ্রা পকেটে নিয়ে দেহ কিনতে আসে তাদের আমি চরিত্রের আসরে একান্ত-ভাবে ব্রাত্য বলে মনে করি। চরিত্র বলতে আমি আচার বিনয় বিদ্যা সংযম প্রভৃতি গুণ-সম্পন্নতার কথা বলছি না, বলছি, যে প্রকৃতি-ধর্ম মানুষের কাছে মানুষকে একটি পরিচ্ছন্ন বা বলিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত করিয়ে দেয়, তাই।

থাক।

অনেকখানি ঠাঁই এতেই চলে গেল। হয় তো শিল্পবিচারে ঐ আলোচনা নিয়ে এতখানি স্থান অপব্যয় করা উচিত হল না। শাড়ীখানার জমি ও পাড়ের অনুপাতে আঁচলখানা বড় হয়ে গেল।

আমি চিঠির গাদা সরিয়ে দিয়ে এবার বলব মণি বউদির কথা। চিঠিগুলো নিয়ে যখন ভাবছিলাম এর মধ্যে কোনখানিকে বেছে নেওয়া যায়—তখনই একখানা চিঠি এল—যে চিঠিখানা বহন করে নিয়ে এল মণি বউদিদির মৃত্যুসংবাদ। সংবাদ দেবার জন্য দেওয়া হয় নি; শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হয়েছে আমার নামে, যে-হেতু মণি বউদির পরিত্যক্ত

সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা হয়েছে যে দলিলে, সেই-দলিলের আমি একজন সাক্ষী। পিণ্ডিং দত্তা ধনং হরেৎ—এ বিধানটা আজও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

কালো কালিতে মোটা হরফে ওঁ গঙ্গা লেখা চিঠিখানা হাতে করে বাকি চিঠিপত্রগুলোর কথা সব ভুলে গেলাম। মণিবউদিকে আজও কেন মনে পড়েনি এর জন্য নিজেকে তিরস্কার করতেও অবকাশ পেলাম না। মনের স্মৃতির ঘরের দরজা খুলে মণিবউদি হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বললেন—জানি গো জানি, তুমি আমায় ভোল নি, ভুলতে পার না—একথা আমি জানি এবং মানি। আবার মনে মনে আন্তরিকভাবে মানি—তাই জানি, সকলের থেকে বেশী করে জানি এবং সত্য বলে জানি।

সঙ্গে সঙ্গে গালে টোল-ফেলা, সেই মুখ টিপে হাসি।

মণিবউদি সম্পর্কে আমার বউদিই হতেন কিন্তু দিদিও বলেছি অনেক সময়।

মণিবউদি আমার থেকে সম্পর্কে বড় কিন্তু বয়সে ছোট। বেশ কিছু বছরের ছোট; আমার গৃহিণী আমার থেকে ছ' বছরেরও কিছু বেশী, মানে ছ' বছর ক' মাসের ছোট; মণি বউদি আমার গৃহিণী থেকেও আবার আট দশ বছরের ছোট। এবং আমাদের সম্পর্কটা ফেল্‌না সম্পর্ক নয়।

সম্পর্কের স্বরূপটা ঠিক প্রকাশ করব না, কারণ মণিবউদির পরিচয়ের যে বিচিত্র রূপ আমি দেখেছি, সে-রূপ প্রকাশ করবার পর আমার এবং মণিবউদির আপনজনদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে অন্তরে আমার অ-সুখ অস্বস্তির আর শেষ থাকবে না। তাছাড়াও কথা আছে; সেটা হল—মণিবউদিকে আপন বলে স্বীকার করা বা দাবী করা সংসারে বা সমাজে সহজ কথা নয়। আমাকে নিজেকেই কি এই বউদিটিকে আমার আত্মীয় আপনজন বলে মেনে নিতে, স্বীকার করতে, কম বেগ পেতে হয়েছে? প্রায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি বলতে গেলে।

পরিচয়ের প্রথম যুগটা তাঁকে স্বীকার করি নি। একেবারে একটা যুগ অর্থাৎ পুরো বারো বছর। প্রথম মণিবউদির সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশুনো এবং পরিচয় হয়েছিল ১৯৪২ সালে।

তখন কিছু কাল হল সবে কলকাতায় বাসা করেছি। আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে থাকি। জীবনে প্রতিষ্ঠা আসছে। 'কালিন্দী' নাটক নাট্যনিকেতনে হয়েছে বটে কিন্তু মধ্যপথে থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে স্টেজের মালিকের মামলার ফলে মালিককে থিয়েটার বন্ধ করতে হয়েছে। এর পর এই দিকের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হল 'দুই পুরুষ' নাটকের সাফল্যে।

সেকালে—; সেকালই বা বলি কেন—এ কালেও বটে, সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠার বিচার গল্প উপন্যাস বা কবিতার রসোত্তীর্ণতা নিয়ে ঠিক নয়, ও নিয়ে বিচার যাঁরা করেন তাঁরা জাত হংস; নীরের মধ্য থেকে ক্ষীর গ্রহণের ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা। সাধারণ লোকের কাছে সাহিত্যিকের সাফল্যের বিচার নির্ভর করে তার কখানা বইয়ের ক'টা সংস্করণ হল এবং কখানা বই ছবি হল বা কখানা নাটক স্টেজে হল, এই তথ্যটির উপর। সাধারণের মধ্যেও আবার অসাধারণ আছেন, যাঁরা হচ্ছেন নাকি, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিহিত, গাড়ী,

বাড়ী ও বিষয়সম্পত্তি ও ব্যবসায়-ব্যণিজ্য-ক্ষেত্রের মহাজন।

এমনি একজন মহাজনদাদার নাম—ধরুন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়। যাঁর নাম অনেক শুনেছি কিন্তু কখনও দেখি নি। গাড়ী বাড়ী বিষয় ব্যবসায়ের মালিকানি ছাড়াও এঁর মহাজনত্বের মধ্যে আরও বিশেষত্ব ছিল এই যে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যে সব বি-এ, এম-এ পাশ ব্যক্তি দেশে দেশহিতৈষী বলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, অবিবাহিত থেকে ব্রতচারণার মত দেশসেবা কর্ম করে চলতেন, ইনি তাঁদেরই একজন। এবং সে-কালে আচার্য রায়ের মন্ত্রশিষ্য বলে নিজেকে দাবী করতেন। অমৃতবাবু—আমার অমৃতদা'র ইচ্ছে ছিল না যে, তিনি ধনী মানুষ হন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য তাঁকে ধনী মানুষ করে দিলে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে দশজনের দোরে ধরণা দিয়ে শেয়ার বিক্রী করে একটা কাপড়ের কল এবং কাপাসের চাষ করবার কল্পনা নিয়েছিলেন। এবং তারই প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে একটা বিস্তীর্ণ পতিত প্রান্তর কিনেছিলেন কোন স্থানে। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ১৯২১-এর অনেক আগে, শেষ হল ১৯২১-এর কিছুদিন পর। কোম্পানী ফেল পড়ল, অমৃতদা ইনসলভেন্ট হলেন; পতিত প্রান্তরটা থেকে গেল অমৃতদা'র মার নামে। ১৯২৫।২৬ নাগাদ সেই বন্ধ্যা প্রান্তরটা প্রসব করলে একজাতীয় বিচিত্র পাথুরে মাটি। যে-মাটির নাম হল ফায়ার-ক্লে। আগুনে লোহা গলে জলের মত যখন তরল হয় তাকে তখন ধারণ করতে পারে কেবল এই ফায়ার-ক্লে মাটি। লোহার যে পাত্রে লোহা গলানো হয়, সেই পাত্রের ভিতরটায় এই মাটি এবং এই মাটিতে তৈরী ইট দিয়ে আর একটা আবরণ তৈরী করে নিতে হয়, তবে লোহা গলানো সম্ভবপর হয়। নইলে লোহার পিণ্ডের সঙ্গে লোহার পাত্রটারও গলে যাবার কথা। এ মাটি লোহার যুগের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মাটি।

অমৃতদা এই মাটি মূলধন করে কারখানা গড়বার জন্য নতুন কোম্পানী খুললেন। এবং সোনা মাটি মাটি সোনা এই সত্যটাকে পরমহংসদেবের আর নিঃসন্দেহে আর একবার প্রমাণিত করলেন। অবশ্য পরমহংসদেবের সত্যের উল্টোপিঠটাকেই সত্য বলে প্রমাণিত করলেন। কথাটা আমার নয়, কথাটা অমৃতদা'র। দশ বিশটা কথার মধ্যে একবার না একবার তিনি বলতেনই কথাটা। বলতেন—দেখ হে, সত্য যা তার এ পিঠও যেমন সত্য ও পিঠও ঠিক তেমনি সত্য। সত্যের উল্টো বলে সেটা মিথ্যে নয়।

আরও গম্ভীর হয়ে বলতেন—দেহেরই ছায়া পড়ে। আত্মার ছায়া পড়ে না। সে ট্রানসপেরেন্ট।

ইনি সে কালের অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়—ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট মহলের এ. মুকুরজী বা মুকুর-জী-সাব; এবং দেশসেবকদের কাছে খদ্দরপরা মহান ব্যক্তি, তার সঙ্গে দার্শনিক; পণ্ডিত তো বটেনই। তাঁর চিঠির কাগজ থেকে দরজার পাশের নেমপ্লেটে তাঁর নামের শেষে লেখা থাকে দুটি ইংরিজী অক্ষর M. A.। ইনিই আমার অমৃতদা। উত্তর কলকাতাতেই সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যু থেকে বের হওয়া একটি প্রশস্ত রাস্তার উপর বাড়ী করেছেন। হঠাৎ তাঁর পত্র পেলাম একটা। এম্‌বসিং পদ্ধতিতে অমৃতভাণ্ড লাঞ্ছিত একখানি মূল্যবান চিঠির কাগজে

স্বহস্তে লিখেছিলেন চিঠিখানা। চমৎকার ইংরিজী ভাষায় লেখা। চিঠিখানা হারিয়ে গেছে। মর্মার্থ মনে পড়ছে। সম্বোধন ছিল, মাইডিয়ার···বাবু। অতঃপর মর্মার্থ বাংলায় লিখছি। ভাষাটা আমারই হয়ে গেল।

"তুমি (বা আপনি) আমার পত্র পেয়ে আশ্চর্য হবে নিশ্চয়। তবে আমি নিশ্চিত যে তোমার সঙ্গে আমার নিকট আত্মীয়তার বিষয় সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ নও। তিনপুরুষ পূর্বে যাটটি বিবাহ দ্বারা বিখ্যাত, যাটটি পত্নীর স্বামী, যেটেরা কালিচরণ তোমার শ্বশুরের ঠাকুর্দা একথা নিশ্চয় জান। এই যেটেরা কালিচরণেরই আর এক পৌত্র আমার পিতৃদেব। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর পিতামহ এবং আমার পিতামহ বৈমাত্রেয় ভাই অর্থাৎ দুই মায়ের সন্তান হইলেও এক পিতার সন্তান। ফলতঃ তোমার স্ত্রী আমার খুড়তুতো বোন। সুতরাং আমি তোমার ব্রাদার-ইন-ল। বয়সে অবশ্য অনেক তফাৎ হইবে। অত্যন্ত আফসোসের কথা—ম্যাটার অব গ্রেট রিগ্রেট যে, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। তুমি এখন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। নাট্যভারতীতে তোমার দুই পুরুষ নাটক দেখিতে গিয়া অমরের সঙ্গে দেখা হইল। সে-ই বলিয়া দিল যে, তুমি চারু-খুড়োমশায়ের জামাতা। আমার ভগ্নীপতি। নাটকটি খাসা লাগিল। বেড়ে লিখিয়াছ। কঙ্কনার বাবুদের নাম করিয়া···দের খুব ঠুকিয়াছ। যাহাই হউক তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চাই। এ বিষয়ে আমার গৃহিণীর খুবই উৎসাহ। আগামী রবিবার আমাদের বাড়ীতে একটি মজলিস হইবে। তুমি সস্ত্রীক অবশ্যই আসিবে। অবশ্যই আসিবে। কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকিবেন। আলাপে উপকৃত হইবে বলিয়া মনে করি। নিশ্চয় আসিবে। রবিবার বৈকাল পাঁচটার সময় গাড়ী পাঠাইব।"

আমি অমৃতবাবুর নাম যে আত্মীয় হিসেবে শুনিনি তা নয়; তবে আমার শ্বশুরদের সঙ্গে ওঁর মেলামেশার আত্মীয়তা ছিল না। অমৃতবাবু এম-এ পাশ এবং এককালে দেশসেবক ছিলেন বলে শুধু-মাত্র ব্যবসায়ী, খনির মালিক আমার শ্বশুরদের সঙ্গে বেশ একটা অন্তরের মিল ছিল না। একটা কমপ্লেক্স কাজ করত উভয়পক্ষে। আমার খোদ শ্বশুরেরা খনি ব্যবসায়ে অমৃতবাবু থেকে বৃহত্তর ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এম-এ পাশ এবং এককালে দেশসেবক হিসেবে অমৃতবাবু এঁদের থেকে অনেক উচ্চনাসা ব্যক্তি ছিলেন, এবং এঁদের বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেকে মহত্তর সত্তা বলে জাহির করতেন।

মণি বউদির কথা বলতে গিয়ে অমৃতদার কথা বেশী বলতে হল। না-বলে উপায়ও নেই। ছায়া, সে যেমনই হোক, যে কায়ার সে প্রতিফলন, তাকে বাদ দিয়ে তো তার কোন অস্তিত্বই নেই। বিশেষ করে অমৃতদা এবং মণি বউদির ক্ষেত্রে এই সত্যটা অত্যন্ত কঠিন বাস্তবের রূঢ়তায় রূপ নিয়েছে। সে-কথা পরে প্রকাশ পাবে।

আমি একাই গিয়েছিলাম, আমার গৃহিণী যান নি। তার কারণ পূর্বে বলেছি; আমার শ্বশুরকুল নিজেদের সম্পদে এবং শিল্পপতিত্বের বৈষয়িক গুরুত্বে আপনাদের বৃহৎ মনে করতেন এবং অমৃতদা এম-এ ডিগ্রীর ও একদা দেশসেবকত্বের গৌরবে এঁদের থেকে আপনাকে মহৎ মনে করতেন। ফলে দুইপক্ষের মধ্যে আত্মীয়ের অন্তরঙ্গতার চেয়ে জ্ঞাতিত্বের ঈর্ষা-অবজ্ঞাই

বড় হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিনের মধ্যে স্বল্প যোগাযোগের জন্য সেটা দৈর্ঘ্যে বড় না হলেও গল্পের বাস্তুসাপের মত আকারে ছোট হয়েও প্রকাণ্ড ফণাটা নিয়ে নিরীহভাবেই বেঁচে ছিল।

আমার গৃহিনী ভুরু কুঁচকে বললেন—দাদা! হ্যাঁ, তা সম্পর্কে দাদাও বটে, সম্পর্কও সত্যি বটে। কিন্তু সে তো কালিচরণের ষাটটা বউয়ের ছেলের খোঁজ করলে, পাঁচ ষাটে তিনশো হবে। ও তুমি যাও। লেখক বলে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে। আমাকে করে নি। করলেও আমি যাব না। আমার বাবা কাকাকে যা বলত!

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—তা ছাড়া তার বউ—! সে তো বিয়ে করেছে বুড়ো বয়সে প্রেম করে। বউ তো মাস্টারী করতো আগে। শুনেছি খুব ফ্যাশানে মেয়ে। লম্বা লম্বা কথা বলে। সে আমার সহ্য হবে না। তোমরা লেখক মানুষ তোমরা যাও। তোমাদের ভাল লাগবে। তবে সাবধান হয়ে কথাবার্তা বলো বাপু, সে মেয়ে বিশ্বনিন্দুক। বড্ড চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। আর রূপের গুমোরে বিদ্যার গুমোরে অপ্সরী বিদ্যেবতী তো ফেটে পড়েন! আমাকে যে-সে বলে নি, বলেছে, বড়বউদি দেবেনদার বউ।

দেবেনবাবু আমার স্ত্রীর বড় মামাতো ভাই। আমার মামাশ্বশুরেরা বিখ্যাত ধনী। বড় বড় খনির মালিক। কোল মাইন, মাইকা মাইন নিয়ে বিরাট ব্যবসা। তার সঙ্গে তাঁরা ফায়ার-ব্রিক্‌সের কারখানাও করেছেন। অমৃতবাবুর সঙ্গে ফায়ার-ক্লে নিয়ে ব্যবসার সম্পর্ক আছে। রক্তের সম্পর্ক, আত্মীয়তার বা কুটুম্বতার সম্পর্ক বংশগৌরবে, বিদ্যাগৌরবে অনায়াসে উপেক্ষা করে চলা যায়, কিন্তু ব্যবসায়ের লেনদেন সম্পর্ক যেখানে, সেখানে সেই যে একটা কথা আছে—'ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষ' বলে, সেই কথাটাই চরম সত্য হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের একজন নিরক্ষর মানুষ প্রথম জীবনে ভাগাড়ের মরা গরুর চামড়া আর হাড় কুড়িয়ে ব্যবসা শুরু করে বহু লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন। তাঁর ম্যানেজার যিনি ছিলেন তিনি রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি বলে কথা বলতেন। তিনি দূরের কথা—রায়বাহাদুর খেতাব পেয়ে তিনি রাজদরবারে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-রায়বাহাদুর এম-এ পাশ-রায়বাহাদুরদের পাশে বসতেন। এবং তাঁর বাড়ীর নিমন্ত্রণে সকলে যেতেন। সুতরাং ব্যবসাতে নেমে এম-এ পাশ এককালের দেশসেবক, তাঁর ফায়ার-ক্লের খরিদ্দারের কাছে আসবেন এবং মিষ্ট অন্তরঙ্গতায় অন্তরঙ্গ হতে চাইবেন এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। তবে আড়ালে হয় তো ইনিও মন্দ কথা বলেন এবং তিনিও বলেন। দেবেনদা অমৃতদার থেকে কিছু ছোট, কিন্তু অমৃতদার বউ দেবেনদার বউ থেকে অনেক তরুণী, হয় তো সুন্দরী আধুনিকাও বটেন, তার উপর তিনি না কি মাস্টারী করতেন, অর্থাৎ শিক্ষিতা, পাশ করা মেয়ে, সুতরাং দেবেনদার বউয়ের কানে কথা চ্যাটাং চ্যাটাং ঠেকবারই কথা এবং চোখে এই আধুনিকার (তরুণী রূপসীটির) বেশভূষা, প্রসাধন, স্মার্টনেস সব কিছুই ফ্যাশানোদ্ধত বলেও মনে হতে পারে স্বাভাবিকভাবে।

আমি মনে মনে হাসতে হাসতেই গেলাম।

অমৃতদা সবান্ধবে বসে ছিলেন—দেবেনদাও ছিলেন, দেবেনদাই বললেন—এই এসে গেছে।

অমৃতদা এসে হাত ধরে আমাকে কিছু বললেন না—ডাকতে লাগলেন মণিবউদিকে।

—কোথায় গেলে। ওগো। ওগে ।

বোধহয় কাছেই ছিলেন কোথাও মণি বউদি। ঘরে ঢুকে বললেন—এই তো গেলুম—এরই মধ্যে ওগো-ওগো। কি ?

অমৃতদা বললেন—'সংসার-স্যাভ্যাল যুদ্ধে ওগো আমাদের ওগো ; একান্ত ভরসা সখি, তোমারই এ্যাডমিরাল টোগো।' বুঝেছ। নাও—ইনিই আমাদের—

সহাস্যে মণিবউদি বললেন—আসুন। অত্যাধুনিকা সুন্দরী তরুণী মণি বউদি, শুধু সামনের দাঁত দুটি উঁচু। হাসলে বেশী উঁচু দেখায় কিন্তু খারাপ লাগে না। আমার কিন্তু বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ইনিই মণি-বউদি ?

দুই

অবাক হয়ে গেলাম। ইনিই মণি-বউদি ? বিচিত্র বিস্ময়। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল—খুব চওড়াপাড় তাঁতের শাড়ী পরে কাঁধে দামী এবং শৌখীন শান্তিনিকেতনী ঝোলা ঝুলিয়ে একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের তরুণী দুপুরবেলা হেঁটে চলেছেন কলকাতার দ্বিপ্রহরের রাজপথ ধরে, তাঁরও সামনের দাঁত দুটি এমনি উঁচু। দুপুরবেলা রাজপথে লোকজনের যাতায়াত কমে চিরকালই আসে ; ভিড় পাতলা হয়। সেকালে সেকালের মতোই হতো। একালে একালের মত হয়। তখন ১৯৪২ সাল চলছে। তখনও বোমা পড়েনি, সময়টা ছিল গরমের সময়। কলকাতার লোকের একটা অংশ তখন বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মফস্বল শহরে ভিড় জমিয়ে সে কালের 'ড্যাঞ্চিবাবু' নামে খ্যাত হয়ে থাকলেও কলকাতায় ভিড় মোটামুটি তখনও ছিল। এবং দুপুরের দিকে বেলা সাড়ে এগারটার পর থেকে বেলা তিনটে, গ্রীষ্মের সময় চারটে পর্যন্ত, একটা সময় আপিস ও বাজার অঞ্চলের বাইরের অঞ্চলগুলোতে একটা অলস নিশ্চলতার খাঁ খাঁ ভাব ফুটে উঠত। রাস্তায়-ঘাটে ভিড় পাতলা হয়ে যেত। দোকানপাট কিছু কিছু বন্ধ হত। কিছু কিছু দোকানের দরজা ভেজানো থাকত। দোকানী বসে ঢুলত, না হয় কোন একখানা বই খুলে বসে থাকত। রেস্টুরেন্টগুলো খাঁ খাঁ করত। কুকুর, গরুগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে পথের দুপাশে বসে ঝিমুত। নির্জন রোয়াকে বসে মস্তানের দল বিড়ি টানত এবং অলস মন্থর সুরে ও কণ্ঠে রসিকতা করত। মধ্যে মধ্যে দু'খানা চারখানা গাড়ী হর্ন বাজিয়ে রাস্তার নির্জনতা ও স্তব্ধতাকে একটু সচকিত করে দিয়ে চলে যেত। কখনও বা ঠুন-ঠুন শব্দ তুলে যেত এক-আধখানা রিক্সা। এবং দু'চারখানা সেকালের থার্ডক্লাস ঘোড়ার-গাড়ীর আওয়াজও উঠত মধ্যে মধ্যে। তখনও ঘোড়ার-গাড়ী যায়নি। তাই বা কেন—মধ্যবিত্ত সমাজে ঘোড়ার-গাড়ীর আধিপত্য পড়ন্ত জমিদার বাড়ীর প্রতাপের মত বজায় ছিল। বরঞ্চ যুদ্ধের বাজারে মোটর আমদানীতে মন্দা পড়ায় কিছুটা যেন আবার চনমন করে

উঠেছিল।

এমনি সময়ে খুব চওড়াপাড় তাঁতের শাড়ীপরা শান্তিনিকেতনি ঝোলা কাঁধে শৌখীন চটি পায়ে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখতাম—হেঁটে চলে যাচ্ছেন। সেটা অল্পদিন আগের ঘটনা ছিল তখন। জনবিরল পথে সুন্দরী তরুণী অবশ্য চোখ ও দৃষ্টিকে চকিত ও আকৃষ্ট করেই থাকে; এ মেয়েটিও করেছিল। বলতে গেলে একটু বেশী চকিত ও আকৃষ্ট করেছিল। কারণ ছিল—তাঁর বেশ, ভূষা, আচরণ ও চালচলনের মধ্যে প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার এমন একটি বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছিল যে তা শুধু দৃষ্টিকেই আকর্ষণ করত না, সঙ্গে সঙ্গে মনকে সবেগে নাড়া দিয়ে কুমোরের চাকের মত ঘুরিয়ে দিত, যার ফলে চাকের মাথার মাটি থেকে যেমন গেলাস বা হাঁড়ি বা খুরি গড়ে ওঠে তেমনিভাবেই একটা প্রশ্ন চেহারা নিয়ে গড়ে উঠত —মন বলত—"আরে! এটা কিরকম হ'ল! শান্তিনিকেতনী ঝোলা এবং চটির সঙ্গে হাতীপাঞ্জা লালপেড়ে শাড়ী পুরনো ঢঙে পরা। মাথায় প্রচুর চুলে বাঁধা ঝুঁটি-খোঁপায় সাঁওতালী ঢঙ-এর রূপোর চেনে ঝুমকো ঝোলানো খোঁপাভরণ; তার সঙ্গে সিঁথিতে সিন্দুরের ঘটা; গলায় পলার মালা—যা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং তার সঙ্গে হাতে শাঁখা ও নোয়া; এ কিরকম হল!" অথচ অনায়াসে মানিয়ে গেছে মেয়েটির চাল-চলনের স্বচ্ছন্দতায়। আরও আছে।

প্রথম দিন ওঁকে দেখেছিলাম গৌড়ীয় মঠের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা এসে পড়েছে বাগবাজারে, সেই রাস্তা ধরে বাগবাজার স্ট্রীটে উঠলেন। ছিল গরমকাল, জ্যৈষ্ঠ মাস। বাড়ীর কলে জল ছিল না, চৌবাচ্চায় জলের এমন অবস্থা যে দুপুরবেলা খাবার পর হাত ধোয়াটা কোন মতে হলে বাঁচি। তাই যাচ্ছিলাম গঙ্গার দিকে। গঙ্গাস্নান করে আসব। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে সাড়ে এগারটার সময় গঙ্গাস্নানে যাওয়া-আসা সহজ কাজ ছিল না। বিরক্তি-ভরেই হাঁটছিলাম। এরই মধ্যে বাঁদিকের রাস্তা থেকে বেঁটে ছাতা মাথায় মেয়েটি বাগবাজারে পৌঁছে আমার সামনে পশ্চিমমুখ করে একরকম ইঞ্জিনের মতই আমাকে একটা আকর্ষণের জোরে টান দিলেন। পিছন থেকে তাঁর চুলের ঝুঁটি-খোঁপাতে রূপোর ফুলে ঝোলানো চেনগুলির দোলা অবশ্যই আমার মনকে দোলা দিয়েছিল ১৯৪২ সালে। তখন আমি মাত্র চুয়াল্লিশ। শুধু চেন এবং সাঁওতালী ঢঙের ফুলই নয়, তাঁর হাতিপাঞ্জা পাড়ের ডগডগে রঙও মনে ছায়া ফেলেছিল। তার সঙ্গে তাঁর চলনভঙ্গি। সে ভঙ্গিতেও একটা আকর্ষণী ছিল। সারা অঙ্গ যেন দুলত। না, দুলত বলব না। ঠমক-লাগা কথাটা ব্যবহার করব। তুলসীদাসের ভজনে আছে—'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পায়জনিয়া।' নিজের গতিকে দ্রুততর করে-ছিলাম। সকলেই করে। যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে দেখতে সকলেই চায়। আমিও তাই চেয়েছিলাম, তাঁকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে কোন দোকানের ধারে কোন ছুতোয় দাঁড়িয়ে দেখে নেব। কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। বাগবাজারের বাজার যেটা, সেই বাজারের কোন দোকান থেকে অথবা বাজার ঢুকবার পথের মোড় থেকে একটি তরুণ-কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল—এ-ই চলল 'দন্তমনোরঞ্জিনীসুহাসিনী টুথ পেস্ট'—। এবং এমন-

ভাবে বললে যে, সকলেই প্রায় হেসে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মুখবর্তিনী-হংসগামিনী ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। বোধ হয় দেখতে চাইলেন বক্তাকে। কিন্তু সে তো হয় না, দেখতে এমন ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। 'হাওয়া হয়ে যাওয়া' বলে একটা কথা আছে; এমন ক্ষেত্রে যে এমন ধরণের কথা ছুঁড়ে মারে, সে মেরে আর দাঁড়িয়ে থাকে না, মেরেই 'হাওয়া হয়ে যায়'। যে বলেছিল সে বোধ হয় মার্কেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কিন্তু আমার লাভ হয়েছিল। আমি একেবারে তাঁকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিলাম, দূরত্ব ছিল মাত্র হাত পাঁচ-ছয়, তার বেশী নয়। দেখলাম তাঁর সামনের দাঁত দুটি অল্প-একটু উঁচু, কিন্তু উঁচু হলেও বাকীগুলিকে নিয়ে এমনই আনুপাতিক সামঞ্জস্য রেখে সাজানো যে, ভারী ভাল লাগে। আরও যেটা চোখে পড়েছিল এবং যেটা আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছিল সেটা হল তাঁর মুখের হাসি, দেখলাম ঠোঁট দুটিতে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠেছে। গালে দুটি টোল পড়েছে তাতে। মনে হল, 'দন্তমনোরঞ্জিনীসুহাসিনী টুথ পেস্টের' অন্তর্হিত অর্থের সঙ্গে সত্যই একটা মিল আছে এবং তাঁরও রস-বোধ আছে যার জন্যে এমন কথাটা তাঁকে খুশী না করে পারেনি। তারপরই মনে হয়েছিল—না। হাসির মধ্যে এতবড় অবজ্ঞা বা ঘৃণা আর হয় না। থুথু ফেলে অবজ্ঞা প্রকাশ করাও এর থেকে হাল্কা ব্যাপার। তিনি এসে দাঁড়ালেন বাগবাজার স্ট্রীট এবং চিৎপুর রোডের জংসনে, দক্ষিণ দিকে যে কালীবাড়িটি আছে সেখানে। কথা বলতে লাগলেন পুরুতের সঙ্গে। আমার আর দাঁড়াবার সময়ও ছিল না, উপায়ও ছিল না; মাথার উপর রোদ চড়ছে, সঙ্গে আছে বাড়ীর ঠাকুর আর চাকর, একসঙ্গেই স্নান করতে এসেছি। গৃহিণী হেঁসেল নিয়ে বসে আছেন। গঙ্গাস্নান থেকে ফিরবার পথে ভাল করে এদিক-ওদিক দেখেও তাঁকে চোখে পড়ল না। এবং ততক্ষণে গঙ্গাস্নানের সঙ্গেই বোধ হয় কৌতূহল অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল।

অমৃতদার বাড়ীতে মণি-বউদিকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম, কিন্তু মণি-বউদি আদৌ বিস্মিত হলেন না। সেই মুখ, সেই ঈষৎ উঁচু দাঁত এবং পদক্ষেপের ভঙ্গির মধ্যে সেই সারা অঙ্গে দোলনলাগা ঢঙের মিল থাকলেও এ-মেয়ে সেই মেয়ে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ জাগল আমার। ওদিকে তাঁর বিস্ময়লেশহীন মুখ নিয়ে তিনি একরকম চ্যালেঞ্জ দিয়ে দাঁড়ালেন।

ইনি অর্থাৎ মণি-বউদি অবিকল সেই মেয়েটির মত দেখতে হলেও আজকের পোশাকে-পরিচ্ছদে, রকমে-সকমে একেবারে স্বতন্ত্র। এ মণি-বউদি একেবারে ১৯৪২ সালের নিখুঁত মডার্ন মেয়ে; ফেরতা দিয়ে সুন্দর সাদা-জমির উপর সূক্ষ্ম সুচে তোলা বুটিদার ঢাকাইশাড়ী পরেছেন। গায়ে টকটকে লাল বর্ডার দেওয়া সিল্কের ব্লাউজ; পাতা কেটে চুলের বিন্যাস; মুখে স্নো-পাউডারের চড়া সূক্ষ্ম শুভ্রতা, চোখে সুর্মা বা কাজল, তার সঙ্গে ঠোঁট দুটিতে লিপস্টিকের রঞ্জনী; হাতে চুড়ির গোছা, গলায় পাথর-বসানো নেকলেসটির ছটা আজও মনে পড়ছে আমার। আমার এই বিস্ময়কে উপহাস করে তিনি বলে উঠলেন, আপনিই আমার প্রিয় লেখক এবং নন্দাই? ও মা? এ যে মনে আঁকা ছবির সঙ্গে একেবারে মেলে না।

আমি হেসে বললাম, আপনি বুঝি আমাকে অমৃতবাবুর চেয়েও দেখতে সুপুরুষ ভেবে-ছিলেন ?

অমৃতবাবু বলেছিলেন—ওহে বাপু আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ, তোমার থেকে বয়সে অন্তত আট-দশ বছরের বড়। এবং তোমার স্ত্রীর দাদা। আমাকে দাদা বলবে।

আঘাত দিতে ইচ্ছে হল কিন্তু এই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তা পারলাম না। মেয়েটির অভ্যর্থনা এবং কথাবার্তার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল সেটি একটি প্রসন্ন প্রদীপের মত জ্বলছিল —তাকে নিভিয়ে দিতে অথবা ফুঁ দিয়ে কাঁপিয়ে দিতে ভাল লাগল না। মনের মধ্যে তখন তাঁর-মনে-আঁকা আমার ছবিটির সম্পর্কে অনেক সকৌতুক কল্পনা করছিলাম আমি।

মণি-বউদি বলে উঠলেন—তার জন্যে হুঙ্কার ছাড়তে হবে না। তোমাকে, সে উনি নিশ্চয় বলবেন। বলবেন না ?

ইচ্ছে হল বলি, কথাটার মীমাংসা ওঁকে ডেকে করলেই ভাল হয়। সে যদি দাদা বলে ডেকে বিগলিত হয়, তবে অবশ্যই আমি বলব। কিন্তু তার আগেই মণি-বউদি বাকী কথাটা শেষ করলেন—তোমার ছোটবোনের স্বামী হিসাবে তোমাকে দাদা বলুন চাই না-বলুন, আমার জন্যে তোমাকে দাদা বলবেন। কারণ আমি শালাজ এবং বউদি এক-আধারে দু-ই হব। বলে মুখ টিপে হাসলেন। সে হাসিতে দুই গালে দুটি টোল পড়ল এবং হাসিতে যে মিষ্টতা ফুটে উঠল তা সেদিনের সেই মেয়েটির সেই মিষ্টি হাসিকে মনে করিয়ে দিয়েই আর এ-হাসি ক্ষান্ত হল না, সে-হাসি যেন এক মুখেরই এক হাসি হয়ে জ্যামিতির দুটি ত্রিভুজের মত এক হয়ে মিলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যাটি কেটেছিল ভাল। অমৃতদাকেও ভাল লেগেছিল। অমৃতদাকে লোকে পণ্ডিত জানে। প্রাক্তন দেশকর্মীদের যে একটি পৃষ্ঠপোষকসুলভ অহঙ্কৃত স্নেহ বা করুণা বিতরণের ঔদ্ধত্য থাকে, তাঁর চরিত্রে তা কিছু কিছু থাকলেও এখন সে-সব ঘষেমেজে সমান মসৃণ হয়ে এসেছে। এখন যেটা আছে সেটা মোটামুটি সম্পদের হাঁকডাক। অহরহই তিনি এটা দেখাতে ওটা দেখাতে ব্যস্ত। ফার্নিচারগুলো কোথা থেকে কেনা, মেঝের মারবেলের বিশেষত্ব কি, কোন্ কোন মেঝের মারবেল খাস ইটালিয়ান, এমন কি বাথরুমে যে পোরসেলিন টাইল্‌স্ বসিয়েছেন, তা কিভাবে সংগ্রহ করেছেন, এতেই তিনি মশগুল। কোনমতে বা কোনক্রমে যদি মণি-বউদির ধাক্কায় এই চক্র থেকে ছিটকে বেরুচ্ছিলেন তো সোজা গিয়ে আবার একটা অনুরূপ চক্রে ঢুকে ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন; সে চক্রটা হল সরকারী মহলের স্পাইর‍্যাল সিঁড়িতে উঠে একেবারে উপরে গোলকধাঁধার মত গোলাকার একটা মহল, যার দু'পাশেই ঘরগুলিতে রাজকর্মচারীদের দপ্তর। যাঁরা খাঁটি দেশকর্মী তাঁদের পক্ষে সেকালে এ মহল ছিল শৌণ্ডিকালয় বা বেশ্যালয়ের তুল্যই অন্য একটি আলয়, যেখানে পদার্পণ করলে স্মার্ত বিধানে নরকে পতন ছিল অনিবার্য। একালে কিন্তু তা নয়। উল্টে গৌরবের স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মণি-বউদির মুখখানার চেহারা আমার মনে পড়ছে। স্বামী সরকারী মহলের কথা

তুলতেই তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। মণি-বউদির রঙ হলদেটে ফরসা নয়, লালচেও ঠিক নয়, তাঁর দেহবর্ণে সাদার আভাস বেশী। তার উপর পাউডার এবং স্নোর সূক্ষ্ম আস্তরণ বিলেপনে মর্মরশুভ্র দেখাচ্ছিল। সে মুখ লাল হয়ে উঠল। দুটি ভ্রূর মাঝখানে ঠিক নাকের উপরে ক'টি কুঞ্চন রেখাও দেখা যাচ্ছিল। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না এ গোলকধাঁধা থেকে স্বামীকে বের করবেন কি করে? হঠাৎ পথ পেলেন। বললেন—আমাকে না ওঁকে। বললেন—একটা কথা বলব কিন্তু। রাগ করো না যেন। করলে আমি নাচার। সেদিন কিন্তু ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দী তিনজন বাড়িতে এলেন তোমার জন্মদিনে। আর তুমি কড়া কথা বলে দিলে? এগুলো কিন্তু ঠিক নয়।

হা হা করে হেসে উঠলেন অমৃতদা। তিনি প্রায় বিগলিত হয়ে গিয়েছিলেন। হাসি থামিয়ে কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু বউদি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—এইবার সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করব কিন্তু। করি?

—কি? কোন্ কথা। অমৃতদা হাসি থামিয়ে স্ত্রীর মুখপানে চাইলেন।

—সেদিন দুইপুরুষ দেখে ফেরবার পথে যে কথা হয়েছিল!

—ও। তা বেশ তো। কর না।

—আচ্ছা, সত্যি কথা বলবেন লেখক-মশাই। নূটবিহারীর চরিত্রটি কোথায় পেলেন? ওটি কার চরিত্রের ছায়া নিয়ে গড়েছেন? ওঁর নয়?

আমি কি উত্তর দেব খুঁজে পাইনি। আবার হো হো করে হেসে উঠতেও পারিনি।

দুইপুরুষের নূটবিহারী,—অমৃতদা?

আমার বিস্ময় বা নীরবতায় তাঁদের কিছু এসে-গেল না। মণি-বউদি প্রমাণ করে দিলেন যে অমৃতদার চরিত্রের ছায়া থেকেই দুইপুরুষের নূটবিহারী চরিত্র আমি গড়ে তুলেছি। মণি-বউদি এককালে শিক্ষিকা ছিলেন শুনেছিলাম; অমৃতদা নূটবিহারী—এই তথ্যটিকে, সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেই, সেদিন তিনি তার প্রমাণ দিয়েছিলেন। কোন বক্র অর্থকে প্রচ্ছন্ন রেখে এ-কথা বলছি না। সত্যসত্যই মণি-বউদির বিশ্লেষণী ভঙ্গিটি ভাল লেগেছিল আমার। এবং কয়েক জায়গাতেই চরিত্রচিত্রণে ত্রুটিও তিনি তুলে ধরেছিলেন। তখন নিমন্ত্রিতেরা একে একে আসছেন, বসছেন; চাকর ট্রের উপর শীতল পানীয় নিয়ে গিয়ে সামনে ধরছে। মণি-বউদি কথা বলতে বলতেই তাতে ছেদ টেনে অভ্যর্থনা করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাতেও ছেদ টেনে বিশ্লেষণীতে ফিরে আসছেন। সে বেশ সাবলীলতার সঙ্গে। মনে পড়ছে, আমার সম্পর্কে ভায়রাভাই সমরদা, সস্ত্রীক এসেছিলেন কথার মাঝখানে। তখন মণি-বউদি বলেছিলেন, নূটুবাবুর সঙ্গে ওঁর চরিত্র মিলিয়ে দেখুন; প্রথম প্রথম যখন উনি এম-এ পাশ করে দেশ দেশ করে বেকার রয়েছেন, এর দোরে, ওর দোরে শেয়ার বিক্রী করে ফিরেছেন, তখন আত্মীয়দের সঙ্গে এতটুকু মনের মিল নেই; যা তা কথা বলতেন; লোকে বলতো, লোকটা দুর্বাসা। এই-এই-এই সমরবাবু এসেছেন, উনি সাক্ষী দেবেন, আসুন, আসুন; আসুন ভাই বীণাদি, আসুন। বসুন। খুব জমেছে কথা। আমি বলছি, উনি নূটবিহারীর চরিত্র এঁকেছেন

আমার কর্তাটিকে দেখে। খুব ইনটারেস্টিং নয়? বলুন তো মেলে কিনা? যে মানুষ ধনীদের ছায়া মাড়াতো না, গভর্নমেণ্ট অফিসিয়েলদের সঙ্গে যাঁর ছিল নন-কো-অপারেশন; এখন তিনি নিজে পয়সা করেছেন এবং মিনিস্টাররা তাঁর বন্ধু। মিলিয়ে নিন। তবে খুব ক্লেভার। এ বলতেই হবে। বিমলা আর কল্যাণীর ট্রাঙ্গেলের মধ্যে নুটুকে প্রেস করে এমন ফ্রেমে এঁটে দিয়েছেন যে আসল মানুষটিকে ওই ফ্রেমের বাইরে এনে চরিত্রের আসল বৈশিষ্ট্য দেখতেই পায় না কেউ। আর দেখতে চায়ও না কেউ। কি? ও মা, কার গাড়ী থামল? মনে হচ্ছে খুব ভারী-গাড়ী থামল? কে এল বল তো গো? রায়বাহাদুর এলেন বোধ হয়। আসছি আমি—

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলামই না, তার সঙ্গে ভাবছিলামও। এই মণি-বউদি আর সেই মেয়ে কি এক হয় না, হতে পারে। সে-মেয়েকে তো একদিনই দেখি নি আমি। আরও কয়েকদিন—বেশ-ভূষায়, সেই ঢঙেঢাঙে, চালে-চলনে দেখেছি বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে। যাঁরা এইসব গঙ্গার ঘাটের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন, অপরাহ্ণ বেলা পড়লেই এই ঘাটের উপর ছোটখাটো পাঠের আসর বসে যায়। একজন পাঠক এসে যান তাঁর গ্রন্থ, আসন, গ্রন্থ রাখবার ছোট্ট একটি চৌকী, একটি পঞ্চপাত্র ও একটি কুশী নিয়ে। এবং বসে আচমন করে গ্রন্থপাঠ করতে লেগে যান:

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্/হংসং সরস্বতীংচৈব ততজয়োমুদীরয়েৎ—ভাগবত হোক, মহাভারত হোক, চৈতন্যলীলা হোক—পাঠ শুরু করেন এবং আপনা-আপনি একটি দুটি করে শ্রোতা এসে বসে যায় চারি পাশে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই গঙ্গার ঘাটের নৌকায় পণ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা, (সে খড়ের, ইটের, বালির, ইলিশ মাছের) নারীসন্ধানী পুরুষ—পুরুষসন্ধানী নারী, এবং খবরের কাগজ হাতে বায়ুসেবীদের জীবনস্রোতের মাঝখানে ধর্মচর্চার একটি দ্বীপের মত গড়ে ওঠে। সন্ধ্যা হ'তে হ'তে এ আসর শেষ হয়। শেষ হয় আলোর জন্যে। শ্রোতার মধ্যে মেয়ের দলই বেশী। তারা কিছু কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম ক'রে উঠে চলে যায়। এই ধর্মাকাঙ্ক্ষিনীদের মধ্যে কিছু পুরুষ-সন্ধানী ছদ্মবেশিনী থাকেন—যাঁরা উঠবার সময় আঁচলের ঝটকায় একটা আহ্বানের ইশারা জানিয়ে চলতে শুরু করেন। চলেন আর ফিরে তাকান। দেখে নেন কে আসছে। ওদিকে ঘাটের উপর যে দেবালয়গুলি আছে—সেখানে আরতির ঘণ্টা বাজতে শুরু করে। নতুন মুখের আমদানি হয়। শনিবারে শনি সত্যনারায়ণ হয়; পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ হয়। সে আবার বিশেষ সমারোহের দিন। সেদিন ভিড় আরও বেশী জমে।

এই এমনি একটি আসরে তাঁকে বসে থাকতে দেখেছি। ঠিক আসরে নয়। একটু স্বাতন্ত্র্য রেখে। কিন্তু এমন স্বাতন্ত্র্য নয় যাতে করে এই মণি-বউদি এবং ওই সাধারণ সত্যনারায়ণ করা মেয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও কোন এক অকাট্য প্রমাণে দুইকে এক বলে প্রমাণ করা যায়। মনে পড়েছে সেই মহিলাটি ভিড় থেকে খানিকটা স'রে একখানা খবরের কাগজ পেতে বসেছিলেন। এবং ঠিক যে পাঠই শুনছিলেন এমনও ঠিক বলা যায় না,

কারণ তাঁর দৃষ্টি পাঠকটির দিকে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁর দৃষ্টি ছিল—সোজা দক্ষিণমুখে। গঙ্গার প্রবাহ যে তরঙ্গ তুলে বয়ে যাচ্ছিল—তাঁর দৃষ্টি যেন সেই স্রোতে ভাসছিল।

আমি বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকান নি।

আরও দেখেছি।

বাগবাজার স্ট্রীট ধরে ফিরে যাচ্ছিলেন সন্ধ্যার পর।

একদিন নয়, দু-দিন।

মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

তার অর্থ খুব পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়নি। দৃষ্টিতে কিছু যেন ছিল।

মণি বউদির সঙ্গে তার হুবহু মিল—চেহারার দিক দিয়ে। কিন্তু এই দুই-পুরুষের নটু চরিত্র বিশ্লেষণরতা মণি-বউদির সঙ্গে সে মেয়ের প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

মণি-বউদির কাপড়ের পাড়টার দিকে তাকালাম, জমির দিকে তাকালাম। সুন্দর বুটিদার সাদা জমি উৎকৃষ্ট ঢাকাই শাড়ী। পাড়টা দু' আঙুলের বেশী চওড়া নয়। ব্লাউজটা লাল সাটিনের।

তাঁর শাড়ীখানা তাঁতের শাড়ী হলেও ঢাকাই ছিল না। ফেরতা দিয়েও পরে ছিলেন না তিনি, এবং তাঁর শাড়ীর পাড় ছিল আধ হাতেরও বেশী চওড়া, তার রং একদিন ছিল লাল, একদিন ছিল তিনরঙ্গা বা চাররঙ্গা। আর একদিন বা দুদিন—ওই লালই ছিল। হাতীপাঞ্জা লালপেড়ে শাড়ী।

মণি-বউদি তখন দুই পুরুষ সেরে ধাত্রী-দেবতা নিয়ে পড়েছেন। বলছেন—পিসীমা খুব রিয়েল আর গ্রেট। কিন্তু মায়ের কথায় একেবারে পঞ্চমুখ উনি। যাকে বলে মহিমময়ী—।

হেসে উঠে বললেন—ননদকে আমার আনলেন না কেন? একবার যাচাই করে নিতাম—ছোট্ট গৌরীটির সঙ্গে মেলে কিনা?

আমি কিছুতেই একটা মীমাংসায় আসতে পারিনি।

সে মীমাংসায় এলাম—আর কিছুদিন পর।

তিন

সেদিন আর ক'টা দিন পরের কথাটি বলবার আগে তার মাঝের কটা দিনের কথা বলে নিতে হবে।

এই মাঝের দিনকতক আমার একটা নতুন বাতিক দাঁড়িয়েছিল, দুপুরবেলা বাগবাজার স্ট্রীট এবং ওই গৌড়ীয় মঠের রাস্তাটির জংশনের কাছে দাঁড়ানো। এবং বিকেলবেলা বাগবাজারের অন্নপূর্ণা ঘাটে পাঠের আসরের আশে-পাশে ঘোরা। কিন্তু না; সেই মণি-বউদির সঙ্গে আশ্চর্য-সাদৃশ্যযুক্তা রহস্যময়ীর আর দেখা পাইনি। সন্দেহটা অনেকটা তাতেই

মিটেছিল ; মনে হয়েছিল, তিনি এবং ইনি অর্থাৎ মণি-বউদি দুইয়েই এক ও একেই দুই ? আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর মণি-বউদি একদিকের রাস্তা ছেড়েছেন, পাছে দেখা হয়ে যায়। তবে প্রশ্ন জেগেছিল—কেন ? দেখা-হওয়াটা এড়াতে চান কেন ? এবং এমনভাবেই বা উনি ঘোরেন কেন, ছদ্মবেশিনীর মত ?

মানুষের মনের মধ্যে একজন করে চোরও আছে, একজন করে পুলিশও আছে। একই সঙ্গেই আছে। ফলে কখনও বা চুরি করতে গিয়ে অপরের চুরি ধরে পুলিশ হিসেবে পুরস্কৃত হই, কখনও বা পুলিশী করতে গিয়ে চুরির বস্তু দেখে চুরি করে বসি। কিম্বা চোর ধরতে গিয়ে চুরির বামাল চুরি করে চোরের হাতেই ধরা পড়ে চোর বনে যাই। সঙ্গে সঙ্গে পালা-বদলও হয়ে যায়, দেখি যে-চোরকে ধরতে এসেছিলাম, সে-ই পুলিশ হয়ে গেছে। আমি হয়েছি চোর।

মণি-বউদিকে চোর হিসেবে ধরতে গিয়ে একদিন তাঁরই কাছে চোর অপবাদ নিয়ে মাথা হেঁট করে ফিরে এলাম।

ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলা দরকার। ওই প্রথম দেখা হওয়ার দিনের পর অমৃতদা এবং মণি-বউদি যেন আমার সঙ্গে মেলামেশার দিকে একটু বেশী ঝুঁকে পড়লেন। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার নিমন্ত্রণ পাঠালেন। এবার পত্র নিয়ে যিনি এলেন, তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁকে আমরা বলি স্মার্ট-ইয়ংম্যান—তাই।

সুন্দর সুট পরা একজন যুবক—তিরিশ বা পঁয়ত্রিশের মত বয়স, দেখতেও তিনি সুদর্শন এবং সুপুরুষ। অনেক সময় সুদর্শন হলেও সুপুরুষ হয় না, চেহারা হয় নরম-নরম কমলকুমারের মত। এ তা নয়। নামটি কমলকুমার হলেও বেশ শক্তপোক্ত দীর্ঘাকৃতি মানুষ। আগেই বলেছি, মণির আসল নাম মণি-দি নয় ; অমৃতদাদাও অমৃতলাল নন। এ নামগুলি বদলে দিয়েছি, কিন্তু 'কমলকুমারের' নাম খাঁটি সত্য। কমলকুমার অমৃতদা-র মামাতো ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ ভাইপো। প্রথমেই বলেছি অমৃতদা—যেটেরা কালিচরণের প্রপৌত্র, কুলীনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। যাঁরা বাংলার কৌলীন্য-প্রথার কথা জানেন, তাঁরা জানেন, কুলীন সন্তানদের সেকালে পিতা ছিলেন, পিতামহ ইত্যাদি ছিলেন এবং প্রকাণ্ড বংশলতাশ্রয়ী একটি কৌলীন্যমহিমাও ছিল ; কিন্তু তাঁদের পৈত্রিক ভিটা বা পৈতৃক বলে কোন ভূমি কারও ছিল না। তাঁরা জন্মাতেন মাতুলালয়ে। যৌবন প্রাপ্ত হলে অনেকগুলি কুলীন কুমারীর পাণিগ্রহণ করে পালাক্রমে তাদের গৃহে জামাতা সমাদরে কাটিয়ে দিতেন বৎসরটা। যেটেরা কালিচরণ ষাটটা বিবাহ করেছিলেন—সেটা বড় বেশী করেছিলেন। সাধারণত ছটা বিবাহ ছিল হিসাবমাফিক, অভিজাত ব্যাপার ; বছরে দুবার শ্বশুরালয় এসে একমাস করে কাটিয়ে পাওনা-গণ্ডা আদায় করে অন্য স্ত্রীর বাড়ী গমন। এর বেশী হলে ঠিক হিসেব-মত হ'ত না। থাক থাক। মোট কথা কুলীনের ছেলেদের বাবার ভিটে নেই, তারা কাকের বাসায় কোকিলের ছানার মত মামার বাড়িতে বড় হয়। মামারা একটা ভিটে দেয়।

অমৃতদাও মামার বাড়ীতে মানুষ। মামার বাড়ী বাঁকড়ো জেলায়। অমৃতদার বাবার

তিন বিবাহ ছিল। অমৃতদার মামাতো ভাইরা সম্ভ্রান্ত জোতদার ছিলেন। কমলকুমার সেই বাড়ীর বড়ছেলে। এবং বর্তমানে সে-ই অমৃতদার সব। খানসামা বা পিওন থেকে পি-এ এবং জি-এম অর্থাৎ পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত—সব।

এই কমলকুমার এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করে বললে, একবার যেতে হবে আজ।

সে প্রায় জিরিবিরি করে (ওর মানে নেই—ধ্বনি আছে) জড়িয়ে ধরলে—যেতেই হবে; আমি না গেলে তাকে বিব্রত হতে হবে। কারণ খুড়ীমা চটবেন এবং খুড়ীমা চটলে খুড়ো-মশায় অর্থাৎ অমৃতবাবু হয়তো ফটকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবেন—'মাইনেপত্র মিটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাও এক্ষুনি।' সুতরাং আমাকে যেতেই হবে, এই তার অনুরোধ। কি কাজ সে তা বলতে পারে না।

যেতে হয়েছিল। গিয়ে কাজ শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। তাঁদের পাড়াতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে, তার ফাইন্যাল বিচার-বোর্ডে-এ মণি-বউদি আছেন, পাড়ার একজন আছেন, তার সঙ্গে আমাকেও থাকতে হবে। বিচারের ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার বিতরণ হবে। পুরস্কার দেবেন মণি-বউদি, সভাপতি অমৃতদা, আমাকে হতে হবে প্রধান অতিথি। পুরস্কারের টাকা সবটাই দিয়েছেন অমৃতদা। তিনি পাড়ার পেট্রন। এবং আমার দিকের সম্মতিও তিনিই দিয়েছেন, কারণ তিনি আমার বিগ ব্রাদার-ইন-ল অর্থাৎ সম্পর্কে বড় সম্বন্ধী, স্ত্রীর বড়ভাই। মজার কথা এই যে, গিয়ে এসব শুনে একটু আপত্তি করলাম কিন্তু দানা বাঁধল না, মণি-বউদি জল ঢেলে দানা গলিয়ে জলে গুলে দিলেন।

এর দিন-চারেক পর আবার দেখা হল। এবার মণি-বউদি এবং অমৃতদা আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে এলেন; এসে প্রথমেই ঢুকলেন শিল্পী যামিনী রায়ের বাড়ী। সেখানে ছবি কিনলেন। কমল সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল; সে-ই আমার বাসায় এসে খবরটা দিয়ে গেল এবং যামিনীদার বাড়ী আসতে মণি-বউদির নির্দেশ জানালে, বললে—কাকী বললেন। কাকার স্ত্রী কাকী তা বলতে হবে না; শব্দটা শহরে না চললেও পাড়াগাঁয়ে, বিশেষতঃ রাঢ়দেশে, দেশজুড়ে চলে। কাকীর শেষে 'মা' পর্যন্ত জোড়ে না।

ওদিকে যামিনীদার বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে অমৃতদা হাঁক পেড়ে আমাকে ডাকতে শুরু করেছিলেন, আমার না গিয়ে উপায় ছিল না। অমৃতদার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যামিনীদা খোদ। যামিনীদার দোতলার বারান্দা এবং আমার বাসার দোতলার বারান্দা মুখোমুখি। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মণি-বউদি। মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করতে হবে। সেটা এই—যামিনীদার পৈতৃক বাসভূমি হ'ল বাঁকুড়া জেলায়। সেই জেলার সম্পর্ক ধরে অমৃতদা জেলা-জ্ঞাতিত্বের দাবীতে যামিনীদার আপনজন হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এবং তাঁর উঠোনে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়ছেন এবং মণি-বউদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। যামিনীদারও দেশের লোক সম্পর্কে অন্তরে একফালি নরম সবুজ জমি আছে, রাঢ়ের লাল ধুলো সর্বাঙ্গে মেখে যারা কাছে আসে তাদের ওইখানটিতে আসন পেতে বসতে দেন।

যেতে হল আমাকে। অমৃতদা তখন খুব জমিয়েছেন। এ ক্ষমতাটা ছিল অমৃতদার। সোনামুখী পাত্রসায়র প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রামগুলির গল্প জুড়ে দিয়েছেন। এবং বয়স হিসেব করে, যামিনীদা থেকে বয়সে বড় হিসেবে জ্যেষ্ঠের দাবী মানতে হবে গোছের একটা নীরব ডিগ্রী যেন জারী করে ফেলেছেন। আমায় দেখিয়ে বললেন—আপনি আমার দেশের মানুষ আর এই লেখকটি আমার আপনজন, ভে-রী স্ব-ইট রিলেশন—ব্রাদার-ইন-ল।

আপনার ছবি রাখব দেওয়ালে, এবং আমার ব্রাদার ইন-ল'র বই রাখব আলমারিতে। বুঝেছেন! সুন্দর করে বাঁধিয়ে নেব।

যামিনীদা চুপচাপ মানুষ; অসাধারণ নয়, অনন্যসাধারণ তাঁর সহনশীলতা; চুপ করেই রইলেন তিনি সমস্তক্ষণটা। ছবি কেনা শেষ করে অমৃতদা এসে উঠলেন আমার বাড়ী। কমলকুমার মণি-বউদির হাতে একটা কাগজের বাক্স তুলে দিলে। এবং ড্রাইভারটি একটা প্যাকেট নিয়ে এসে নিচের বসবার ঘরে নামিয়ে দিলে অমৃতদার চেয়ারের পাশে। কমলকুমার ঘরে বসল না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

মণি-বউদি প্যাকেটটা হাতে উপরে চলে গেলেন—আমার গৃহিণী তাঁর ননদের সঙ্গে আলাপ করতে; অমৃতদা বললেন—এ-সব তোমার বই। কিনেছি। লিখে দাও—মণি বউদি ও অমৃতদা শ্রীচরণেষু—না, শ্রদ্ধাভাজনেষু!

অমৃতদা, একালে ধনী হয়েও একটা জিনিস হারান নি, সেটা সোজা কথা বলার স্বভাব। তবে এককালে যেটাকে দরিদ্র দেশকর্মীর মুখে তপস্যার তেজ বলে মনে হ'ত, এখন সেটাকে ধনাঢ্যতার অহঙ্কার বলে মনে হয়, সে অহঙ্কার প্রকাশ করতে কিন্তু তাঁর লজ্জা নেই। বললেন —লোকে দেখবে। মনে প্রশ্ন জাগবে তাদের। তোমার লেখা দেখে নিশ্চয় অবাক হবে। তখন বলব—হি ইজ মাই 'ব্রাদার-ইন-ল'।

মণি-বউদি কিন্তু তা' নন।

কথাটা যেন বেরিয়ে পড়ল। তিনি আমাকে বললেন—আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। কাউকে বলতে পাবেন না যে বইগুলো আমরা কিনে আপনার কাছে লিখিয়ে নিয়েছি। আর—দু'খানা বই সত্যিসত্যিই প্রেজেন্ট করতে হবে আমাকে।

এরই মধ্যে বলে ফেললেন—আমি ওদের দেখাতে চাই—টাকার কাঁড়ির উপর বসে থাকলেই বড়-মানুষ হয় না। আপনি যে ওদের আমল দেন না, ওদের সঙ্গে মেশেন না, তার জন্যে আপনাকে সত্যিসত্যি শ্রদ্ধা করি।

ওরা মানে হল—অমৃতদা ছাড়া আমার অপর আপনজন, যাঁরা ধন-কৌলীন্যে প্রাচীন কুলীন —তাঁরা। জীবনের একটা প্রতিযোগিতা তাঁদের সঙ্গে অমৃতদার বরাবরই ছিল স্বাভাবিক নিয়মে। সেটাই এখন চেহারা পালটেছে।

যাই হোক—কিসের জন্য কি হয়েছে সে কথা থাক। যা হ'ল তাই বলি। সেদিন ওঁরা চলে গেলেন। আমার গৃহিণী খুব প্রীত হন নি। বেশী বিরক্ত হওয়া তাঁর উচিত ছিল মণি-বউদির উপর, কিন্তু তাও তিনি হলেন না। বেশী বিরক্তটা হলেন অমৃতদার উপর। বললেন

—কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। বিশ্রী। ছি। ওর থেকে ওর বউ অনেক ভালমানুষ। অহঙ্কার খুব আছে কিন্তু মিষ্টি।

ঠিক সাতদিন পর—গৃহিণী দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর পিত্রালয়ের আপনজনদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে আমাকে বললেন—অমৃতদা'র বাড়ী যদি যাবে তবে আমি দেশে চলে যাব। এখানে তুমি থেকো। যা ইচ্ছে হয় করো। এ তোমাকে বলে দিলাম আমি।

কথাটা কি? এ প্রশ্ন করবার সময়ই পেলাম না এবং প্রয়োজনও হল না; তিনি নিজেই বলে গেলেন। তবে সোজাসুজি ধারাবাহিকতার পথে নয়। আঁকাবাঁকা বিচিত্র পথে; আরম্ভ করলেন মণি-বউদির স্বরূপ বর্ণনা দিয়ে—।

সাংঘাতিক মেয়ে। একেবারে মায়াবিনী যাকে বলে। ঠিক তাই। ওই মণি-বউদি গো।

—মণি-বউদি? মানে?

—শোনই না মানেটা। ওপাড়ায় গিয়ে পা দেবা মাত্র সব একেবারে হৈচৈ করে ধরলে। কি রে, তোদের বাড়ীতে নাকি তোর অমৃতদা আর তার বউ গিয়েছিল? খুব নাকি গলায়-গলায় ভাব হয়ে গেছে তোদের সঙ্গে? তোর কত্তা নাকি ওদের বাড়ী যায়? বই দিয়েছে? ঘটা ক'রে নাম লিখে?

বললাম—হাঁ গিয়ে তো ছিল সেদিন। বউটি তো বেশ মানুষ—। অমৃতদা বরং—।

কথা আর শেষ করতে দিলে না। হাঁ—হাঁ করে বলে উঠল—সব্বোনাশ। বেশ মানুষ। ওই বউটা? ডেঞ্জারাস মেয়ে। আর অমৃতবাবুটা তো চোখ থাকতে কানা। বউয়ের রূপে চোখ ঝলসে গেছে। মরণ।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল তো?

—কেন বল তো কি? জান না কিছু? শোন নি কিছু?

—না তো। কি জানাশোনার কথা বলছ?

জানাশোনার কথা, অর্থাৎ যা তিনি জেনে ও শুনে এসেছেন তা হ'ল এই—এককালের দেশকর্মী অমৃতবাবু প্রৌঢ় পঞ্চান্ন বছর বয়সে ওই মাটির কল্যাণে অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হয়েছেন, সে ধনসম্পদ নানা শিল্পোদ্যমের মধ্যে নিয়োগ ক'রে শিল্পপতি হয়ে দাঁড়িয়েছেন; লীগ মিনিস্ট্রির মিনিস্টারদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে খ্যাতনামা হয়েছেন। তার উপর বিয়ে করেছেন মোহিনীমায়ার মত এই মেয়েটিকে। লোকে বলে, অমৃতবাবু ওকে নাকি টাকা দিয়ে কিনেছেন। আজ থেকে নয়—ছেলেবয়স থেকে ওকে পড়িয়েছেন, পাশ করিয়েছেন, তারপর রূপসী দেখে আর সামলাতে পারেন নি নিজেকে, মেয়েটাকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু মেয়েটা অমৃতবাবুর থেকে অনেক চতুরা, অনেক বেশী পটীয়সী, ছলনায় অনেক নিপুণা।

অমৃতবাবুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি—।

অমৃতবাবুর ওই যে ভাইপোটি, যার নাম কমলকুমার, যে শুধু বয়সে নবীনই নয়, নারীর চিত্ত ও চক্ষুকে রঞ্জন করার মত উত্তাপ এবং দীপ্তির অধিকারী, ওকে নাকি এই মণি-বউই বলে-

কয়ে চাকরি দিয়ে কাছে রাখিয়েছে।

শুধু তাই নয়—আরও আছে।

মণি-বউ নাকি কলকাতার পথে পথে পথচারিণীর মত ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্য নাকি—।

শুধু কি তাই?

মণি-বউ নিজে মেয়ে হয়েও মেয়ে-মহল পছন্দ করে না। পুরুষমহলেই সে তার ছন্দ খুঁজে পায়, মেয়েদের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকে; কথায় কথায় বলে—জানেন, ওই যে মেয়ে-পাঁচালী বলে একটা কথা আছে না? ওর বর্ণবিন্দু আমি বুঝিনে।

পুরুষমহলে কিন্তু পাঁচালী থেকে পঞ্চরঙ পর্যন্ত, পলিটিক্স থেকে ফ্রয়েড পর্যন্ত আলোচনায় তার এতটুকু সঙ্কোচ নেই।

গৃহিণী বললেন—কি বলেছেন স্ত্রীকে, ওর নানান দুর্নাম। সে দুর্নামকে মণি-বউদি গ্রাহ্য করে না।

মণি-বউয়ের কলঙ্কে ভয় নেই। অন্তরালে লোকে ওকে কলঙ্কিনীও বলে। সেকথা শুনেও শোনে না।

ক'রের স্ত্রী বলেছে—তোর দাদা বলছিল—ওর সেটা ভালই লাগে। ওই একধারার মেয়ে ওরা।

গৃহিণী আমাকে বললেন—সকলে সাবধান করে দিলেন। বললেন—খবরদার, ওকে, 'মানে তোমাকে' ওর সঙ্গে মিশতে দিসনে। সম্পর্ক? এতদিন সম্পর্ক ছিল কোথায়? আজকালকার ফ্যাশন হল লেখক শিল্পী অভিনেতা আর্টিস্টদের সঙ্গে আলাপ করা। তারা ঘিরে বসে থাকবে আর মাঝখানে বসে খুকী আমার খুকীপনা করবেন। বলিস—ভেড়া বানিয়ে দেবে। এই তো নিজেই বলে গেছে—উনি? ওনার সঙ্গে আমাদের খুব মেলামেশা।

এর ক'দিন বা কিছুদিন পরেই। অর্থাৎ দু'চার দিন নয়, দশ বা পনের দিন পর। মণি-বউদির সঙ্গে সামনাসামনি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম একদিন স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, একেবারে পথের উপর। কলকাতা শহরের রাজপথ, নইলে বলতাম পথের ঠিক মাঝখানে।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর—দুটো কি আড়াইটে বাজছে তখন। মনে পড়ছে একটা গল্প নিয়ে ছবি করবার কথা বলেছিলেন একজন। তাই নিয়ে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল একটি ছবির আপিসে। তখন ছবির আপিস বা ছবি করবার প্রতিষ্ঠান খুব কমই ছিল। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া কয়েকজন অবাঙালী প্রডিউসার কাজ করতেন। ডিরেক্টারদের মধ্যস্থতায় কাজ হ'ত। একজন ডিরেক্টারের অনুরোধে গিয়েছিলাম ছবির আপিসে। কাজ কিছু হয় নি; তবে হবে বলে একটা প্রত্যাশা আমার সেই কালের আশান্বিত মনকে আরও খানিকটা উজ্জ্বল করে তুলেছিল। বেশ হন হন করেই হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ফুটপাথের উপর বাগবাজার স্ট্রীটের সেই মহিলাটি দাঁড়িয়ে আছেন। সেই তিনরঙা হাতি-পাল্লা পেড়ে তাঁতের শাড়ী খাঁটি বাঙালী মেয়ের ঢঙে পরা, কাঁধে সেই

শান্তিনিকেতনী ঝোলা ঝুলছে, সেই ঠিক মণি-বউদির মত দেখতে, সেই সামনের দাঁত দুটি ঈষৎ উঁচু, সেই মেয়েটি। হাতের ছাতাটি খুললেন সেই মুহূর্তে এবং মাথার উপর তুলে ধরলেন। মুখখানা ঢাকা পড়ে গেল। বুঝতে পারলাম না, ইচ্ছে করে ঢাকা দিলেন কিনা। তবে এটা বুঝলাম যে আজ তিনি পদযাত্রী নন ; দ্বিপ্রহরের জনবিরল ট্রামকার-বিহারিণী। ট্রাম থেকে নামলেন। আমার আজও মনে পড়ছে, ইচ্ছে হয়েছিল বাগবাজারের বাজারের সেই দেখতে-না-পাওয়া ছোকরার মত বলে উঠি—'দেখন-হাসি টুথপেস্ট।' ছোঁড়াটা যা বলেছিল তার থেকে 'দেখনহাসি' টুথপেস্ট অনেক লাগসই এবং মডার্ন। কিন্তু আজও মণি-বউদিকে এবং এই এঁকে ঠিক ত্রিভুজের মত মিলিয়ে এক করতে পারলাম না। চেহারায় এত মিল কিন্তু বেশভূষা চালচলনে এত প্রভেদ!

ইতিমধ্যে হনহন করে তিনি উত্তর দিক থেকে ধর্মতলা স্ট্রীট পার হয়ে উঠলেন দক্ষিণ দিকে, তারপর প্রায় আমার পাশ দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ওয়েলেসলি স্ট্রীটের পূর্ব দিকের ফুটপাথে। একটু এগিয়ে গিয়ে একখানা রিক্সা ডেকে তার উপর উঠে পড়লেন। রিক্সাখানা চলতে লাগল। আমিও হঠাৎ প্রায় ঝোঁকের বশে, আর একখানা রিক্সা ডেকে তার উপর চড়ে বসে বললাম—ওই রিক্সার পিছনে পিছনে চল।

সে রিক্সাটা সুরেন ব্যানার্জী রোডে মোড় ফিরল।

আমার রিক্সাকে বলতে হল না। সেটাও ফিরল।

সামনের রিক্সাটা কিছুদূর এসে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে মোড় ফিরল দক্ষিণ দিকে। রাণী রাসমণির বাড়ীর পাশের বাজারটাকে পিছনে ফেলে কিছু দূর এসে একখানা পুরানো কালের কোন বড়লোকের বাড়ীর দরজায় নামল। আমিও বললাম—রোখো। এবং আমিও রিক্সা থেকে নেমে পড়লাম। দেখলাম আমার দিকে তাকিয়েই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। এবার দৃষ্টি দেখে সন্দেহ ঘুচল। হ্যাঁ—উনি মণি-বউদিই বটেন। চোখ দুটির দৃষ্টি কিছু উগ্র। কিছু কেন, বেশ উগ্র। তবুও আমি এগিয়ে গেলাম। এবং একটু হেসে বললাম—কি আশ্চর্য! আপনি? কি ব্যাপার বলুন তো?

তিনিও হাসলেন। আমার হাসিটা তাঁর মুখে গিয়ে আয়নার হাসির মত ফুটল কিনা জানি না, তবে সে হাসি যত ধারালো তত টান, ঠোঁট দুটো ধনুকের মতো বেঁকে গিয়েছিল, বললেন—আপনি এ রকম তা জানতুম না। ছি ছি ছি। ছি—। বলেই পিছনে ফিরে হন হন ক'রে গিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকে পড়লেন।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছিল। কয়েক মিনিট পরেই ওটা যেন কেটে গেল এবং এবার যেন মাথার মধ্যে খুন চড়তে লাগল। ছি-ছি-ছি?—ছি?—কাকে? ওই কথা কয়টা ফিরিয়ে বলবার জন্য ইচ্ছে হল ঢুকে যাই ওই বাড়ীটার মধ্যে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট—পুরানো বড় বাড়ী ; একসঙ্গে অনেক কথা মনের মধ্যে ভিড় করে জেগে উঠল। আবার ভয়ও করল।

ঠিক এই সময়েই একটি ভদ্রজনবাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন—

নমস্কার। আপনি তো……। আপনাকে স্বামীজী ডাকছেন।

—স্বামীজী ?

—আমাদের গুরুদেব। আপনার বউদি হ'ন ওই মহিলাটি, মিসেস মুখার্জি আপনার কথা বলেছেন। তাই স্বামীজী বললেন—"ডাকো—ডাকো। বল একবার আসতে হবে। বল, উনি এলে আমি খুব খুশী হব।" আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। কিন্তু মনে হল চোর ধরতে এসে নিজেই চোর হয়েছি, শুধু তাই নয়—ধরা পড়ে গেলাম নিজের কাছে।

চার

সে দিন ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ওই পুরনো বড়লোকের পুরনো আমলের বাড়ীর মধ্যে এক আশ্চর্য পুরনো পটভূমিতে দেখলাম অতি-আধুনিকা মণি-বউদিকে। অদ্ভুত লেগেছিল আমার। মস্ত বড় একখানা হলঘরে আসর হয়েছে, সেখানে এসে বসেছেন বিভিন্ন শ্রেণীর কিছু মানুষ। সামনে একটি ছোট চৌকি বা ডায়াসের উপরে সযত্নরচিত সুখাসনের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন একজন স্বামীজী। স্বামীজী ঠিক নন। স্বামীজী বললে একালের একটা ঢঙ আসে। স্বামীজীও সন্ন্যাসী, গোসাঁইবাবাও সন্ন্যাসী, তবুও গোসাঁইবাবা যাঁরা, তাঁরা সেকেলে অর্থাৎ পুরনো কালের সন্ন্যাসী। স্বামীজীরা একালের, অর্থাৎ তাঁরা মডার্ণ। ইনি মডার্ণ নন, পুরনো কালের সেকেলে গোসাঁইবাবার মতই পোশাক-পরিচ্ছদ। পরনে গেরুয়া বহির্বাস, গলায় রুদ্রাক্ষ, ডান হাতে রুদ্রাক্ষের তাগাও ছিল, মাথায় ছিল রুক্ষ পাকা চুল, তাতে জটা না থাকলেও তাকে 'কেশভার' অনায়াসেই বলা চলে। এক মুখ পাকা দাড়ি গোঁফ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটি আশ্চর্য প্রসন্ন কোমল কান্তি ছিল সন্ন্যাসীটির সর্বাঙ্গে। এবং সে কান্তি তাঁর দেহের সুস্থ ও সবল বার্ধক্যের স্পর্শে যেন প্রসন্নতর হয়ে উঠেছিল। চোখ দু'টি ছিল বেশ বড় এবং তার দৃষ্টি ছিল শান্ত। সামনে ধূপকাঠি জ্বলছে, কিছু ফুল রয়েছে সামনে ; তাঁর সুখাসনের উপর এক পাশে সরানো রয়েছে। তাঁর অতি নিকটে একেবারে হাতের কাছে ছোট একটি চৌকির উপর ছোট কল্কেসহ গাঁজার সরঞ্জামও দেখতে পেলাম। এখানেই তিনি পুরনো।

ঘরখানি তখন লোকজনে ভরে ওঠে নি। অল্প-স্বল্প লোকই তখন এসে জমেছিল, একদিকে পুরুষেরা, অন্যদিকে মেয়েরা। মেয়েরা বলতে তখনও পাঁচ-ছ'জনের বেশী ছিলেন না। পুরুষেরা জন দশ-বারো হবেন।

বৃদ্ধ মানুষটি আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিলেন—দেখ না, দেখ না ; কপাল দেখ না। সংসার ছেড়ে পালালাম, মা বলে সর্বনাশী হারামজাদীর পিছু ধরলাম। প্রথম দিনকতক ভয় দেখালে। সে কত ভয়। বাপরে-বাপরে। তারপর দেখ না। দেখ না কাণ্ড, লেলিয়ে দিলে, লোক লেলিয়ে দিলে পিছনে। পালা বললে পালায় না, মারতে গেলে মার খায়, গাল দিলে মাখে না, এখন নে ঠ্যালা, নে। করি কি বল তো। কেন ? কেন আমার পিছনে

লেগেছে বল তো তোমরা, কেন ?

একটু থেমে আবার বলেই যান—

—আরে বাপরে। কেউ টাকা এনে বলে—নাও। কেউ দু হাতে পা জড়িয়ে ধরে বলে—ছাড়ব না। কেন রে বাপু, কেন ? ছাড়বি নে কেন ? যে নিজে সাঁতার জানে না, তাকে জড়িয়ে ধরে লাভটা কি ? তুই যদি বা বাঁচতিস তাও বাঁচবিনে ; ওই ওরই টানে তুইও ডুববি। কি করব ? নিরুপায়। আমি নিরুপায়। অগত্যা বলি—'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর' ?

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—না কি বাবা ? এঁ্যা ? এ ছাড়া এর মানে কি হয় ? এঁ্যা ? আমি বাবা নিজের পরিত্রাণই এখনও খুঁজে পাই নি, এদের কি করে ত্রাণ করি বল তো ?

এসবের একটা ধরাবাঁধা গৎ বা ছক আছে। জলের ধারা যেমন এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলে ঠিক সেই ধরনেই এই সংসারে বৈরাগী মানুষগুলি, যাঁরা হঠাৎ মধ্যপথে অন্য মানুষদের চোখে পড়েন বা ধরা পড়েন, তাঁরা এই এক ধরণের কথাই বলে যান। নদী নালার স্রোতের শব্দের মধ্যে যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি পার্থক্য এঁদের মধ্যেও আছে। কেউ চড়া সুরে গালি-গালাজ দিয়ে কথা বলেন, শাপ-শাপান্ত করেন, কেউ মিষ্টি কথা বলেন। এঁর দেখেছিলাম চেহারার সৌম্যপ্রসন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কথাবার্তাটিও মিষ্টি। কিন্তু তাঁর কথার উত্তর কি দেব খুঁজে পেলাম না। আমার মন খুব প্রসন্ন ছিল না তাঁর উপর। কারণ তখনকার কালের আমি যে-আমি ছিলাম, সে-আমি এসব মানুষদের উপর কোন আস্থাই রাখতাম না। সব কিছুর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ভণ্ডামি খুঁজে বেড়াতাম। কিন্তু সেদিন তাঁর কথাবার্তার জবাবে কি বলব তা ঠিক ঠাওর করতে পারি নি।

কারণ ছিল। এটি ছিল তাঁর নিজের এলাকা, বলতে গেলে এখানে তিনি রাজা-মহারাজার চেয়েও বড় হয়ে শোভা পাচ্ছিলেন। রামদাস স্বামী শিবাজীকে বলেছিলেন, 'তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি', এবং সে-ভিক্ষুক তিনি নিজে ; কিন্তু তিনি নিজে কার প্রতিনিধি তা না বললেও শিবাজীর কাছে তিনি ছিলেন বিধাতার প্রতিনিধি। সেদিন ওই কলকাতার ওই পুরনো কালের বংশধরদের কাছে তিনি ছিলেন তাই। তাঁকে অকারণে কটু কথা বলতে পারি নি। পারা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া জানতাম না, তিনি আমাকে কেন ডেকে-ছিলেন। তাঁর পাশে একদিকে মণি বউদি। বেশ একটু মুখ নামিয়েই যেন বসে আছেন। নিজের মনকেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম মণি-বউদি ফুটপাতে আমাকে যে ছি-ছি-কার দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, সে সব বিবরণ এখানে এসে নিবেদন করেছে নাকি ? সুতরাং উদ্বিগ্ন চিত্তে ভাবছিলাম, কি বলা উচিত, ওঁকে বিরূপ করে তোলা কি সমীচীন হবে ?

বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাব না। গেলে তার মধ্যে হয়তো ওই সন্ন্যাসীটির চরিত্র অধিকতর দীপ্তিতে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে। এবং মণি-বউদি নিষ্প্রভ হয়ে যাবেন। কিংবা আড়ালে পড়ে যাবেন। তবে এটুকু বলতেই হবে যে, সন্ন্যাসীটিকে আমার ভাল লেগেছিল শেষ পর্যন্ত। সে-

কালের সনাতন-পন্থী সন্ন্যাসী তিনি; তাঁর সংঘ নেই, তাঁর আশ্রম নেই; তাঁর লোকহিতকর কাজের কোন ফতোয়া নেই, সোজাসুজি তিনি বলেন, আমি মাকে ডাকি রে বাবা! আর কিছু না। মাকে দেখি নি রে, তবে সাড়া যেন পেয়েছি। তা তিনি যখন আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন তখন তোরা আমাকে ডাকলে সাড়া না দিয়ে কি করে থাকি বল? ভাগ্যটাগ্য ফিরিয়ে দিতে আমি পারি না বাবা, তবে মাকে বলতে পারি, মা, ওর ভাগ্যের মন্দটা তুই ভাল করে দে। সে সব পারে, তা পারে। তবে বাবা, কর্মটা তো তোর হাতে, যা তুই নিজে করিস তার ফলটা তো তোকে নিতে হবে। না হবে না? হুঁ হুঁ বাবা। ওখানে তো তো ছাড়ান নাই।

কে যেন বলেছিল—আপনি মাকে বলে মাফ করিয়ে দিন বাবা। এ তো প্রণাম মন্ত্রেই আছে 'অজ্ঞানদ্বা প্রমাদাৎবা বৈকল্যাৎ সাধনস্ত চ, যন্ন্যূনমতিরিক্তংবা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি'। তা তিনি করেন।

—ওরে বেটা। তুই তো দেখি খলিফা আদমী রে। এঁ্যা? পাপ করে বলবি, অজ্ঞানে করে ফেলেছি, প্রমাদের বশে করেছি, আপনি মাকে বলে ক্ষমা করিয়ে দিন। ভারী মজা রে। এঁ্যা। তুই নিজে বল না রে। নিজে বল। আমি কেন বলতে যাব রে। কি বাবা বল তো তুমি? ও বাবা, তুমি তো গুনি লিখেটিখে নাম করেছ গো। তোমার বই থিয়েটারে হয়। এ বেটাদের মত তো আমার কাছে পাপ মাফ করাতে আসো নি। এঁ্যা? বল না গো। এরা সব হতভাগা, বুঝেছ বাবা, একেবারে হতভাগা। মা তো সবারই মা। মাকে সরাসরি না বলে পাণ্ডা পুরুত দালাল এসব পাকড়ায় কেন বল তো?

এসব কথাবার্তা শুনলে মনে হবে এ তো সব বাঁধাবুলি। সনাতনপন্থী এইসব সন্ন্যাসীরা সেই বুদ্ধ শঙ্করের আগে থেকেই এই বুলি আউড়ে আসছেন। হয়তো এর সঙ্গে ছাই জটা এবং হাঁকডাকের আড়ম্বর কোথাও বেশী কোথাও বা কম এইমাত্র। আমি এই সন্ন্যাসীটিকে ভাল বা মন্দ কোন একটি নির্দিষ্ট বিশেষণে চিহ্নিত করতে পারিনি। তবে মণি-বউদির কোন অভিযোগে তিনি আমাকে তিরস্কার করবেন এ ভয়টা তখন গেছে। এর মধ্যে কয়েকবার চলে আসতেও চেয়েছিলাম, কিন্তু, তিনি বলেছিলেন—বসো বসো, একটু বসো। আমার একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে। একটু আলাদা বলব।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা আবার একবার ধড়াস করে চমকে উঠেছিল। সে চমকটা প্রচণ্ডরূপে প্রবল হয়ে উঠল, যখন তিনি সান্ধ্য উপাসনার সময় আমাকে অন্য ঘরে ডেকে পাঠালেন তখন। উপাসনার জন্যে তিনি অন্য ঘরে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেলেন মণি-বউদি। আর একজন মহিলাও গেলেন। দু-চারজন ভক্তও গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ পর একজন এসে আমাকে ডাকলেন।

—বাবা একবার ডাকছেন আপনাকে।

—আমাকে! চমকে উঠেছিলাম আমি।

—হ্যাঁ আপনাকে। আপনার উপর বাবার অসীম দয়া।

বেশ নার্ভাস হয়েই ঘরের মধ্যে গেলাম। যাবামাত্র বাবা বা সন্ন্যাসী সকলকে বললেন—বাইরে যাও তো সকলে। একবার বাইরে যাও। মা তুমি থাক। মণি মা।

আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। অনুমান করতে পারছিলাম না, মণি বউদি কি অভিযোগ করেছেন এই সন্ন্যাসীর কাছে। তবু কোন রকমে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিলাম। সকলে চলে যেতেই সন্ন্যাসী বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা, মণি মা তো তোমার বড় শালার স্ত্রী। তা ওকে একটু বুঝিয়ে বল দেখি। আমার টাকা-কড়ির কি দরকার? নিয়ে আমি কি করব? কিন্তু উনি ছাড়বেন না। কিছুতে ছাড়বেন না। পাঁচ-দশ, দুশো-চারশো হয়, তা নিয়ে না হয় পাঁচটা গরীবকে দিই, কল্যাণ যেটা সেটা ওঁকেই অর্শাক। কিন্তু পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা, এ নিয়ে কি করব বাবা? আমি বলছি—মা, তুমি নিজে টাকাটা দিয়ে কোন সৎ কার্য কর। দান-ধর্ম কর। কিন্তু না। উনি ধরেছেন আমাকে দেবেন।

শুনে আমি অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। সন্ন্যাসীর মুখে দেখবার বিশেষ কিছু ছিল না। তবে মানুষটির মুখের সেই সৌম্য প্রসন্নতা আমার মনে একটি অকপট ও অকৃত্রিম রূপের আভাস ফেলে দীপ্ত করে তুলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি আশ্চর্য মিষ্ট রসের আস্বাদনেও তৃপ্ত করেছিল। দেখবার যা-কিছু ছিল মণি বউদির মুখে। সে যে কি ছিল তা বলে বা বর্ণনা করে বুঝাতে পারব না। তবে ছিল, আশ্চর্য কিছু ছিল। বিস্ময়কর কিছু ছিল। যা কখনও দেখি নি মণি বউদির মুখে। আশ্চর্য সে মুখ। আবেগে আরক্তিম এবং দু চোখে বইছিল জলের ধারা। এমন নীরব নিবেদন আমি আর দেখি নি। হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

কথাটা এইখানেই থাক। মোট কথাটা বলে নি। মোট কথা হল এই যে, সন্ন্যাসীটি মণি-বউদির টাকা নেন নি। অন্তত সেদিন নেন নি। এবং আমাকেই বলেছিলেন, মণি-বউদিকে সঙ্গে করে বাড়ী পৌঁছে দিতে। বলেছিলেন—এ পাড়াটা তো নানান জাতের পাড়া। তা ছাড়া এ সময়টাও ভাল নয়।

একখানা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরেছিলাম। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি। পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে, সেটা ১৯৪২ সাল। তখন মধ্য কলকাতায় চৌরঙ্গী এবং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট এলাকা যুদ্ধের বাজারে একটি বীভৎস চেহারা নিতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে নিয়ে ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার সাহস হয় নি, শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর কথাই ভাবছিলাম আর মধ্যে মধ্যে চকিত দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে নিচ্ছিলাম। দেখে নিচ্ছিলাম কথা ঠিক নয়, দেখছিলাম। বোধ হয় তাঁর মুখ দেখে তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। বউদির চোখের জল তখনও ঠিক শুকোয় নি। স্থিরভাবে, প্রায় যেন পুতুলের মত সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে ছিলেন। তাঁর মাথার ঘোমটা খানিকটা স'রে ন'ড়ে গিয়েছিল, তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না। আমি ভাবছিলাম।

তিনিই প্রথম কথা বলেছিলেন—আমি নই। কফি হাউস পার হয়ে এসে তিনি বলেছিলেন—আপনাকে একটা কথা বলব।

—বলুন।

—যা বলব, তা শুনবেন ?

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম—আগে শুনি।

—এ কথা কাউকে বলবেন না।

এতে আমার আপত্তি হবার কারণ খুঁজে পাই নি। বলেছিলাম—বলব না।

বেশ মনে পড়ছে, গাড়ীর অন্ধকারের মধ্যে মোটরের ইঞ্জিনের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ-গুঞ্জিত বাতাবরণের মধ্যে আমাদের মৃদু স্বরের টুকরো-টুকরো কথাগুলি যেন পুকুরের জলে, পাড় থেকে ছুঁড়ে দেওয়া ঢিলের মত মধ্যে মধ্যে টুপ-টুপ শব্দ তুলে ডুবে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ওই 'বলব না' কথাটি। আমার মনে হয়েছিল যেন আমার খুব কাছেই একেবারে পুকুরের কিনারার জলে, কথাটি ছোট একটি ঢিলের মত পড়ে ডুবে গেল। এবং এর মধ্যে কোথায় যেন কি একটা কিছু আছে, যা উদাসীন, যা বিষণ্ণ ও একান্তভাবে আধ্যাত্মিক বা রহস্যময়।

তার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধতা।

গাড়ীটা এসে ট্রাফিক কনেস্টবলের হাতের ঠেকায় আটকে থমকে দাঁড়িয়েছিল হ্যারিসন রোড এবং সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু জংশনে।

এবার ইঞ্জিনের শব্দও ছিল না। গাড়ীর ভিতরের অন্ধকার এবার বোবা। সেই বোবা অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম, তিনি ঠিক সেইভাবে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। এক সময় একটা সশব্দ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। শব্দটাই বলে দিলে, এই দীর্ঘনিঃশ্বাসটি মণি-বউদির বুকের গভীরতম প্রদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ আমি বললাম—বউদি, আপনি চলে যান, আমি এইখানে নামি।

চমকে উঠলেন—নামবেন ? কেন ?

—এই তো নাট্যভারতী। ওই তো কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোড জংশন।

—জানি। কিন্তু আজ তো থিয়েটার নেই। গিয়ে কি করবেন ?

উত্তর দিতে পারলাম না। বলতে পারলাম না যে, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। বউদিই বলে উঠলেন—আজকে তখন ফুটপাথের উপর কিন্তু আমিআপনাকে অন্যায় কথা বলেছি। কিছু মনে করবেন না যেন। এঁ্যা—! এমন হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালেন আপনি। চমকে উঠেছিলাম।

কথাটার উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে অন্য কথায় এলাম, বললাম—একটা কথা জিজ্ঞেস করব বউদি ?

—কি বলুন ?

—ওঁকে টাকাটা দিতে চাচ্ছিলেন কেন ?

—কেন ? বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ইচ্ছে হচ্ছিল বললেই সত্যি বলা হবে। কিন্তু আপনি কি তা বিশ্বাস করবেন ?

—না; তা করব না। আপনি নিজেই করছেন না। করলে নিজেই বলে নিজেই

সংশয় প্রকাশ করতেন না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—হ্যাঁ তা ঠিক বলেছেন। নিজেই সংশয় প্রকাশ করতাম না।

আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—দেখুন, ক দিনই ওঁর কাছে আসছি। এসে-এসে কেমন ধারণা হয়ে গেছে যে, টাকাটা উনি নিলে আমার ভাল হবে।

বলে ফেললাম—আপনার ভালোর অভাবটা কি বলতে—। মাঝপথে থেমে গেলাম। মনে পড়ে গেল বউদি নিঃসন্তান।

বললাম—ওতে কি ফল হয় বউদি? আপনি ডাক্তার-টাক্তার নিশ্চয় দেখিয়েছেন—তাঁরা কি বললেন? এ ভাবে ছুটে—

—ডাক্তার কিসের জন্যে? তারপরই বললেন—ও। বুঝেছি। না, ভাই, আপনি আমার নন্দাই—আপনাকে লজ্জাও নেই, গোপনও করব না; ছেলেপুলে আমার হবে না। আর ও নিয়ে আমার মাথাব্যথাও নেই।

—তা হ'লে কোন্ ভালোটার আপনার অভাব বলুন তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—তা জানিনে ভাই। কিন্তু মনের মধ্যে কি একটা নিদারুণ অভাব অশান্তি আমার আছে তা বলতে পারব না। উনি যখন থাকেন তখন নানান ভাবে মেতে থাকি, উনি বলেন আমি মাতিয়ে রাখি, আমি বলি উনি মাতিয়ে রাখেন। যাই হোক যিনিই রাখুন মাতিয়ে, মেতে থাকি। কিন্তু একলা হলেই মনে হয় সব মিথ্যে। সব ফাঁকি। সব শূন্য। বাড়ীঘর কাপড় গয়না টাকা সব তেতো হয়ে যায়। আমার কোষ্ঠীতে এখন খুব খারাপ দশা চলছে। খুব খারাপ দশা।

অবাক হয়ে গেলাম। অতি মডার্ণ মণি-বউদি সন্ন্যাসীকে পাঁচ হাজার টাকা দান করতে চেয়েছিলেন, সে তথ্য বা সত্যকে হজম করেছিলাম কোন রকমে, কিন্তু মণি-বউদির খারাপ দশা চলছে কোষ্ঠীতে, এই কথাটাকে বিশ্বাস করে নিজের মনের মধ্যে নিজেই আগুন জেলে বসে আছেন এটা হজম করতে পারলাম না।

বউদি বললেন—আমার ভাগ্যই খারাপ। জানেন, একবার ওই ছেলের জন্যই অশান্তি কথাটা বিশ্বাস করে, একটি ছেলেকে নিয়েছিলাম, মানুষ করব, লেখাপড়া শেখাব—এইরকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে এমন প্রব্লেম হয়ে দাঁড়াল যে হে ঈশ্বর রক্ষা কর বলে বেশ কিছু খেসারত দিয়ে সে ছেলে ফিরিয়ে দিয়েছি। এখনও মাস-মাস কিছু ক'রে খরচ গুনতে হয়।

আবার খানিকটা চুপ ক'রে যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—কত বড় বড় জ্যোতিষীর কাছে গেছি, কতজনকে হাত দেখিয়েছি, কত সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গেলাম, কত দেবতাস্থানে প্রণাম করলাম—কিন্তু মনের এই খালি খালি ভাব, এই একটা অশান্তি—এ আর আমার গেল না। বুঝছেন, উনি আপিস চলে যান, আমি বেরিয়ে যাই। ঘুরি—। কোন মন্দিরে নয়তো কোন সাধুর কাছে গিয়ে বলি, বাবা, আমার মনে বড় অশান্তি। আবার

উনি যখন কলকাতার বাইরে যান তখন তো আমার নিরঙ্কুশ অবকাশ। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে যায়। আটটা ন'টাও বেজে যায়। এই তো দু'দিন থেকে তিনি বাড়ী নেই। দিল্লী গেছেন। কাল ফিরতে হয়েছিল রাত্রি ন'টা। এই বাইরে বাইরে আমি বেশ থাকি। পায়ে হেঁটে ঘুরি। গঙ্গার ঘাটে বসে পাঠ শুনি। বেশ লাগে।

আমি বলে ফেললাম—আমি জানি।

সচকিতের মত আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—জানেন? কে বললে? ওরা বুঝি?

ওরা মানে আমাদের অন্য আত্মীয়-স্বজন। তাঁদের সঙ্গে অমৃতদা মণি-বউদির তৈল-বার্তাকুর মত সম্পর্কের কথা আগেই বলেছি। আমি, 'জানি' বলবামাত্র মণি-বউদি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়েছেন কথাটা আমি তাঁদের কাছে থেকেই জেনেছি। একটু হাসি আমার এসেছিল। কিন্তু সে হাসি নিজে জাহির করতে পারি নি। আমার মধ্যের পুলিশটা তখন একটা কুটিল বা ক্রুর ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমি তেমনি একটি ভঙ্গিতেই তাঁকে বললাম—বাগবাজারের ঘাটে আপনাকে দেখেছি। পাঠ শুনছিলেন। সেদিন এমনি তিনরঙা হাতী-পাজা পেড়ে শাড়ী পরেছিলেন। আর একদিন—।

একটু থেমে বললাম—এইদিনই আপনাকে প্রথম দেখেছিলুম গৌড়ীয় মঠের রাস্তাটা ধরে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। বাজারের সামনে একটা ছেলে—।

মুখে আটকে গেল কথাটা।

বউদি এবারে হেসে উঠলেন খিলখিল ক'রে। বড় দাঁত দুটি বেরিয়ে পড়ল একটু বেশী করে। আঁচল চাপা দিয়ে বউদি দাঁতের লজ্জাটা ঢাকা দিলেন। হাসিটা একটু সামলে নিয়ে বললেন—ওমা। আপনি সেই দন্তরঞ্জন মনোমোহিনী টুথ পেস্ট শুনেছেন বুঝি—কি বলব আপনাকে? ছোঁড়াটা এই সবে পনের ষোল বছরের একটা ইতর। আগে বাগবাজার আমি প্রায় যেতাম। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ওদিকটা মাড়াইনে, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে।

তারপর বললেন—কতজন যে কত বলে ঠাকুর জামাই। আর আমি যে কোথায় কিভাবে কাকে কটু কথা বলি আর কার কথা হেসে উড়িয়ে দিই তা কি আমারই মনে থাকে? এই আজ যেমন আপনাকে—!—কিছু মনে করবেন না যেন। কেমন?

গাড়ীটা ইতিমধ্যে তখন তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে গেছে। বউদি বললেন—রোখো ড্রাইভার। এ হি মোকাম। রোখো।

মণি-বউদি তখন সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠেছেন। গাড়ী থেকে নামতে হঠাৎ যেন তাঁর মনে পড়ে গেল কথাটা। অন্ততঃ বলবার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হল। গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে চেঞ্জ নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, ওরা কি বলছে বলুন তো? ওরা—। যা তা বলে নি আমার নামে? বলে না?

পাঁচ

সেদিন মণি-বউদির বাড়ী থেকে ফিরতে কিছু রাত্রি হয়েছিল। সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল। মণি-বউদি সেদিন যে-বিচিত্র রূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছিলেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন চুম্বক এবং আমি হয়ে উঠেছিলাম লোহা।

গোটা বাড়ীটা সেদিন নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল এবং তাই-ই ছিল। বাড়ীতে কেউ ছিল না। কারণ অমৃতদা দিল্লী গেছেন। দরজাতে লেখা আছে এ এল মুকুরজী—আউট, মিসেস মুকুরজী—আউট। এছাড়াও একটা ছোট কার্ডজাতীয় কাগজে লেখা আছে 'টু ডেল্‌হি'।

মিস্টারের সঙ্গে মিসেস বাইরে যান—এইটেই তাদের নিয়ম বলে সকলে জানলেও মিসেস মুকুরজী সব সময় যান না। কিন্তু ওই রকম লেখা থাকে। কমলকুমারও নেই। সে তার কাকার সঙ্গে গেছে।

বউদি ভিতরদিকের একটি ঘরে আমাকে বসিয়ে বলেছিলেন, বসুন—চা করতে বলি—খাবার আনি।

চা নয়, কফি খেয়েছিলাম। মণি-বউদি কফির পট নিয়ে বসে ছিলেন। বেশ বড় পট, আমাকে প্রায় আড়াই কাপ খাইয়েছিলেন। নিজে দেড় কাপ।

অন্তরঙ্গতার জন্ম হয় জীবনে-জীবনে কাছে আসার মধ্যে। আড়াল নেই, বাধাবন্ধ নেই এমন যেখানে মিল বা কাছে আসা—সেখানেই অন্তরঙ্গতা বর্ষার বীজের মত উপ্ত হয়—পাতা মেলে ডালপালা মেলে, ফুল ধরায়, ফল হয়। তবে তাতেও একটা সময়ের প্রয়োজন হয়, প্রকৃতির তাই বিধান। কিন্তু এমন বাজীকরও আছে, যে এখনি আমের আঁটি পুতে, একটু জল দিয়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জাদুবৃক্ষকে বড় ক'রে বাড়িয়েই তোলে না—তাতে ফল ধরায় এবং সে ফল দর্শকদের নাকি আস্বাদনও করায়। আমি এমন আম কখনও আস্বাদন করিনি কিন্তু সেদিন আমাদের অন্তরঙ্গতার যে বীজটি কিছুদিন আগে পুঁতেছিলাম, সেদিন সেটি জাদু-বৃক্ষের বা লতার মতই বেড়ে উঠল এবং অজস্র ফুল ফুটিয়ে তার সর্বাঙ্গ পুষ্পিত করে তুলল।

সে দিন দুজনে আমরা সেই বাজীকরের বিধানের আওতায় এসে পড়েছিলাম। ওই যে গাড়ীতে অর্থাৎ ট্যাক্সিতে দুজনে এসেছি, সেই সময় যদিও দুজনে খানিকটা আড়ষ্টভাবে যথা-সম্ভব স্বল্প কথা করেছি এবং সে-কথাগুলোও নেহাৎ ফৌজদারী আদালতের জেরাধর্মী প্রশ্নোত্তরের মত, তবুও তারই মধ্যে কোন্ জাদু ছিল জানি না—আমরা ওই বাজীকরের ভেল্‌কির মধ্যে পড়ে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় হয়ে উঠেছিলাম।

ওই জাদু বা ভেল্‌কি কোন কথার মধ্যে লুকনো ছিল তা বেশ অনুমান করতে পারি। ওই যে—যে-মুহূর্তে আমি বলেছিলাম—আমি জানি—আমি দেখেছি আপনাকে বাগবাজার স্ট্রীটে; বাগবাজারের বাজারে; সেই যে কে এক চ্যাংড়া ছোঁড়ার 'ঐ-ই যায়—দন্তমনোরঞ্জিনী সুহাসিনী টুথ পেস্ট' হাঁকটির কথা, সেই মুহূর্তে পরস্পরের কাছে দুই চোরের মত মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র জাদুর মায়ায় পরস্পরের নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম।

মণি-বউদির কিন্তু এতে কোন লজ্জার হেতু ছিল না। বড় জোর কোন মডার্ণ বড়লোক বন্ধুর কাছে কথাটা প্রকাশ পেলে একটা লজ্জার হেতু আছে—সেটা হল কোষ্ঠীমানা দেবতা-মানা ধর্ম মানার জন্যে লজ্জা, কিন্তু সেটা আর এমন কি? লক্ষ্মীর ঘর, একটু আড়ালে—পুজোর ঠাঁই, এ শতকরা নিরেনব্বুইয়ের আজও আছে। কোষ্ঠীও। যাক—মোট কথা মণি-বউদির এতে লজ্জার হেতু বা চুরি করার দায়ের মত কোন দায় ছিল না। আমার বরং ছিল, অন্ততঃ ওই যে ছোঁড়াটার সুহাসিনী টুথ পেস্ট হাঁক শুনে উনি হাসিমুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে-ছিলেন—সেই সুহাসিনীর মুখ দেখবার জন্য যে একটি অশোভন আগ্রহ আমি দেখিয়েছিলাম তার জন্য লজ্জা আমাকে স্পর্শ করা উচিত ছিল। কিন্তু মণি-বউদি যখন ট্যাক্সি বিদায় করে আমাকে বসিয়ে—কফির পট এবং জল-খাবারের ডিস নিয়ে এসে সামনে বসলেন তখন কোন লজ্জারই কোনদিক থেকে লম্বা ঘাড় বাড়িয়ে আমাদের মধ্যবর্তী স্থলটুকুর মধ্যে মুখ দেখাবার কোন সুযোগই হয় নি—বা তেমন স্থানটুকুও ছিল না। আমরা খুব কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম।

কথায় কথায় সেদিন সন্ধ্যায় মণি-বউদি তাঁর সমস্ত অন্তরটাই আমার কাছে খুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—জানেন ভাই, জীবনটা আমার আশ্চর্য। একলা থাকলে কথাগুলো মনে পড়ে। ভাবি আর নিজেই যেন কূলকিনারা হারিয়ে ফেলি। হাঁপিয়ে উঠি। বুঝতেই পারি না কেন আমি এই লোকটিকে বিয়ে করলাম। কেন আমি—এমন—।

চুপ ক'রে গিয়েছিলেন মণি-বউদি। যেন ওই 'কেন' প্রশ্নটির উত্তর কি—সহস্রবার ভেবে পাননি, একাধিক সহস্রবারের জন্য তাই আবার ভেবে দেখলেন।

তারপর আবার হঠাৎ মুখ খুললেন—জানেন—ওঁকে আমি একজনের কাছ থেকে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছি? আর তিনি যে-সে নন—তিনি ওঁর প্রথম যৌবনের ভালবাসার জন। এবং—।

একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন—এবং তিনি আমার মাসীমা হতেন। আপন মাসীমা। ওঃ—সে যুদ্ধ একটা ভীষণ যুদ্ধ। নুটুকে নিয়ে বিমলা আর কল্যাণীর যুদ্ধ আর কি—কতটুকু? কল্যাণী তো আপনার মরা মানে বিদেহিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনী। হিন্দুর ঘরের বিধবাকে টেনে এনেছেন—এর থেকে আর তাকে কতটুকু প্রজ্বলিতা দেখাতে পারতেন?

আমার মনে পড়ছে—'বিদেহিনী, এবং 'প্রজ্বলিতা' শব্দদুটি—মণি-বউদির মুখে শোনা শব্দ। শব্দদুটি শুনে পঁচিশ বছর আগে ১৯৪২ সালে চমকে গিয়েছিলাম; গিয়েছিলাম বলে মনে আছে শব্দ দুটির কথা। সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়েছিল যে, শব্দদুটি মণি-বউদির যোগ্যই হয়েছে। কারণ—মণি-বউদি সে আমলের বি-এ পাশ। এবং কিছুকাল মাস্টারীও করেছিলেন বিয়ের আগে। এই বাড়ীতে যেদিন প্রথম এসেছিলাম ওঁর আমন্ত্রণে, সেদিন মণি-বউদি নাটক নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন তাতে এ শব্দদুটো আমার কাছে একটু অভিনব প্রয়োগ বলে মনে হয়েছিল এবং মনে মনে তারিফ করেছিলাম বলে মনে পড়ছে। সপ্রশংস দৃষ্টিতে অসঙ্কোচেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম—মনে হয়েছিল তাঁর মনের-মহলের

খোলা জানালা দিয়ে—মহলের ভিতরের বিদ্যা ও বুদ্ধির মণি-দীপের আলোর ঝলকানি যেন বেরিয়ে এসে আমার চোখের উপর টর্চের ছটার মত পড়ছে।

* * * *

বলতে বলতে মণি-বউদি তাঁর নিজের কথা প্রায় সবটাই বলে ফেলেছিলেন সেদিন।

মণি-বউদির বাপ ছিলেন সে আমলের 'রেবেল' অর্থাৎ বিদ্রোহী। নাম ছিল গোপীজনবল্লভ চাটুজ্জে কিন্তু প্রকৃতিতে ছিলেন ত্রিশূলধর রুদ্র। ১৯১৬ সালের ওধারের কথা। সুতরাং অনায়াসে বিনা ডিটেল্‌সেই বিশ্বাস করতে এতটুকু বাধা হয়নি যে, মণি-বউদির বাবা একটি গোঁড়া হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুল থেকে পাশ ক'রে সে-আমলের একটি প্রগতিশীল ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়েটা কিন্তু হয়েছিল হিন্দুমতে। কারণ মণি-বউদির বাপের প্রথমা স্ত্রী ওদিকে বাড়ীতে বাড়ী দখল ক'রে বসে ছিলেন। এবং তা অগোচর ছিল না মণি-বউদির মার কাছে। সুতরাং রেজিস্ট্রী করে বিয়ের উপায় ছিল না। তার জন্য এ-বিয়ের ফলে পাত্র কন্যা উভয়কেই উভয়ের পিতৃপক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।

মণি-বউদির বাবা ছিলেন গোঁয়ার মানুষ। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে অকূলে ভাসার মত—বাংলা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বেহার অঞ্চলে। বেহারশরিফের কাছাকাছি একখানা গ্রাম—সে গ্রামে বুন্দেলা রাজপুতদের বাস এবং তাদের কুলপতি হিসেবে একঘর জমিদার তাঁদের দৌলতখানা গড়ে তুলেছেন। সেই গ্রামে এসে সাঁতার জল থেকে একহাঁটু জল পেয়ে—ডাঙ্গায় উঠলেন এবং প্র্যাক্‌টিসের জন্য চেপে বসলেন।

মণি-বউদির সে গল্প আমার মনে আছে। তিনি বলেছিলেন—সে আমলটাই অন্যরকম ছিল—মানুষগুলোও আলাদা ধরণের ছিল। বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের বয়স হয়েছিল নাকি সত্তর বছর—সেই বয়সে হয়েছিল অসুখ। ওঁদের ছিল কবিরাজ আর হাকিম। তারা খাওয়ার ধরা-কাটা করেছিল বলে ডাক্তার আনবার হুকুম হয়েছিল। আমার বাবা প্রথম কিছুদিন 'রাঢ়'-এ ছিলেন। রাঢ় থেকে বক্তিয়ারপুর, সেখান থেকে বিহারশরীফে এসে মাস দুতিন বসেছেন—এই সময় এল এক ডাক। গেলেন দেখতে। গিয়ে বিছানার পাশে বসলেন—তা ঠাকুরসাহেব হুকুম করলেন—শোন হে ডকডর সাব,—তুমি তো দেখি নেহাৎ ছোকরা হে! চিকিৎসার কিছু জান? শোন—আমাকে সারাতে হবে। এ বেটারা বুড়বকের দল, বলছে উপোস করতে হবে। আরে বাবা ভুখাকে মারে তো ভূত-পিরেত ভি ভাগতা হ্যায়—এ তো বেমার আর বুখার। খেতে না পেলে তো আপনি সারবে। হাকিম কবরেজ ডাকডরে কি জরুরৎ। আমি খাব। তুমি ওষুধ দাও। দিয়ে সারাও, তবে তো তুমি ডাগডর।

ঠাকুরসাহেব খেতেন ঘি রাবড়ি, মিঠাই, হালুয়া, আর সে-সব ব্যঞ্জনের ফিরিস্তি কি দেব? ওদের ঠাকুরবাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখেছি—সত্যি সত্যি এক-অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একুনে একান্ন পদ ছাড়া ওদের ভোজনের পর্ব শেষ হয় না। তা সেই খাওয়া তিনি খাবেন আর তাঁকে সারিয়ে তুলতে হবে ডগডর সাহেবকে। সারিয়ে দিলে বহুৎ ইনাম শিরোপা মিলবে।

না-সারলে ডগডরের জান থাকবে ঠাকুরসাহেবের জিম্মাদারীতে।

বাবা বলতেন—হয়েছিল আমাশয়। শেষ কি করবেন—ভেবে চিন্তে বললেন—হ্যাঁ খেতে আমি নিশ্চয় দেব—কিন্তু ওই ধরণের খাওয়া নয়—ঠাকুরসাহেবকে শিকারের পাখীর গোস্ত খেতে হবে। টাটকা, হোয়াইট মীট। আর মাংসে আমাশয় সারায়।

মণি-বউদি হঠাৎ খুব হেসে উঠেছিলেন।

আমি একটু চমকে উঠেছিলাম।

মণি-বউদি বলেছিলেন—রোজ ক'টা পাখীর মাংস খেতেন জানেন? বালিহাঁস জানেন তো? সেই বালিহাঁস—মিনিমাম আটটা দশটা। খেতে খেতে আপসোস ক'রে বলতেন, একি খাব ডাগডর সাব, আমি যে আমি বুঢ্যা আদমী—আমার দাঁতে তোড়নে কো লায়েক এক হাড্ডি নেহি ইসমে।

যাই হোক—মণি-বউদির বাবার ভাগ্য ভাল, ঠাকুরসাহেবের সে অসুখ দিন-তিনের মধ্যে সেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরসাহেব বললেন—ডাগডর ভাই, তুমি হামারা হিঁয়া আ যাও ভাই। এখানে লোকদের চিকিৎসা কর। আচ্ছা ডগডর তুমি।

এক কোঠী অর্থাৎ ইটের দেওয়াল—খাপরার চাল বাড়ী, অন্দরটা দোতলা, আর সামনের বাহার মহলটা একতলা, চৌকা 'থাম'ওয়ালা অংশটা ডগডরখানা, এর উপর মাসে দু মণ মিহি চাল—এক মণ ঘরে-পেশাই আটা, আর পঞ্চাশ রুপেয়া নগদ, এই বরাদ্দ হল—ঠাকুরসাহেবের কাছাহ্‌রী থেকে।

এছাড়া একটা ছোটখাটো দাওয়াইখানা রইল।

এসবের পরিবর্তে ডগডর সাহেব ঠাকুরসাহেবের বাড়ীর বাঁধা ডাক্তার হলেন। ঠাকুরসাহেব থেকে চাকরবাকর সকলকে দেখতে হবে।

এরপর মণি-বউদির বাপের প্র্যাক্‌টিস্ জমে উঠতে দেরি হয়নি। মাসকয়েকের মধ্যেই পদাতিক ডাক্তারবাবু—শুধু অশ্বারোহী পদেই উন্নীত হন নি—বাইসাইকেলারোহী হয়েও পাকা শড়কে কাপড় ও কোটের সঙ্গে শোলাহ্যাট মাথায় দিয়ে রথবাজীসমন্বিত ভাগ্যবানে পরিণত হয়ে উঠেছিলেন।

এইখানেই হয়েছিল মণি-বউদির জন্ম। বছর তিনেক পর—১৯১৪ সালে।

এর বছর দুয়েক পর মণি-বউদির মা মারা গেলেন। মণি-বউদির বাবা আর বিয়ে করলেন না; ঠাকুরসাহেব তখনও বেঁচে—তিনিই মেয়েটিকে মানুষ করতে এবং ডগডর সাহেবের যত্নআত্তি করতে দেখে দিলেন এক যুবতী দাসী। নাম ছিল তার 'সরবতিয়া'। জাতে কি ছিল তা জানেন না মণি-বউদি। জাত তার ছিল না, থাকলে সে ছিল জাতেই ঝি।

মণি-বউদি বলেছিলেন, খুব বেশী খুলে তো বলার দরকার নেই। বুঝতেই তো পারেন। তবে যেটা বুঝতে পারবেন না সেটা বলে দি। সেটা হ'ল এই যে, মেয়েটা ছিল ঠাকুরসাহেবের বাড়ীর কেনাদাসীর পেটের মেয়ে। লোকে বলত সরবতিয়ার দেহে ছিল ঠাকুরসাহেবদের বংশের রক্ত।

সরবতিয়া খুব সম্ভ্রমের এবং তরিবতের মেয়ে ছিল। তার সহবৎ ছিল কুলবধুর মত। সরবতিয়ার বিয়ে একটা দিয়েছিলেন ঠাকুরসাহেব কিন্তু সরবতিয়া বছর কয়েকের মধ্যেই পূর্ণযৌবনকে বুকে ধরে বিধবা হয়ে ফিরে এল। মেয়েটার একটা ছেলে হয়েছিল, সেটা গেল কিছুদিন পর। সাগাইয়ের কথা ভাবছিলেন ঠাকুরসাহেব। ওদিকে বাড়ীর ছেলেপিলেরা সরবতিয়ার উপর ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক সেই সময় ঘটল ঘটনাটা। ঠাকুরসাহেব ডগডর সাহেবের হাতে সরবতিয়াকে দিয়ে বলেছিলেন—ডাগডর, সাদী যখন করবে—করবে—এখন একে নিয়ে যাও—তোমার মেয়েকে দেখবে তোমাকে দেখবে। মেয়েটারও ছেলে মরেছে—ও তোমার মেয়েটাকে পেয়ে খুশী হবে।

মণি-বউদির বাবা তখন পত্নীশোকে প্রায় সতীহারা শিবের মত হয়ে উঠেছেন। মণি-বউদির মা মারা গিয়েছিলেন হঠাৎ। হার্টফেল করেছিলেন। মণি-বউদির বাবা শেষসময়ে বাড়ী ছিলেন না। ডাকে বেরিয়েছিলেন রোগী দেখতে। এর ধাক্কাটা তিনি সামলাতে পারেন নি। মদ ধরলেন সেই দিনই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেই হয়।

মণি-বউদির বয়স ছিল তখন বছর দুয়েক। এসব তাঁর মনে নেই, শুনেছিলেন। শুনেছিলেন ওই সরবতিয়ার কাছে। ডাগডরবাবুর বউ মরে গেছে খবরটা নিয়ে বুড়ী দাঈটা ছুটে গিয়েছিল ঠাকুরসাহেবের বাড়ী। ঠাকুরসাহেব নিজে এসে বসেছিলেন। এদিকে মণি-বউদি, তখন ছোট দু বছরের মণিমালা, মায়ের সাড়া না পেয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। ঠাকুরসাহেব হুকুম দিয়েছিলেন—যা সরবতিয়াকে ডেকে আন। বিধবা সরবতিয়ার ছেলেও মরেছে—কচি ছেলে—তার বুকে দু'ধ আছে—দু'ধ দিয়ে ডাগডরের মেয়েটিকে ঠাণ্ডা করুক।

মণি-বউদির বাপ ফিরে এসে মরা স্ত্রীকে দেখে কিছুক্ষণ পাথরের মত দাঁড়িয়েই থাকলেন। একবার শুধু নেড়েচেড়ে দেখে উঠে গিয়ে বসলেন তাঁর রোগী দেখবার ঘরে। ঠাকুরসাহেব যে ঠাকুরসাহেব, তাঁর ডাকেও সাড়া দেননি।

শ্মশানে গেলেন—মুখাগ্নি করলেন। শব-সৎকার করে ঘরে এলেন—স্তম্ভিত বাক্যহারা এক মানুষের মত। তখনও পর্যন্ত ঠিক রইলেন। তারপর একসময় রাত্রে ডিসপেনসারির আলমারি থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলে শুরু করেছিলেন মদ্যপান। মদ খাওয়ার একটা অভ্যাস তাঁর ছিল—সেটা ছিল পরিমাণে পরিমিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত। রাত্রে খাবার সময় এক পেগ ক'রে ব্র্যাণ্ডি তিনি খেতেন। সেদিন থেকে পরিমাপ এবং নিয়ম এ দুটো উঠে গেল।

মাসখানেক পর আবার সবই যথানিয়মে চলতে লাগল—সব মানে ডাক্তারী আর আহার নিদ্রা—শুধু মদ্যপানটা আর পরিমিতি ও নিয়মের বেড়ায় ঘিরে ফেলা গেল না।

ঠাকুরসাহেব ডাগডরকে ডেকে বলেছিলেন—সাদী কর ডাগডর।

ডাগডর মদ খেয়েই ছিলেন—বলেছিলেন—কভি না। এ কথা বলবেন না। তাহলে চলে যাব আমি।

—তোমার মেয়ে? তার কি হবে?

—কেন? ওই তো একটা মেয়ে ওকে নিয়ে থাকে—দুধ পিলায় দেখেছি, ওই-ই মানুষ করবে। মেয়েটা সুশ্রী এবং নোংরা নয়। স্বাস্থ্যও ভাল—। ওকে মাইনে দেব আমি।

ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—তা তুমি পেতে পার। কিন্তু তলব দিয়ে ওকে পাবে না তুমি। ও হল ঠাকুরসাহেবের ঝিয়ের মেয়ে; নিজের মেয়ের মত ভালবাসি ওকে। ও বিধবা হয়েছে—ওকে সাগাই কর না কেন?

—না। এ বাত অন্যে বললে আমি তার সঙ্গে লড়াই করতাম ঠাকুরসাব।

—বেশ, তবে ওর খাওয়াপরার আজীবন ভার তোমাকে নিতে হবে। সে নেবে তো?

সে ভার নিতে রাজী হয়েছিলেন—মণি-বউদির বাপ।

মণি-বউদি একটু হেসেছিলেন এবং বিচিত্র অর্থদ্যোতক একটি হাসি তাঁর মুখে ফুটিয়ে তুলে বলেছিলেন—কিন্তু যখন থেকে আমার মনে পড়ে ঘটনাগুলো; সে ধরুন পাঁচ ছ'বছর বয়স হবে, তখন থেকে আমি সরবতিয়া মাঈজীকে—মা বলেই ডেকেছি এবং আমাদের বাড়ীর গিন্নী হিসেবে দেখেছি। কাপড়চোপড় যা পরত তা অবিশ্যি ঘাঘ্‌রি কাঁচোলী ওড়না হলেও সেসব ছিল যেমন রুচিসম্মত তেমনি দামী। হিসেবের অঙ্কে সরবতিয়া মাঈজীর দাম ঝিয়ের দাম ছিল না। নাকে একটা হীরে ছিল—সেটা ঝক্‌ঝক্ করত। আরও একটা কথা বলি। সরবতিয়া মা সিঁথিতে সিঁদুর পরতেন তখন, আর সন্ধ্যেবেলা পাউডার মাখতেন। ঠাকুর-সাহেবের বাড়ীর মেয়েরা তাকে পরিহাস করে বলত—"ডগডর-গিন্নী"।

বাংলা-কথাটা বেহারী জিভে একটুখানি বেঁকে যেত। আমাদের জিভে যেমন হিন্দীভাষার বাঁকা তেরচা চালগুলো সরল 'আকারান্ত বা অন্তস্থর' বা ব-এর উচ্চারণ যেমন এলিয়ে সোজা হয়ে যায়—তেমনি ভাবে।

মণি-বউদির মনের এবং বোধের সূক্ষ্ম এবং পাতলা পরিচয়জ্ঞাপক কথাগুলোর মধ্যে সেদিন আর এক মণি-বউদিকে পাচ্ছিলাম।

মণি-বউদি বলেছিলেন—

সরবতিয়া মাঈজী বাবুজীকে কেমন করে জয় করেছিল সে কথা আমি শুনেছি ভাই—আমি জানি—কিন্তু সে আমাকে বলতে নেই। ও বলবার অধিকার আছে একমাত্র কালিদাসের মত মহাকবিদের। বাক্য এবং অর্থের মত, পার্বতী এবং পরমেশ্বরের মত, বাবা মাকে যারা অভিন্ন একাত্ম না ভাবতে পারে—তাদের অধিকার নেই বলেই আমি মনে করি।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

মণি-বউদি কি? এ বলছে কি? কানের পাশে কে যেন আবৃত্তি করে যাচ্ছিল—"বাগর্থ-মিবসংপৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌঃ।"

সংসারে মনের মধ্যে একটা গোপন কুঠরী আছে—সেটার মধ্যে থাকে মনের কথা। শুধু কথা কেন? মনের কথা থাকে, মনের মধু থাকে, সবশেষের স্তরে থাকে জাদু। ও কুঠরীর দরজা সহজে খোলে না। কেন না ওই ঘরের দরজা কোন চাবিতে খোলেও না বন্ধও হয় না। কারণ ও দরজায় চাবি নেই। কোথায় আছে ওর চোরা-বোতাম, যে-বোতামে

হাত পড়লে আপনি খুলে যায়। আবার একটু অসতর্ক হলেই আপনি বন্ধ হয়। তখন মশাল জেলে বিস্ফারিত চোখে ওই বোতামটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর পাওয়া যায় না।

সেদিন মণি-বউদির ওই মনের ঘরের বন্ধ-দরজা চোরাবোতামে তাঁর বা আমার হাতের চাপ পড়ে খুলে গিয়েছিল—তা বলতে পারব না, তবে সেই খোলা দুয়ারের মধ্য দিয়ে মনের কথাগুলি মনের মধুতে অভিষিক্ত হয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। তিনিও যেন গঙ্গাস্নান করে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মত উজাড় করে দিচ্ছিলেন নিজেকে।

হয়তো উচ্ছ্বাস একটু বেশী হয়ে গেল। কিন্তু না। উচ্ছ্বাস যদি হয়েই থাকে তবে বলব যে, এর থেকে কম উচ্ছ্বাস সেদিনের মণি-বউদিকে বা আমার নিজেকেও ঠিক বোঝাতে পারব না। উচ্ছ্বাসের এ গভীরতায় যদি নিজেরা না হারিয়ে যেতাম, যদি আমরা বাস্তব বুদ্ধিতে সজাগ থাকতাম—তাহলে আমরা নারী-পুরুষ হয়ে যেতাম এবং তখন আর ওইভাবে ওই নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসে থাকবার অধিকারই আমাদের থাকত না।

সে থাক। এখন মণি-বউদি নিজের জীবনের যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন সেগুলি বলি।

এরপর ন বছর চলে গিছল।

মণি-বউদি এগারো বছরের হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে সরবতিয়া মাঈজীর হাতে মানুষ হয়ে মণি-বউদিও একরকম হিন্দুস্থানী মেয়ে হয়ে পড়েছিলেন। তবু মণি-বউদির বাবার বাংলা ভাষার উপর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল—সেকালে ব্রাহ্মমেয়ে বিয়ে-করা বাঙালীর ছেলে হিসেবে।

হিন্দু বাঙালী যাঁরা প্রবাসী হয়ে অন্য-প্রদেশে বাস করতেন তাঁদের বাংলাভাষার উপর কোন আকর্ষণই ছিল না—তাঁরা গোড়া থেকে ইংরিজীকে মাথায় করতেন আর মাটির বুলি হিসেবে হিন্দী শিখতেন আপনা থেকে। বাংলা বলতেন ভুল—লিখতে আরও বেশী ভুল করতেন। যা বলতেন তাও হিন্দীর ছাঁচে ফেলে বলতেন—'ইংরিজী রাজভাষা হচ্ছে এবং ইংরিজী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা হচ্ছে সুতরাং বাংগালী ভাষা নিয়ে কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছে বল তো!'—কিন্তু ব্রাহ্ম যাঁরা তাঁরা বাংলা ভাষাকে পরিস্ফুট করেছেন এবং বাংলাকে ভোলেন নি—কোনখানে গিয়েই। প্রবাসী পত্রিকা তার প্রমাণ। মণি-বউদির বাবা গোপীবাবু প্রবাসীর গ্রাহক ছিলেন এবং শুধু মণিকে নয়—সরবতিয়াকেও বাংলা বলতে ও পড়তে শিখিয়েছিলেন। তবে মণি-বউদি কাপড়-চোপড় পরতেন হিন্দুস্থানী মেয়ের মত। খাওয়াদাওয়ায় চালেও হিন্দুস্থানী স্বাদগন্ধ প্রবল ছিল। হয়তো বাংলা শিক্ষাটাও কাজে আদৌ লাগত না যদি পর পর কতকগুলো ঘটনা না ঘটত।

প্রথম ঘটনা ঠাকুরসাহেবের মৃত্যু।

দুর্দান্ত ঠাকুরসাহেব বিরাশি বছরে মারা গেলেন—তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে লাগল মামলা। ঠাকুরসাহেবের বিয়ে করা বৌ পাঁচজন—এ ছাড়া কেনা দাসী, তার সংখ্যাও কম না। ঠাকুরসাহেব উইল করে সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। তাতে সরবতিয়াও কিছু পেয়েছিল। কিন্তু মামলা বাধল ছেলেদের সঙ্গে নাতিদের। অর্থাৎ ঠাকুরসাহেবের যেসব

ছেলে মারা গেছে তাদের সঙ্গে ঠাকুরসাহেবের জীবিত ছেলেদের। উইলও একখানা নয় তিনখানা। তার দুখানাতেই সাক্ষী ছিলেন মণি-বউদির বাপ। পক্ষ দাঁড়িয়েছিল চারটে। মণি-বউদির বাপ যে সাক্ষীই দিন—তিন বিপক্ষের রোষবহ্নিতে পড়তে হবেই। কালটা ১৯২২ সাল। মণি-বউদির বাবা গোপীবল্লভবাবু সে গ্রাম ছেড়ে চলে এলেন পাটনায়। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তাঁর প্রাণই শুধু বিপন্ন নয়—আরও অনেক কিছু বিপন্ন—এরা তাঁর সম্পত্তিটা কেড়ে নিতে চায়, এদের মধ্যে আবার দুজন হাত বাড়িয়েছে সরবতিয়ার দিকে। সরবতিয়া মণিমালিনীকে যখন কোলে তুলে নেয় তখন ওর বয়স ছিল বিশ বছর; দশ বছর পর এখন তার বয়স ত্রিশ; যাকে বলে যৌবন গঙ্গার ভরাভাদর। এবং বাঙালী ডাক্তারবাবুর শিক্ষায় এবং সহবতে সে সুমার্জিত হয়ে এমনই অপরূপ হয়ে উঠেছিল যে তারা ঠাকুরসাহেবের ছেলে হয়েও এদিকে হাত বাড়াতে সংকোচবোধ করেনি।

এসব কথা অনায়াসে অসঙ্কোচে বলে যাচ্ছিলেন মণি-বউদি।

—জানেন ঠাকুরজামাই—তখন বারো বছরের আমি পশ্চিমে বড় হয়ে বেশ একটু হাপালো হয়ে উঠেছি এবং দেখতেও মন্দ নই; তার উপর আমার এই উঁচু দাঁত-দুটোতে তো আমাকে চব্বিশঘণ্টাই দেখন-হাসি ক'রে রেখেছে। সুতরাং বুন্দেলাদের সবাই বলে—আমায় দেখে ছোক্‌রী হাসে। সুতরাং আমার দিকে পর্যন্ত হাত, সে একখানা দুখানা নয়—ঠাকুরসাহেবের চার নাতির, এক ছেলের এই পাঁচজনের পাঁচ দু গুণে দশখানা হাত উদ্যত হয়ে উঠেছিল। বাবা ছিলেন গোঁয়ার মানুষ; ভীষণ জেদী। সে গোঁয়ারতুমি জীবনে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আরও মজবুত হয়ে হাতীর দাঁত হয়ে উঠেছিল এবং মদ বেশী বেশী খাওয়ার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বেশী প্রগল্‌ভ হয়েও উঠেছিলেন। প্রথমটা তিনি বেশ খানিকটা হাঁকডাক ক'রে লড়াই দেবার জন্য খুঁট পেতে দাঁড়ালেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বুঝলেন, আজকাল স্ফটিকস্তম্ভ ফাটিয়ে নৃসিংহাবতার বের হন না, সাবিত্রীর সতীত্বকেও যম এতটুকু সমীহ করে না; এবং সত্য বা নীতি ইত্যাদির এমন কোন শক্তি-নেই যা নিছক পশুশক্তিকে বা বস্তুশক্তিকে হঠাতে পারে, হারাতে পারে।

আমার তখন এগারো বারো বছর বয়স, দিব্যি মনে আছে তখনকার কথা; বাবা মদ খেতে খেতে সরবতিয়াকে বলছিলেন—আমি হিন্দু থেকে ব্রাহ্ম হয়েছিলাম। আজ থেকে নাস্তিক হলাম। কুছ নেহি হ্যায়—কুছ নেহি হ্যায়—। অবাঙমনসোগোচর মানে কুছ নেহি হ্যায়।

কিছু থাক বা না থাক—আমাকে নিয়ে বিপদ তখন এমন ঘনীভূত হয়েছে যে—দিন-কয়েকের মধ্যেই বাবা, আমাকে আর সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে, পালিয়ে এলেন বেহারশরীফ। কিন্তু বিহারশরীফও ১৯২২-২৩ সালে এমন নিরাপদ ছিল না যে—বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবদের সঙ্গে বিবাদ করে নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মাস দুয়েক পর চলে এলেন পাটনায়। পাটনায় বসে মামলা জুড়লেন বুন্দেলাবাবুরের বিরুদ্ধে। তাতে টাকারই শ্রাদ্ধ হ'ল, ফল কিছু হ'ল না। এই সময়ে একদিন এলেন—আপনার এই দাদাজী।

দাদাজী। পরক্ষণেই বুঝলাম—।

প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে একটু হেসে—মণি-বউদি বলেই দিলেন—মদীয় স্বামী, পতি, আপনার শ্যালক।

অর্থাৎ অমৃতদা।

* * *

মণি-বউদির বয়স তখন বারো বছর। ১৯১৪ সালে জন্ম—সুতরাং সালে সেটা ১৯২৬ সাল। অমৃতবাবু তখন ১৯২১ সালে ক'মাসের জেলের পালা সেরে বেরিয়ে এসে গঠনমূলক কাজে মন দিয়েছেন। অর্থাৎ ওই তুলোর চাষের জন্য নেওয়া জমিটাতে ফায়ার ক্লে'র খোঁজ পাওয়া গেছে। পতিত ব্রহ্মডাঙ্গা। বেনামীতে পড়ে ছিল। হঠাৎ বের হল মাটি। পূর্ব মালিকরা বিষয়ীর প্যাঁচ ক'ষে জমিটাকে ঘুড়ির মত অমৃতবাবু লাটাইয়ের সুতোর বাঁধন থেকে কেটে নিজের লাটাইয়ের সুতোয় লটকে নেবার আয়োজন করলেন। লেখাপড়াজানা অবিষয়ী লোকদের প্রতি বিষয়ী লোকদের গভীর শ্রদ্ধা এই কারণে—এঁরা সুবোধ বালকের মত 'যাহা পান তাহাই লইয়া' ঘরে ফিরে যান। কিন্তু অমৃতবাবু ঠিক তা না করে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নেমেছেন। জায়গাটা বেহারের সীমানার মধ্যে। সুতরাং বেহারের হাইকোর্ট দেখতে এসেছেন তিনি। সেই সূত্রে আলাপ হয়ে গেছে মণি-বউদির বাবার সঙ্গে। কথায় কথায় আলাপ গিয়ে পৌঁচেছে সম্পর্কের বা আত্মীয়তার দোরগোড়ায়।

অমৃতবাবু বলেছেন—বিহারশরীফে একজন বাঙালী ডাক্তার আছেন—তাঁরও নাম গোপী-জনবল্লভ চ্যাটার্জী—

চমকে উঠে গোপীজনবল্লভ ডাক্তার বলেছিলেন—চেনেন তাঁকে? কি ক'রে চিনলেন?

—চিনি না। তবে নাম শুনেছি।

—কি ক'রে? কার কাছে?

* * *

অমৃতবাবুর এক বান্ধবীর নাম রত্নমালা। সেই রত্নমালার দিদির নাম ছিল পুষ্পমালা। পুষ্পমালা এণ্ট্রান্স ফেল ক'রে নার্সের কাজ শিখছিল—ক্যাম্‌বেল ইস্কুলের হাসপাতালে। সে ওই ইস্কুলের একটি হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছে। নাম গোপীজনবল্লবভ চ্যাটার্জি। ব্রাহ্ম মেয়ে পুষ্পমালাকে হিন্দু-মতে বিয়ে করে সেই গোপীবল্লভও বেহারে এসে-ছিলেন। আর দেশে ফেরেন নি। শোনা যায় বেহারশরীফে তাঁর এখন অনেক পসার।

গোপীজনবল্লভবাবু তার হাত চেপে ধরে বললেন—আপনার নাম তো বললেন অমৃতলাল মুখুজ্জে। গন্ধে অবিশ্যি জাত বোঝা আজকাল আর যাচ্ছে না। কিন্তু ঠিক ব্রাহ্ম বলেও তো মনে হচ্ছে না! অবশ্য গান্ধীজীর ছকটার সঙ্গে ব্রাহ্ম ছকটা অনেক জায়গায় বেশ মিশে গেছে, তবু-ও তা যেন মনে নেয় না। তামাকু খান না চুরোটও খান না কিন্তু পান খান—মাথায় তেল মাখেন—। কান-ফোড়ার দাগ রয়েছে। কর্ণবেধের দাগ।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—না ব্রাহ্ম আমি নই, তবে জাত আমি মানি না।

—না মানুন। রত্নমালা তো গোঁড়া ব্রাহ্ম ঘরের মেয়ে। পুষ্পকে নিয়ে তো বেগ কম পাইনি আমি। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন খোঁটা দিয়েছে। আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভেপারে সেঙ্ক করেছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে রত্নমালার সম্পর্ক কতদিনের?

সেদিন অমৃতবাবু আজকের অমৃতবাবু ছিলেন না। সোজা মানুষ—এম-এ পাশ—দেশ-সেবক, চোখে অনেক স্বপ্ন, অকুণ্ঠ বা সর্বপ্রকার কুণ্ঠাবিমুক্ত সোজা খাপখোলা তলোয়ারের মত মন। একবিন্দু মরচের দাগ পড়েনি। তার গড়নে-দীপ্তিতে উদ্দেশ্য গোপনের এতটুকু চেষ্টা ছিল না। সোজাসুজি বলেছিলেন—রত্নমালাদের ইস্কুলে বছর দুয়েক মাস্টারী করেছিলাম; এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাস্টার ছিলাম। রত্নমালা ক্লাস টেনে উঠল সেবার। ক্লাসে ভাল মেয়ে ছিল। টেস্টের পর কিছুদিন কোচও করেছিলাম। তারপর ও পাশ করে আই-এ পড়তে গেল, আমি চাকরি ছেড়ে নেমে পড়লাম—দেশের কাজে।

—তারপর—?

—তারপর আর কি? রত্না এখন চাকরি মানে ইস্কুলে মাস্টারী করে—বাড়ীর সঙ্গে একরকম আলাদাই সে। স্কুলবোর্ডিংয়ের সুপারইনটেণ্ডেণ্ট।

—কিন্তু বিয়ে করেনি কেন? অবস্থার জন্যে?

—অনেকটা তাই বটে। মানে অবস্থা পাল্টানো তো সোজা নয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া চাই। মানে এ-জীবনে বিয়ে আমরা করব না।

শুনে খুশি হয়েছিলেন গোপীজনবল্লভবাবু। বাড়ী এনেছিলেন অমৃতবাবুকে।

মণি-বউদি বলেছিলেন,—জানেন—সেদিন মানুষটিকে আমার ভারী ভাল লেগেছিল। ১৯২৬ সাল—তখন ওর বয়স বত্রিশ বছর। লালচে চুল—লালচে টক্‌টকে রঙ, কটা চোখ। বাবা বলেছিলেন—লোকটা খাসা লোক—ক্যাট্‌স্ আই লোকটার। খুব পুশিং হবে। সে আমলে বারো বছরের মেয়েও প্রেমে পড়তে পারত। আপনার সঙ্গে ননদের বিয়ে যখন হয়, তখন তার বয়স তো শুনেছি এগারো ছিল।

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

মণি-বউদি বললেন—আমি তখন বারো, কিন্তু আপনার দাদার প্রেমে আমি সেদিন ঠিক পড়িনি। পড়লাম পরে। ওই মাসী রত্নমালার সঙ্গে বিবাদ বাধল। সেই বিবাদে আমি জোর ক'রে এঁর প্রেমে পড়লাম—এঁকে ছিনিয়ে নিলাম মাসীর কাছ থেকে। মাসীর উপর একটা আক্রোশ আমার গোড়া থেকে—একেবারে সেই প্রথম দেখা থেকেই জন্মে গেল। ওর চোখে আমি দেখলাম আমার শত্রুকে—আমার চোখের মধ্যেও সে বোধ হয় ঠিক তাই দেখেছিল—নিজের জীবনের সবথেকে বড় শত্রুকে দেখতে পেয়েছিল।

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

* * *

মণি-বউদি বললেন—বাবা মানুষটা ছিলেন দিল-দরিয়া মানুষ। সত্যবাদী মানুষ। সেটা এঁর বেশ ভাল লেগেছিল। বাবারও ভাল লেগেছিল—দেশ-সেবক—প্রেমিক লোক।

বলেছিলেন—তুমি আমার এখানে এসে উঠবে এবার থেকে। আরে আমার শালীর সঙ্গে প্রেম করেছ। বিয়ে করনি, করবে না। ওয়াণ্ডারফুল। এখানে এসে উঠবে। অনেক জায়গা এখানে। বুঝেছ? এবং আমার উপার্জন মন্দ নয়।

উনি উঠতেন তাই।

মাস ছয়েক পর। সেবার বোধ হয় তৃতীয় বার উঠেছেন। দিন পাঁচেক আছেন। সেবার ঠিক মামলার জন্যে যাননি। গিয়েছেন রাজগীর-নালান্দা যাবেন বলে। মাসীকেও নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু মাসী যাননি। মাসী যাননি সরবতিয়ার জন্যে—সেটা পরে বুঝেছিলাম। যাকগে। বাবা কলে বেরিয়েছিলেন; একখানা থার্ড ক্লাস গাড়ীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল—, বাবা সেইটেতে চড়ে কলে বেরুতেন। সেদিন উনিও সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল কল সেরে বাবা ওঁকে নিয়ে পাটনা সিটি দেখিয়ে আনবেন। পথে গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা লেগে গাড়ীখানার পিছনের একটা চাকা ভাঙল। সেই দিকের কোণে বসেছিলেন বাবা। বাবা বসেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর নাক-মুখ দিয়ে রক্ত খানিকটা বেরিয়েছিল এই পর্যন্ত। হাসপাতালে নিয়ে গেল সেই অবস্থায়। অবস্থা দেখে ডাক্তারেরা বললে মারা গেছেন। সেরিব্রেল হেমারেজ হয়েছে। আপনার শ্যালকও আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু সে সামান্য আঘাত। হাসপাতাল থেকে খবরটা নিয়ে উনিই ফিরে এলেন। এক মুহূর্তে আমরা অনাথ হয়ে গেলাম। আমি আর সরবতিয়া মা। কিন্তু উনি আমাদের পরিত্যাগ করলেন না। ওখানকার সমস্ত দায় চুকিয়ে আমাদের নিয়ে এসে তুলে দিলেন আমার মাসী রত্নমালা দেবীর বাড়ীতে। রত্নমালা দেবী খবরটা জানতেন, পত্রযোগে খবর তিনি পেয়েছিলেন, প্রতীক্ষা করে তিনি দাঁড়িয়েও ছিলেন। আমি মাসীর মধ্যে মাকে প্রত্যাশা করিনি, মাসীকেই প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম আমাকে দেখে মাসীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

বাবা রেখে যা গিয়েছিলেন তা খুব খারাপ ছিল না। বরং ভালই বলতে হবে। সরবতিয়া মা বা আমি ওঁদের গলগ্রহ ছিলাম না। তবু মাসীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে যে কি জ্বালা আপনাকে কি বলব।

নাকের পাশে ঠোঁটের ভঙ্গিতে এমন একটা বিষ ফুটে উঠেছিল আপনাকে কি বলব। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মাসী আমাকে বলেছিল—ওকে ছেড়ে এদিকে এস। গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, তাও জান না? ছি-ছি-ছি। জানবে কি করে? শেখাবে কে?

তারপর ওঁকে বলেছিলেন—তুমি কি বলে' ন্যাট উয়োম্যানটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে বল তো? আমি ওকে ঠাঁই দিতে পারি না। উইদাউট টেকিং মাই কনসেন্ট—এ কি করলে তুমি? ও-তো একটা প্রস্টিটুট।

সরবতিয়া মা চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। বাবার কাছে সে দশ বছর ছিল—বাবা তাকে গড়েপিটে তৈরী করেছিলেন

নিজের পছন্দমত ক'রে। ইংরেজী শব্দ প্রক্ষেপ দেওয়া কথা সে মোটামুটি বুঝত। দিন সাতেক সে বহু জ্বালা বহু উত্তাপ সহ্য করেও ছিল আমার জন্য। সাতদিন পর সে আমাকে বললে—বেঁটিয়া—আমি চলে যাই-রে। তুই কাঁদিস নে। আমার জন্যে ভাবিস নে। আমাকে যা তোর বাপ দিয়ে গেছে, তাই দিয়েই চলে যাবে বাকী দিনগুলো। আমি কাশী চলে যাবো।

তাই সে গিছল।

বাবা তাকে গয়নাই শুধু দেননি—তার নামে পাঁচ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেটও কিনে দিয়েছিলেন।

মণিবউদি বলেছিলেন—আরও একটা জিনিস দিয়েছিলেন বাবা। সেটা হ'ল—জীবনে একটা বিচিত্র বোধ। যে বোধে মানুষ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারে। সরবতিয়া মাঈ তার ক্যাশ সার্টিফিকেট তাব নিজের কাছে রাখত। কারুর হাতে সে দেয়নি। বাবা তাকে খানিকটা লেখাপড়াও শিখেয়েছিলেন। হিন্দি, বাংলা দুটো ভাষাই সে বলতে পারত, পড়তে পারত।

সুতরাং মাসীর কাছে আমাকে রেখে 'একলা চলরে' বলে কাশী চলে যেতে তার কোন বাধাই হয়নি। এতটুকু ভয়ও সে পায়নি। তবে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে যে কষ্ট সে পেয়েছিল সে-কষ্ট পাবার কথা শুধু নিজের মায়ের।

ছয়

মণি-বউদি সেদিন বসে বসে তাঁর গোটা জীবনের সমস্ত কথাই বলেছিলেন আমাকে! সেদিনের রাতটা ছিল চাঁদনী রাত। ১৯৪২ সাল। শহরের রাস্তার এবং বাড়ীঘরের বাইরের লাইটগুলো ব্ল্যাকআউটের ঠুঙি আটকে পড়ে মাটির বুকেই যেন হাত-পা বাঁধা হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল; শূন্য-মণ্ডলে জ্যোৎস্না পেয়েছিল অবাধ খোলামেলা; কোনো প্রাসাদের জনহীন উদ্যান-সরোবরে একাকিনী স্নানার্থিনীর মত জ্যোৎস্না যেন বাঁধানো ঘাটের পৈঠেতে বসে সুঠাম শুভ্র বরতনুখানিকে সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিল। হয়তো জলের মধ্যে নিজের ছায়া দেখছিল। আমরা দু'জনে তারই মধ্যে খোলা জানালাটার ধারে বসেছিলাম। মণি-বউদি বলে যাচ্ছিলেন, আমি শুনছিলাম। কোন সঙ্কোচ ছিল না। থাকলে ওই রূপসী জ্যোৎস্নার মায়াবিভ্রমে আমরা দু'জনে অনায়াসে কপোত-কপোতী হয়ে যেতে পারতাম। এই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে নারী মণি-বউদি চুপ করে যেতেন এবং তার বদলে বকতে শুরু করতাম আমি। কপোতগুঞ্জন তুলে আমি তাঁকে প্রদক্ষিণ করে ফিরতাম। অনায়াসেই তা হ'তে পারত। আমাদের উভয়ের অজ্ঞাতসারে, জীবনের আচরণে সকল শালীনতা বজায় রেখেই হতে পারত। কিন্তু তা হয় নি। সাক্ষী তার আমি। আর যাঁকে সাক্ষী মানতে পারি তাঁকে একালের মানুষেরা জীবিত বলে স্বীকার করেন না। ঈশ্বর মৃত

একথা এ যুগের দ্বারা ঘোষিত।

* * *

পৃথিবীতে জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষনভঙ্গুর ; জীবনের কথা কিন্তু ক্ষণস্থায়ীও নয় ক্ষণভঙ্গুরও নয়। পৃথিবীতে মানুষ মরে যায়, মরা মানুষটাকেও মানুষ ভুলে যায়, কিন্তু তার কথা থাকে। তার চিহ্নও থাকে—সে কোথায় কোন দিন কপালে সিঁদুরের টিপ প'রে তার আঙুলটি মুছে গেছে—তার দাগটি রয়েই যায়। বিবর্ণ হতে হতে ধুলোময়লার আবরণের তলায় লুকোয়। ধুলোময়লা ধুলেই আবার পাওয়া যায় তাকে। খুঁজলে হয়তো আদিম মানুষটির কোন-না-কোন চিহ্ন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও পড়ে আছে, লুকিয়ে আছে, কোনদিন বেরিয়ে পড়তে পারে।

মণি বউদি বললেন—একটু বসুন। আমি এক্ষুনি এলাম ব'লে। যেন হঠাৎ মনেপড়া কাজের তাগিদে উঠে চলে গেলেন তিনি।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে আমাকে বললেন—পড়ুন।

একখানা চিঠি। চিঠিখানা নিজের হাতেই রাখলেন এবং বললেন—সম্বোধনটুকু পড়ুন আর নিচে লেখক বা লেখিকার নাম পড়ুন।

দেখলাম—'প্রিয়তম অমৃত', আর পরিশেষে 'তোমার রত্না'।

মণি-বউদি বললেন—খানিকটা আমি পড়ে শোনাই। সবটা শোনাব না। শোনানো যায় না। পড়তে দিতেও যেন কেমন লাগবে আমার, দেব না। শুনুন।

"যে রমণী তোমাকে কিশোরী বয়স হইতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভালবাসিয়াছে, তোমার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছে, যে তোমার প্রিয়তমা ছাত্রী ছিল, যে প্রথম যৌবনে তোমার জন্য পাগলিনী হইয়াছিল, ঘর-সংসার সব ত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিল, যে তোমার জন্য রাত্রির পর রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছে ; অবশেষে তোমার কথায় তোমার নিকট দীক্ষা লইয়া কুমারী থাকিয়াই আজও অবধি তোমার পথ চাহিয়া রহিয়াছে, তাহাকেই তুমি এত বড় সন্দেহ করিবে, এতখানি ছোট করিবে, এতখানি ছোট চোখে নিরীক্ষণ করিবে তাহা কোনদিনই এই হতভাগিনী কল্পনা করিতে পারে নাই।

"তুমি আমাকেই শেষ পর্যন্ত চোর বলিয়া সন্দেহ করিলে ? আমি মণির গহনা চুরি করিব, ক্যাশ সার্টিফিকেটগুলা নষ্ট করিয়া দিব ? 'মণি' আমার দিদির মেয়ে। তোমার চেয়ে আমি তাহার অনেক আপন জন। আমি তাহার আপন মাসী। আমি এই পাপকার্য করিব ?

"তুমি কল্য আমার মুখের উপর বলিলে যে, আমি তাহাকে হিংসা করি। আমি মণিকে হিংসা করিব ?"

এর পরই মণি-বউদি চিঠিখানা মুড়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রাখলেন এবং একটু হেসে বললেন—'মানুষ যায় কথা থাকে' কথাটা আপনাদের মানে আমার স্বামীর গোষ্ঠীর কাছে শেখা কথা। কথাটা যেমন সত্যি তেমনি ভাল। আমার মাসী রত্নার কথাগুলোই শুধু আমার মনে খোদাই করা আছে তাই নয়, তার চিঠিপত্তর এবং কয়েকটা জিনিস আমি

অত্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। একটা হারের লকেট দেখাই দাঁড়ান।

উঠে দাঁড়িয়েও বউদি বসলেন—পরে দেখাব আপনাকে। লকেটটায় মীনা করে লেখা 'মালা'। ওটা উনি দিয়েছিলেন মাসীকে। মায়ের নাম ছিল পুষ্পমালা, মাসীর নাম রত্নমালা —আমার নাম মণিমালা। কিন্তু ওটা ছিল মাসীর।

আগেই তো বলেছি, আপনার দাদা এম-এ পাশ করে স্কুলে মাস্টারী করতে গিয়ে মাসীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন। তারপর সে প্রেম এমন জমাট হল যে মাসী ঘর ছাড়ল, এঁর জন্যে মাস্টারী করতে লাগল। দু'জনে সেকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশ যতদিন স্বাধীন না হবে ততদিন বিয়ে করবেন না। পরে আপনার দাদা আমাকে এর একটা বিবরণ দিয়েছিলেন। সেটা হল এই যে, ওঁরা দু'জনে একদিন রাণা প্রতাপসিং থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন—সেকালে; তাতেই দেখেছিলেন মা কালীর সম্মুখে প্রতাপসিং সর্দারদের শপথ করাচ্ছেন—মা কালীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর, যতদিন চিতোর না স্বাধীন হবে ততদিন আমরা বৃক্ষপত্রে ভোজন করব, তৃণশয্যায় শয়ন করব। এইরকম একটা মস্ত ইতিহাস-বিখ্যাত প্রতিজ্ঞা।

একটু হেসে বলেছিলেন—এখন নাকি চিতোরের রাণাবংশের সকলে এবং রাজপুত সর্দারদের অনেকে থালার নিচে গাছের পাতা রাখে আর খাট পালংকের গদির তলায় কয়েক-গাছা খড় রেখে দেয়। এঁরা দু'জনে সেদিন থিয়েটার থেকে ফিরে পরের দিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এবং তাই পালনও করেছিলেন দু'জনে। কিন্তু হঠাৎ বিধাতা-পুরুষই যেন আমাকে ওঁর ঘাড়ে দিলেন চাপিয়ে।

মাসী ব্রাহ্মঘরের মেয়ে, সরবতিয়া মাঈকে দেখে তার চটবার হয়তো কারণ ছিল। কিন্তু বারো বছরের আমাকে দেখে তো চটবার কারণ ছিল না, থাকবার কথাও নয়, তবু মাসী আমার আমাকে দেখেও চটলেন।

আমার বয়স তখন বারোর মাঝখান পেরিয়ে তেরোর কোঠার দিকে বেশী ঝুঁকেছে। আর সেকালে বারো তেরো বছরেই মেয়েরা এ বিষয়ে অনেক বেশী পেকে উঠত। সুতরাং মাসী যাই বলুন, যে ভাবে ভঙ্গিতে বলুন, আমি তার গন্ধ থেকে ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম যে, মাসী আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনীর দৃষ্টিতে দেখছে। আপনার দাদার বয়স তখন বত্রিশ তেত্রিশ, মাসীর বয়স ছাব্বিশ, আমার বয়স বারো। তাতে কিছু যায়-আসে নি। ত্রিভুজটি দস্তুরমত শক্তপোক্ত হয়েছিল। সেই বারো বছর বয়সেই কেউ যেন খুঁচে, খোঁচা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে আমাকে মাসীর চ্যালেঞ্জ দিয়ে জীবনের আসরে নামিয়ে দিল। এবং নামিয়ে দেবামাত্র আমি দিব্যি সে চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করে কোমর বেঁধে নেমে গেলাম লড়তে।

কেমন ভাবে জানেন? যাত্রীতে ঠাসাঠাসি কামরায় একটুখানি জায়গা পেয়ে কেউ যদি হঠাৎ মাঝখানে বসে পড়ে, এমন কি অক্ষম হয়েও টলে পড়ে যায়, তা হলেও সঙ্গে সঙ্গে পাশের যাত্রীর কনুই দুটো যেমন রুষ্টভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় ওই ব'সে-পড়া যাত্রীটির কনুই বা সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে প্রতিরোধ করে, ঠিক তেমনিভাবে ব্যাপারটা শুরু হল।

রত্না মাসী সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে যে ঝগড়া শুরু করলে, তা দেখতে-শুনতে বেশ একটা

পবিত্র গঙ্গাজল-খাওয়া হবিষ্যান্ন-করা তপস্যা গোছের ব্যাপার হলেও বারো বছরের মণিমালার মন তাতে প্রতারিত হয়নি, সে ঠিক বুঝতে পেরেছিল, মাসী ঝিকে মেরে বউকে শেখাচ্ছেন। অর্থাৎ সরবতিয়া উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য সে অর্থাৎ বারো বছরের মণি।

বারো বছরের মণিমালার কৈশোর বাল্যকালকে দুই-এক নয়, বোধহয় চার পাঁচ পা পিছনে ফেলে যৌবনের দিকে যেন দীর্ঘ পদক্ষেপে বেশ একটু জোরেই হাঁটছিল। সরবতিয়া থাকলে হয়তো সরবতিয়ার প্রসঙ্গ নিয়েই লড়াইটা করতো রত্নমালা, করতো অমৃত মুখুয্যের সঙ্গে। বলতে পারত, নিজেরা পরস্পরকে ভালবেসেও যখন ব্রহ্মচর্যকে মাথায় করে তপস্যা করে যাচ্ছি, তখন সরবতিয়ার মত ভ্রষ্টার কলঙ্কিত ছোঁয়াতে কেন পড়ব? কেন?

কিন্তু সরবতিয়া মাঈ তখন চলে গেছে। সুতরাং সোজাসুজি ঝগড়া বাধল আমাকে নিয়ে।

হেসে মণি-বউদি বলেছিলেন—মেয়েদের কথা আপনি বোঝেন, লেখক মানুষ। ইদু পুরুষে বিমলার চরিত্রের মধ্যে ব্যাপারটা সুন্দর করে দেখিয়েছেন। কল্যাণীকে যখন নুটু ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন বিমলা এসে মহিমময়ীর মত বলছে—যেয়ো না ঠাকুরঝি, দাঁড়াও। স্বামীকে তিরস্কার করে তাকে ঘরে আশ্রয় দিচ্ছে। আবার নুটু যখন কল্যাণীর মুখ চেয়ে সুশোভনকে সহ্য করছে, তখন আগুন হয়ে এসে বলছে—আমার অরুণ যদি সুশোভনের মত হত, তা হলে কি তুমি তাকে সহ্য করতে?

ঠাকুরজামাই—আমার মাসী রত্নমালার চরিত্র ঠিক তাই। কল্যাণী আপনার নাটুকে চরিত্র, অথবা এমনি প্যাসিভ না-হলে নাটক জমত না, অন্ততঃ এইভাবে জমত না। আমি কল্যাণীর মত এতখানি কনসাস ছিলাম না। নিজের শুচিতা নিয়ে এতটুকু আশঙ্কাও ছিল না; কথাটা মনেও উঠত না। তা ছাড়া আমার বাবা টাকাকড়ি রেখে গিছলেন, গয়না রেখে গিছলেন, আমি ওদের উপর ভার-বোঝাও ছিলাম না। বুঝেছেন ব্যাপারটা?

শুধু ব্যাপারটাই বুঝিনি, আরও বুঝেছিলাম যে, মণি-বউদি আমার আশ্চর্য মেয়ে। এমন ক'রে নিজেকে সে খতিয়ে খতিয়ে দেখেছে।

মণি-বউদিকে এ সম্পর্কে সচেতনভাবে সক্রিয় করে দিয়েছিলেন ওঁর সেই মাসী রত্নমালা এবং আংশিকভাবে অমৃতবাবু।

সরবতিয়া চলে যাওয়ার পরের দিনই। একটা ঘরে একলা তখনকার বারো বছরের মণিমালা খুব কাতর হয়েই বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছিল। পাশের ঘরে অমৃতবাবু চুপ করে-বসে ছিলেন। আপন মনে বকছিলেন মণিমালার মাসী রত্নমালা। বলছিলেন—গেছে বেশ হয়েছে। একটা প্রস্টিট্যুট—একটা পাপ—বেশ হয়েছে গেছে। গঙ্গাজল দিয়ে ঘরদোর ধুয়ে ফেলা উচিত।

অমৃতবাবু কোন উত্তর করেন নি। মাটির দিকে তাকিয়েছিলেন, যেন ভাবছিলেন।

কি ভাবছিলেন তিনিই জানেন। মণিমালা ছিল পাশের ঘরে; মাঝখানের খোলা দরজাটা দিয়ে মধ্যে মধ্যে তীর্যক দৃষ্টিতে সে ও ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল। মাসীর কথায় উত্তাপে ও তীব্রতায় তার চোখে জল পড়লেও আশ্রয়স্থল অমৃতবাবু কি বলেন শুনবার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল; কথা শুনতে না পেয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে অমৃতবাবুর মুখ দেখে বুঝতে চাচ্ছিল, মন তাঁর কি বলছে। অমৃতবাবুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকাটা তাকে যেন ভরসা দিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল রত্না মাসীর কথা তিনি ঠিক সমর্থন করতে পারছেন না।

মাসী সেটা আরও পরিষ্কার করে দিয়েছিল, বলেছিল, কি—? কিছু বলছ না যে? কথাগুলো খুব পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকেছিলেন, যেন প্রতীক্ষা করেছিলেন তাঁর উত্তরের; উত্তর না পেয়ে ফেটে পড়েছিলেন—শেষ। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের শেষ।

অমৃতবাবু এতক্ষণে বলেছিলেন—আঃ, কি করছ রত্না? মেয়েটি পাশের ঘরে রয়েছে।

—হ্যাঁ রয়েছে। কাঁদছে। হয়তো জেগে আছে। শুনছে। তাতে কি হয়েছে? আমি ওর মাসী। মায়ের সহোদরা। তুমি কে? তোমার এত দরদ?

—দরদ মানুষের জন্যে মানুষের হয়, সে সম্পর্ক থাকলেও হয়, না থাকলেও হয়। এমন কি জন্তুর জন্যেও হয়; ওর দুঃখ একটা হয়েছে সেটা মানতেই হবে। সে-মেয়েটি ওকে মায়ের মতই মানুষ করেছিল। ভালবাসত।

—মায়ের নামটা মুখে এনো না। নামটা কলঙ্কিত হবে। একটা ঝি, বাপের মিস্ট্রেস, তার মা ছিল বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের রক্ষিতা। পাপ। মূর্তিমতী পাপ। সেই পাপের হাত থেকে ওকে আমি রক্ষা করেছি।

* * *

সে এক অন্তহীন এবং অর্থহীন, অন্ততঃ নিরর্থক, জোর করে বাধানো ঝগড়া। শুরুই হল কিন্তু শেষ হল না কোন দিন। দিন দিন বেড়েই চলল অকারণে।

সরবতিয়ার উপলক্ষ পুরানো হয়ে গেল—ঘষে প্লেন হয়ে যাওয়া বাক্স এবং মিইয়ে যাওয়া দেশলাইয়ের মত হাজার সংঘর্ষেও আগুন যখন জ্বালানো গেল না, তখন সরাসরি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই আগুন জ্বলল।

১৯৪২ সালে সেদিন রাত্রে নিজের জীবনের গল্প বলতে বলতে যেন হঠাৎ হেসে মণি-বউদি বললেন—আগুন জ্বালানো তো খুব কঠিন নয় ঠাকুর-জামাই, কিন্তু আগুন জ্বেলে যাকে পোড়াতে চাই তাকে পোড়ানো খুব কঠিন কথা। কারণ, যাকে পোড়াতে চাই তারও তো একটা আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে। আগুন প্রতিহত হলে ফিরে গিয়ে যে জ্বালিয়েছে তার কাছে চায় তার ক্ষুধার খাদ্য; অথবা পূজার বলি, যাই বলুন। অশান্তি করে গেলে তো আগে নিজেকে অশান্ত হতে হয়; সেই তো আগুনে জ্বলা। মাসী আমার আগুন জ্বালতে গিয়ে গোড়াতেই আগুন জ্বাললে নিজের বুকে, তারপর থেকে

আঙুল নিয়ে অগ্নিবান ছুঁড়তে লাগল ভাগাভাগি করে আমাদের দু'জনের দিকে।

সরবতিয়া প্রসঙ্গ পুরনো হ'ল, মুছে গেল ; তারপর শুরু হ'ল, এ অসভ্য মন্দ-তরিবৎ বিশ্রী-সহবৎ মেয়েকে নিয়ে আমি করব কি ? এবং ওঁকে দৃঢ়স্বরে দায়ী করলেন, কেন তুমি ওকে এনে ঘাড়ে চাপালে ? কেন ? কি তোমার স্বার্থ ?

স্বার্থ কথাটা শুনে অমৃতবাবু প্রথম দিন বোমার মত ফাটলেন।—স্বার্থ ? তুমি স্বার্থ খুঁজছ ? একটি অসহায় মেয়ের বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, আমাকে বলে গেলেন—ওকে দেখো ভাই তুমি। রত্নমালাকে বলো—বলেই আমাকে ভার দিয়ে গেলেন। I promised—and I tried to keep that promise.—তোমার কাছে এনে দিয়েছি।

—আমি কেন এ দায়দায়িত্ব নিতে গেলাম ? কি গরজ আমার ?

—তোমার দিদির মেয়ে। তুমি মাসী।

—কিন্তু সে দিদি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে চলে গেছল একজন সমাজের বাইরের লোকের সঙ্গে।

একটু হেসে অমৃতবাবু বলছিলেন—থাক। এর পর আর পা বাড়িয়ো না রত্না, জায়গা নেই।

রত্নমালা কিন্তু এতেও থামে নি। শূন্যলোকেই পা-ফেলে আকাশপথে চলতে চেষ্টা করে ছিল। বলে ছিল—আমি ভালবেসেছি তোমাকে কিন্তু নিজেকে কলুষিত করি নি।

একটুক্ষণ গুম হয়ে থেকে অমৃতবাবু বলেছিলেন—এমন হবে তা ভাবি নি আমি। ও মেয়েটি আর্থিক দিক থেকে কারুর ভার-বোঝা নয় এবং স্বভাবটভাবের কথা—; থাক সে-কথা। প্রয়োজন নেই সে বিতণ্ডায়। ওকে আমি কোন ভাল রেসিডেনসিয়েল ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

মাসী চমকে উঠেছিল ঠাকুর-জামাই।

বলতে বলতে মণি-বউদি হেসে উঠে বলেছিলেন—সে চমক আমার মনে আছে, হাতে চায়ের কাপ-ডিশ ছিল, চা খেতে-খেতে ঝগড়া হচ্ছিল ; মাসী আমার চমকে বলে উঠল—কি বললে ?

সঙ্গে সঙ্গে হাতের ডিশটার উপর থেকে কাপটা পড়ে গেল প্রথমে মাসীর কাপড়ে তারপর মেঝের উপর। এবং তপ্ত চায়ের ছ্যাঁকায়—'মাগো—মাগো' ব'লে, যাকে বলে ঝেড়েপেড়ে উঠে দাঁড়ানো, সেইভাবে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। যথাসাধ্য কাপড় ঝেড়ে চা ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেলেন কাপড়খানা ছাড়বার জন্য। যাবার সময় বলে গেলেন—সারটেনলি নট। ইউ কান্ট, ইউ কান্ট ডু ইট। তোমার কোন অধিকার নেই। কো—নো—অধিকার নেই। সী ইজ মাই নিস্—আমার সহোদর বোনের মেয়ে, আমি মাসী, আমিই তার একমাত্র গার্জেন। তার সম্বন্ধে তোমার কোন অধিকার নেই। আশা করি সে সম্পর্কে তুমি কনসাস্ হবে।

এবার আমার কথা বলি ঠাকুরজামাই।

এ ভারী মজার ব্যাপার। খেলা তো ঠিক নয়। কারণ খেলা মানুষ ইচ্ছে করে খেলে বা খেলতে বসে। এতে বা সংসারে যা ঘটে তাতে মানুষের ইচ্ছের কোন দাম নেই ; এতে যে যা করে—তাকে তাই একরকম যেন করতেই হয়। বর্ষার দিনে পোকাগুলো আলো দেখে উড়ে আসে, শুকনো দিনে আসে না, কিন্তু মাটি ভিজলে আসবেই ; যেন নেমন্তন্ন দেওয়া আছে। আলোর চারিধারে পোকা ওড়ে, কেন ওড়ে পোকা জানে না ; টিক্‌টিকি ঘোরে পোকা খাবার জন্যে। তাকিয়ে দেখলে দেখবেন টিক্‌টিকিটা ঠিক খেলা করছে, পোকাগুলো আলোকে ঘিরেও খেলছে, কিন্তু তাতে চলছে জীবনমৃত্যুর পালাগান।

যে-খেলায় বা যে-পালায় আমি ভিজে মাটির আশ্রয়হারা পতঙ্গ, পাখা মেলে অমৃতবাবুরূপী আলোটির কাছে উড়ে আসতে গিয়ে মাসীরূপী টিক্‌টিকিটির গ্রাসের মুখে পড়েছিলাম, সে পালায় আমিও ক্রমাগত ওই আলোটাকেই স্বাভাবিকভাবে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি। টিক্‌টিকিটা যখনই তাড়া করেছে তখনই আমি ওই আলোর ফানুশে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছি।

প্রথম শুরু হয় স্মিতহাস্যে সম্ভাষণ দিয়ে। উনি এলেই আবার মুখে হাসি ফুটত। আশ্বস্ত হতাম। এবং সুযোগমত অসুবিধার কথা বলতাম।

মাসীই এগুলো ধরিয়ে দিত। বলত—তুমি ওর সম্বন্ধে কোন ইন্টারেস্ট নিয়ো না।

ইনি বলতেন—কেন ?

—কেন কি ? তোমার উচিত নয়। তুমি এলেই মেয়েটা যেন হেসে ওঠে। তোমার কাছে ও আমার নামে লাগায়।

ইনি বলতেন—না। তা লাগায় না। তবে দু' চারটে অসুবিধার কথা বলে। আমাকে না-বলে কাকে বলবে ? আর তো কাউকে চেনে না। এবং ওর বাপের কাছে আমি কথা দিয়ে খানিকটা মরালি রেস্‌পন্‌সিবল, তাও অস্বীকার করতে পারি না। তুমিই বল না। পারি কি ? তা ছাড়া সংসার অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ়, এখানে মানুষ আশ্রয়স্থল স্বাভাবিকভাবেই খোঁজে। তাকে অভিযোগ করা চলে না।

মাসী তৎক্ষণাৎ কথাটার বাঁকা মানে করে নিয়ে বলত—তার মানে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং রূঢ়, কেমন ?

ইনি বলতেন—না, তা আমি বলি নি।

—তাই বলছ। নইলে ও কথার মানে কি হয় ? ওর কাছে সংসার বলতে তো আমার এই কোয়ার্টারটুকু এবং আমি।

ইনি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলেন—আমি আর তোমার এখানে আসব না।

মণি বউদি বললেন—সত্যিই আসা ছাড়লেন ভদ্রলোক। ঘটনাটা প্রায় এক বছরের মাথায়। এলেন না মাসখানেক।

তারপর মাসী চিঠি লিখলে প্রেমের টানে। এবং লুকিয়ে আমিও চিঠি লিখলাম প্রাণের দায়ে। কারণ মাসী এই ভদ্রলোকের না-আসার জন্য আমাকে ষোল আনা দায়ী করে আমার

উপর আক্রমণ তীব্রতর করে তুললেন। আমি বাঁচবার পথ বা আমাকে বাঁচাতে পারে এ আক্রমণ থেকে এমন মানুষ খুঁজতে গিয়ে এঁকে ছাড়া আর দ্বিতীয়জনকে মনে মনে খুঁজে পেলাম না।

সেই শুরু হল চিঠি লেখা। ইনি এলেন চিঠি পেয়ে কিন্তু মাসীর কাছে আমার চিঠির কোন উল্লেখ করলেন না। অথচ আমি চিঠির জবাব পেয়ে গেলাম। এক ফাঁকে আমাকে একটা টুকরো কাগজে লিখে হাতে গুঁজে দিলেন। তাতে লেখা ছিল—"তোমার কোন অসুবিধা হলে আমাকে এমনি করে চিঠি লিখে জানিয়ো।"

* * *

মণি-বউদি হেসে বললেন আমাকে—সেই ১৯৪২ সালের সেই রাত্রিটিতে, হঠাৎ কাহিনীর মাঝখানে ছেদ টেনে বললেন—মুখোমুখি কথা বলে প্রেম জমানো বা প্রেমে দানা বাঁধানোর ভিয়েনটা কঠিন ঠাকুরজামাই; আমাদের দেশে মা-বাপে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেম একেবারে রেডিমেড জামা পোশাকের মত গায়ে উঠে চেপে বসে। হাতে বড় হলে খাটিয়ে নেয়, খাটো হলে জোড়াতালি দিয়ে নেয় অথবা আজন্মই খাটো জামা পরে কেটে যায়। তার মধ্যেও প্রেম জমাতে ওই প্রেমপত্র ভরসা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থিয়েটারে যাত্রায় রিহার্শ্যালে অভ্যেস করে তবে বলা যায়—'ওগো তোমায় ভালোবাসি।' এমনিতে এটা ভারী কঠিন। চিঠির মত সুবিধে মুখোমুখি চোখে চোখ রেখে 'ভালবাসি' কথাটা বলতে হয় না; নির্জন স্থানের দরকার হয় না। দিব্যি 'কেমন আছ? কেমন আছ?' লিখতে লিখতে দিব্যি লেখা যায়—"হৃদয়ে বড়ই যাতনা হইতেছে আজকাল—কেন তাহা বুঝিতেছি না?" সঙ্গে সঙ্গে ও তরফ থেকে উৎকণ্ঠিত উত্তর আসবামাত্র আবার দিব্যি লেখা যায়—"হৃদয়ে কেন যাতনা হইতেছে তাহা কি বুঝিতে পারেন না?"

মণি-বউদি প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিলেন। বাক্যে প্রগল্‌ভা, হাস্যে প্রগল্‌ভা, চিত্তেও বুঝি বা প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেও একটি নির্বিকারত্ব ছিল, সেটা আমি অতি অনায়াসেই অনুভব করেছিলাম।

বাল্যবয়সে প্রেম করেছিলেন, জীবনসংকট ও সমস্যার যন্ত্রণার মধ্যে পড়ে। তখন তার মধ্যে বিলাসের বৈভব ছিল না, হয়তো বা কোন মোহেরই স্থান ছিল না। আর আজ—অর্থাৎ ১৯৪২ সালের সেই রাত্রিটিতে স্মৃতিস্মরণের মধ্যে বিলাস-কৌতুক ও মোহের সরস জীবন-ভাণ্ডটি উপচে উপচে পড়ে আমাদের দুজনকে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

মণি-বউদি অবলীলাক্রমে বলে গেলেন, কবে কখন কোন চিঠিতে যে ওঁকে প্রাণ সমর্পণ করেছিলাম তা আমি জানি না। উনিই বা যে কবে আমাকে চেয়ে ছিলেন মনে মনে তারও হিসেব ওঁর ঠিক নেই। কিন্তু এ সবের ঠিক হিসেব রেখেছিলেন রত্না মাসী। তিনি চিঠির খবর সন্দেহ করতেন কিন্তু ধরতে পারতেন না। ফলে আমার উপর নির্যাতন ক্রমশ বাড়ছিল। বাড়ছিল আমার পড়াশুনো উপলক্ষ করে এবং ওঁর সঙ্গে ঝগড়ার পরিমাণ বাড়ছিল যে-কোন ছুতো অবলম্বন করে। সুতরাং তিনি বলতে পারতেন কার চোখের ভাষায় কবে কোন তারিখে

চাওয়ার কথা ফুটে উঠতে তিনি দেখেছিলেন।

এ ভদ্রলোকের তখন সবে কপাল খুলছে। দস্তুরমত আপিস টাপিস খুলে ইনি সবে বসছেন। এক ঘোড়ায় টানা একখানা পাল্কিগাড়ী, যাকে কম্পাসের গাড়ী বলে, তাই কিনেছেন। মাসীর বাড়ী যাওয়া আসা কমে গেছে। আমি পনেরো পার হয়ে ষোলতে পড়েছি। পড়ছি সেকেণ্ড ক্লাসে মানে ক্লাস নাইনে। মাসীর পাহারায় থাকি। ইস্কুলে মাসী বাড়ীতে মাসী পথে মাসী। তবু মাসীর সন্দেহ যায় না। মাসী হঠাৎ আমার জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। আগেই বলেছি আমি তখন ষোলতে পা দিয়ে ষোড়শী হয়েছি। দাঁত দুটি উঁচু বলে এমনিতেই দেখনহাসি কিম্বা সুহাসিনী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ছবি বলে মনে হতে লেগেছে। ওদিকে রত্না মাসী তিরিশে পা দিয়েছেন এবং কোন্ কারণে জানি না মনের দারুণ অশান্তি সত্ত্বেও দস্তুরমত মোটা হতে শুরু করেছেন। সুতরাং 'তন্বী-শ্যামা শিখরিদশনা' আমাকে দেখে যদি মাসী ঘাবড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তার জন্যে কোন দোষ তাঁকে কেউই দিতে পারবে না। ঠাকুরজামাই, রত্না মাসীকে সেজন্যে অর্থাৎ আমার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হওয়ায় আমি দোষী মনে করিনে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। কেন ঘাবড়ে গেলাম তা বুঝি নি। তবে ঘাবড়ে গিছলাম এটা ঠিক কথা। প্রস্তাবটা শুনে মনে হয়েছিল, মাসী আমাকে বিচিত্র পন্থায় যাবজ্জীবন দীপান্তর বা কারাদণ্ডের মত একটা দণ্ড দিতে চাইছে।

সুতরাং আমি বলেছিলাম—না।

মাসী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ এবং তীর্যক দৃষ্টিতে আমার অন্তর ভেদ করে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল—কেন?

উত্তর তো ছিল না, সুতরাং চুপ করে ছিলাম।

মাসী গর্জন করে উঠেছিল—'বল'।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—'বল। কেন বিয়ে করবে না সেটা বলতে হবে তো। বল'।

আমি এবার সাহস সঞ্চয় করে বলেছিলাম—বিয়ে আমি করব না।

—বিয়ে করবে না? কেন?

—তুমিও তো বিয়ে কর নি।

—না। করি নি। তার কারণ আছে—। তুমি বিয়ে করবে না, তার কারণটা কি? বল?

উত্তর আর চালিয়ে যেতে পারি নি, সুতরাং মাসী বিজয়িনীর মত বলেছিলেন—যাও, পড়াশুনা কর গে। যা করবার সে আমি করব। বাঁদরামি, পাকামি।

ঠিক সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমার না-দেওয়া জবাবটা দিলেন উনি। অর্থাৎ মাসীর প্রিয়তম বন্ধু। অমৃতবাবু তখন আসাযাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে রত্নমালার প্রতি তাঁর বিরক্তির চিহ্ন। কিন্তু ঠিক সেইদিনই এলেন তিনি। তিনি সমস্ত শুনে বললেন—

না। ওর অমতে কেন বিয়ে দেবে তুমি? ওর বাপ আমাকে বলেছিলেন—দেখ, ওকে পড়িয়ো। মনটাকে তৈরী করে দিয়ো।

মাসী বলে উঠেছিল—না। লেখাপড়া শিখে কি হবে? এই তো আমার মত হবে। না। তা আমি হ'তে দেব না। মেয়েদের চাকরী করে খাওয়ার মধ্যে গৌরব হয়তো অনেক-অনেক কিন্তু তার মধ্যে শান্তিও নেই সুখও নেই। আমি মানি না।

উনি—অর্থাৎ অমৃতবাবু বলেছিলেন—

মণি বউদি বলেছিলেন—আশ্চর্য শান্তভাবে এবং তার থেকেও আশ্চর্যতর দৃঢ়তা ছিল ওঁর শান্ত ভাবটির মধ্যে। উনি (অমৃতবাবু) বলেছিলেন—সে তুমি মানো বা না-মানো তাতে কিছুই আসছে যাচ্ছে না রত্না। এক্ষেত্রে যা মানতে হবে সেটা হ'ল ওর বাপের অন্তিম ইচ্ছা এবং ওর নিজের অন্তরের বাসনা। অবশ্য তার সঙ্গে ওর যোগ্যতাও বিচার্য নিশ্চয়। এ তিনটিই কিন্তু তোমার মতকে সমর্থন করে না। এরপর সব থেকে যেটা বড় কথা সেটা হ'ল —মেয়েটি কারুর পোষ্য নয়। কাছে থাকলেও তোমাকে ওর জন্যে অর্থব্যয় করতে হয় না। ওর বাপ যে টাকা রেখে গেছেন—ক্যাশ সার্টিফিকেট রেখে গেছেন—ওর মায়ের যা গহনা আছে, তাতে ও কারুর দয়ার উপর নির্ভর করে না। ওর মজুত টাকা থেকে প্রতি মাসে তুমি টাকা নাও।

মাসী চীৎকার করে উঠেছিলেন—সে ওর মা থাকলে তাকেও এই টাকা থেকেই খরচ করতে হ'ত। সে রোজগার ক'রে আনত না।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—সেক্ষেত্রে টাকাটায় মায়ের অধিকার থাকত। মা আর মাসী ঠিক সমান কথা নয়।

মাসী আবার বলে উঠেছিল—অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠেছিল—ভাল কথা, তুমি কি ক'রে বাধা দাও আমি দেখব। বিয়ে দিয়ে ওকে আমি বিদায় করব, তবে আমি রত্নমালা।

অমৃতবাবু বলেছিলেন—শোন, তাহলে বলি। তা করতে চাইলে আমি কোর্টে গিয়ে দরখাস্ত করব, বলব—ওর বাপের শেষ ইচ্ছা আমি বহন করছি এই অধিকারে আদালতে আশ্রয় নিচ্ছি। ওর বাপের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ীই আমি ওকে ওর মাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখন দেখছি মাসী মেয়েটির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং ওর বাপের শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দিতে চায়। সুতরাং মেয়েটির স্বাধীন ইচ্ছা পড়াশুনা করা, এবং বাপেরও সেই অন্তিম ইচ্ছা যাতে পালিত ও পূর্ণ হতে পারে তার জন্য এই বিরুদ্ধবাদিনী মাসীর কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে কোন নিরাপদ হোম বা বোর্ডিংহাউসে বা রেসিডেনসিয়াল ইস্কুলে তাকে রাখার অর্ডার হোক এবং তার পৈতৃক টাকা গহনা ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদি কোন এ্যাটর্নির হাতে দিয়ে তাঁকেই আইনসম্মত গার্জেন-নিযুক্ত করা হোক।

এক নিশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন অমৃতবাবু। যেন মনে মনে সমস্ত কথাগুলো ফেঁদে মকশো

করে এসেছিলেন।

শুনে রত্নামাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল—চোখদুটো নিষ্পলক—চোখের তারা দুটোতে যেন একটা ঝক্‌মকানি খেলে যাচ্ছিল।

মণিবউদি বললেন—আমাকে নিয়ে মাসীর সঙ্গে ওঁর ঝগড়া সেই নতুন নয়। বারো বছরে এসেছিলাম—এখন পনেরো পার হয়ে ষোলতে পড়েছি। চার বছর গেছে। ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে সরবতিয়া মাঈকে নিয়ে—ওর কাছে এসে পৌঁছুনোর ঠিক পরদিন থেকে। কিন্তু কখনও রত্না মাসীকে হারতে দেখি নি। উনিও (অমৃতবাবু) কখনও বান্ধবীকে অর্থাৎ আমার মাসীকে এমন ক'রে হার মানান নি। ঝগড়া শুরু করে একটা জায়গায় এসে মাসীকে কৌশলে নিরস্ত্র এবং নিরস্ত্র দুইই ক'রে মুখে নিজে হার মেনে নিতেন এবং নিতেন প্রেমিকের মতই সহাস্য আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে—বলতেন—বেশ-বেশ তাই, তাই হ'ল গো। আমি হার স্বীকার করছি। তুমি যা করবে তাই হবে। তবে তোমার সাম্রাজ্যে এ অধীন অনুগৃহীত জন বলতে চায় যে, আমার বাক্যদানের কথাটা স্মরণ করো। আমার যুক্তিটা ভেবে দেখ।

মাসী হেসে ফেলে বলতেন—খুব যাহোক তুমি!

সে-দিনই হ'ল প্রথম, স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম। উনি ওই কঠিন কথাগুলি বলেই উঠে চলে গেলেন। নিজের তরফ থেকে আপোসের চেষ্টা করা দূরে-থাক, মাসীকেও তার নিজের হাতে রান্নাকরা চড়ানুন তরকারিটাতে খানিকটা গুড় মিশিয়ে মুখে দেবার মত করে নেবার অবকাশ দিলেন না।

আমি মনে মনে খুব খুশী হয়েছিলাম ঠাকুরজামাই। মুখে আমার হাসির রেখা ফুটেছিল। হঠাৎ সশব্দ পদক্ষেপে মাসী গোটা বাড়ীটাকে চমকে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঠাস-ঠাস করে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিলেন। একটা গালে, একটা মুখের ওপর কপালে আর একটা মাথায়। বললেন—কে ওকে এসব খবর দিলে? কে? আজ সকালে কথা হয়েছে—আজই এসেছে। অথচ এ বাড়ী মাড়ানো ছেড়েছে। হঠাৎ আজই কেন এল বল্? বল্? বল্? কে খবর দিয়েছে বল্?

সাত

মণি-বউদি কথা বলতে বলতে হঠাৎ হেসে ফেললেন। বেশ বিচিত্র হাসি-মুখেই আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সে তাকানো এমন যে আমি অস্বস্তি অনুভব না করে পারলাম না। অথচ এ বাড়ীতে ঢুকে অবধি এ পর্যন্ত এতটুকু সঙ্কোচের কোন হেতু পাইনি। মণি-বউদির ঠোঁটের সেই বিচিত্র হাসি যেন অল্পে-অল্পে বেড়ে চলেছিল কোন সবিশেষ কারণে।

আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না—কি হল?

গভীর কোন ভাবনা না-হোক ভাবরসের আস্বাদনের মধ্যে বউদি যেন মগ্ন হয়ে ছিলেন;

প্রশ্নটা এক ডাকে ঠিক সাড়া জাগালে না। দ্বিতীয়বারে একটু চকিত হয়ে উঠে সাড়া দিলেন —এঁ্যা ?

বললাম—থামলেন যে ? কি হল ? এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছেন কেন ?

এবার, ফিক্ করে হাসা যাকে বলে, সেই ফিক্ করে হেসে বউদি বললেন, নারী পুরুষের সম্পর্কের কথা ভাবছিলাম। সংসারে কার্যের পিছনে কারণ থাকে। সে কারণের মূল ধরে এগিয়ে গভীরে গেলে আদ্যা প্রকৃতির সেই উষ্ণ প্রস্রবণে গিয়ে পৌঁছুতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও বোঝা কিছু যায় না তবে তার জিজ্ঞাসা থাকে না, বোবা হয়ে যায়।

মানে বুঝি নি। একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

বউদি বললেন—মাসী সেদিন আমার গালে মুখে ক্রোধবশে চপেটাঘাত করেছিলেন, আঘাতগুলো আমার মুখে কিন্তু ঠিক পড়েনি ; বলতে গেলে মাসীই নিজের গালে-মুখে চড় মেরেছিলেন। এবং প্রশ্ন করেছিলেন, কি করে জানলে ? কে জানালে ? বল। কে জানালে বল ? এ প্রশ্নের উত্তর সেদিন সে মুহূর্তে আমি জানতাম না। কল্পনাও করতে পারিনি যে এ বিশ্বসংসারে এমন দরদী আমার কেউ আছে যে আমার দুঃখ সইতে না পেরে তা অমৃতবাবুর কাছ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করে দিয়ে আসবে।

আমি ভেবেছিলাম বা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম যে, কাকতালীয় ন্যায় অনুযায়ী তিনি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই এসে পড়েছিলেন সেদিন ; কিন্তু না। তা নয়, তিনি মাসীর সন্দেহমত খবর পেয়েই এসেছিলেন। খবর সত্যিই একজন তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। প্রকৃতির রাজ্যে বাতাস যেমন ফুলের গন্ধ মৌমাছিকে পৌঁছে দেয়, অনেকটা সেইভাবে পৌঁছেছিল।

মাসীর বাড়ীতে ছিল এক প্রৌঢ়া ঝি, আর এক ছোঁড়া চাকর। বয়স তখন তার তের কি চৌদ্দ, তার বেশী নয় ; বছর চারেক আগে যখন মণি-বউদি এ বাড়ীতে প্রথম আসেন তখন ছেলেটা ছিল ন'-দশ বছরের। নিতান্ত অনুগত ভালোমানুষ চাকর। 'সাত চড়েও রা কাড়ে না' বলে একটা কথার কথা প্রচলিত আছে, সেটা আশ্চর্যরকমে সত্যি ছিল এই চাকরটার বেলা। ছেলেটা কানে একটু খাটো ছিল, তারই জন্যে মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকত। একটা কথা অন্ততঃ বারকয়েক জিজ্ঞাসা করলে পর তবে সে তার জবাব দিত। একটু বোকাগোছের দেখেই রত্নামাসী ছোঁড়াটাকে রেখেছিল। মাইনে কম দিত। এঁটো—কাঁটা যা থাকত তার কিছুই ফেলতে দিত না। মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় চুষেই ক্ষান্ত হত না, চিবিয়ে চুর করে ছাড়ত। সেই ছোঁড়াটা তখন চার বছরে বেড়ে চৌদ্দ কম্‌প্লিট করে পনেরোতে পড়েছে। আমার একটু অনুগত হয়ে পড়েছিল।

কাজে-কর্মের মধ্যে ফাঁক পেলেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে চুপিচুপি বলত, কোন কাজ করতে হবে দিদিমণি।

ছোঁড়াটার তখন বোকা ভাবটা কিছুটা কেটেছে বয়সের সঙ্গে, না হলে, বুঝতেই পারছেন, চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করত না।

জানিয়ে এসেছিল সেই ছোঁড়াটা। নাম ছিল 'পর্‌সাদ'; কি পরসাদ তাও কেউ কোন দিন জিজ্ঞাসা করেনি, তবে শুধু প্রসাদ তো হয় না, হয় রাম, নয় শিব, কালী, দুর্গা, বা দেব বা দেবী কোন একটা শব্দের প্রসাদ হতেই হয়, কিন্তু সেটা কেউ জানত না।

আমাকে সেদিন বিয়ের কথা নিয়ে মাসী যে লাঞ্ছনা করেছিল, সেটা তার চৌদ্দ-পনের বছরের নবীন মনটিকে বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলেছিল। খবরটা সেদিন সে-ই গিয়ে দিয়ে এসেছিল অমৃতবাবুর কাছে। বেশ ভঙ্গি করে, কণ্ঠস্বরে সেই চৌদ্দ-পনের বছরের ছেলেটির বেদনার্ত কণ্ঠস্বরের আমেজ নকল করে, মণি-বউদি বলেছিলেন, পরসাদ বলেছিল, বহৎ দুখ দেতি হ্যায় মাইজী। ব-হ-ত্। দিদিমণিকে এমুন করে বক্‌লে—। দিদিমণির ব-হ-ত দুখ লাগল। দোনো আঁখে পানি আয়া।

একটু চুপ করে থেকে মণি-বউদি বললেন, প্রসাদ আছে, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। আমাদের ফায়ার-ব্রিক্‌স ফায়ার-ক্লের ওখানে একটা বেশ দোকান করেছে। কিছু ফায়ার-ক্লে কেটে সাপ্লাই-এর কারবারও করে। বোকা আর নয়। আমিই তাকে দোকান-টোকান করে দিয়েছি। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত প্রসাদ আমাদের কাছেই ছিল।

আবার একটু চুপ করে থেকে যেন ভেবেটেবে নিয়ে বউদি বললেন, আপনাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কেষ্টা, রাজারাণীর শঙ্কর, শরৎবাবুর বেহারী, অনুরূপাদেবীর মথ্‌রো—এরা অমর চরিত্র। চাকর হয়েও সত্যিকার মানুষ, চাকরত্বের যে নিচু-তলা, সে তলা ছাড়িয়ে তারা বড় হয়ে উঠেছে। প্রসাদও আমার তাই। অনেকটা তাই। আবার তফাৎও অনেকটা। হয়তো বা—।

চুপ করে গেলেন আবার। মনে হল যেন মনে-মনে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চোখের চাউনির মধ্যে যেন অন্যমনস্কতা, সেই অন্যমনস্কতাই কথা জুগিয়ে ছিচ্ছিল। হঠাৎ বললেন—মানে—।

কি বলব? আবারও একটু চুপ করে থেকে বললেন, এবার যেদিন আসবে, সেদিন আপনাকে খবর দেব। নিশ্চয় আসবেন। কারণ খুশী হবেন। সত্যিকারের একটা মানুষকে দেখবেন। এই লম্বা। কালো কষ্টিপাথরে গড়া চেহারা। চল্লিশ ইঞ্চি বুকের পাটা, কোমরটা আটাশ-তিরিশের বেশী নয়। অসাধারণ সাহস, সহ্যশক্তি। আর খুব ভালো গোলাপ ফোটাতে পারে। ওই কারখানার এলাকায় একটা ছোট বাংলোবাড়ী করেছে এখন; এখন তো তার অবস্থা ভাল, সেখানে বাগান করেছে। চমৎকার বাগান। চমৎকার ফুল। বিশেষ করে গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলা আর চামেলী। যখন এখানে আসে তখন ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসে। আগে তো নিয়মিত পাঠাতো সে রোজ। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বন্ধ করেছি।

আপনি নিশ্চয় জানেন, কানে আপনার নিশ্চয় এসেছে যে, মণিমালা মুখার্জী, মিসেস এ মুকুরজীর চালচলন সন্দেহজনক। সেটা দুপুরে এইভাবে সাধুসন্ন্যাসী গণৎকার দেবতাস্থান বেড়ানোর জন্যেই শুধু নয়। আর নাকি অনেক কারণ আছে যা অত্যন্ত কদর্য। তার প্রথম

কারণ আমার বয়স আর আপনার ছেলের বয়সের তফাৎ ; আমার দেখনহাসি এই চেহারা এবং আমার হাসিখুশী ; তাছাড়া উলসিত বিলসিত চরিত্র এবং বি-এ ডিগ্রির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সেই অসামঞ্জস্য দোষ আর তার সঙ্গে ওই পরসাদের ফুলের রাশির উপঢৌকন—সোনায় সঙ্গে সোহাগার মত জুটে গেছে।

আমার মুখে বোধ করি কোন ভাবান্তরের চিহ্ন দেখেছিলেন মণি-বউদি। তিনি বললেন—থাক, কথাটা বেশী আড়ম্বর করে নাটুকে ভঙ্গিতে বলব না ; সোজা রাস্তায়, সাদামাটা ভাবে সত্য কথাটা বলি আপনাকে। আপনার মুখে লাল ছোপ ধরেছে ; আমার জন্যে হয় আপনি লজ্জা পাচ্ছেন, নয় অস্বস্তি, অশান্তি ভোগ করছেন।

মণি-বউদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমার মাসীই আমার গায়ে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল প্রথম। আমার জীবনের কলঙ্ক সেই যে চন্দ্রগ্রহণের মত লাগল, ওর আর মোক্ষ হল না কোনদিন। সেদিন মাসীর সঙ্গে অমৃতবাবুর কথাবার্তায় তপ্ত খোলায় ধান থেকে খই ফুটল এবং মাসী আমাকে চড় মেরে জিজ্ঞাসা করলে—ওকে কে খবর দিলে বল, সেদিন সে-প্রশ্নের উত্তর আমিও দিতে পারলাম না, তিনিও বের করতে পারলেন না। কিন্তু বছর দুই পর মাসীই প্রথম বের করলেন যে, খবরটা দিয়ে এসেছিল ওই বোবার মত ইডিয়ট পরসাদ। এবং তার অন্তর্নিহিত কারণ আমার প্রতি অন্ধ অবুঝ উন্মাদ কামনা।

হেসে আবার বললেন, এসব শব্দগুলো বেশ ভেবে বেছে, বাছাই করে প্রয়োগ করছি, নইলে প্রথম যেদিন মাসী এ অপবাদ দিলে, সেদিন ওই সংস্কৃতিবান ঘরের লেখাপড়া-জানা পেশায়-শিক্ষিকা মেয়েটি সোজাসুজি যে ভাষা প্রয়োগ করেছিল, সে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। 'পিরীত' 'ছেনাল' শব্দ দুটো সেদিন তার মুখ থেকে নিরাপদে ঘরের ভেতরে সাপ বের হওয়ার মত বের হয়ে এল। আমি প্রথম দিনটায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর মাসীর মুখ আরও খুলল, তার ধারালো জিভ আরও খেলতে লাগল। এবং ওই সব শব্দের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

ওদিকে অমৃতবাবুর সঙ্গে মাসীর ঝগড়া বাড়তে লাগল।

একটা কিছু হলেই অমৃতবাবু ঠিক খবরটি পেয়ে যেতেন। এ-বেলা হলে ও-বেলায়, রাত্রে হলে পরদিন সকালে।

এরই মধ্যে আমার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল। ইস্কুল থেকে ছুটি পেলাম। ইস্কুল যেতে হত না আমাকে, কিন্তু মাসীকে যেতে হত। আমি বাড়ীতে থাকতাম। কিছুদিন যেন বেঁচে গিছলাম।

মাসীর তখন সন্দেহের বীজ থেকে অঙ্কুর কেন, গাছ হয়েছে। মাসীর সন্দেহ ছিল অমৃতবাবু আমার ষোল বছরের যৌবন ও রূপের আগুনে পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয়েছেন। ভাবতেন মাসী নিজে লণ্ঠনের কানুসের মত আমার রূপযৌবন শিখাকে ঘিরে রেখেছেন তাই রক্ষে, নইলে এতদিন কবে অমৃতবাবু ঝপ্ করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজে পুড়তেন এবং আমার শিখাকেও নিভিয়ে দিতেন। এবং পোকা পোড়ার কদর্য গন্ধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করে

কলঙ্কের গন্ধে ভরে দিত।

এবার যখন ফানুসরূপিণী মাসীকে আমাকে একলা রেখে ইস্কুলে যেতে হল, আমি একলা বাড়ীতে থাকতে লাগলাম, তখন তাঁর উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের আর সীমা রইল না। দিন আট-দশ বেশ শান্তিতে কেটেছিল। তারপরই মাসী জিনিস ফেলে যেতে লাগলেন। ইস্কুল থেকে রিক্‌শা করে এসে হাজির হতেন। এবং দরজায় ধাক্কা মেরে শোরগোল তুলে সেই দুপুরবেলায় গোটা পাড়াটাকেই চঞ্চল এবং চকিত করে তুলতেন। প্রথম কয়েক দিন লোক কিছু চকিত হয়েছিল চীৎকারের জন্যে, কিন্তু দুতিনদিন পর থেকে বিষয়বস্তুর মধ্যে কলঙ্কের স্বাদ পেয়ে তারা উল্লসিত কৌতূহলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত মাসীর উত্তপ্ত উচ্চ কণ্ঠ-স্বরের জন্য। তারপর ক্রমে ক্রমে এতেও মন্দা পড়ল, কারণ স্বাদটা পুরনো একঘেয়ে হয়ে আর তেমন রুচিকর রইল না।

অন্যদিকে মাসী যেন তাঁর দিক থেকে জোর হারাচ্ছিলেন। আমাকে ঠিক হাতেনাতে ধরতে পারছিলেন না। এবং এই অন্যদিকের অন্যদিকে অনুভব করছিলেন, যে-অমৃতবাবু তাঁর কৈশোর-যৌবনের বন্ধু, তিনি তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।

মানুষটা তখন বিষয়-ব্যাপার নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। ব্যবসায়ে আয় হচ্ছে। ভাল আয়। আয়কর বিভাগের আওতায় গিয়ে পড়েছেন। আমার ব্যাপার নিয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যে তিনি ঠিক করে ফেললেন, আমার পরীক্ষার ফল বের হলেই আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কোন বোর্ডিংহাউসে। আমি সেখানেই থাকব। মাসীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আর আমার থাকবে না।

আমি তখন সপ্তদশী। সতেরোতে পা দিচ্ছি।

মনে মনে, যেন উনোনে-চড়ানো কড়ায় টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছি।

নিশ্চয় বুঝেছেন কথাটা।

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন মণি-বউদি।

তারপর বললেন, দুদিনের দুটো কথা বলি আপনাকে। বেহায়া হয়তো ভাববেন। তা ভাবুন। বেহায়া আমাকে করে দিয়ে গিয়েছে আমার মাসী। আমার প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কথায়, প্রত্যেক চাউনিতে সে বেহায়াপনা দেখতে পেত এবং তার জন্যে আমার লাঞ্ছনার বাকি রাখত না। আমার জীবনের সব কিছুতেই, চাউনি, চলাফেরা, হাসি-কান্নাতেও আমার অজ্ঞাত বেহায়াপনা আবিষ্কার করে ওই—'পিরীত', 'ছেনালি' গোছের অজস্র কথা আমাকে শুনিয়ে শিখিয়ে পাকা বেহায়া করে তুলেছিল।

ঠাকুরজামাই, বেশ্যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে? তাদের বেহায়াপনা দেখেছেন? তাদের মুখে অশ্লীল কথা শুনেছেন? কণ্ঠস্বর তাঁর শক্ত এবং ঝাঁঝালো হয়ে উঠল।

বললেন, শোনেন নি বললে বিশ্বাস করব না। আপনি বিব্রত হবেন না. আপনার কাছে কনফেসন আদায় করছি নে। বলছি তাদের কথা ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, ওই অশ্লীল শব্দগুলো এবং খারাপ খারাপ ইমেজগুলো মানুষের মনে জন্মদোষে বা আপনা-আপনি, ফাল্গুনের

শেষের পাতাঝরা ডাল-ভরা পলাশ-শিমুলের মত ফোটে না। ওগুলোকে চাষ-আবাদ করে ফলাতে হয়। ভদ্রঘরের বউ বা মেয়ে যখন ওপাড়ায় ওদের বাড়ী গিয়ে পড়ে, তখন ওই শব্দ আর ওই ভাব-ভাবনাগুলো হাসির মধ্যে, রাগের মধ্যে, চেঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার কানে ঢুকিয়ে দেয়।

বলতে বলতে মণি-বউদি পাল্টালেন।

হাস্য-রহস্য-কৌতুকময়ী মেয়েটি যেন শক্ত কঠিন সোজা কোন ইস্পাতের ধারালো অস্ত্রের মত ঝকমকে হয়ে উঠলেন। চোখের দৃষ্টিতে জ্বালা ফুটল। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল, নিজেও যেন শক্ত হয়ে উঠলেন।

আরও একটি কথা বলে নিই এইখানে। মণি-বউদির এ কথা তো আজকের কথা নয়। পঁচিশ বছরের বেশী আগের কথা। সুতরাং মণি-বউদির সংলাপ যা বসিয়েছি তা ঠিক মণি-বউদির শ্রীমতী-মুখ-নিঃসৃত অবিকল কথাগুলি নয়। তবে তার সঙ্গে ভাবভঙ্গিতে মিল আছে। মণি-বউদি বি-এ পাশকরা মেয়ে এবং ব্রাহ্ম বাপ ও মাসীর কাছে মানুষ। এ-মেয়ে যে-কালেরই হোন এ-মেয়েরা দীপ্তিমতীই হয়ে থাকেন। অর্থাৎ জীবনে যেভাবে যেদিকেই মুখ ফেরান বা ফিরে তাকান একটা ঝকমকানি থাকে। সে হাসিতেও বটে, কথাতেও বটে, রসিকতাতেও বটে, এমনকি কান্নাতেও বটে। সেই কথা মনে রেখেই মোটামুটি, সেই ১৯৪২ সালের আগস্টের শেষ বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে এক শুক্লপক্ষের রাত্রে তাঁর কাছে শোনা তাঁর কথাগুলিকে আমার ভাষাতেই প্রকাশ করেছি। তবে এমনি ধরনের একটা তীর্যক ভঙ্গিতেই সে কথাগুলো তিনি বলেছিলেন। কিন্তু এই যে শেষের কয়েকটা, সেখানে কৌতুকময়ী মনোরমা মণি-বউদি অকস্মাৎ শক্ত এবং সোজা ইস্পাতের কোন ধারালো অস্ত্রের মত হয়ে উঠে কথাগুলো বলেছেন, সেগুলো আমার ভালভাবে মনে আছে। কারণ, কথাটা শেষ করেছিলেন একটা গল্প বলে।

বলেছিলেন, একটা গল্প শুনেছিলাম বুন্দেলা ঠাকুরসাহেবের ঠাকুরবাড়ীতে পণ্ডিতজীর কাছে। এক ব্যাধ বন থেকে দুটো ময়নার বাচ্চা এনেছিল এবং একটা বিক্রী করেছিল এক ব্রাহ্মণকে, আর একটা বিক্রী করেছিল এক ব্রাত্যকে। (এখানে তিনি একটা জাতের নাম করেছিলেন।) বামুনের বাড়ীরটা বড় হয়ে উঠে ভোর থেকেই শুরু করত—কৃষ্ণরাধা, কৃষ্ণরাধা। সীতারাম, সীতারাম। লোক দেখলে বলত—আসুন, আসুন। আর ব্রাত্যের বাড়ীরটা সকাল থেকেই শুরু করত অশ্লীল কথা। কুৎসিত গালাগালি।

এর পরে বলেছিলেন—আমি দুই বাড়ীর সকল বুলিই শিখেছিলাম। পাখী শুধু বুলি বলে, বুলির কোন ভাব তার অন্তরকে দোলা দেয় না, নাড়ায় না, কিন্তু মানুষের মুখে যা বের হয়, বুকের ভেতর থেকেই তার জন্ম হয়। কানে যা ঢোকে, তার মানেটা বুকের ভিতরটায় ভাবের ঢেউ তুলে আছাড় খেয়ে পড়ে।

ঠাকুরজামাই, সতের বছর বয়সে তখন সবই শিখেছি। কানে আর তখন কথাগুলো খুব

কটু ঠেকে না। খুব ঝাল-তরকারি খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেলে যেমন নামেই ভিজে জল আসে এবং খেয়ে পেট-মুখ জ্বললেও মনে হয় আরও খাই, না খেতে পেলেই যেমন সবকিছুতে অরুচি ধরে, তেমনি অবস্থা হল আমার। ঠিক এই সময়েই একদিন আবিষ্কার করলাম চারটে বা দুজোড়া লুব্ধ দৃষ্টি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

একজোড়া চোখ অমৃতবাবুর, অন্য জোড়া ওই ছোকরা চাকর পরসাদের।

শুধু আমি দেখলাম না। সে হলে আজ আমিই আপনাকে বলতাম—ঠাকুরজামাই, ঠিক বলতে পারছি না ভাই, লোভটা তাদের না আমার নিজস্ব মনের? আয়নাতে ছাপ পড়ার মত ছাপ পড়েছিল। দাঁড়ান, আগের কথাটা বলে নিই।

* * *

এরই মধ্যে, মানে, ঠিক আমার পরীক্ষার ফল বের হবার প্রায় এক সপ্তাহ আগে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

অবশ্য অমৃতবাবু চেষ্টা করে আমার পাশের খবরটা আগেই জেনেছেন ও জানিয়েছেন। আমি তখন খুব খুশী। বেশ হেসেই অমৃতবাবুর সঙ্গে কথা বলি, আবদার করি। এবং আরও সূক্ষ্ম তীর্যক ভঙ্গিতে পরসাদের দিকে তাকিয়ে হাসি। তখন একদিন চুরি হয়ে গেল মাসীর বাড়ীতে।

আট

এবার মণি বউদির কথা আমার জবানীতে বলছি—

মণিবউদির মাসীর বাড়ীতে হঠাৎ চুরি হয়ে গেল। তাতে যা গেল তা সবই গেল মণি-বউদির। রত্নমালা-মাসীর গয়নাগাঁটি বিশেষ ছিল না। ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তাঁর গয়নার উপর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না; থাকবার মধ্যে প্লেন বালা, কানের টাপ, গলার হার আর একটা হাতঘড়ি। সে সবের মধ্যে হাতঘড়িটা ছিল বালিশের তলায়, বাকী যা কিছু তা ছিল গায়ে। সে সবে তারা হাত দেয় নি। তারা ঘরের কোণে একটা লোহার সেফ ছিল সেটা বিচিত্র কোন কৌশলে খুলে তার ভিতর থেকে নিয়ে গিয়েছিল দামী এবং মজবুত একটা ষ্টিলের ক্যাশবাক্স। তার মধ্যে ছিল মণিমালার মায়ের গহনা, মণিমালারও বাড়তি বা তোলা গহনা যাকে বলে তাই কয়েকখানা, আর তার বাপের কেনা ক্যাশ সার্টিফিকেট।

মণি বউদি বলেছিলেন, বলতে ভুলে গেছি, আয়রণ সেফটা সমেত গয়নার বাক্স উনি নিয়ে এসেছিলেন পাটনা থেকে আমারই সঙ্গে। আমাকে এনে তুলে দিলেন মাসীর বাড়ী, তাই ওই আয়রণ সেফ সমেত ক্যাশবাক্সটাও এসে উঠেছিল মাসীর বাড়ী। চাবি কয়েকটা প্রথম ওঁর কাছেই থাকত, তারপর এসেছিল মাসীর হাতে।

কলকাতায় এই ধরনের চুরি আশ্চর্য চুরি হলেও বছরে অনেক কয়েকটা ঘটে, বাইরে থেকে ভিতরের ছিটকিনি হুড়কো খিল খুলে তারা ঘরে ঢুকে অন্ধকারের মধ্যে বা টর্চ

জেলে বাক্স-পেঁটরা বের করে নিয়ে চলে যায়, ঘরের মানুষেরা ঘরে অগাধ ঘুমে ঘুমিয়ে থাকে; কোনক্রমেই লোকজনের চলাফেরায় বা জিনিসপত্র সরানোর শব্দে তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় না। এ সেই ধরনের চুরি।

সিন্দুক খুলে ক্যাশবাক্সটা এবং চৌকির ওপর রাখা গোটা দুই ট্রাঙ্ক নিয়ে চলে গেছে। কোন প্রকারের কোন নিশানা রেখে যায়নি। নিশানার মধ্যে পাওয়া গেল পরিত্যক্ত ভাঙা বাক্স কয়েকটা: বাড়ীর ঠিক পিছনেই জমাদার যাতায়াতের গলির মধ্যে। ভিতরের বস্তুগুলির কোন সন্ধানই কোন সূত্রে পুলিশ আবিষ্কার করতে পারলে না। আবিষ্কার করবার জন্য ধরে নিয়ে গেল পরসাদ অর্থাৎ ছোকরা চাকরটাকে: বোকা সরল পরসাদ তখন কৈশোর পার হবো-হবো করছে; তার চোখের দৃষ্টি বদলের কথা আপনাকে বলেছি, সম্ভবতঃ সেই নতুন-রকম দৃষ্টি দেখেই তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল, বলে গেল, ছেলেটার রকম-সকম খুব সাস-পিসাস, ওকে নেড়ে দেখতে হবে। আর বাড়ীর লোক ভিতর থেকে খবর না-দিয়ে থাকলে এ চুরি হয় না।

প্রায় মাস দুয়েক ধরে নাড়া খেয়েছিল পরসাদ এবং লছমন পরসাদ ছাড়াও আরও কিছু-লোকও নাড়া খেয়েছিল; রেহাই পায় নি।

মণিবউদি বললেন—সে আমার মাসী থেকে আপনার দাদা পর্যন্ত। মাসীর বাড়ীতে থাকত একটা ঝি, সে তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম করলে। মাসীকে অমৃতবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করত বাড়ীতে এসে; আমাকেও বাদ দেয় নি; আমাকেও জিজ্ঞাসা করত। যখন জিজ্ঞাসা করত তখন আমার ভয় হত, মনে হত হয়ত আমাকেই জেলে ধরে নিয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করত কি জানেন, জিজ্ঞাসা করত কাকে-কাকে তুমি তোমার মায়ের গয়নার কথা বলেছ? মনে কর তো? কোন মেয়েবন্ধুকে বল নি? কোন মেয়েবন্ধুর ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ নেই? ওই পরসাদ ছোঁড়াটাকে বল নি যে, তোমার মায়ের গয়না টাকাগুলো পেলে তুমি মাসীর কাছ থেকে গিয়ে বাঁচতে? বলতে না?

আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। আমারই যখন এই অবস্থা তখন মাসীর এবং মাসীর ঝি'র অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ঝিটা থানা থেকে এসে ডাক-ছেড়ে কাঁদত। আমাকে অভিসম্পাত দিত।

মাসীও তাই। এক-একদিন বলত—আমি বিষ খাব। বিষ খেয়ে মরব। কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরব।

অমৃতবাবু এ বাড়ীতে আসতেন না। তাকে সম্মুখে না-পেয়ে উদ্দেশে অভিযোগ করে বলত আমার জীবনের অভিশাপ, আমার কুগ্রহ। ওই কুগ্রহের জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা। আজ আমি পথের কুকুরের থেকেও অধম হয়ে গেছি। সারা জীবনটাকে শুকিয়ে ঝরিয়ে পথের ধুলোয় মিথ্যেমিথ্যি মিশিয়ে দিলাম। সাধ আকাঙ্ক্ষা আশা সব কর্পূরের মত কোন দিকে উবে গেল। এঁটো পাতার মত অবস্থা আমার। ওই একটা লোকের জন্যে। ওই লোকটা।

অর্থাৎ অমৃতবাবু।

বউদি অর্থাৎ মণিমালা-বউদি হেসে বললেন—আর আমার সম্পর্কে যা বলতেন, যে-শাপ-শাপান্ত দিতেন, তার কথা ঠিক বলে প্রকাশ করতে পারব না ঠাকুরজামাই। কারণ ময়রার বাড়া তো গাল নেই। শাস্তিও নেই। কখনও কখনও নানান রোগ হোক বলে শাপ-শাপান্ত করে কেউ-কেউ। আপনার শ্যালকের দেশে মেয়েদের ঝগড়ায় শুনেছি—বলে—চোখের মাথা খেয়ো। একটি একটি করে অঙ্গগুলি পচে-পচে খসে যাক। কিন্তু কথায় তো শাপ নেই নন্দাই, শাপ আছে, কথা বলার কোপের মধ্যে নিষ্ঠুরতার মধ্যে। সে জেনুইন—মানে আদি ও অকৃত্রিম না হলে নকল করে আনা যায় না। তবে শেষ যে শাপই বলুন আর বাণই বলুন যেটা নিক্ষেপ করলেন, সেটা এসে সোজা আমার বুকে বিঁধল। এবং গভীর অন্তঃস্থলে প্রবেশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা আমি মরলাম না।

মাসী পুলিশের কাছে বলে বসল, আমার বোনঝি, আমি বলতে ঠিক পারি নি। আমার সন্দেহ হয়—। সন্দেহ হয়—ওই পরসাদ ছোঁড়াটার সঙ্গে ওর—।

কথাটা ঝাল এবং নোন্তা। শুনবা মাত্র জিভে জল আসে; জিভে দেবা মাত্র আরও একটু মুখে দিতে ইচ্ছে করে। পুলিশ কথাটা শক্ত করে ধরে বসল।

আমার গায়ে ছাপ পড়ে গেল।

কলঙ্কের ছাপ।

মণিবউদি হেসে বললেন—সেই প্রথম। সেদিন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম নন্দাই। একেবারে বোবা যাকে বলে তাই। এর কোন জবাব থাকতে পারে তা আমার কল্পনাতেও আসে নি। আমি ওই প্রসাদ—ওই চাকরটার সঙ্গে—?

পরসাদকেও এর জন্যে কম নির্যাতন করেনি পুলিশ। পরসাদ পুলিশকে বলেছিল, চুরির কথা সে কিছু জানে না। সে শিউজী মহারাজের মন্দির ছুঁয়ে একথা বলতে পারে। আর মণিদিদি তাকে ভালবাসে কিনা সে জানে না, তবে মণিদিদিকে যেভাবে তার মৌসী দুধ দেয় তাতে তার মনে খুব দুখ লাগে। এবং সে-ই এ সব খবর দিয়ে আসে অমৃতবাবুকে। এর বেশী কিছু নয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। সম্বিতের সঙ্গে কথা; কথার সঙ্গে মাসীর অভিযোগের জবাব।

বলে বসলাম—আমার সন্দেহ হয় মাসীই আমার গহনা টাকা চুরি করিয়েছে। এতদিন মাসী বলে চুপ করে ছিলাম। আজ আর চুপ করে থাকব না। কেন থাকব? মাসী অমৃতবাবুকে ভালবেসে বিয়ে করে নি, বাড়ী থেকে চলে এসে চিরকুমারী হয়ে রয়েছে এ তো সবাই জানে। এখন অমৃতবাবু আমাকে ভালবাসে, বিয়ে করতে চায় সন্দেহ করে আমার গহনা চুরি করিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে চাকরের সঙ্গে কলঙ্ক রটিয়ে দিচ্ছে।

কথাটা মণিমালা বা মণিবউদি ভেবেচিন্তে বলেন নি।

সেদিন অর্থাৎ ১৯৩২ সালে সেদিন রাত্রে আমাকে তাঁর জীবন-কথা বলতে গিয়ে ঠিক এই

কথাটাই বলেছিলেন, আমার বেশ মনে পড়ছে। বলেছিলেন, কথাটা খুব ভেবে-চিন্তে আমি বলি নি নন্দাই ; ছেলেমানুষের ঝগড়ায় একজন অন্যজনকে চোর বললে সে যেমন সঙ্গে-সঙ্গে বলে বসে—কি, আমি চোর? তুই চোর, তুই চোর, তুই চোর। ঠিক তেমনিভাবেই বলেছিলাম কথাটা। বলেছিলাম—আমি যদি পরসাদকে ভালবেসে তাকে দিয়ে আমার গহনা টাকা চুরি করিয়ে পালাতে চেয়ে থাকি, তবে মাসীই বা অমৃতবাবুকে আমার উপর এত সদয় দেখে পরসাদের সঙ্গে জড়িয়ে আমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিচ্ছে না, এমনই বা হবে না কেন এবং আমার গহনা ক্যাশ-সার্টিফিকেট চুরি করিয়ে আমাকে সাজা দিতে চাচ্ছে না, এমনই বা নয় কেন? আরও একটা কথা বলে বসলাম। জানি না কেমন করে বলতে পেরেছিলাম। বলে বসলাম, পরসাদকে আমি ভালটাল বাসি নে। আমি ভালবেসে ফেলেছি অমৃতবাবুকে। অমৃতবাবুও আমাকে ভালবাসে। মাসীর রাগ সেইখানে। মাসীই বলুক না বুকে হাত দিয়ে নিজে মুখে সে কতবার এই কথাটা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলেছে। মাসীর ঝিটা, তার নাম ছিল সত্যবালা, সে শুনেছে, সেও এর সাক্ষী ; বলুক না সে। অমৃতবাবু নিজেই বলুন না, তাঁকেও একথা শুনতে হয়েছে কিনা। বলুন উনি।

পুলিশ আমার কথা দিয়ে মাসীকে চার্জ করলে। মাসীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফ্যাকাশে মুখে পুলিশ অফিসারকে বলে ছিল, এই কথা বলেছে মণি?

অফিসারটি বলেছিল, ডেকে মোকাবিলা করে দেব?

বোবা হয়ে গেল মাসী।

অফিসার তবু আমাকে ডেকেছিল, বলেছিল—আমাকে যা বলেছ তা তুমি আবার তোমার মাসীর সামনে বলতে পারবে?

মণিবউদি বললেন—আমি চুপ করে ছিলাম। আমার সাহস মুখোমুখি হয়ে ভেঙে আসছিল। অফিসারটি বললেন—আমাদের খাতা থেকে পড়ে শোনাচ্ছি।

মাসী বলছিল, থাক। আমি অমৃতবাবুকে ভালবাসি এ সবাই জানে। অমৃতবাবুই ওকে নিয়ে এসেছে ঘাড়ে করে এও সত্যি। আমি সন্দেহও করি এও সত্যি। অমৃতবাবু ওকে ভালবাসে এও খুব সম্ভব সত্যি ; কিন্তু ও অমৃতবাবুকে ভালবাসে?

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে ছিল, কিন্তু চুরির কিছু জানি না আমি।

আমি মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাসীর মুখ যেন ফ্যাকাশে সাদা হয়ে গিয়েছিল। মড়ার মত মুখ। ঠোঁট দুটো শুকনো মনে হচ্ছিল। চোখের চাউনি যেন বোকার মত, বিহ্বলের মত।

সব থেকে কৌতূহলজনক বা বিস্ময়জনক কি জানেন? সেটা হল অমৃতবাবুর কথা। অমৃতবাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল না। অমৃতবাবুর টকটকে ফর্সা রঙ আরও যেন লাল হয়ে উঠল। বয়স তখন তাঁর চল্লিশ। মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। তাছাড়া এঁদের বংশে চুল তিরিশের পরই ফিকে হতে শুরু করে ; এঁর আবার একটু বেশী। ফলে বেশ ভারিক্কি ভারিক্কি

দেখায়। তার উপর দেশসেবক ব্রহ্মচারী বলে একটা নামডাক আছে। সেই মানুষটা কেমন যেন বাসরঘরের অল্পবয়সী বরের মত লজ্জিত এবং পুলকিত এবং সুরঞ্জিত হয়ে উঠলেন। এবং স্বীকার করলেন পুলিশ অফিসারের কাছে যে, মণিমালা যা বলেছে তাতে তাঁর প্রসঙ্গ যতটুকু আছে তা, সত্য বলেই তিনি স্বীকার করছেন। হ্যাঁ, মেয়েটির ভার তিনি সস্নেহে নিয়েছিলেন, তার বাপের মৃত্যুশয্যায়। এবং আজ তিনি এতদিন পর স্বীকার করছেন যে, ক্রমে ক্রমে স্নেহ এখন একটি উত্তপ্ত আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। তবে তাকে তিনি প্রাণপণে সংযত রেখে এসেছেন। রত্নমালাই তাকে খুঁচে-খুঁচে ধোঁয়াটে উনোনকে খুঁচিয়ে জ্বালিয়ে তোলার মত প্রজ্বলন্ত করে তুলেছে। এবং মণিমালা যে সন্দেহ করেছে সে সন্দেহকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়েও দিতে পারেন না তিনি। তবে অবশ্য তিনি এ সম্পর্কে নীরবই থাকছেন। কোন মন্তব্যই করছেন না।

সেই দিন রাত্রে রত্নমালা-মাসী অমৃতবাবুকে চিঠি লিখেছিল। প্রিয়তম অমৃত বলে।

মণিবউদি বলেছিলেন, মাসী আমার এর পর চিঠির পর চিঠি লিখেছে; এবেলা লিখেছে ওবেলা লিখেছে। কিন্তু অমৃতবাবু একখানারও উত্তর দেন নি। সে সব চিঠিগুলো আমি সংগ্রহ করে রেখেছি।

—সে সব অনেক চিঠি। মাসীই চিঠি লিখত অমৃতবাবুকে। অমৃতবাবু কিন্তু তাকে কোন উত্তর দিতেন না। প্রথম কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। ওদিকে পুলিশ একটু-একটু করে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং অন্যদিকে আমার নামে অনেক রটনা রটছিল। পাড়াটা মুখর হয়ে উঠল। রটনার সুকৌশলে সপ্তদশী মণিমালা টাগ অব ওয়ারের দড়িতে পরিণত হয়ে গেল, যার একদিকে পরসাদ, অন্যদিকে অমৃতবাবু ধরে টানছেন। এবং ক্রমে-ক্রমে আমার নিজেরও যেন তাই ধারণা হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ হেসে ফেললেন মণিবউদি।

সামনের দাঁতদুটি উঁচু, মণি-বউদির চেহারাই দেখনহাসির মত; এবং সেটুকু তিনি নিজে জানেন, তাই যখন হেসে ফেলেন তখন ডান হাতে রুমাল বা কাপড়ের আঁচল তুলে মুখ মোছার ভান করেন, কখনও অকপটভাবেই মুখে কাপড় চাপা দেন।

হেসে ফেলে আঁচল টেনে চাপা দিয়ে বললেন, আমার কিন্তু বেশ লাগত ঠাকুরজামাই। মনে-মনে গরবিনী-গরবিনী ভাব একটা আমার দেমাক বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে আমার ঢঙ বেড়েছিল, ছলাকলা বেড়েছিল। আমি যেন পদ্মপত্রে জলের মত টলমল করে নেচে বেড়াতাম। কথাগুলো আমার নয়। কথাগুলো আমার মাসীর ঝির। ঝিটার নাম ছিল সত্যবালা সে আবার মধ্যে-মধ্যে ছড়া কাটত। অশ্লীলতা ঘেঁষা ছড়া।

আমি মুখ টিপে হাসতাম।

এরই মধ্যে একদিন অমৃতবাবু আমাকে চিঠি লিখলেন। একখানা চিঠি বের করে খুলে ধরে বললেন—আরম্ভ করেছেন 'স্নেহের মণিমালা' সম্বোধন দিয়ে; শুরু করেছেন বেশ—এরপর পড়ে গেলেন, "অনেকদিন হইতে তোমাকে লিখিব-লিখিব করিয়াও লিখিতে পারি

নাই। কোথা হইতে কে বা কি যেন আমার কলম চাপিয়া ধরিত ; লিখিতে পারিতাম না। বিশেষ করিয়া তুমি পুলিশ অফিসার সুরেনবাবুকে যাহা বলিয়াছ, তাহা শুনিয়া অবধি আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, আমার সারাজীবনটাই যেন অকস্মাৎ এক মুহূর্তে বদলাইয়া গিয়াছে। আকাশের রঙ বদলাইয়াছে, মাটির চেহারা পাল্টাইয়াছে, বাতাসের স্পর্শ পাল্টাইয়াছে, সারা জীবনের মানে পাল্টাইয়াছে। মধ্যে-মধ্যে নিজেরই যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি, ইহা মায়া নহে তো ? ইহা ভোজবিদ্যার খেলা নহে তো ? আমি দিবাস্বপ্ন দেখিতেছি না তো ? ইহা কি সত্য হইতে পারে ? তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ ? আমি যৌবনের প্রায় শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তুমি সদ্যকুসুমিত যৌবনের মাধবীকুঞ্জে মঞ্জু-বিকচ কুসুমপুঞ্জ ; তুমি আমাকে ভালবাসিয়াছ ? ইহা যে আমার স্বপ্নের অতীত। ইহা যে আমি কখনও কল্পনাও করি নাই।"

আবার মুখে কাপড় চাপা দিলেন মণিবউদি। এবং এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—এ যে কত আছে কি বলব আপনাকে ? পাঁচ পৃষ্ঠা চিঠি, মূল্যবান কাগজ, সুন্দর করে লিখতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাতের বাংলা লেখা এত খারাপ যে রীতিমত প্রাচীন-লিপি উদ্ধার করার মত কষ্ট করে পড়তে হয়। কথা কিন্তু ওই একটা বা দুটো, যে যেমন হিসেব করে ধরে আর কি।

ওই—"ইহা কি সত্য ? তুমি আমাকে ভালবাস ?"

পরিশেষে বক্তব্য আছে কিছু। চিঠিখানা সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। লিখেছেন—"রত্নমালা এখন চাহিতেছে যে, এই চুরির সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি উপরে বলিয়া-কহিয়া চাপা দিয়া দিই। তুমি নিশ্চয় জান যে মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে আমার জানা-শোনা আছে। দুই-চারিজন বন্ধু-বান্ধবও আছেন। স্বয়ং হুকসাহেব আমাকে স্নেহ করেন। আমি বলিলে কথাটা থাকিবে বলিয়া আশা করি। এখন সবই নির্ভর করিতেছে তোমার সম্মতির উপর। তুমি সম্মতি দিলে ব্যাপারটা আমি চাপা দিয়া দিব। রত্নমালা যে হাঙ্গামায় পড়িয়াছে তাহা হইতে সে উদ্ধার পাইবে।

অবশ্য তোমার গহনাগুলি গেল। ক্যাশসার্টিফিকেট উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিব। গহনার জন্য দুঃখ করিও না। তোমার জন্য বিধাতা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন।

তুমি ইহাতে সম্মতি দিলে আমি ব্যাপারটা চাপা দিব, বিনিময়ে রত্নমালা তোমার এবং আমার জীবন হইতে সরিয়া যাইবে।"

নয়

এই পর্যন্ত ব'লে মণি-বউদি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। যেন ভেবে নিচ্ছিলেন। সেদিন তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে। আমি এবার একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। গোড়ার দিকটা বেশ ভাল লেগেছিল কিন্তু এতক্ষণ ধরে বলার পর যেন তেমন কোন জমাট কিছু পাই

নি বলে আর ততটা ভাল লাগছিল না।

একটি তিরিশ-উর্ধ্বা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একটি কিশোরী বা সপ্তদশী সদ্যযুবতীর এই দ্বন্দ্ব যতটা কৌতুকজনক হোক না কেন তার থেকেও যেন বেশী বিয়োগান্ত, বেদনাদায়ক। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমি মণি-বউদির মাসীর জয় হলেই খুশী হতাম। মণি-বউদির জয় হয়েও তো জয় ঠিক হয় নি, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মণি-বউদি নিজে সুখী হন নি। সুখী হবার কথাই যে নয়। একটি সপ্তদশ বসন্তের মালার পক্ষে উপযুক্ত কণ্ঠদেশটির বয়স তিরিশের নিচেই হওয়া উচিত।

আমি উঠে আসতে চাচ্ছিলাম।

মণি-বউদি হঠাৎ বলতে শুরু করলেন—বললেন—পাড়াগাঁ অঞ্চলে একটা কথা আছে, লোকে বলে—সতীনের হাড়ে মেয়ের জন্ম। তার মানে মায়ের ভাগ্যে মেয়ে হিংসে করে। মায়ের গয়না হলে মায়ের ননদ বা জায়ের হিংসার কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না কিন্তু মেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যায়—আমার কই? আমার কই? আমি নেব। বাবা মাকে আদর করলেও মেয়ের হিংসে হয়। মেয়ের বিয়ে হলে দিনকতক মা মেতে ওঠে মেয়েকে নিয়ে। ক্ষেত্রবিশেষে মায়েও মেয়ের হিংসে করে বলেই আমার বিশ্বাস ঠাকুর-জামাই। মাসীর কথা তো শুনছেনই। এবং মেয়ের সব থেকে বড় শত্রু পুরুষ নয়, খাদ্যখাদক সম্বন্ধ হলেও নয়; মেয়ের সব থেকে মারাত্মক শত্রু হল মেয়ে।

আমি—; মণি-বউদি বললেন—আমি ওঁর চিঠি পেয়ে মাসীর এই লাঞ্ছনায় এবং তার পরাজয়ে আশ্চর্য রকমের খুশী হয়ে উঠেছিলাম। আজকাল লোকে বলে 'ভীষণ আনন্দ' হয়েছে, তা আমার ক্ষেত্রে সেদিনের সে আনন্দ সত্যি সত্যিই ভীষণ আনন্দই ছিল। সেই ভীষণ আনন্দটুকু আশ্চর্য রকমের রোমান্টিক করে তুলেছিল, আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়—আমার মেসোর বয়সী অমৃতবাবুর ওই বিহ্বল প্রেম-নিবেদন, কি বলব আপনাকে; দুটো আনন্দ মিলিয়ে সে যেন আনন্দের তাল-বেতাল-সিদ্ধির আনন্দ অনুভব করেছিলাম; সর্বাঙ্গে যেন খুশি কানায়-কানায়-ভরা সরোবর-দীঘির মত টলমল করছিল, একটু নড়াচড়া করতে গেলেই উছলে পড়ে চারি পাড় বা চারিপাশকে ভিজিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছিল।

এখানেই একবার একটু থেমে আমার মুখের দিকে সঙ্কোচহীন প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বললেন—আপনাকে আজ পরম বন্ধুর মত মনে হচ্ছে নন্দাই—কোন কথা গোপন করব না আপনার কাছে। সেদিন আমি চার পাঁচবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে কটাক্ষ হেনেছি এবং উল্লাসে হেসে প্রায় ভেঙে পড়েছি। বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে একবারও পরসাদের কথা ভাবি নি বা একবারও মনে হয় নি যে, অমৃতবাবু আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়, মাথার চুলে তার পাক ধরেছে এবং সামনের দিকটার চুল বেশ পাতলা হয়ে এসে টাক ফেলছে। অসাধারণ মজা লাগছিল, এতবড় একটা মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে লাল হয়ে যাচ্ছে, বোকা হয়ে যাচ্ছে, ছেলেমানুষির আর শেষ রাখছে না।

থাক। সে সব অনেক কথা। আপনি যদি এই নিয়ে একটা নাটক লেখেন তবে আমার কাছে বসবেন খাতা কলম নিয়ে; আমি বলব আপনি লিখে নেবেন। তারপর মেজেঘষে নিলেই সে যেমন রিয়েল হবে তেমনি সাহিত্যও হবে। এবং নাটকও হবে। একটু থামলেন আবার। একটা চিন্তা থেকে চিন্তান্তরে এলেই যে ভাবান্তর হয় তাতে এই হঠাৎ ছেদের প্রয়োজন আছে। ইলেকট্রিক পাখার সুইচ অনই করুন বা অফই করুন একটা শব্দ হবেই। ওইটেই ছেদ। একটু থেমে বললেন—কিন্তু মাসীর উপর শোধ নিতে যে কি নিষ্ঠুর হয়েছিলাম তা আজ যখন ভাবি তখন নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই। যেমন করে ঈশপের গল্পের ছেলেরা ব্যাঙ নিয়ে খুঁচে খুঁচে আমোদ করেছিল ঠিক তেমনি ভাবে। খুঁচে খুঁচে তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলাম। এতটুকু মায়া হয় নি। উল্টে আনন্দ হয়েছিল।

না, ঠাকুর-জামাই, ভুল বললাম। মাসী, আমার ব্যাঙ ছিল না, আমিও ছেলেমানুষের ছেলেমি করি নি। মাসী ছিল আমার সাপ আমি ছিলাম বেজি। না, ঠাকুর-জামাই, ঠিক বলা হল না। বেজীতে সাপে লড়াইয়ে যে হারে সে বেঁচে থাকে না, তাকে মরতে হয়। মাসী শেষ পর্যন্ত মরে নি। আজও তার জন্যে পাগলা গারদের খরচ যোগাচ্ছি। উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে। বিশাল একটা মাংসস্তূপ। এ-ই মোটা হয়েছে। এবং—।

বলতে বাধছে মুখে।

জীবনের তার সব চলে গেছে, আছে শুধু জীবনের যা অশ্লীলতা তাই। যত দিন যাচ্ছে তত যেন পচে ফুলে, আয়তনে বাড়ছে।

থাক। এ হল অনেক পরের কথা। সে সময় অমৃতবাবুর পত্র পেয়ে—। পত্রখানা নিয়ে এসেছিল অমৃতবাবুর আরদালী। পত্রখানা দিয়ে বললে—উত্তর নিয়ে যেতে বলেছেন। বাড়ীর বাইরে তখন ইনস্‌পেক্টর বসে আছে, মাসীর সঙ্গে চুরি সম্পর্কে তদন্ত করছে।

অমৃতবাবুর নিজের লেখা চিঠিখানার সঙ্গে আমার মাসী তাঁকে যে চিঠিখানা লিখেছিল সেখানা একাধারে বিগলিত প্রেমপত্র এবং সকাতর মার্জনা ভিক্ষার স্বীকারোক্তি বহন করছিল, যেখানা পড়ে শোনালাম আপনাকে, সেখানকারও একখানা নকল ছিল। সম্ভবতঃ আমাকে অমৃতবাবু যে প্রেম নিবেদন করেছিলেন তার অকপটতা প্রমাণের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আমার অমতে তিনি প্রথম যৌবনের অঙ্গরঙ্গ বান্ধবীকেও ক্ষমা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমার প্রতি তাঁর অনুরাগের গভীরতার প্রমাণ দেবার জন্য জীবনের গোপনতার তলদেশ থেকে প্রেমপত্রখানা তুলে পাঠাতে চেয়েছিলেন বোধ হয়।

একটু বেশী হেসে ফেলে বললেন—প্রেমে পড়লে মানুষ বোকা হয়ে যায়। প্রেমিকার কাছে সিনসিয়ারিটি প্রমাণ করা তো সহজ কথা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে—আমার উল্লাস। এবং চাইতাম কি জানেন—চাইতাম কোন-না-কোন ছুতোতে একটু আলুথালু চুলে ও পোশাকে ওঁর সামনে পড়ে গিয়ে জিভ কেটে সলজ্জিতা হয়ে থমকে দাঁড়াতে।

এমনি অবস্থার পটভূমিতে চিঠিখানা পেলাম। মাসীর লেখা চিঠিখানা (অমৃতবাবুকে

লেখা) পড়ে মন বলে উঠল—হেরে গেছে, হেরে গেছে, মাসী রাক্ষসী হেরে গেছে।

শুধু হেরে যাওয়া নয়; মাসী হাতজোড় করলে। হাতজোড় করিয়ে আমি ছাড়লাম। মাসী কথা বলছিল থানা অফিসারের সঙ্গে। আমি ঝিটাকে বললাম—একবার মাসীকে ডাকো। বল খুব জরুরী দরকার। খুব জরুরী।

মাসী আসতেই তাঁর লেখা চিঠির সেই নকলখানা তাঁকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম—অমৃতবাবু এই চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়েছেন, আর আমাকে লিখেছেন—আমি রাজী থাকলে উনি এ ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দেবেন। আমি কি বলব? কি লিখবো? তুমি যদি বল—মণি, তুই চাপা দিতে বল, আমি তোকে বলছি—তা হ'লে তাই বলব আমি। কিন্তু নিজে থেকে তুমি না বললে আমি তা বলব না।

মাসী হতবাক হয়ে নিষ্পলক চোখে আমার দিকে শুধু তাকিয়েই ছিল, কিন্তু সে তাকানোর মধ্যে কোন ভাষা ছিল না। সে যেন বোবা চাউনি। শুধু বার কয়েক তার নিচের ঠোঁট দুটি খুব সূক্ষ্ম কম্পনে কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আমি চোখ নামিয়ে একটু অপেক্ষা করে বলেছিলাম—মাসী?

মাসী বলেছিল—বেশ তাই বলছি।

আমিও তাই লিখলাম। এবং হলও তাই। কেসটা ধামাচাপা পড়ল।

বউদি বললেন—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ঠাকুর-জামাই যে, দেশের কর্তা মহলে ওঁর জানাশোনা আছে। হক সাহেব ওঁকে স্নেহ করতেন; উনি বলে ক'য়ে চাপা দিলেন ব্যাপারটা। কিছু যেন নগদও খরচ করেছিলেন। আমার গয়না গেল, ক্যাশ সার্টিফিকেটেরও হদিশ হল না; কিন্তু উনি লিখলেন—আমার সর্বস্বই তোমার। গহনার জন্য ক্ষেদ করিও না।

আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন মণিবউদি; মুখে কাপড় দিয়ে হাসি ঢেকে বললেন—নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—চল্লিশ বছরের আধটাকপড়া অমৃতবাবুর যথাসর্বস্ব বিষয়সম্পত্তি সম্পদ সঞ্চয় থেকে হৃদয় পর্যন্ত সব কিছু ঝপঝপ করে এসে পড়ল এই অষ্টাদশী দেখনহাসি মণিমালার চরণতলে।

মাসখানেকের মধ্যে পত্র মারফতে আমাদের, কি বলব;—মন দেওয়া-নেওয়াই বলি, মন দেওয়া-নেওয়ায় পালাটি সুশেষ হয়ে গেল। অপেক্ষা রইল আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার। আঠারো বছর পূর্ণ হলেই আমি সাবালিকা হব। তার আগে হাতে হাতে বন্ধন হতে গেলে মাসী হয়তো অভিভাবিকা হিসাবে সে বাঁধনে কোপ মারতে পারে এই আশঙ্কায় অপেক্ষা করাই স্থির হয়েছিল। অমৃতবাবু, আপনার শ্যালকটি—আমার থেকে কুড়ি বছরের বড়—এবং তখন তাঁর বয়স এসেছে যৌবনের ওপারের সিংহদরজার কাহাকাছি; আমার মত পূর্ণ সপ্তদশীর রূপযৌবনের প্রতি লালসা এবং লোভ যথেষ্টই ছিল, প্রেম-পত্রে প্রেমের কথা লেখবার সময় দিশাও হারাতেন, তবুও বলব লোকটি সুস্থির মানুষ, যাকে বলা হয় ধীর এবং

বিচক্ষণ তাই। তিনি নিজেই অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

মাসীর কাছ থেকে মাসখানেকের পরই আমার স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থা করলেন। স্থির হল আমি এর পর থাকব Y. W. C. A. ইয়ং উয়োমেনস কৃশ্চান এ্যাসোসিয়েশন বোর্ডিং-এ।

মাসী আমার তখনই দু' চারটে কথায় ও কাজে পাগলামির পরিচয় দিতে শুরু করেছে। কিন্তু তখন আমরা কেউই সেটা বুঝতে পারি নি।

হঠাৎ মাসী আমার পদাবলী কীর্তন গাইতে শুরু করলে। একদিনের কথা বলি—ক'দিন থেকেই আমার ঘর থেকেই শুনতাম মাসী কীর্তন গাইছে। সেকালে তখনও পান্না কীর্তন-ওয়ালীর "ও কুব্জার বন্ধু। কেমন করে পাসরিলে রাই-মুখ-ইন্দু?" গানের রেকর্ডখানার যথেষ্ট সমাদর ছিল দেশে। যাদেরই গ্রামোফোন ছিল তারাই ওখানা রাখত। এবং কীর্তনের কথা উঠলেই লোকের ওখানার কথা মনে পড়ত। প্রথম দিন ওই দু' লাইন কানে এসেছিল, কিন্তু মনে এমন কিছু হল না বা হয় নি। তখন আমি যেন খানিকটা কেমন-কেমন হয়ে গেছি, বেশ অনুভব করছি যে, মাসীর দড়ি ছিঁড়ে ফেললেও ঠিক মুক্তি পাই নি। মনে হচ্ছে যেন আর একটা শেকলে বাঁধা পড়ছি। অমৃতবাবু তখন প্রত্যেকদিন একবার করে আসছেন। বাইরের ঘরে ব'সে আমার সঙ্গে দু' চারটে কথা বলে যাচ্ছেন। নিতান্ত সাধারণ কথা, তারই মধ্যে কয়েক বার লাল হয়ে যাচ্ছেন, তোৎলার মত কথা আটকাচ্ছে।

—কেমন আছ?

—কিছু দরকার টরকার থাকে তো বল?

—চল না একদিন মার্কেটে গিয়ে পছন্দ করে কাপড়-চোপড় কিনে আনব।

—ভাদুড়ীমশায়ের সীতা দেখে আসি চল। যাবে?

এখানে মাসীর কথা উঠত। আমিই বলতাম—অভ্যাসবশে আপনা থেকেই যেন বলে ফেলতাম—মাসীকে বলুন।

হেসে অমৃতবাবু বলতেন—কেন? কি প্রয়োজন? তবে তুমি চাও তো বলতে পারি। সঙ্গে নিতে চাও? সে কিন্তু ঠিক হবে না।

বিচিত্রভাবে অমৃতবাবুর ভিতর থেকে সনাতন পুরুষ তার অকৃত্রিম চেহারা নিয়ে সবল মুঠিতে প্রথমে আঁচল তারপর হাত, তারপর দু'হাতে ঝাপটে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি খানিকটা অসহায়ভাবে, খানিকটা পুলকিত-তনু হয়ে আত্মসমর্পণ করলাম।

ভালই লেগেছিল নন্দাই। অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। একটি সদ্য-উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ের কাছে বোধকরি এর থেকে মিষ্ট এবং কাম্য আর কিছু নেই। এই সনাতন, এই শাশ্বত।

মাসী রত্নমালা যেদিন বাপের বাড়ীর সম্বন্ধ কাটিয়ে প্রেমে তপস্বিনী হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল সেদিনও এই সনাতন, এই শাশ্বত আকর্ষণেই এসেছিল। কিন্তু মাসীর এই পরিণামের কথাটা আমাকে ভয় দেখায় নি, আমি তাতে ভয় পাই নি।

কবিরা অবশ্য মেয়েদের রূপকেই বলেন আগুনের শিখা।

বেটাছেলেদের বলেন পতঙ্গ।

বলেন, পুরুষেরাই পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখা পুড়িয়ে মরে। কিন্তু না, বেটাছেলেরাই আগুন—মেয়েরাই পতঙ্গ। মেয়েরাই পুড়ে মরে।

হঠাৎ হেসে বললেন—আপনার শ্যালক থিয়েটারে সীতা দেখতে গিয়ে এই কথা বলে অভিযোগ করেছিলেন। মেয়ে জাতটাই হল আগুন; পুরুষ জাতকে পুড়িয়ে মারবার জন্যে বিধাতা এই আগুন জেলেছেন সৃষ্টির আদিতে। আজও তাই করে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম—না। আগুন তোমরাই। তবে নেহাতই যদি জোর কর তাহলে বলব—মেয়েরা আগুন যেকালে ছিল—ছিল; একালে তারা পুরুষদের হাতের কৌশলে দেশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়েছে। সেও নেহাৎ সিগারেট ধরাবার জন্যে।

উনি হেসে বলেছিলেন—তুমি এমন কথা বল যে অবাক হয়ে যাই।

আমি হেসে বলেছিলাম—তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী। আমি অবাক হয়ে শুনি—কেবল শুনি।

আমার হাতখানা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে উনি বলেছিলেন—চল এখান থেকেই যাই কালীঘাট। মায়ের প্রসাদী সিন্দুর—।

আমি ভয় পেয়েছিলাম এতক্ষণে। বুঝতে পেরেছিলাম শার্দুলের ঘুম ভেঙেছে। মনে মনে পিছিয়ে এসে বলেছিলাম—না। আমি পড়ব। অন্ততঃ আই-এটা পাশ করতে দাও আমাকে—তার আগে না।

উনি চুপ করে বসেছিলেন। বুঝতে পারছিলাম নিজেকে সংযত করছেন। আমি ভয়ে ঘামছিলাম।

কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—বড্ড ঘামছ তুমি।

আসল সত্য ঢাকবার জন্য হ্যাঁ বলে এড়াতে চেয়েছিলাম। হাতখানা একটু টেনেও ছিলাম। তিনিও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম।

কথাগুলো হচ্ছিল থিয়েটারের বক্সে বসে।

এত-কথা এমন করে বলছি কেন জানেন। বলছি এই জন্যে যে এখনও আমি ঠিক যাচাই করে বুঝতে পারিনি কেন এমনভাবে ওঁর সঙ্গে লুকোচুরির মত খেলা খেলেছিলাম।

সবটাই কি মাসীর বন্ধুকে কেড়ে নেবার জন্যে?

কখনও মনে হয় তাই। হ্যাঁ, রত্নমালা মাসীর পরিণত যৌবনের শতকামনার যে বন্ধুটিকে সে পুজোর আসনে বসিয়ে পুজো করেও পায় নি, তাকেই আমার সপ্তদশ বসন্তের একখানি বকুল মালার লোভ দেখিয়ে হাতছানি দিয়ে দিব্যি হাঁটি হাঁটি পা-পা করে হাঁটিয়ে আসন থেকে উঠিয়ে আনাই ছিল এ খেলার মূল কথা।

কখনও মনে হয়—না। তাই সব নয়। পুরুষের সঙ্গে এই খেলা খেলার মত সাধের খেলা, সুখের খেলা মেয়েদের আর নেই—আর হয় না। এতে একবার নামলে আর রক্ষা থাকে না। বাঁধবাঁধা জল যেমন একবার বাঁধ ভেঙে সরু একটি ধারায় বেরিয়ে যেতে শুরু

করলে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে ধারা গতিতে সবলা প্রবলা হয়ে ওঠে, দু'-কূলভাসিনী হয়ে তরঙ্গিনী হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই আমিও সেদিন ক্রমশঃ প্রগল্‌ভা হয়ে উঠেছিলাম—আর তখন পিছনের ডাকে ফেরার উপায় নেই।

আবার চুপ করে গেলেন বউদি। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—সেইদিনই থিয়েটার থেকে বাড়ী ফিরে শুনলাম মাসীর ঝি বললে—মাসী নাকি পাগল হয়ে গেছে। ব্যাটাছেলের মত কাপড় পরে বসে আছে, বলছে—আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি। আমি কৃষ্ণ হয়ে গেছি।

আড়াল থেকে চোখে দেখলাম।

কানেও শুনলাম। অনেক অশ্রাব্য কথার সঙ্গে অনেক গান কীর্তন—পদাবলী।

পরের দিনই আমি চলে গেলাম হোস্টেলে।

মাসীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন অমৃতবাবু। কিন্তু কিছুই হয় নি চিকিৎসায়। দুবছর পরে মাসীকে রাঁচীতে পাঠিয়ে তবে আমাদের বিয়ে হল। তবে এই দু বছরের ভেতর মধ্যে মধ্যে মাসী বেশ ভালই থাকত; সে একেবারে ভাল থাকার মত ভালো। তখন আমার নামে নানান কলঙ্ক রটিয়ে আমাকে নামজাদা কলঙ্কিনী করে তোলাই ছিল তার একমাত্র কাজ। এইটিই ছিল তার পাগলামি।

অমৃতবাবুর আত্মীয়দের সকলকেই সে জানত। তাদের জনে জনে চিঠি লিখে আমার কলঙ্ক-কথা জানিয়েছিল।

কলঙ্ক পরসাদের সঙ্গে।

কলঙ্ক কমলকুমারের সঙ্গে। কমলকুমারও তখন এসেছে, ওঁর বাড়ীতে থাকে। আরও অনেকজনের সঙ্গে অনেক কলঙ্ক।

•

১৯৪২ সালের সেদিন রাত্রে মণি-বউদির কাহিনীতে এইখানেই ছেদ পড়েছিল।

রাত্রি তখন অনেকটা হয়েছিল।

প্রায় এগারটা। তিনি বলেছিলেন—তবে বুঝতেই পারলাম না ঠাকুরজামাই আমি সুখী না দুঃখী? অভাবটাই বা কিসের? কেন এমন ক'রে ফিরি? আপনি বলতে পারেন? আপনি তো লেখক! আমার মনটা পড়ে দিতে পারেন?

আমার মনে সেদিন নানান কথা ঘুরপাক খেয়েছিল। কিন্তু বলতে সাহস করিনি। অথবা মণি-বউদিকে এমন কোন আঘাত দিতে চাই নি যা শকথেরাপীর কাজ করে। এই এক ধরনের পাগলামির মধ্যে বেশ আছেন। কাজ নেই তাঁর ভাল হয়ে।

আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম।

মুহূর্তে মণি-বউদি পাল্টে গিয়েছিলেন, মুচকি হেসে বলেছিলেন—নষ্ট চাঁদ দেখলে—আপনার নামে মিথ্যে কলঙ্ক হবে।

বুঝলাম ইঙ্গিতটা। মণি-বউদির তারিফ করলাম ওঁর বাকশক্তির জন্য এবং ওঁর এই অতি-

সহজ ললিত-রাগ-বিভোর চিত্তের জন্য। ইচ্ছে হ'ল বসে কথাগুলো বলে যাই। কিন্তু ভাগ্যে বলি নি। ওঃ কিছুদিনের মধ্যেই মণি-বউদিকে আবার যে নূতনরূপে দেখলাম—! মনে হ'ল মণি-বউদি বহুরূপা। বহুরূপী অর্থে নয়। সত্য অর্থে।

দশ

মণি-বউদিকে যে কারণে বহুরূপা বলছি তা হল এই—

যে মণি-বউদিকে, ভর্তিহুপুরে কলকাতার জনবিরল পথে, গিন্নীবান্নীর মত হাতীপাঞ্জাপেড়ে তাঁতের শাড়ী ঢলকো ছাঁদে পরে, শান্তিনিকেতনী ঝোলা কাঁধে, ঠাকুরমন্দির, গঙ্গার ঘাট, ভাগবতপাঠের আসর, জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরতে দেখেছি, আবার যাকে নিজের বাড়ীতে স্বামী অমৃতবাবুর নিমন্ত্রিত সংস্কৃতিবান, ধনবান, রাজনীতিক্ষেত্রের শক্তিমানদের মধ্যে ফেরতা দিয়ে আধুনিক ঢঙে সাজসজ্জা করে, বাঁকা ছাঁদে বেশ সুর করে প্যাঁচালো কথাবার্তা বলতে শুনেছি, সেই তাঁকেই একদা দেখলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে একজন বিলীতি বা আমেরিকান সাহেবের প্রায় অঙ্গলগ্না হয়ে উপর থেকে নীচে নেমে আসছেন। পোশাকে যা দেখেছিলাম, তা এর আগে আর কখনও মণি-বউদিকে পরতে দেখিনি। বগলকাটা, কাঁধকাটা, অর্ধেক বুক বের-করা জামা, রেশমী খস্‌খসে কাপড়, যার আঁচল ক্ষণে ক্ষণে কাঁধ ও হাত থেকে খসে খসে পড়েছিল, পায়ে শৌখিন নাগরা, এবং চোখে গাঢ় কালো গগল্‌স্—এই ছিল সেদিনের পোশাক; চুলের প্রসাধনও ছিল অদ্ভুত যার নাম আমি ঠিক জানি না। এবং তাঁর সারা অঙ্গ থেকে নির্গত প্রসাধনের সুরভির সঙ্গে একটা তীব্র অন্য গন্ধও মিশ্রিত ছিল—যেটা আমার মনে হয় তাঁর নিশ্বাস এবং দেহের রোমকূপ থেকে বের হচ্ছিল।

কালটা ১৯৪৪-এর প্রথম। ১৯৪২-এর সেই সেপ্টেম্বরের চন্দ্রালোকিত রাত্রিটির পৌনে দু'বছর পর। এই পৌনে দু'বছরের জীবন-নদীতে যত জল প্রবাহিত হয়েছিল, এবং তার তীব্র তরঙ্গভঙ্গে দুই কূলে যত ভাঙাগড়া ঘটেছিল, তার জোয়ারভাঁটা খেলা ভাগীরথীর বুকে প্রবাহিত হয়নি কিংবা তার দুই কূলে অত ভাঙাভড়া ঘটেনি।

সে-ভাঙাগড়া আমার জীবনের ভাঙাগড়াও বটে এবং অমৃতবাবু মণি-বউদির জীবনের ভাঙা-গড়াও বটে। ওই 'দুই পুরুষ' নাটকের পর থেকে যে খ্যাতি প্রতিষ্ঠার দ্বীপ গড়ে উঠল তার উপর ছোটখাটো দালানকোঠারও পত্তন হয়ে গেল। ওই সেপ্টেম্বরের রাত্রিটির মাসচারেকের মধ্যেই দুই পুরুষের শততম রাত্রির উৎসবের দিনে একদিকে বোমা পড়ল, অন্যদিকে আমার ভাগ্যে দুই পুরুষের সিনেমা কণ্ট্যাক্ট সই হয়ে গেল। দুই পুরুষের শততম রাত্রিতে মণি-বউদি এবং অমৃতবাবুকে প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা আসেন নি; একটা ফুলের তোড়া এবং একখানা পত্রে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভাষাটা ছিল ইংরেজী মিশানো, ইংরাজী অংশটুকুর গড়ন-বৈচিত্র্যের জন্য আবছা আবছা মনে আছে। আমার সাহিত্যকর্মকে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিলেন—

Congratulations for first century—go on completing another hundred not out.

এ-পত্রখানা অমৃতবাবুর। মণিবউদির পত্রও একখানা ছিল, সেখানা খুবই বিচিত্র। কমলকুমার এবং আর একজন লম্বা শক্ত-সবল দেহ হিন্দুস্থানী এসেছিল ওঁদের চিঠি এবং তোড়া নিয়ে। ফার্স্ট রো-এর পরই সেকেণ্ড বা থার্ড রোয়ের টিকিট কেটে দুই পুরুষ দেখে গিয়েছিল। বলেছিল, ওঁরা দিল্লি চলে গেলেন।

কমলকুমার বলেছিল, বড় কাজ ধরেছেন। একেবারে মিলিয়নেয়ার হয়ে যাবেন।

হিন্দুস্থানীটিই লছমন প্রসাদ। সে এসে ছিল তিন ঝুড়ি ফুল নিয়ে, গোলাপ ক্রিসেনথামাম; যার সবই ওঁরা নিয়ে গেছেন দিল্লী, বড়দিনের বাজার তখন সামনে। দিল্লীতে ভেট দেবেন। তারই মধ্য থেকে কিছু ফুল এবং পাতা দিয়ে একটা তোড়া বেঁধে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওঁরা। এসব আমার ভাল লাগেনি, তবে বউদি একখানা চিঠি দিয়েছিলেন লছমন-প্রসাদের হাতে। সে এক সময় আমাকে কমলকুমারের অগোচরে চিঠিখানা হাতে দিয়ে বলেছিল—ইয়ে চিঠ্‌ঠি তো দিদি আপকে দিলেন।

খামখানা সুদৃশ্য এবং সুরভিত।

খুলে দেখলাম, দুটি ছত্রে লেখা একখানি পত্র। প্রথমেই পদাবলীর কোটেশন—"তোমারই গরবে গরবিনী হাম।" তারপরই লেখা—'কিন্তু ভাগ্যে নেই। কি করব? দিল্লী যাচ্ছি। ইতি—বউদি। ভাল লাগল, বিশেষ করে পদাবলীর উদ্ধৃতিটুকু। কিন্তু এর মেকীত্ব কতটা তা আমার অজানা ছিল না।

দুই পুরুষের সেন্টিনারির পর আর দেখা একরকম হয়নি ওঁদের সঙ্গে। তবে তার আগে দেখা হয়েছিল। যার ফলে আর আমার আকর্ষণ বিশেষ ছিল না। কিন্তু সে থাক।

অমৃতবাবু দিল্লীতে আপিস খুলেছিলেন, বাসাও করেছিলেন ওখানে। কলকাতায় আসতেন-যেতেন; সে যাওয়া-আসা ভি-আই-পি পদচিহ্ন-লাঞ্ছিত মার্গ ধরে যাওয়া-আসা। কখনও-সখনও খবর পেতাম, কখনও পেতাম না; তবে দু'চারবার তত্ত্বতল্লাসের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছি। এর মধ্যে আমার মেয়ের বিয়ে গেছে, বড় ছেলের বিয়ে; নেমন্তন্নপত্র আমার দিক থেকে করা হয়নি; আপত্তি ছিল অন্দর মহলের। গৃহিণী বলেছিলেন—দেখ, কুলীনের জ্ঞাতিত্বের দাবী, মরলে অশৌচ হয়। তিনদিন কোনরকম মাছটা না খেয়ে থাকে; আগে দাড়ী-গোঁফ কামাত না; এখন এইসব আপিসী সভ্যতার যুগে একদিন বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দিনে নিজে কামিয়ে নিয়ে চান করলেই অশৌচ চলে যায়। জ্ঞাতাশৌচে তো খবরই দেয় না। অন্নপ্রাশন, বিয়ে এসবে কোন দায়ই নেই। কুটুম্বিতে রাখলে থাকে, না-রাখলে থাকে না। আত্মীয় হিসেবে আত্মীয় মেনে তোমার সঙ্গে ওরা আলাপ করেনি। যেচে আলাপ করেছে লেখক হিসেবে। নেমন্তন্ন করেছে, গিয়েছ,—বেশ হয়েছে। আর থাক। তুমি আর নেমন্তন্নের ছেঁড়া চুলে বিনুনি পাকিয়ে খোঁপা বাঁধার মত ঝুটো সম্পর্ক পাকিয়ো না বাপু। আমার সম্পর্কে ওর সঙ্গে সম্পর্ক—আমারই তা সইবে না। আমার যারা সত্যিকারের আত্মীয়

তারা ওদের ভাল চোখে দেখে না। ভাল লোকও ঠিক নয়। তাছাড়া আমাদের ছেলেমেয়ে আছে, ওদের ও-পাট নেই। ছেলে বলতে অমৃতদা, মেয়ে বলতে দেখনহাসি মণিবউদি। ওরা আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নৌকুতো দেবে, বিশেষ করে আমার সত্যিকারের আপনজনদের ছোট করবার জন্যে বেশ দেখানো করে দামী জিনিসপত্তর দেবে—আমরা নিয়ে খেয়ে থাকব তো! শোধ দেব কখন! কাজ তো হবে দুটো।

কথাটা চরম কথা। দুটো কাজ অর্থে ওঁদের দুজনের দুটো পারলৌকিক ক্রিয়া, শ্রাদ্ধ। এবং তাও অত্যন্ত অনিশ্চিত, কারণ আমার ঐ ক্রিয়াটা আগে হয়ে যেতে পারে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

গৃহিণীর কথাগুলি যেমন নিষ্করুণ, তেমনি সত্যও বটে। আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠালে ওঁরা যে ঐশ্বর্যের ঘটা ও ছটা বিকীর্ণ করে দেখনসাহী উপঢৌকন পাঠাতেন তাতে সন্দেহ নেই। এবং সেও পাঠাতেন হৃদয়ের কোন প্রেরণায় নয়, পাঠাতেন আমাকে এবং আমার অন্য আত্মীয়জনকে চমৎকৃত করবার জন্য। তার সঙ্গে হেয় করবার প্রচ্ছন্ন বাসনাও যে তার মধ্যে থাকত না এমন কথাই বা কে হলপ্ করে বলবে?

"এইটেই ওদের ধারা।" আমাদের আপ্না-আপ্নির মধ্যে অর্থাৎ জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে বলা-কওয়া হয়—"এটাই অমৃতদের ঢঙ। ওই বউটার যেমন ঠমক!"

কথাটা মিথ্যে নয়। এর মূলে ছিলেন মণিবউদি। অমৃতবাবু নয়। অমৃতবাবুর উচ্চ-নাসাপনা ঠিক ঐশ্বর্যের ঘটার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। গোড়ার জীবনে তাঁর তো ঐশ্বর্য ছিল না। ঐশ্বর্যবানদের প্রতি এই বিদ্বান ও সেবাব্রতী ব্যক্তিটির অবজ্ঞা, এবং উদ্ধত বিদ্রোহী আচরণের ভিতের উপরেই ছিল তার প্রতিষ্ঠা। তার উপর ছিলেন কুমার ব্রহ্মচারী। আমাদের দেশে কুমারদের খাতির তো শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব এবং বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব থেকেও বেশী।

মণিবউদি আসতেই কুমারত্ব খিড়কীর দরজা দিয়ে নির্গত হল। বাকি রইল বিদ্যারত্ন এবং দেশপ্রেম, ও দুটোকেও মণিবউদি বিদেয় করলেন বাড়ীর পুরানো রাঁধুনী এবং চাকরটার-মত।

এ-উপমা উপমার জন্য বানিয়ে বলছি না। সত্যি সত্যিই তাই ঘটেছিল। মণি-বউদি ঠিক তাই করেছিলেন। আই-এ পরীক্ষার পরই ওঁদের বিয়ে হয়ে গেল। পরীক্ষার ফল বের হবার প্রতীক্ষাও করেননি অমৃতবাবু। অমৃতবাবুর মনোপিঞ্জরে বন্দী ক্ষুধিত শার্দুল খাঁচাটা ভেঙে ফেলেছিল। বিয়ের পর মণি-বউদি স্বামী গৃহে এসে প্রথম কিছুদিন অমৃতবাবু প্রমত্ততার ছোঁয়াচে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন, কোনদিকে তাকাবার অবকাশ পাননি। মাস আষ্টেক পর যখন খানিকটা ক্লান্তি এসেছে উভয়ের জীবনে এবং কাজের তাড়ায় টেনেছে অমৃতবাবুকে, তখন বাড়ীর দিকে তাকিয়ে মণি-বউদির মসৃণ ললাটে সারি সারি রেখা জেগে উঠল। বাড়ীটা যেন পরের দখলে। তিনি সিংহাসনে বসে আছেন—লক্ষ্মীর ঘরের আটনে নতুন পাতা লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মত, আর বাড়ীটার দখল নিয়ে বসে আছে অমৃতবাবুর পুরনোকালের রাঁধুনী কালীঠাকুর আর পশ্চিমা খানসামা রামধনিয়া। রান্নাশাল ভাঁড়ার ঘর এসবের মালিক ঠাকুর

এবং বাইরের দরজার মোটা তালাটা থেকে বাক্স প্যাটরা স্যুটকেস আলমারী এ্যাটাচি এ সমস্ত-কিছুর চাবিগুলোর জিম্মাদারী রামধনী চাকরের।

হুকুম খাটাতে গিয়ে তিনি বাধা পাননি, কিন্তু বিচিত্রভাবে অনুভব করলেন যে, এই লোকদুটো আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে দিয়েই তাঁর হুকুম এমনভাবে সংশোধন করিয়ে নেয় যে, তাঁর সংশোধিত ইচ্ছার সঙ্গে তাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোন তফাৎ থাকে না। শুধু তাই নয়—আরও তাঁর নজরে পড়ল যে, এরাই দুজনে অমৃতবাবুর আত্মীয়স্বজনদের খবরাখবর রাখে, এ-বাড়ীর খবর ও-বাড়ীতে দিয়ে আসে ওবং অমৃতবাবুর যেটুকু স্বাধীন ইচ্ছা, সেটুকু ওই ওদের ইচ্ছার মধ্যে থেকেই যেন প্রকাশ পায়।

মণি-বউদি বলেছিলেন, (১৯৪২ সালের ওই রাত্রে নয়, পরে, অনেক পরে একদিন)—একদিন ওদের দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম ঠাকুরজামাই। দেখলাম কি জানেন—দেখলাম ঘি দিয়ে রান্না হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম—উনি ঠাকুরকে বলেছেন, তেলের রান্না ওর সহ্য হচ্ছে না। উনি বললেন—হ্যাঁ, তেলের রান্নায় একটু অম্বল হচ্ছে কিন্তু ঘিয়ে রান্না করতে তো বলিনি। তবে আগে ওরা এইরকম করত। রান্না পাল্টাতো।

মণিবউদি এ নিয়ে কোন বিতর্ক না করে ঠাকুরটিকে বিহারে কারখানায় পিওনের চাকরী দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে জবাব দিয়ে বিদায় করেছিলেন। ওরা দূর হতেই অমৃতবাবুর আত্মসমর্পণ পূর্ণভাবে হল সম্পূর্ণ। মণি-বউদি নিজে নিলেন বাক্স, সুটকেস, আলমারি, এ্যাটাচির চাবীর গোছা। আরও করলেন। ছোট একটা ঘরে ইলেকট্রিক উনোন কিনে অমৃতবাবুর জন্যে ঘিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করলেন নিজের হাতে।

এইভাবে রত্নমালা মাসী থেকে পুরানো ঠাকুর-চাকর ছোট-বড় সকল প্রতীদ্বন্দ্বীকে দূর করে মণিবউদি যত সান্ত্বনাই পান, সুখ পেলেন না। শান্তিও না। সুখ কিসে তারও হদিস পেলেন না, শান্তি কোথায় তারও নিশানা, না।

এদিকে বছর-কয়েকের মধ্যে অমৃতবাবুর জীবনে যত বৈষয়িক উন্নতি হল, তত তিনি মডার্ন হলেন, তত তিনি ফ্যাশনেবল হলেন; তার সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে বাড়ল সংস্কৃতির কমলহীরের ঝলমলানী। সে-ঝলমলানী আর আদরিণী মণিবউদি—দুইয়ে মিশে এক হয়ে গেল। অমৃতবাবুর জ্ঞাতিগোষ্ঠি যারা এতকাল ধরে অমৃতবাবুর উচ্চনাসাত্বের জন্য বিরূপ ছিল, তারা এবার অমৃতবাবুকে ছেড়ে মণি-বউদিকে নিয়ে পড়ল, কারণ অমৃতবাবুর নাকের উপর এখন মণিবউ পাঁসনে' চশমার মত শোভা পাচ্ছিল। রত্নমালা পত্রযোগে তাদের কাছে যে-সব অপবাদের বাণ পাঠিয়েছিল, সে-সব বাণ তারা নিক্ষেপ করতে লাগল তার দিকে।

মণিবউদি এগুলি অবজ্ঞার বর্মে ঠেকিয়ে ভূতলশায়ী করে চলতেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ সংঘর্ষও বাধত। কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক স্থানে একত্রিত হবার সুযোগ হলেই মণিবউদি যুদ্ধের তুরঙ্গিণীর মত ঘাড় উঁচু করে পা ঠুকে হ্রেষাবর ছেড়ে চাঙ্গা হয়ে উঠতেন। এবং ঐশ্বর্যের ঘটা ও উচ্চ সংস্কৃতির ছটাময় উপঢৌকনরূপ বাণ

প্রয়োগে সকলকে আঘাত দিতে ও ঝলসে দিতে চাইতেন। এবং নিজেও আসতেন সেজেগুজে। সে সাজগোজে সোনা-রূপো, মণি-মুক্তোর কোন ছোঁয়াচ থাকত না। হাতে থাকত একহাত গালার চুড়ি, নয়ত কাচের চুড়ি। মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনী ঢঙের রূপোর গয়না পরতেন মণি-বউদি। এবং সেগুলো সবই সাঁওতালী গয়না। তার সঙ্গে দু-চারটে পাথর বসানো থাকতো। লাল এবং সবুজ পাথর। রুবি আর পান্না। মস্ত খোঁপায় এই এত বড় একটা রূপোর ফুল, তা থেকে কানে ঝোলান ঝুমকো। অবাক হয়ে দেখতে হত। কাজেই এটা সকলেই অপছন্দ করত। এই ধরনের আক্রমণাত্মক ঐশ্বর্য দেখানটা কারুর কাছেই ঠিক পছন্দের নয়। আমার গৃহিণীর যুক্তি সংক্ষিপ্ত হলেও তার অর্থ ছিল অনেক।

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির পর হয়ত আমার এই কথাটি ঠিক বিশ্বাস্য হবে না বলেই আর একটা দেখা হওয়ার কথা বলি। বোধ করি, অক্টোবরে; পূজোর আগে; বিয়াল্লিশের সেই ইতিহাস-বিখ্যাত সাইক্লোন তখনও সামনে। ওদিকে আগস্ট আন্দোলন ভারতবর্ষের অন্য সকল স্থানের জীবনকে চঞ্চল করে তুললেও কলকাতায় ইংরেজের সামরিক বাহিনীর চাপে মূর্ছাহত। আমার পূজোর কাজ শেষ হয়ে গেছে; তখন আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বই 'গণদেবতা' লিখছি। একদিকে লিখে কপি যোগাচ্ছি অন্যদিকে ছাপা হচ্ছে। বিন্দুমাত্র অবসর নেই। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যায় কেমন করে ওঁদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ঠিক বলতে পারি নে। তবে একটা সঙ্গত কারণ ছিল। সেটা হল—দিল্লীর বহু বিখ্যাত ঘণ্টেওয়ালার দোকানের 'সোহন হালুয়া'; এবং খস-খস আতরের একটা তত্ত্ব না তল্লাস সকালে এসে পৌঁচেছিল ওঁর কাছ থেকে। বাহক আর কেউ নয়, কমলকুমার। সে বলেছিল—"উনি মানে খুড়ী ফিরেছে কাল দিল্লী থেকে। এই সব জিনিস এনেছে। এখন আমার উপর অর্ডার হয়েছে দিয়ে এস ঘরে ঘরে পৌঁছে।"

ওঁদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে যখন খেয়াল হল যে, আমার চরণযুগল আমার অজ্ঞাত মানসের আদেশ বা নির্দেশে চালিত হয়ে ওঁদের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে দিয়েছে, তখন সোহন হালুয়া বা খসখস আতরের জন্য ধন্যবাদ রচনা করে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম।

বাড়ীর চাকর-বাকরেরা মোটামুটি চিনে রেখেছিল। বাড়ীর দরজায় একজন গুর্খা দারোয়ানও ছিল। সেও চিনত। এবার গিয়ে দেখলাম তারা কেউ নেই; এক দারোয়ান ছাড়া সেটকে-সেটই নতুন। অসুবিধে হল। সবাই জিজ্ঞেস করে কাকে চাই। এবং সকলেই যেন অবজ্ঞা ভরে তাকায়। কারণটা বুঝতে আমার দেরি হয় নি। আমার জীবনে এটা প্রায় অভ্যাসই হয়ে গিয়েছিল। আমার চেহারা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দু-দিকেই খাট এবং ক্ষীণ। গায়ের রঙও কালো। একবার একজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমাকে বাড়ীর গমস্তা ভেবে পান খাবার জন্য কিঞ্চিৎ দিয়ে আমাদের সেরেস্তায় কার্যোদ্ধার করে নিতে চেয়েছিলেন। এবং আজও অনেকে এসে আমাকেই বলেন—ওঁকে ডেকে দিন, দরকার আছে। সুতরাং রাগ করি নি, বা চলে আসি নি; একটু গলা উঁচু করে বলেছিলাম—বউদি, এরা আমাকে

আপনার নন্দাই বলে মানতে চাচ্ছে না। একটু নেমে আসুন।

নেমে তিনি আসেন নি, ওঁর ঝি (সে পুরানো লোক) আমাকে দেখে একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিল—ওমা আপনি!

সরাসরি পর্বটায় ছেদ টেনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—বউদি কোথায়? কণ্ঠস্বর একটু শুকনো-শুকনো হয়ে উঠেছিল ঝিকে দেখে। সেদিনের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে একান্ত নিরালায় বউদির আত্মকাহিনী শোনার পর আমাকে অভ্যর্থনার জন্য তাঁকেই প্রত্যাশা করেছিলাম, তাঁর বদলে ওই ঝিটিকে দেখে কণ্ঠস্বর শুষ্ক হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিকভাবে।

বলেছিল, উপরে। একটু কাজে ব্যস্ত আছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। একটা অবজ্ঞা বা অবহেলার ধাক্কা যেন আচমকা বুকে এসে লেগেছিল।

বলেছিলাম—তা হলে আমি যাই।

ঝি বলেছিল—না-না। আমি খবর দিই, দাঁড়ান।

—কি দরকার?

—না। শেষে আমার উপর রাগ করবেন। এ বাড়ীর সবারই চাকরি গিয়েছে, শুধু দারোয়ান আর আমি আছি, শেষে আমারও যাবে। একটু বসুন।

আমি বসলাম, ঝি দ্রুত চলনেই উপরে উঠে গেল। ওঁদের প্রমুখাৎ শুনে এবং আমার সঙ্গে ওঁদের ব্যবহারের ধারা দেখে আমার সম্পর্কে মেয়েটি একটা ভাল ওজনও আন্দাজ করে রেখেছিল। ঝি-এর এই ব্যস্ত-সমস্ততা আমার ভালই লেগেছিল। মনে-মনে ঠিক করে-ছিলাম, বউদি এবার নিশ্চয় নামবেন এবং হাত ধরে বলবেন—দেখুন তো এমন অন্যমনস্ক হয়ে গিছলাম, ছি-ছি ছি, আপনার গলা শুনেও বুঝতে পারি নি, কথার ছন্দ থেকেও খেয়াল হয় নি যে, এ ছন্দ আপনি ছাড়া আর কারুর হতে পারে না। 'এরা আমাকে আপনার নন্দাই বলে স্বীকার করছে না।' এবং কথা শেষ করে কাপড়ের আঁচল চাপা দিয়ে সম্মুখের দেখনহাসি দাঁত দুটিকে আবৃত করবেন। আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, এর উত্তরে বলব—"সেদিন আকাশের স্বপ্নপারাবারে একাদশীর চাঁদ খেয়া দিতে-দিতে সাক্ষী হয়েছিল, আজ আকাশে চাঁদ নেই কিনা, তাই ভ্রম হয়েছে, আপনার দোষ নেই।"

ঠিক এই সময়েই নেমে এলেন মণি-বউদি। কিন্তু ঠোঁটে এতটুকু হাসির রেখা ফুটল না, চোখের দৃষ্টিতে এতটুকু দীপ্তির ঝিকিমিকি জাগল না, সারা শরীরের ছন্দে এতটুকু হিল্লোল বইল না, তিনি সোজা শক্ত ভঙ্গিতে চটির শব্দ তুলে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালেন একটি নমস্কার করে, বললেন—নমস্কার! অত্যন্ত দুঃখিত, কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম! তারপর? কেমন আছেন? বাড়ীর সব ভাল আছে তো? সোহন হালুয়া খেয়েছেন? খসখস আতর?

যত কিছু প্রশ্ন ছিল, সব পর-পর ক'রে গেলেন, যেন একটার উত্তর নিয়ে আর একটা প্রশ্ন করতে সময় কিছু বেশী ব্যয় হবে। যার অর্থ হল, তাঁর সময়ের অত্যন্ত অভাব। আসলে প্রশ্নগুলোর কোন উত্তরই তিনি চান না।

সেটা বুঝতে আমার বিলম্ব হয় নি। এবং অত্যন্ত চতুর ভাবেই এর পর দু-তিনটে কথায় ওখানকার পালা সেরে আমি উঠে পড়েছিলাম এবং বলেছিলাম—আজ তাহলে উঠলাম।

ভদ্রতার খাতিরেই বোধহয় বলেছিলেন,—একটু কফি খাবেন না? সে কথা শেষ করতে দিই নি। বাধা দিয়ে বলেছিলাম, না বউদি দোহাই আপনার, বিষ খেতেও রাজী আছি, কিন্তু চা কফি, কি মিষ্টি জল, এ না। আপনার ঘৃতসিক্ত সোহন হালুয়া যা বস্তু; বাপ্‌স্ আমার মাথার চুলগুলো থাকলে হয়। ওঃ, গলায় গলায় অম্বল হয়ে আছে।

বলে চলে এসেছিলাম। আসতে আসতে ভেবে পাই নি মহিলাটির এমন আচরণের অর্থ কি? দুটো-তিনটে দিন যতদূর মনে পড়ছে ওঁর এই বিচিত্র আচরণের কথা চিন্তা করে মনে-মনে কিছু পীড়া অনুভব করেছিলাম। এর পর আর ও-মুখো হই নি। কি প্রয়োজন? প্রয়োজন ছিল না, প্রলোভন ছিল ওই মণি-বউদির মত চপলা খেয়ালী মেজাজের মডার্ন বউদিটির জন্যে। তবে ও প্রলোভনটা আমার কাছে খুব বড় প্রলোভন ছিল না। কারণ তখন আমি আরও একটা বড় প্রলোভনের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে চলেছি। খ্যাতির প্রলোভন ও প্রতিষ্ঠার আকর্ষণ। এবং আজ সত্যকে গোপন করব না, অকপটেই বলব যে, তখন পত্রযোগে অনেক মুগ্ধার প্রশস্তি আমি পাচ্ছি। থাক। এখন সহজ সোজা ভাষায়—যা ঘটেছিল তাঁর ও আমার মধ্যে—তাই বলে যাই। আমি আর ওপথ মাড়াই নি। ওঁরাও আর ঠিক খোঁজ করেন নি। একেবারে ওই দুই পুরুষের শততম রজনীর অভিনয় উৎসবে কমল-কুমার এবং লছমন মারফৎ একখানা চিঠি আর একটা খুব ভাল ফুলের তোড়া পেলাম। দিয়েছেন বিচিত্র-রূপিণী মণি-বউদি। আর একখানা চিঠিতে সেটা দিয়েছেন অমৃতদা—"Go on completing another hundred not out—"

সেদিন শুনলাম আমার জীবনে দুই পুরুষের শততম অভিনয় যত গৌরবের, অমৃতবাবু এবং মণি-বউদির জীবনে দিল্লীতে অভিনব ব্যবসায়ের কালোগৌরব অর্থাৎ আর্থিক বহু বাহুল্য, তার থেকে কোন ক্রমেই কম নয়। অনেক বেশী। ব্যাপারটা লোহার পারমিট নিয়ে রহস্যজনক দুর্বোধ্য ব্যাপার।

এর পর আমার জীবন যেমন দ্রুতবেগে চলেছে, ততোধিক দ্রুতবেগে চলেছে ওঁদের জীবন। হিমালয় থেকে বেরিয়ে সিন্ধু যেমন পশ্চিম মুখে এবং ব্রহ্মপুত্র যেমন পূর্ব মুখে বেরিয়ে বিপরীত দিকে চলে গেছে, যেমন ভাবেই ওঁরা দুজনে দিল্লী কলকাতা, বোম্বাই-এর ব্যবসায়ের বাজারে আমার থেকে একেবারে বিপরীত মুখে অনেক দূরে চলে গেলেন।

ক্রমে ভুলেও গেলাম তাঁদের কথা। ওঁরাও নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন আমার কথা। হঠাৎ সেদিন মণি-বউদিকে দেখলাম গ্র্যাণ্ড-হোটেলে। মণি বউদির নূতন প্রকাশ দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

হায়, মণিবউদি।

বিচিত্র মণিবউদি। এও তাঁর প্রকাশের শেষ নয়। এর পরও আছে।

এগার

বলা চলে এর এক যুগ পর।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এ-যুগের যুগ নয়, সচরাচর যে-যুগ আমরা বারো বছরে গণনা করে থাকি, সেই যুগ। অর্থাৎ বারো বছর পর।

১৯৪৪ সাল আর ১৯৫৬ সাল। বারো বছর পর আবার মণিবউদিকে দেখলাম। ১৯৪৪ সালে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে একজন বেশ ভারিক্কি জবরদস্ত শ্বেতাঙ্গের প্রায় বাহুলগ্না হয়ে বিচিত্রবেশিনী মণিবউদিকে সেই যে দেখেছিলাম, তারপর এই বারো বছরের মধ্যে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। যে-তিনি বা যে-তাঁরা অর্থাৎ মণিবউদি এবং অমৃতবাবু আমার সঙ্গে উপযাচক হয়ে ডেকে দেখা করে তিনপুরুষ আগের মরচে-ধরা বা ময়লাপড়া সম্পর্ক-শৃঙ্খলের জোড় আবিষ্কার করে, তাকে মেজেঘষে নতুন করে পান ধরিয়ে আমাকে এতখানি সমাদর করে সযত্নে বাঁধতে চেয়েছিলেন, সেই-তিনি বা সেই-তাঁরা এরপর যেন মর্তলোকের মঞ্চ থেকে অকস্মাৎ দেবলোকে চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে গেলেন। বলা চলে—শিকলের সম্পর্ক কেটে চলে গেল, আর এল না। যে মণিবউদি ১৯৪২ সালের ব্ল্যাক আউটের কল্যাণে প্রাপ্ত একটি দুর্লভ জ্যোৎস্নালোকিত ভাদ্র রজনীতে খোলা বাতায়নের পাশে বসে জানালার দিকে মাথা রেখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অকপট অন্তরঙ্গতায় তাঁর বিগতজীবনের কথা বলেছিলেন, তিনি এর পর আর ভুলেও একছত্র পত্রযোগে আমাকে আমার জীবনসাফল্যে উৎসাহিত করলেন না। কাব্য করে 'তোমার গরবে গরবিনী হাম' লেখা দূরে থাক একেবারে মেঠো গদ্যতেও লিখলেন না—'আপনার সম্মানে সুখিনী হইলাম', অথবা 'সাবাস' জানাচ্ছি।

দুই পুরুষের সাফল্যের পর ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কালটা তো কম নয়। বারো বছরেরও বেশী; চোদ্দ বছর। এর মধ্যে দুইপুরুষ থেকে আরও অনেক উজ্জ্বলতর সাফল্য আমার জীবনে এসেছে। এবং এই যুগপরিবর্তন, যাকে সত্য অর্থে বলা যায় যুগান্তরের, সেই যুগান্তরের মধ্যে যে-যুগ গেল, তারও প্রসাদ যেমন পেয়েছিলাম আমি, নবাগত যুগের অকৃপণ প্রসাদও আমি ঠিক তেমনি পেয়েছিলাম। আগন্তুক যুগের প্রসাদগুলি উজ্জ্বলতর ছিল তাও আগে বলেছি। তাছাড়াও সে-প্রসাদের বার্তা শুধু মর্ত্যলোক অর্থাৎ বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল না—যাকে দেবলোকবাসিনী মণিবউদি এবং দেবলোকবাসী অমৃতবাবু অনায়াসে ডাকে তিন পয়সার পোস্টকার্ডযোগেও কিছুটা বাহবা দিতে পারতেন। এবং এ-দেওয়া তাঁদের মত মানুষ যাঁরা, তাঁদের কাছে তো হীরের বালা-পরা হাতখানি ঘুরিয়ে বালার হীরে থেকে ঠিকরে-পড়া ছটায় চোখ-ধাঁধিয়ে দেওয়ার মত কৌতুকের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। সুন্দরী মণিবউদি

অনায়াসে লিখতে পারতেন—"তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।" তাতে এই রূপহীন কালো মানুষটিকে দারুণ ঠাট্টা করা হতো। এবং অমৃতবাবু এবার ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলের হ্যাট্রিক ট্যাট্রিক গোছের নতুন কিছু বলে উৎসাহিত করতে পারতেন। সেটা রেকর্ড হয়েও থাকতে পারত।

থাক।

লেখার সুর বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এবং বঁড়শির মত নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে, যাতে বুঝতে পারছি, ওঁদের উপর আমার মনের বিদ্বেষ আজও যায়নি। অথচ মণিবউদির শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা সামনে পড়ে রয়েছে।

যা বলার তা সোজা কথাতেই বলা ভাল। অনেক কাল আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান শুনেছিলাম—"এ তোমার ভালো তোমাতে থাক, আমায় তো তার ভাগ দেবে না।" শুধু ভালোই বা কেন, মন্দর বেলায়ও তো তাই বলা উচিত। মন্দের ভাগও তো কেউ নেয় না। মণিবউদি-অমৃতদার ভালো, সে-ভালোর পরিমাণ বৃহৎ এবং বিপুল, তার ভাগ কাউকে ওঁরা দিন বা না-দিন, ওঁদের ভালো থেকে খসে-পড়া ঝরে-পড়া ভালো অংশ বহুজনে কুড়িয়ে নিয়েছে, পিছন থেকে পাশ থেকে টেনেটুনে বাগিয়েও নিয়েছে, আমি তাদের দলের নই, এ আমার অহংকার।

ওঁদের সংস্পর্শ, ওঁদের সংবাদ ওই ১৯৪২ সালেই আরম্ভ, ১৯৪২ সালেই শেষ। শেষ উপঢৌকন খসখসের আতর আর সোহন হালুয়া। এবং শেষ সাক্ষাৎ ওঁদের বাড়ীতে, সেই শীতল সাক্ষাৎ। ১৯৪২-এর সাইক্লোনের সপ্তাহ-দেড়েক আগে। তারপরই সব যেন চুকে-বুকে গেল। এরপর বাংলাদেশে যুগান্তরের ঘুরপাক যেন গাজনের চড়কপাটার মত ঘুরতে লাগল। বর্ণনার দরকার নেই। এ-ইতিহাসের কথা। সাইক্লোন মন্বন্তর থেকে নাগাসাকি হিরোসিমা পর্যন্ত যা ঘটেছিল তাতে পৃথিবীর মানচিত্রের রঙ পাল্টালো, চেহারা পাল্টালো ভূগোল নতুন করে লেখা হল, ঝড়ে বন্যায় দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মহাযুদ্ধে মহাপ্রলয়ের একটা ঝাপ্‌টা এসে কাকে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেললে, তার খবর রাখবার অবকাশ কারুর ছিল না। এর মধ্যে আমিও কালের প্রসাদধন্য এবং মণিবউদিরাও তাই শুনেছিলো; তবুও তাঁদের সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না। ১৯৪৪ সালে গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে ওই নতুন রূপে মণিবউদিকে দেখে যে বিস্ময় এবং যে-প্রশ্ন জেগেছিল, তার উত্তর পাবার জন্য কৌতূহল আমার জাগ্রত হয়নি এমন নয়, কিন্তু তার উত্তর পাবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠতে পারিনি। তার আগেই অন্যকিছুর টানে অনেক দূরে গিয়ে পড়তে হয়েছে; মনে মনে অনেক দূরে, নইলে বাগবাজার আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে গ্রে স্ট্রীটের একটু ওধার—সে আর কতটুকু পথ!

ওঁরা অবশ্য তখন মর্ত্যলোকে থাকতেন না। ১৯৪২ সালেই মর্ত্যভূমি-রূপ এই ঘিঞ্জি কলকাতা নগরী ছেড়ে দিল্লী গেছেন। সে কথা আগেই বলেছি। এবং উড়োভাসা যে দু'চারটে খবর বা কথা—সে গুজবই হোক আর সত্যই হোক তাই মনের এই দুর্বল কৌতূহলকে আপনা-আপনি স্তিমিততর করে প্রায় নিভিয়ে এনেছিল।

১৯৪৪ সাল। যে-সময়ে রাশি রাশি নোটের বাণ্ডিল এনে এই গরীব দেশের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিল দুটি দেশ—ইংলণ্ড ও আমেরিকা। সে-সময় একাদশে বৃহস্পতি থাকার জন্যই হোক আর শনি তুঙ্গী থাকার জন্যই হোক অথবা উভচরী যোগের কল্যাণেই হোক, অমৃত-মণি দম্পতি বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তার সঙ্গে বেশ কয়েকটা বড় কারখানার মালিকানা অর্জন করেছিলেন বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে।

জল প্রচণ্ড হিমে জমে বরফ হয়, তখন জলকে সে ঢেকে রাখে, তার স্রোতকে সে রুদ্ধ করে। কিন্তু বরফ যখন গলে, তখন জল হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। অমৃতবাবু জলই হোন আর বরফই হোন, এক সময় বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে ব্যবসায় ধর্মে একাত্ম হয়ে মিশে গিছলেন।

এসব শোনা কথা মাত্র, তার অধিক কিছু নয়। এবং এ নিয়ে আমার দিক থেকে শিরঃপীড়া বা গাত্রদাহেরও কারণ ছিল না এবং আমার নিজের হাতের মাপে আমার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত থেকে এতটুকু খাটিয়ে যায়নি। বরং তার বিপরীতই হয়েছিল। আমার হাতের মাপে আমার দৈর্ঘ্য কিছু বেশীই হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৬ সালে দিল্লী গেলাম। আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছি, সেই পুরস্কার আনতে গেছি। তখনও দিল্লীর বিখ্যাত বিজ্ঞানভবন সম্পূর্ণ এবং ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয় নি। পুরস্কার বিতরণের জন্য বর্ণাঢ্য সামিয়ানা খাটিয়ে মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল। তখন আকাদেমির সভাপতি স্বর্গত তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষে ছিলেন না, বিদেশে গিয়েছিলেন। সভাপতি ছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বর্তমানে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন।

মণ্ডপের মধ্যে সভাপতির বেদী ও আসনের ঠিক ডানদিকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল—সম্মানিত লেখকবর্গের আসন; বাঁদিকে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি করে বসেছিলেন ভারতের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। এবং সামনে ছিল সারিবন্দী নিমন্ত্রিত অতিথিদের আসন। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা ছিলেন, পার্লামেণ্টের সভ্যরা ছিলেন, বড় বড় রাজকর্মচারীরা ছিলেন। তাছাড়া যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বড় কম পদস্থ নন—তাঁরা ওখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন নিজেদের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিজীবনের দাবীতে; সে-ব্যক্তিত্ব সম্পদের মুকুটেও উজ্জ্বল হতে পারে আবার বিদ্যা বা গুণপনার মুকুটেও উজ্জ্বল হতে পারে। শিল্পপতি এবং বড় বৈজ্ঞানিক পাশাপাশি বসেছিলেন সেখানে। তাঁদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। এবং তাঁদের গুণের কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিয়ে যথাযোগ্য সম্ভ্রম জানিয়ে তাঁদের রূপের এবং বেশভূষার ও দীপ্তিছটার কথা এই বয়সেও বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলব যে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পূজ্য প্রাপ্য নারীর এবং তারপরের যে-পূজ্যটি সে-পূজ্যটি প্রাপ্য রূপের, অর্থাৎ রূপসী নারীর থেকে রমণীয়াও কেউ নেই এবং পূজার দাবীও কারুর নেই। পূজা নিয়ে যদি বা জ্ঞানের ও গুণের আদালতে ইনজাংশন পড়ে, তাহলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, চোখের আরতি ওঁরাই পাবেন, চোখ ওঁদের উপরেই আগে পড়বে। পুরুষরাই যে মেয়েদের দিকে তাকান তা নয়, মেয়েরাও আগে তাকান মেয়েদের দিকে। তবে তাঁরা তাকিয়ে দেখেন ঈর্ষার

দৃষ্টিতে ; অর্থাৎ যে-রূপ তাঁর রূপ থেকে উজ্জ্বল, সে-রূপের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টি দেশ-লাইয়ের কাঠির মত ফস্ করে জ্বলে উঠে জ্বালিয়ে দিতে চায়। রূপবান গুণবান ঐশ্বর্যবান প্রিয়তমের বামভাগে বসেও তাঁরা কোন সামান্য ব্যক্তির রূপসী প্রিয়তমার দিকে ওই একই দৃষ্টিতে তাকান। এত কথা বলার কারণ এই যে, সেদিন সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—একটি নিরাভরণা শুভ্রবসনা সুন্দরীর দিকে। সাদা পোশাক, খালি হাত, খাটো করে কাটা চুল অনেকটা বব করার মত হলেও যেন কিছুটা গরমিল আছে ; নিখুঁত সাদা বেশবাসের উপর একখানা কাশ্মীরী শাল, তারও রঙ সাদা। অতি চমৎকার তাঁকে মানিয়েছিল। পরিপূর্ণ যুবতী বলেই মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, সামনের সারিতে তাঁর আসন ছিল বলে দেখতে পেয়েছিলাম যে, তাঁর পায়ের স্লিপারের রঙটাও শাদা। চোখে রিমলেশ চশমা। নাকের উপরে সোনাটুকু ঝিকমিক করছে। আর বয়স সত্ত্বেও আশ্চর্য স্নিগ্ধ লাগছিল। বেশ একটু রোগা হয়ে গেছেন যেন।

যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝবার কথা যে, মহিলাটি বিধবা। কিন্তু যদি এ-প্রশ্ন ওঠে যে, ওই সাদা পোশাকের মধ্যে বৈরাগ্য বড়, না রুচি বড়, তাহলে প্রশ্নটা মুহূর্তে জটিল হয়ে উঠবে। এবং যিনি প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনি থমকে যাবেন, এ-কথার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

পাঠকেরা বুঝতে নিশ্চয় পারছেন যে তিনি মণিবউদি। সেই তাঁর সামনের দাঁত-দুটি ঈষৎ উঁচু। বয়স হিসেব মত পঞ্চাশের ধারে পৌঁচেছিল নিশ্চয়, কিন্তু তা বোঝা যাচ্ছিল না। আমি মুগ্ধবিস্ময়ে একটু বেদনার সঙ্গেই তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। মুগ্ধতার কারণ, বিস্ময়ের কারণ আমার একার ছিল না, সেটা ছিল প্রায় সবার ; দেখেছিলাম তো, সকলেই এই শুভ্রবসনা পরিপূর্ণ স্থিরযৌবনা মেয়েটির দিকে বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। তাঁরা বেদনাবোধ করেন নি, করবার হেতুও ছিল না। কিন্তু আমি বেদনাবোধ না করে পারিনি। সেইটুকুই ছিল আমার নিজের। আত্মীয় হিসেবে ছিল আমার মণিবউদিকে দেয়।

মণিবউদি বিধবা ? অমৃতবাবু নেই ?

মণিবউদি আমার দিকে কয়েকবারই তাকালেন। চোখোচোখি যাকে বলে—চোখের তারায় তারায় দৃষ্টি বিনিময়—তাও কয়েকবার হল। কিন্তু একটুও হাসলেন না তিনি। চিনলেন কিনা তাও যেন বুঝতে পারলাম না।

সেবার চৌদ্দটি ভাষার মধ্যে Bengali অর্থাৎ বঙ্গভাষার লেখকের পুরস্কৃত হবার পালা সর্বপ্রথম। A. B হিসেবে বাংলার স্থান দ্বিতীয় কিন্তু অসমীয়া ভাষায় কোন গ্রন্থ পুরস্কৃত হয়নি বলে প্রথম A অক্ষরের আসন ফাঁক থেকে গিছল। আমার নাম ঘোষিত হল, আমি পুরস্কার নিয়ে ফিরে এসে বসলাম। এবার দেখলাম মণিবউদি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

বারো

আকাদেমী অ্যাওয়ার্ড বিতরণী সভায় মণিবউদির সঙ্গে চোখ চোখে মিলিয়ে দেখা হল, তিনি আমার দিকে বার দুয়েক চোখ মিলিয়ে তাকালেন; কিন্তু কোন সাড়া যেন পেলাম না। আমি বার বার তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম, অনেকক্ষণ ধরেই তাকিয়ে থেকেছিলাম, মুগ্ধ হয়েও দেখেছিলাম—তাঁকে ভাল করে বিশ্লেষণ করেও দেখেছিলাম।

মণি-বউদির শুভ্র বেশবাসের মধ্যে বর্ণাঢ্যতার অভাব ছিল কিন্তু দীপ্তির অভাব ছিল না; বৈধব্যের সকরুণ ইঙ্গিত ছিল কিন্তু তা তাঁর রূপকে ম্লান করেনি অথবা তাঁর ভিতরের জনটিকে বিশেষ বিষণ্ণ-মলিন করেছে বলেও মনে হয়নি। খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে খানিকটা বেদনার সন্ধান করেছিলাম; চোখের দৃষ্টি ঠোঁটের কোণ এমন কি সমস্ত কিছু নিয়ে এই শুভ্রবসনা সুন্দরীটির অবয়ব ও কান্তিতে কোন কিছুর একটি অস্পষ্ট ছায়াও আবিষ্কার করতে পারি নি। তবে হ্যাঁ, এ কথাটা স্বীকার করব যে তাঁর সেই ঈষৎ উঁচু দাঁত দুটির শুভ্রচ্ছটা দিয়ে সে সুহাসিনী টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন আর চলত না; সেই 'দেখন-হাসি' রূপটি তাঁর গাম্ভীর্যের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। এমনি কি আমার সঙ্গে দু-দুবার তাঁর চোখোচোখি হওয়ার সময়েও সে দেখনহাসি সুপ্রসন্না মণিবউদি চকিতের জন্যও উঁকি মারেন নি।

এর ফলটা আমার কাছে কিছু রূঢ় হয়ে উঠেছিল। তিক্তও বলা যায়। মানুষের মন তো! মনের মধ্যে আত্মীয়স্বজনদের কাছে শোনা যত কনফিডেন্সিয়াল মার্কা—কালো মলাটের ফাইল-বন্দী—চুপিসারের কাহিনীর কাগজ দমকা হাওয়ায় ফরফর করে উড়তে শুরু হয়েছিল আমার চোখের সামনে।

লছমনপ্রসাদ, কমলকুমার, অজ্ঞাতনামা ক্যাপ্টেন বা মেজর বা কর্নেল বা মিস্টার প্রভৃতি জনের নামগুলোও মনে পড়ে গিয়েছিল।

তা যাক। তাতেও মণিবউদির প্রতি ঘৃণা হয় নি বা তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ এক বিন্দু কমে নি। আমি প্রশ্নকুঞ্চিত ললাট নিয়েও অবাক হয়ে দেখেছিলাম তাঁর রূপ। মণি-বউদিকে যত দেখলাম তত মনে হল মণিবউদির রূপ যেন এই পরিণত পূর্ণ যৌবনে রূপে রসে আশ্বিনের কানায় কানায় ভরা দীঘির মত আশ্চর্য মনোহারিণী এবং শীতলাভাসে টলোমলো হয়ে উঠেছে। না, এও যেন হল না। একেবারে পরিপূর্ণ খুলে যাওয়া লাল পদ্ম দেখেছেন? এমন ফুটেছে যে পাপড়িগুলোর একটু একটু খ'সে পড়ি-পড়ি ভাব, গন্ধ বেশ-কিছু গাঢ় কিন্তু বাসী নয়। ভিতরের মর্মকোষ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত; সব নিয়ে মনে হয় যৌবন যেন পূর্ণ, রূপ যেন তন্দ্রালু হয়ে পড়েছে মণি-বউদির সর্বাঙ্গে।

সব থেকে বেশী মনোহারিণী করেছিল তাঁকে তাঁর চুলের রুক্ষ শোভা এবং খাটো বিন্যাস। বলতে ভুলেছি চুলের খাটো বিন্যাস্ত ওঁর তখন থেকেই। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে যখন ওঁকে দেখেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম তাঁর খাটো করে ছাঁটা রুখু চুলের বিন্যাস। কাঁধ পর্যন্ত বেশ থাক বেঁধে দুলছে। কিন্তু তখন যে কোন কারণেই হোক এমন ভালো

লাগে নি। সব মিলিয়ে মনে হয়েছিল তাঁর জীবনাকাশে তাঁর রূপচ্ছটা একেবারে মধ্যগগন-বিহারিণী। বয়স তখন তাঁর বোধ করি পঁয়তাল্লিশ। ওই সভায় মহিলার সংখ্যা কম ছিল না। পাঞ্জাবের রূপের নাম-ডাক আছে এবং রঙের জৌলুসে ও দীর্ঘাঙ্গীত্বের ছন্দে তরুণী বয়সে ওঁদের আকর্ষণ দুর্দমনীয়। তবুও তাঁদের মধ্যেও মণিবউদি অপরাজিতা বিশেষণ-সমন্বিতা গরিবিনীদের অন্যতমা হয়ে বসেছিলেন এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল, উনি কোন একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতেও প্রকাশ করুন যে, উনি আমাকে চিনেছেন। তিনি আমাকে চিনে একটু না-হাসায় আমার আকাদেমি পুরস্কার লাভের গৌরবের স্বাদটুকু লবণহীন বলে মনে হচ্ছিল। অন্য সভা বা অনুষ্ঠান হলে হয়তো নিজেই আমি ওঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে বসতাম—'কি? চিনতে পারছেন না নাকি?'

পুরস্কার পাবার আগে যেতাম না। পরে যেতাম এবং পুরস্কারের ফলকটা হাতে করেই গিয়ে সামনে দাঁড়াতাম। যাতে তিনি আমার এই গৌরব ও সম্মান সম্পর্কে ভুল করবার কোন সুযোগ না পান। কিন্তু এ সভা সাধারণ সভা নয়। মণ্ডপের বেদীর উপর বসে আছেন, ভারতবর্ষের বাণীরূপের প্রতীকের মত উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন। পুরস্কারস্বরূপ ওই ফলকটি আমার হাতে দেবার সময় তিনি এমন দু'তিনটি কথা আমাকে বলেছিলেন যা আমার চিত্ত এবং অন্তরকে একটি মহৎ আবেগে পূর্ণ এবং শান্ত করে দিয়েছিল। এই দুটো কারণই সেদিন বাইরের সকল আকর্ষণের—সে মণিবউদির আকর্ষণের মোহ এবং চাপল্যকেও ঠোঁটে তর্জনী রেখে ভ্রূভঙ্গির শাসনে শাসিত করে রেখে ছিল। নড়াচড়ার উপায়ও ছিল না এবং ওই শাসন আমাকে অচপল করেই রেখেছিল।

নারীর মোহে—সে মোহের মধ্যে কোন কামনা থাক বা না থাক—পুরুষেরা বিধাতার নির্দেশে দু'চার পা বা কদম আদিম নৃত্যছন্দে ফেলে থাকেন; এবং সারা অঙ্গে দুটো একটা হিল্লোলও বয়ে গিয়ে থাকে। কিন্তু মানুষের জীবনে বিধাতার এই নির্দেশের চেয়েও কঠিনতর নির্দেশ আছে, সে নির্দেশ তার সমাজের; সে নির্দেশ দৈববাণীর চেয়েও অমোঘ।

সুতরাং বসেই ছিলাম। বার বার তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে মনে নানান জল্পনা করে-ছিলাম। সেও ওই কল্পনাতেই শেষ। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। কারণ অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মণিবউদি বিশিষ্ট মানুষের জনতার মধ্যে যেন মিশিয়ে গেলেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বেরিয়ে যাবার পরই এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ সাজানো সভাটার মানুষেরা উঠে মিলেমিশে যেন একটা বিশৃঙ্খল জনারণ্যের সৃষ্টি করে ফেললেন, তার মধ্যে মণিবউদি-রূপা স্বর্ণলতাটি যে কোন সহকারের স্কন্ধলগ্না হয়ে কোন পথে কোন দিকে বেরিয়ে গেলেন, তার আর কোন হদিসই পেলাম না আমি। মনে হয়েছিল, ইচ্ছে করেই এমনভাবে নিজেকে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমার চোখের আড়াল হলেন মণিবউদি। কিন্তু মণি-বউদির একটা ভুল হয়েছিল। দৃষ্টির বাইরে গেলেই নিজেকে নিখোঁজ করা—অধিকাংশের পক্ষে

সম্ভবপর হলেও কিছু মানুষ আছে যাঁদের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। কারণ তাঁরা শুধু রূপ দিয়েই তো চিহ্নিত নন, ষষ্ঠেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার ধ্বনি স্পর্শ এবং গন্ধ—তিন দিয়েও তাঁরাও মানুষের মহলে সুপরিচিত। এসব মানুষের ঠিকানা সকলে জানে। ওই সভার ভাঙা আসরে তখন মাত্র বিশ-পঁচিশজন মানুষ অবশিষ্ট; তাদের মধ্যে আমিও দাঁড়িয়ে আছি খানিকটা বিভ্রান্তের মত; ভাবছি, ওই মণি-বউদিরই কথা। এরই মধ্যে কেউ আমাকে বললেন—ও। ওই উনি? Lady in the white—উনি তো মিসেস মুকুরজী? ভারতবর্ষের বৈজয়ন্তীধাম এই দেহলী নগরীতে উনি সুপরিচিতা! ভেরী ভেরী ওয়েলনোন পারসোনালিটি! এই ক'বছর যা ঘুরলেন—বোধ হয় বার পাঁচেক হল—ওয়ার্লড্ টুর হয়ে গেছে। কোথায় না? ইউ-এস-এ থেকে চায়না পর্যন্ত। মিস্টার মুকুরজীর ব্রেনই ছিলেন উনি। এখন তো ওঁর হাতেই সব। যদিও আর বেশী কিছু নেই; যা আছে তা খোসা মাত্র; শাঁস যা ছিল তা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ইট ইজ ভেরী ইজি টু ফাইণ্ড আউট হার অফিস। কিন্তু এনগেজমেণ্ট না করে যাবেন না। দেখা হবে না।

সেই সঙ্গে শুনলাম স্বাধীন ভারতবর্ষের যাঁরা নারীশিরোমণি, সর্বজন শ্রদ্ধাস্পদা—তাঁদের সঙ্গেও মণি-বউদির যোগসূত্র নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। শুধু ব্যবসায়-সূত্রেই তিনি বিশ্বভ্রমণ করেন নি। কালচারাল রিলেশনের তাগিদে এবং প্রয়োজনেও তিনি ঘুরেছেন। সেও ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা থেকে রাশিয়া চায়না পর্যন্ত।

নিষেধ করা সত্ত্বেও আমি সংকল্প ছাড়ি নি; আমি মুকুরজী এণ্টারপ্রাইজের আপিসের দরজায় বিনা এনগেজমেণ্টেই গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কলকাত্তার আপিসের কায়দা তবু দেখাশোনা আছে, দিল্লীর ঘোরালো জাঁকজমক বলতে গেলে সেই প্রথম দেখলাম।

রিসেপসনিস্ট মেয়েটি—বাঙালী মেয়ে। খুব চটপটে, কথাবার্তাও খুব ভাল; ইংরিজি উচ্চারণ শুনলে মনে হয় এ নিশ্চয় সেই মেয়েটি কথা বলছে, যে রেডিয়োতে খবর বলতে বলতে বলে—'দিস ইজ ওল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো—গিভিং ইউ দ্য নিউজ—'। যার উচ্চারণ ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর শুনতে ভারী ভাল লাগে।

আমার আগে থেকে এনগেজমেণ্ট নেই অথচ আমি দেখা করতে চাই শুনে সে বিচিত্র ধরনে শিউরে উঠে বলে উঠল—মাই গুডনেস! এনগেজমেণ্ট নেই অথচ মিসেস মুকুরজীর সঙ্গে দেখা করবেন!

তারপর স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যেন তাকে আমি আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে দেবার কথা বলেছি।

ইচ্ছে হল বলি—দেখ মেয়ে, বেশী ন্যাকামি ক'র না। খবরটা দিয়ে দেখই না। ১৯৪২ সালে একদিন রাত্রে তোমার বস চাঁদ পেড়ে আমার কপালে টিপ পরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মুখে আমি বলেছিলাম—অনুগ্রহ করে খবরটা বা একটা স্লিপ তুমি পাঠিয়েই দাও না।

তা অবশ্য করতে হল না। তার আগেই ভেতর থেকে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সেই

পুরাতন কমলকুমার।

বেশ একটু দীর্ঘ এবং রূঢ় পদক্ষেপে সে বেরিয়ে এসে চলে যাচ্ছিল, যেন কোন উত্তপ্ত বাতাবরণ থেকে উত্তাপ ছড়াতে ছড়াতেই সে আসছিল; শুধু পদক্ষেপের শব্দ এবং ভঙ্গিই নয়, তার মুখ-চোখের থমথমে ভাবও সে কথা বলে দিচ্ছিল। সে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল—আপনি?

আমি বললাম—হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।

—কার সঙ্গে? ওই নটোরিয়াস উয়োম্যানটির সঙ্গে।

কথাটা শুনে ধাক্কা খুব খেলাম না কিন্তু কমলকুমারের মুখে কথাটা ভাল লাগল না। মানালো না।

ঝট করে মুখে আপনি এসে গেল—এখানে আর চাকরি কর না, মনে হচ্ছে। কি করছ?

—করছি অনেক কিছু। কিন্তু আপনি হঠাৎ এখানে কেন?

—বললাম তো বউদির সঙ্গে দেখা করব। অনেকদিন দেখা হয় নি—।

—বউদি? আশ্চর্য এক তিক্ত হাসি ফুটল কমলের মুখে। বারদুয়েক বেশ সরস ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বললে—বউদি? বউদি? হায় হায় হায়! ওই মহিলাটি?

সবিস্ময়ে বললাম—কি বলছ?

—কি বলব? ঠিক বলছি। বলছি—উনি কারুর বউদি নন। যেকালে ছিলেন—ছিলেন। এখন নন। এখন আবার—। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে—কাকার মৃত্যুসংবাদ জানেন তো?

—না। শুনি নি। তবে সেদিন সভায় ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল কথাটা।

কমল বললে—সেও এক কেলেঙ্কারি মৃত্যু। সুইসাইড।

—সুইসাইড?

—হ্যাঁ। তিনি সুইসাইড করেছিলেন—ইনি পঞ্চাশ বছরের ধিঙ্গী বিধবা মাগী—সী ইজ গোয়িং টু ম্যারি এগেন। অমৃত মুখুজ্জের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে নেত্য করছেন। বিধবা বউমা তাঁদের 'করবেন বিয়ে, হবে ছেলে, স্বর্গে যাবেন পিণ্ডি পেলে।'

—কমল!

কমলের পিছনের দরজাটা খুলে গেল এবং সে খোলা দরজায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন মণি-বউদি—না মিসেস মুকুরজী। মুকুরজী এণ্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

কমল ঘুরে তাকাল। এবং চুপ করে গেল তার মণি-খুড়ীকে দেখে।

মণি-বউদি আমাকে দেখেও আমার সঙ্গে কথা না বলে কমলকেই বললেন—আমার অপিসের মধ্যে তুমি অন্তত শীলতা রক্ষা করে চলবে বলে আশা করি। না চলাটা নিরাপদ হবে না তোমার পক্ষে।

কমল একমুহূর্তে যেন দেখতে অত্যন্ত কুৎসিতদর্শন হয়ে গেল। সে একটা প্রায় অশ্রাব্য কথা বলে হন হন করে নেমে চলে গেল। মণি-বউদি একটু হেসে আমাকে অভ্যর্থনা

জানিয়ে বললেন—আমার মনে হয়েছিল আপনি আসবেন।

* * *

ওঁর আপিস ঘরের পাশেই একটি ছোটখাটো বিশ্রাম-কক্ষ। একেবারে আধুনিক ছাঁদে সাজানো। যে ধরনের সাজানো ঘর সচরাচর বিলিতী অথবা ইংরিজী সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের পাতায় ফটো ব্লকে দেওয়া বিজ্ঞাপনের মধ্যে দেখতে পাই—সেই ধরনের। কলকাতায় এমন সাজানো ঘর নেই এমন কথা বলব না, তবে সে সব অঞ্চলে তখনও (অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে) আমার যাতায়াতের 'ভিসা' ঠিক ছিল না। কাঠের কারবারটা সেখানে বেশী। যাক বর্ণনা করতে যাব না, তাতে আমাকে বিপন্ন হতে হবে।

মণি-বউদি সেই ঘরে আমাকে বসিয়ে বললেন—বসুন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। আজও তাঁর প্রায় সেই সেদিনের মতই সাজসজ্জা বেশভূষা। একটি সাদাসিধে নিরাভরণতার আবরণ আশ্চর্য এক উজ্জ্বলতা এবং দীপ্তিকে অত্যন্ত অনায়াস সহজ ছন্দে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করে রেখেছে। অর্থাৎ মনেই হয় না যে, ইচ্ছে করে সযত্নে সুকৌশলে কেয়ারফুল কেয়ারলেসনেসের মত এটাকে কেউ গড়ে তুলেছে। যত্নের চিহ্নটা আদৌ ধরা পড়ে না। বর্ষাকালে জঙ্গুলে শ্বেত কাঞ্চনের অজস্র সাদা ফুলে ভরা লম্বা এবং রোগা গাছটির মত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

* * *

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দামী সিগারেট ডি মুরিয়ারের লাল রঙের টিন বের করে সামনে ধরে বললেন—খান।

কর্কটিপ্‌ড্‌ সিগারেট ; ভারি ভালো সিগারেট। উনি নিজেই লাইটার জেলে সিগারেটটার সামনে ধরে বললেন—ভারী ভাল সিগারেট। যাদের এ্যাজমা আছে তারা খেলেও টান ধরে না।

একটু পর বললেন—অনেকগুলো টিন কিনে স্টক করে রেখেছিলাম। নিয়ে যাবেন ?

আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম এই জন্যে যে, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর এই তাঁর সঙ্গে—ব্যাকরণমতে চতুর্থবার দেখা নইলে বলতে গেলে এই দ্বিতীয়বার দেখা। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সিঁড়িতে এবং সেদিন আকাদেমি এ্যাওয়ার্ড প্যাণ্ডেলে দুবার চোখোচোখি হওয়াটাকে ঠিক দেখা হওয়ার সামিল না ধরলেও কিছু যায়-আসে না। এই সত্য বা তথ্যটি মানুষের জীবনে অনেক কিছুর কারণ হতে পারে। অনেক প্রশ্ন অন্ততঃ আমার মনে জমা হয়েও ছিল এবং ভিড় করে বের হবার জন্য ঠেলাঠেলিও করছিল। কিন্তু মণি-বউদি আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে এমন সহজ ছন্দে একটি লোহার ফটক টেনে বন্ধ করে দিলেন, যে প্রশ্নোত্তরের পালায় মুহূর্তে ছেদ পড়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তাঁর সেই সহজ ছন্দের মধ্যে ব্যক্তিত্বময়ী বিলাসিনী রূপটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনের প্রশ্নগুলো বোবা হয়ে গেছে ততক্ষণে।

মণি-বউদি, পুরানো কথা এবং পুরানো কালের সব অভিযোগ অনায়াসে এড়িয়ে গিয়ে ডি-মুরিয়ার সিগারেট প্রসঙ্গ তুলে কথা বলে যাচ্ছিলেন। তারই মধ্য থেকে হঠাৎ এক সময়

বলে বসলেন—উনি শেষটায় এত বেশী ড্রিঙ্ক আর স্মোক করতে ধরেছিলেন যে, হাঁপানীর টান হ'ত। ডাক্তারেরা ওগুলো ছাড়তে বলেছিলেন, তা হেসে আপনার দুই পুরুষের সুশোভনের কথা কোট করে জবাব দিয়েছিলেন, ওরে বাবাঃ, তাহলে বাঁচব কি খেয়ে মুট্‌দা। শেষে ডাক্তারেরা প্রেসক্রাইব করলে মারটেল ব্র্যাণ্ডি আর ডি মুরিয়ার সিগারেট। সে-সময় আমিও খেয়েছি।

চমকে খুব উঠলাম না। কারণ শুভ্রবসনা স্থিরযৌবনা মণিবউদির হালের রূপের মধ্যে যে দীপ্তি ঝিলিক মারছে তাতে সিগারেট না খেলেই বেমানান হবে। ভারতবর্ষে যাঁরা বর্তমানে গরীয়সী মহিলা, তাঁদের এক হাতে পানীয়ের গ্লাস এবং অন্য হাতে লম্বা পাইপে সিগারেট—নইলে রূপে সম্পূর্ণই হন না। অবশ্য সবাই নন।

হঠাৎ কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলেন মণি-বউদি।—ওঁর মৃত্যুর খবর জানতেন না, না?

আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বিষণ্ণ হেসে বললেন—কেলেঙ্কারির দায়ে খবরটা চেপে যেতে হয়েছিল। সুইসাইড করলেন; একটা কিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে এমন কেলেঙ্কারি করলেন যে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করতে হ'ল। সেও বিদেশে। সেটাও একটা সুবিধে হয়েছিল, এখানে ব্যাপারটা পাব্লিসিটি পায় নি।

একটু আগেই কমল বলে গিয়েছিল, সেও এক কেলেঙ্কারির মৃত্যু, সুইসাইড। সুতরাং বিস্ময়ের ধাক্কা আসেনি তাতে। কিন্তু ফিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে 'এমন কেলেঙ্কারি' কথাটুকু বিস্ময় নিয়ে এল অনিবার্যরূপে।

মনের মধ্যে মাছি আছে। সে মাছি ফুলের মধুও পান করে, আবার সেই মাছিই নর্দমায় বসে পরমানন্দে পঙ্করসে ডুবে থাকে। মনের সেই মাছিটা পাখা মেলে উড়তে শুরু করলে—ওই ফিরিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে অমৃতবাবুর কেলেঙ্কারির পঙ্করসকুণ্ডের সন্ধানে।

—আমি বারণ করেছিলাম ওঁকে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন মণি-বউদি। একটা সত্যকারের বিষণ্ণতা যেন ছড়িয়ে পড়ল ঘরের বায়ুমণ্ডলে। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে অনুভব করলাম তার স্বাদ।

—খুব সুখের জীবন ছিল আমার। একটু থেমে আবার বললেন—জীবনের ছেলেবেলা থেকে কখনো হারি নি আমি। কক্ষনো না। সেই বিহারশরীফ থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত, কোথাও না।—হেরে গেলাম দিল্লীতে এসে।

আবার একটু চুপ করে যেন ভেবেচিন্তে নিয়ে বললেন—প্রথমটা বুঝতে পারি নি যে হারছি। মনে হয়েছিল জিতছি। সে-জেতা এমন-তেমন নয়। যেন দিন-দুনিয়া জিতে নেওয়া। কিন্তু আসলে যে পায়ের তলার মাটি সরে সরে ডুবে যেতে বসেছি, তা বুঝতে পারি নি।

—হঠাৎ একজন কর্ণেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। হঠাৎ মানে য়্যাকসিডেণ্টাল নয়; সে রকমটা উপন্যাস গল্পে দেখা যায়। যা থেকে রোমান্স হয়। তা নয়। সহজ পথে আলাপ হল। ব্যবসার পথে। কর্ণেল সাহেবটির হাতে ছিল সরকারী দিকটার কর্তৃত্ব। টেণ্ডার

স্যাংশন করবার একটা কমিটি আছে, কিন্তু সে-ই সব। তারপর মাল দেখে নেওয়া—সেও তাঁর হাত। বিল পাশ করে অন্য লোক কিন্তু সেখানেও এঁর হাত।

একটু হেসে বললেন—এতগুলো ব্যাপার যাঁর হাতে এবং মাথায়, সে মানুষটার দশটা মাথা কুড়িটা হাত বাইরে থেকে দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে থাকেই। যার অন্তর্দৃষ্টি আছে সে দেখতে পায়ই।

সে অন্তর্দৃষ্টি উনি ব্যবসা করতে শুরু করে অর্জন করেছিলেন। এককালে আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন; দেশপ্রেমিক কুমার-ব্রতধারী মানুষটির কপালে একসঙ্গে জমে উঠল ব্যবসা আর প্রেম। যে-ডাঙ্গাটা নিয়েছিলেন তুলোর চাষের জন্য সেখানে কপাল-গুণে বেরিয়ে গেল ফায়ার ক্লে; আর এক ডাক্তার ভদ্রলোকের মৃত্যুশয্যায় দায়ে পড়ে নিজের কন্যার বয়সী, তার যে কিশোরী মেয়েটিকে একান্ত ভাবে স্নেহবশে নিয়ে এলেন, সে যুবতী হয়ে তাঁর গলায় মালা দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলে, এও তাঁর কপাল-গুণ ছাড়া আর কি বলুন। বোধ করি সেই কপালচক্রেই উনি পাকা ব্যবসাদার হয়ে উঠে এ অন্তর্দৃষ্টিটুকু অর্জন করেছিলেন। একদিন আমাকে বললেন—মণি, এ লোকটা একটা জাত হাঙ্গর, ব্যাটার দাঁত যত ধারাল, পেট তেমনি অভর। তবে গাঁথতে পারলে অনায়াসে ওর তেল নিঙরে বের করে নেওয়া যায়।

সেই তেল নিঙড়ে নিতে গেলেন। একজন সুন্দরী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে স্টেনোর চাকরি দিয়ে এনে তার সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি করে বললেন—সায়েবকে পাকড়াতে হবে।

টোপের আগে চারের ব্যবস্থা।

সে ব্যবস্থা খানা-পিনা-ডিনার-ড্রিঙ্ক।

বলতে পারব না, কি করে এসব তিনি পারলেন, কি করে তাঁর মনে এত সায় দিলে! একদিন তো উনি সত্যিকারের নীতিবাদী খাঁটি মানুষ ছিলেন।

হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ, প্রায় মিনিট খানেক, চুপ করে বোধ হয় ভেবে নিলেন, এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—এক-এক সময় আমার নিজেকেই দায়ী বলে মনে হয়। আমার রূপ-যৌবনের লোভেই তিনি পা পেছলালেন। মাসীর প্রেম তার পড়ন্ত যৌবনের সঙ্গে-সঙ্গেই বাসী হয়ে গেল। সে আমার জন্যেই। এবং আমিই তাঁকে টেনে-ছিলাম।

আবার হেসে বললেন—অবশ্য বাস্তব দুনিয়ার শক্ত মাটিতে হুঁচোট খেয়ে খেয়ে সেন্টিমেণ্ট আর প্রায় অবশিষ্ট নেই বললেই হয়, তবুও মধ্যে মধ্যে এই ধরনের ইমোশন বুকের মধ্যে ঠেলে উঠতে চায় এবং ওঠেও সময়-সময়। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ইমোশনের মধ্যে সত্যি কিছু নেই। ওতে পেট ভরে না। ওর ফুডভ্যালু নেই, তৃষ্ণার জলও নয়। কিন্তু ওতে একটা নেশা আছে। মদের নেশার চেয়েও গাঢ় একটা নেশা হয়। উনি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মধ্যে মধ্যে কাঁদতেন—মণি, আমি-আমি-আমি সব কিছুর জন্যে রেসপনসিবল। আই অ্যাম রেসপনসিব্‌ল! মণি, তুমি আমার পবিত্র মণি।

সে শুনে না-হেসে পারতাম না।

হাসলে আবার রাগ করতেন। কিন্তু যে-দিন মদ না খেয়ে নিছক ইমোশন-বশে কাঁদতেন সেদিন আমাকেও কাঁদতে হত। দুজনে দুটো ঘরে শুয়ে-শুয়ে কাঁদতাম। এ কি হল? কেন এমন হল? কিন্তু কি করব? এই যে চলতে-থাকা দুনিয়া, এ বড় কঠিন; এক দণ্ড, কি এক মুহূর্ত থামে না। ইট নেভার স্টপ্‌স্। আমার আপনারও থামবার অবকাশ নেই। সেই চলার টানে আমরা চলি। পুরোপুরি ম্যাথামেটিক্যাল ব্যাপার, ইমোশনাল নয়; কিন্তু তবু ইমোশন আছে জীবনে। অন্ততঃ একাল পর্যন্ত তো আছে।

* * *

একটু থেমে হয়তো কিছু ভেবে কিম্বা দম দিয়ে বললেন—কি আর বলব বলুন। কালের এমন একটা প্রবল স্রোত, যা হাজার হাজার নায়াগ্রা ফল্‌সের চেয়েও প্রবল! কথাটা উনি বলতেন। বলতেন, এই যে কালটা, এই যে ওয়ার, এর যা স্পীড, এর যা মোমেণ্টাম, এতে গোটা পৃথিবীর ম্যান, মেটিরিয়েল, একেবারে জল আর কয়লার মত বয়লারের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হিটলারের মত শক্তি উড়ে গেল, জীর্ণ খসে পড়া পাতার মত। তো আমি।

বলতেন—না দুঃখ আমার নেই। আই হ্যাভ টেস্টেড এভরিথিং।

দুঃখ করতেন আমার জন্যে।

বলতেন—কিন্তু আপসোস, তোমাকে কেন এর মধ্যে টানলাম মণি?

আমি সান্ত্বনা দেবার মত কথাও খুঁজে পাই নি। কমল-টমলের কাছে ডিটেল্‌স্ শুনতে পারেন। আরও অনেকের কাছে পাবেন। ওরা সব দেখেছে। চোখ দিয়ে দেখে যা বোঝা যায় যতটুকু ধরা যায় তার রেকর্ড আছে তাদের কাছে। কিন্তু তার মানে ওরা ঠিক জানে না। আমিও ঠিক বলতে পারব না। এখনও আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে আসে নি। উনি সুইসাইড করেছেন। আমি তা করি নি। যত কলঙ্ক, যত অপবাদ মাথায় করে নিয়েছি। মাথায় করে কেন? সাপের মত আমার দেহটা জড়িয়ে রেখেছে। আগেকার আমলের আমি হলে আমিও বোধ হয় সুইসাইড করতাম। কিন্তু এই দশ-বারো বছরে জীবনে অনেক ঢল নেমে বয়ে গেল ঠাকুরজামাই। যে মণি-বউদি হাতীপাঞ্জাপেড়ে শাড়ী, পুরনো আমলের ঢঙে ঢল্‌কো করে পরে কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে গণক দৈবজ্ঞদের কাছে যেত, সে মণিমালা একেবারে পাল্টে গেছে। এ বারো বছরের চার-চার বার ফরেন টুর করে এসেছে। দুবার কন্টিনেন্ট ঘুরেছে; একবার সারা পৃথিবী। রাশিয়া চায়না তাও গেছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমার চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে? বাইরের চেহারার সঙ্গে তার অনেক গরমিল।

কমল এখুনি খুব রূঢ়ভাবে তর্জনী উদ্যত করে শাসিয়ে গেল। নালিশ করবে। অমৃতবাবুর ধর্মভ্রষ্টা নীতিভ্রষ্টা পত্নী হিসেবে আমার জাত গেছে, কুল গেছে, সব গেছে; সুতরাং অমৃত-বাবুর যে উত্তরাধিকারে আমি অধিষ্ঠিতা রয়েছি, তা থেকে আমাকে হটে যেতে হবে। আই মাস্ট কুইট।

অবশ্য তার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করলে আলাদা কথা।

শর্ত মাত্র তিনটি।

আমি তাকে ভজবো—নাম্বার ওয়ান।

নাম্বার টু হল, একখানি কাগজে সই করে দিতে হবে। যে কাগজের লেখাগুলি অর্ধ সত্য অথবা বাইরে সত্য, ভিতরের প্রশ্নই নেই—সে কাগজখানা তার হাতে থাকবে আমার মৃত্যুবাণ হিসেবে।

তিন নম্বর হল—লছমন প্রসাদকে যেতে হবে।

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম এই বারো-চৌদ্দ বছরে আমূল পরিবর্তিত হয়ে-যাওয়া মণি-বউদিকে।

এতটুকু মিল নেই। মাঝে-মাঝে জানালার মধ্যে দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তার মধ্যে ১৯৪২ সালের সেই রাত্রের জীবনকাহিনী বলা মণি-বউদিকে মনে পড়ছিল, তিনিও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশের দিকে এমনিভাবে তাকিয়েছিলেন মধ্যে-মধ্যে, ঠিক এমনি বা তেমনি উদাসীনতার সঙ্গে।

আমি সিগারেট টেনে যাচ্ছিলাম একটার পর একটা।

সেদিনের পালা প্রায় এইখানেই শেষ হয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ছিলাম ওঁর কাছে, বার দুয়েক কফি খাইয়েছিলেন, তার সঙ্গে বাদাম বিস্কুট ছিল, তার বেশী কিছু না। ফিরে আসার সময় সিগারেটের টিনটা নিতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি নিই নি।

এক বছর পর মণিবউদি টেলিগ্রাম করলেন, একবার আসতেই হবে। শেষ অনুরোধ। কলকাতা অপিসকে প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

তেরো

এক বছর পর মণিবউদিকে দেখলাম। দেখে যেন কেমন হয়ে গিছলাম আমি। মণিবউদিকে চিনতে পেরেও মনে হয়েছিল, চিনতে না পারলেই যেন ভাল হত। সবই সেই, (এক বছরে একটা মানুষের আর কত পরিবর্তনই বা হয়, যদি না কোন ব্যাধি থাকে), তবু যেন এমন কিছু ছিল না বা হারিয়েছিল, যাতে তাঁকে না চিনতে পারলেই ভাল হত।

রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর 'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিষ্ঠুর শিশির ঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া' ছত্রটি আজ মনে পড়ছে। মণিবউদি মৃত অর্থাৎ দল ঝরে-পড়া পদ্মের দশায় তখনও উপনীত হননি ; তবে তার কিছুটা আগের দশার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। দল-গুলিতে শুকনো একটা স্পর্শ লেগেছে, বৃন্ত শিথিল হয়েছে, গন্ধে বিষণ্ণতা এবং বিকৃতি এসেছে, রঙ বিবর্ণ হয়েছে ; মৃদু বাতাসে এমনভাবে দুলছে যে মনে হয় বাতাসের মধ্যে একটু ঝড়ো আমেজ লাগলেই দলগুলি ঝরঝর করে ঝরে পরে যাবে, বা গেলেই ভাল হয়।

মণিবউদি সেই জানালাটার ধারেই একখানা কুশন-দেওয়া চেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন ;

ঠিক পড়ছিলেন না, তিনি বইখানার মধ্যে আঙুল পুরে ধরে বসে ছিলেন—আমারই অপেক্ষা করছিলেন।

তার আগে বলে' নি, দেখা তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী দিল্লীতে আমার হয়নি; দেখা হয়েছিল কলকাতায়। আপিসের লোক এসে জানিয়েছিল যে, দিল্লী আর আমাকে কষ্ট করে যেতে হবে না; কারণ, মালিক কলকাতাতেই আসলেন। এসেই উনি আমাকে খবর দিয়েছিলেন।

খবর একখানি ছোট্ট চিঠিতে পাঠিয়ে ছিলেন, চিঠিখানা নিয়ে এসেছিল সেই লছমনপ্রসাদ। যে একদা মণিবউদির মাসীর বাড়ীতে বয়চাকর ছিল এবং যে ছেলেটি কিশোর বয়সের আবেগে বা মনোধর্মে একটি কিশোরী মেয়ের নির্যাতন দেখতে না পেরে তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিল, আপনার মনের নির্দেশেই সকল খবর পৌঁছে দিয়ে এসেছিল—ঠিক স্থানটিতে অর্থাৎ অমৃতবাবুর কাছে। এবং যে লছমনপ্রসাদ পরবর্তী জীবনে অমৃতবাবু ও মণিবউদিদের ব্যবসায় সংস্রবে থেকে একজন কৃতী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে আজ, সেই লছমনপ্রসাদ। দিল্লীর কথাপ্রসঙ্গে আমার বলা উচিত ছিল যে, সেখানে আমি লছমন প্রসাদকে দেখেছিলাম। চুস্ত পায়জামা এবং দামী শেরওয়ানীতে তাকে শুধু একজন রইস আদমী বলেই মনে হচ্ছিল, না, মনে হচ্ছিল লছমনপ্রসাদকে কোন নেতৃত্বের আসনে বসালেও এতটুকু বেমানান দেখায় না। এবং লছমন তাতে অপারঙ্গমতার লজ্জায় লজ্জিতও হবে না।

থাক, লছমনপ্রসাদের কথা থাক।

চিঠিখানায় লেখা ছিল, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে মুছে ফেলে শ্রদ্ধাস্পদেষু সম্বোধন করলাম। আমি কলকাতায় এসে পৌঁচেছি। কাজটা দিল্লীতে হয়ে উঠল না; এখানেই আসতে হল। আপনার একটু সাহায্য ভিক্ষা করছি, কোন সম্পর্ক ধরে নয়; পরিচয়ের দাবীতে। একখানা দলিলে আপনাকে সাক্ষী হতে হবে। আর কিছু না। বিকেলে একবার দয়া করে এলে খুব খুশী হব। ইতি মণিমালা দেবী।'

মণিবউদির বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম—উনি উপরে আছেন এবং আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। দোতলার সেই ঘরে তিনি সেই জানালাটার ধারে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, যেটা দক্ষিণ দিকের জানালা এবং যে জানালাটার ধারে বসে একদা ১৯৪২ সালের ব্ল্যাক-আউটের রাত্রিতে তিনি সর্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে আমাকে তাঁর জীবনের কথা বলেছিলেন। তাঁর পূর্ণযুবতী, রুচিবাদিনী, শিক্ষয়িত্রী মাসীকে বয়সে কিশোরী, পশ্চিমের দেহাতী-রুচিসম্পন্না তিনি কি বিচিত্র কৌশলে যুদ্ধ করে পরাজিত করেছিলেন সেই বিচিত্র কাহিনী বলেছিলেন, ঠিক সেই জানালার ধারেই আজ তিনি যেন যৌবনের পশ্চিম সিংহদ্বারের চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গে অপরাহ্ণের লালচে রৌদ্র মেখে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই একটু ম্লান হেসে বললেন—আসুন। আপনার জন্যেই বসে আছি।

চট করে মনের মধ্যে একটা গানের লাইন ভেসে এল—'কালা তোর তরে কদমতলায়

চেয়ে থাকি/পথের পানে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার কাজল-পরা জোড়া আঁখি।'—কিন্তু ওঁর দিকে তাকিয়ে সেকথা যেন একটা আঘাত খেয়ে থমকে বোবা হয়ে গেল। ওঁর এই ছবিটি আমার মনের পর্দায় ছাপ ফেলতেই কথাগুলি জিভের মধ্যে লজ্জা পেয়ে তখন গুটিয়ে গেল।

তার বদলে মনে পড়ল কথা ও কাহিনীর ওই ছত্রটি। 'অঘ্রাণে শীতের রাতে, নিষ্ঠুর শিশিরাঘাতে পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।' আগেই বলেছি যে, আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। ঠিক তেমনি শুকনো শুকনো লাগছিল। অথচ শরীর শীর্ণ হয়নি; প্রসাধন বা সাজসজ্জারও যে অভাব ছিল, তা ছিল না। চুলগুলি রুখু, সে স্যাম্পু-করা রুখু বলেই মনে হল। খসখসে কালো চুলের মধ্যে মধ্যে রূপালী চুলের দু-চার গাছা বা এক-আধ গুচ্ছ ঝিকমিক করছিল; মুখের উপর পাউডারের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণও ছিল, মণিবউদির গৌরবর্ণের গৌরবের মধ্যেও কোথাও দাগ পড়েনি, তবু যেন একটা ছায়া পড়েছিল কিছুর; সব থেকে শুকনো মনে হচ্ছিল ঠোঁটদুটি, এখানেই অভাব ছিল প্রসাধনের; দেখলাম মণিবউদি লিপস্টিক মাখেননি। শীত-শীর্ণ পদ্মের সঙ্গে মিলটা যেন এইখানেই সব থেকে বেশী ছিল।

না।

আরও এক জায়গায় ছিল। চোখের চাউনিতে। অর্থাৎ দৃষ্টিতে। হয় বিমর্ষতা, নয় হতাশা, দুটোর একটা অথবা দুটোই—একসঙ্গে মিলিতভাবে মণিবউদির সেকালের সকল তারুণ্য ও দীপ্তির উৎস তাঁর আয়ত চোখের কালো তারাদুটিকে যেন কেমন নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল।

আমি একটু বিস্মিত হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

তিনি বললেন—বসুন। সামনের সোফাখানা দেখিয়ে দিলেন।

বসলাম। বসে বললাম—এক বছরে—

—হ্যাঁ। অনেক ঝড়জল মাথার উপর দিয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন—সেই মামলা। আপনি যেদিন গিয়েছিলেন দিল্লীর আপিসে সেদিন কমল আমাকে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। আপনাকে বলেছিলুম বোধ হয়।

বললাম—হ্যাঁ।

—তারপর ওরা মামলা দায়ের করেছিল। বেশ কিছুটা দূর এগিয়েও ছিল। তারপর আর ভাল লাগল না।

একটি বিচিত্র হাসি—যে হাসির মধ্যে কান্নার ইশারা উঁকি মারে, দুঃখের কথা মনে পড়ায় যে-হাসি, এ-হাসি সেই হাসি; তিনি বললেন—

সইতে এমনিই পারছিলাম না। তাই মিটমাট করে ফেলছি।

কোন্ কথা আমি খুঁজে পাইনি, কি বলব? মনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী অনেক শোনা কথা এবং বিশ্বাস ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছিল তাদের প্রত্যেকেরই বলবার কথা অনেক ছিল। এই এতদিন অর্থাৎ ১৯৪২ সালের শেষ ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৬। '৫৫ সাল পর্যন্ত অমৃতবাবু এবং মণিবউদির ভাগ্য সম্পর্কে কম কথা তো রটেনি; সে-সব অনেক কথা। গুজবে কান দিতে

নেই কথাটা 'সদা সত্য কথা বলিবেন' জাতের একটা কথা। গুজবের জন্য কান উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এবং মুখরোচক গুজবকে আরও কিছু মুখরোচক করে তোলার কাজটা মনে মনেই হয়ে থাকে। সুতরাং তার পর একেবারে হাঁ-হা করে ওঠারই কথা। কিন্তু মণিবউদির মুখের দিকে তাকিয়ে তারা চুপ করে গেল। সেখানে সেদিন সেই মুহূর্তটিতে শুধু বিষণ্ণতা বিমর্ষতা বেদনার্ততাই ছিল না। আরও কিছু ছিল। যা ছিল, তা অসাধারণ কিছু। একটা কঠিন দৃঢ়তা ছিল। বিশ্বসংসারকে উপেক্ষা করার একটা দৃপ্ততা ছিল। সেটা সেই মুহূর্তে যেন ছ-ব্যাটারী টর্চের আলোর মতো জ্বলে উঠেছিল। বা কোন মেঘাচ্ছন্ন স্তব্ধ-সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরে দিগন্তের বিদ্যুচ্চমকের মত চমকে উঠেছিল বারেকের জন্য।

ঠোঁটদুটি তাঁর বেঁকে গেল, মুখে চোখে যেন ঘৃণা উপচে পড়ল। বললেন—ঘেন্না হয়ে গেছে আমার।—জানেন, সংসারে দেহের সত্যিকারের দাম বোধ হয় শকুনি শেয়াল ছাড়া অন্যে বেশী জানে না। কিন্তু তারাও জ্যান্ত মানুষকে ছিঁড়ে খায় না। মানুষ তার থেকেও জঘন্য, আর সেইজন্যেই যে দেহটার প্রতি যত বেশী অনুরাগ, কুৎসিত কালো কালি তত বেশী করে সেই দেহটার সারা অঙ্গে লেপে দেয়।

হেসে বললেন—এও এক ধরনের পূজো, বুঝলেন না? কিম্বা এক ধরনের ভোগ করার স্যাটিসফ্যাকশন।

এই হাসির সময়টুকুর অবসরে একটি বিচিত্র সত্য আবিষ্কার করলাম: আবিষ্কার করলাম, মণিবউদির সেই সামনের ঈষৎ উঁচু দাঁতদুটি ঠিক তেমনিভাবেই উঁচু এবং চকচকে থাকা সত্ত্বেও সেই দেখনহাসি রূপটি তাঁর চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।

* * *

অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবে কমলকুমার প্রমুখ জনকয়েক বাদী হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। দাবী—"অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের পত্নী বলিয়া বর্ণিত শ্রীমতী মণিমালা দেবী তদীয় স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব হইতেই স্বকীয় ভ্রষ্টাচার ও নীতি-বিগর্হিত আচার-আচরণের জন্য মৃত অমৃতলাল দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। এবং অমৃতলাল তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একজন শ্বেতাঙ্গ কুমারীকে রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই, নতুবা তাহাই করিতেন। এবং প্রতিবাদিনী শ্রীমতী মণিমালা দেবী ১৯৪৩ সাল হইতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অজুহাতে নানান জনের সহিত মেলামেশা এবং স্বেচ্ছাচার করিয়া আসিতেছেন একেবারে স্বৈরিণীর মত। ১৯৪৭ সালের পরবর্তীকালে সারা পৃথিবী জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং নানান কেলেঙ্কারি করিয়াছেন। লিখিত চিঠিপত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদিতে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ সমস্তই বাদীপক্ষের হাতে মজুত আছে। অমৃতবাবু শেষজীবনে এইসব কারণে এই স্ত্রীকে বর্জন করিবার যাবতীয় ব্যবস্থাদি করিয়াও, আকস্মিক মৃত্যু হেতু তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

"এইসব কারণে বাদীপক্ষের প্রার্থনা, এই ভ্রষ্টা নারীকে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়-পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হোক। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ভ্রষ্টা নারীর জাতিপাত

হইয়া থাকে বলিয়া সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সুতরাং সেই অনুযায়ী ধর্মত্যাগিণী জাতিচ্যুতা বিবাদিনীকে মৃত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়-পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হউক এবং সেই অধিকার তাঁহার ন্যায্য ও প্রকৃত উত্তরাধিকারিগণ এই বাদীগণের অনুকূলে ডিক্রী দেওয়া হউক।"

তার উত্তরে যে-জবাব দেওয়া হয়েছিল, সে-জবাব পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ওখানে বসেই কথাপ্রসঙ্গে এইসব বিবরণ মুখে বলতে বলতে, কি তাঁর ইচ্ছে হল জানি না, তিনি এক সময় বললেন—দাঁড়ান, আসছি, এক মিনিট।

উঠে গিয়ে অন্য ঘর থেকে মামলার নথির নকল এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন—পড়ে দেখুন। মুখে আর কত বলব ?

পড়ে দেখে, আগেই বলেছি, স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মুখে তো অনেকটাই বলেছিলেন। কমলকুমারদের দল, ব্যবসায়ের অজুহাতে যে-সব বিদেশীদের সঙ্গে মণিমালা দেবী অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেছিলেন এবং লছমনপ্রসাদের মত যে-সব অনুগতের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন, তাদের নাম স্বচ্ছন্দে মুখে এনে এই জবাবের বেলায় নথিটা কেন এনে দিলেন তা বুঝতে আমি পারিনি।

নারী রহস্যময়ী। তার চরিত্র তার নিজের কাছেই দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্ভেদ্য, এছাড়া আর কোন কৈফিয়ৎ আমি খুঁজে পাইনি।

জবাবের দুটো দিক ছিল।

প্রথমটা হল এই যে, এই সম্পত্তি একক অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের ছিল না। তাতে মণিমালা দেবী স্বকীয় পৈতৃক অর্থমূল্যে ব্যবসায়ের অংশীদার হয়েছিলেন। বিস্তৃত বিবরণের একটা সারাংশ দেওয়া ছিল। মণিমালার বাপ যে ক্যাশ-সার্টিফিকেট রেখে গিয়েছিলেন, সেই টাকাটা চুরি গিয়েছিল বলে যে পুলিশ-কেস হয়েছিল তা সত্য নয়। অমৃতবাবুই কৌশলে সে টাকা ও গহনা হস্তগত করেছিলেন। এবং বিবাহের অব্যবহিত পরেই অমৃতবাবু নিজের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বাজারচলিত সুদ দরেই ধার নিয়ে নিয়োগ করেছিলেন। এবং বৎসরান্তে সুদ হিসাব করে সেই সুদটাকে আসল হিসাবে নিয়োগ করে এসেছিলেন নিয়মিত-ভাবে। এইভাবে টাকাটা ক্রুদ্ধ বিন্ধ্যের মত মাথা তুলে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। যখন যুদ্ধের সময় নতুন করে বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নামলেন অমৃতবাবু তখন সমস্ত নিরাপদ ব্যবসায়গুলির মালিকানা দিয়েছিলেন মণিমালাকে।

জবাবে সেই কথাই বেশ বক্রভাবে ধারালো করে জানানো হয়েছিল। বলা হয়েছিল—মণিমালা দেবী এই সকল সম্পত্তিতে অমৃতলালের উত্তরাধিকারিণী স্ত্রী হিসাবে যেমন মালিক, তেমনি মালিক তিনি তাঁর স্বকীয় অধিকারে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছিল—এই সকল ব্যবসায়ের কর্ম-পরিচালনাকল্পে মণিমালা দেবী আজ বারো বৎসর ধরে যে স্বাধীনভাবে নানান জনের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন, তা স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের কালেই করেছেন এবং তাতে স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায়ের কোন

আপত্তিরই কারণ ঘটেনি।

আরও অনেক কথা। যার মধ্যে কোন অনাচার বা কদাচার বা জাতিপাতের মত ব্যভিচার করেন নি, এই প্রতিবাদটা উচ্চ নয়—উচ্চ হয়ে উঠেছে এই কথাটা যে মণিমালা যা করেছেন, তা অমৃতলালের জ্ঞাতসারেই করেছেন। ওই যে একটি বিদেশিনী মেয়েকে নিয়ে শেষবয়সে অমৃতবাবু মাতামাতি করেছিলেন, সে কথার উল্লেখ করেও যেন বলতে চেয়েছেন যে, একটা বোঝাপড়া করেই যেন এমনটা হয়েছে। যার যা মন চায় সে তা করেছে। জীবনের চুক্তির আসল অর্থও ঠিক এইরকম।

সেই কারণেই অমৃতবাবু উইলের কোন পরিবর্তন করেন নি। বন্ধ্যা হলেও তাঁকেই দিয়ে গেছেন তাঁর স্বকীয় সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার।

তার উপর বর্তমানকালে হিন্দু কোড বিলে যে-বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, নারী-পুরুষের অধিকারের ক্ষেত্রে—সে-বিচারেও এই ধরনের কোন আপত্তিকর দাবী উত্থাপনের অধিকার বাদীদের নেই।

তারপর যথানিয়মে এই মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে আদালতের সকল খরচ, যা তিনি বাধ্য হয়ে করেছেন, তা, বাদীদের কাছ থেকে আদায় পাবার প্রার্থনা জানিয়েছেন।

কাগজ থেকে মুখ তুলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন না, জানলা দিয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন নিবিষ্টচিত্তে, একেবারে যেন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

আমি মুখ তুলে তাকালাম, তিনি বুঝতে পারেন নি। বাধ্য হয়ে একটু সাড়া দিলাম। তিনি ফিরে তাকালেন। চোখোচোখি হতেই কাগজগুলি সামনে নামিয়ে দিয়ে বললাম—মিটিয়ে ফেলছেন?

একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। তবে সে কম্প্রোমাইজ নয়; দিল্লীতে কমলের দেওয়া যে টার্মসের কথা বলেছিলাম আপনাকে, তা নয়।

এর কোন জবাব দিলাম না, চুপ করে রইলাম। কি জবাব দেব?

উনি বললেন—সব ছেড়ে দিচ্ছি ওদের। বড় ঘেন্না করছে—এইসব নিয়ে প্রশ্ন, পাল্টা প্রশ্ন, জেরা করতে।

বুঝতে পারলাম। উকীল ব্যারিস্টারের কুটিল প্রশ্নজালের মধ্যে অসহায়া হরিণীর মত পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরণাপন্ন হয়ে উঠেছেন, তা থেকে মুক্তি চাচ্ছেন।

কিন্তু না। সে-কথা উনিই বললেন—দেখুন ভয় আমি পাইনি! না। ভয় নয়। আমি শেষ বারো বছর তো সারাদুনিয়া চষে বেড়িয়েছি—সব ঘেঁটে দেখেছি। পাপ বলুন পুণ্য বলুন ধর্ম বলুন অধর্ম বলুন এ-সবের কোন শাসনই আমার উপর কেউ খাটাতে পারে না। আমার সব সংস্কারের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি নিজে। শেষটায় তিনি নিজে—

চুপ করে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেন—নিজে তিনি তাঁর পুরানো কালে পিউরিট্যানি-

জমের ঝোঁক, ছেড়ে দেওয়া নয়, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। লনা মেয়েটা এক-পুরুষে এ্যাংলোইণ্ডিয়ান; মা ওর খাস বিলেতের মেয়ে, এদেশে স্বামীর সঙ্গে এসে বিধবা হয়ে একজন এ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করেছিল। মেয়েটার রূপ ছিল—তারও ওপরে ছিল আশ্চর্য একটা চার্ম। মোহ। তার সঙ্গে তাঁর কিছুদিন ধরেই দিনরাত্রি দুইই কাটতে লাগল। যুদ্ধের সময়; মেয়েটাকে প্রথমে নিয়েছিলেন টাইপিস্ট হিসেবে, তারপর তাকে করলেন নিজের সেক্রেটারী।

বার কয়েক ঘাড় নাড়লেন সে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে।

সে-ভঙ্গিতে মানুষ দুটো কারণে ঘাড় নেড়ে থাকে। এক মনে-মনে বুঝে উপভোগ করে ঘাড় নাড়ে, এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আবার ওদিক থেকে এদিক পর্যন্ত। যতক্ষণ মনে-মনে মানুষ এই উপভোগের রতি ভোগ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলে এই ঘাড়নাড়া। আর এক কারণেও এইভাবে ঘাড় নাড়ে—সেটা হল একটি বেদনার্ত আক্ষেপের কারণে।

মণিবউদি কোন কারণে ঘাড় নেড়েছিলেন তা বুঝতে পারিনি। তবে মনে হয়েছিল আক্ষেপেই করেছেন। অমৃতদা মোটামুটি এই অধঃপতনের আগে পর্যন্ত একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল, তাঁর জীবনের দিগন্ত ছিল, যথাসাধ্য সূর্যালোকের দিকেই সামনে ফিরে পথ চলেছেন; দেশসেবার একটি ধর্ম বা পুণ্য এও তাঁর ছিল, এও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই মানুষ পঞ্চাশ বছর পার হয়ে অকস্মাৎ সব ঝুট হ্যায় বলে সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটির ধুলোর মধ্যে; এবং তার পরিবর্তে কুড়িয়ে নিলেন সংসারের রক্তমাংস ক্লেদ আর বস্তুপুঞ্জের মধ্যে থেকে একটি নারীদেহ ও আসবভাণ্ড। এর জন্য মণিবউদি আক্ষেপ ছাড়া আর কি করতে পারেন? হয়তো সে আক্ষেপ আরও বেড়েছিল—নিজের কারণে। এরই ধাক্কায় তিনিও—

বউদি বললেন—জানেন, বুঝতেই পারিনি। উনিও না। আমিও না। যুদ্ধের চাকায় দুনিয়া এমনভাবে পাক খেতে লাগল যে, কে কখন কোন পাতালে পড়ল বা উঁচুতে উঠল তার হিসেব খুব সহজ ছিল না। যুদ্ধের বাজারে এই ব্যবসাটিকে বিরাট একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে গেলাম আমরা। সুযোগ এসে গেল। ওই কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হল। বেশ কল্পনা করে প্ল্যান করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আপিসে স্টেনোটাইপিস্ট লনাকে ব্যবহার করবেন টোপ হিসেবে—তার সঙ্গে বললেন—মণি, তুমি সুদ্ধ দেখ। তুমি তো বোঝসোঝ, লেখাপড়া জান। অন্ততঃ আমার সঙ্গে একটু-আধটু ঘোরাঘুরি কর। তাই করতে করতে কখন যে পা পিছলে গেল ওঁর—।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, মানুষের জীবনে যে সব আমূল পরিবর্তনগুলো হয়, সেগুলো নাটক করে হয় না। আস্তে আস্তে হয়। মানুষ যেমন ভাবে বাড়ে তেমনি ভাবে হয়। লটারীতে টাকা পেয়ে যারা বড়লোক হয়, তাদের কথা ছেড়ে যারাই গরীব থেকে বড়লোক হয় তারা মানুষকে হকচকিয়ে দিয়ে বড়লোকী চাল ধরে না। মোটা কাপড় থেকে মিলের ফাইন কাপড়, তারপর

শান্তিপুরী কাপড় তারপর স্যুটটুট পরে। এবং নিজে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধে তখন আগের দিনের সঙ্গে সেদিনের নিজের গরমিল আদৌ মনে কোন সাড়া জাগায় না। ঠিক সেইরকম হ'ল। বারো বছরের উনি সেই পুরানো কালের স্বদেশী আদর্শের মানুষ, এককাল খদ্দরপরা মানুষ, স্যুট ধরলেন, সিগারেট ধরলেন, তার সঙ্গে মদ।

হেসে ফেলে বললেন, মদ ধরলেন কি ভাবে জানেন? হঠাৎ শরীর বড় ক্লান্ত হতে লাগল; weakness, অত্যন্ত টায়ার্ড। বিজ্ঞাপনের হরলিক্‌সে প্রতিকার হল না। তখন ওর সঙ্গে এক চামচ ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ডাক্তার বললেন, মিঃ মুখার্জ্জি, বয়স তো পঞ্চান্ন হল; এখন ইয়ং ম্যানের এনার্জি পেতে হলে আপনাকে সোমরস পান করতে হবে। বুঝেছেন? যখন টায়ার্ড ফীল করবেন তখন এক চামচ দু চামচ ব্র্যাণ্ডি খান। এ ছাড়া আমি বলি কি, আপনি রাত্রে ডিনারের সময় একটি পেগ পান করে নেবেন।

উনি বলেছিলেন, ভেবে দেখি।

আমি বলেছিলাম, এর আর ভেবে দেখবে কি? এ তো ওষুধ।

ডাক্তার বলেছিলেন, এক্‌স্যাক্‌টলি।

এর পর এক পেগ থেকে দু পেগ, দু পেগ থেকে তিন পেগ; তারপর ডিনার টেবিলে পুরো বোতল রেখে বিলিতী মতে ডিনার; খাবার আসত গ্রেট ইস্টার্ণ, গ্র্যাণ্ড থেকে; যুদ্ধ বিভাগের সাহেব থাকতেন অতিথি। প্রথম প্রথম হোস্টেসের কাজ করে দিত লনা; তারপর করতাম আমি। এই করতে করতে একটু একটু করে পিছলে পিছলেই বলুন, আর ভাসতে-ভাসতেই বলুন একেবারে এইখানে, এই বর্তমান কলঙ্ক-সমুদ্রে এসে পড়লাম, যেখানে জীবন-সমুদ্রে স্রোত আছে অথচ খুব তরঙ্গ নেই, যেখানে বরফ-জমা হিম শীতলতা নেই, উত্তাপও নেই। এবং আর একটা ব্যাপার আছে, সেটা হল একালের কালোচিত একটা প্রগ্রেসিভনেস, সমৃদ্ধ বড় বড় বন্দরের একটা সমাবেশ আছে তটে-তটে; ইমোশ্যন-সর্বস্ব জীবনের দিগন্ত বড় অনুর্বর। নির্জন, বড় উদাসীন, বড় নির্বাক। আমাদের, বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে, সেইটেই তো অভিযোগ ঠাকুরজামাই। সেকালে যারা আপনার দাদার খদ্দরের জামা-কাপড় পছন্দ করে নি, তারাই তাঁর স্যুট পরা দেখে ক্ষেপে উঠল। যারা আমার শিথিল কবরী পছন্দ করতে পারে নি, তারা আমার চুল কেটে ফেলাকে চরম সর্বনাশ মনে করে গাল দিতে লাগল।

যারা আপনার দাদার স্যুট-পরা চেহারা আর আমার ববছাঁটা-চুল চেহারা পছন্দ করে না তারা কি খুব প্রগ্রেসিভ নন্দাই?

হেসে ফেললেন মণি-বউদি।

তারপর বললেন, নেহাৎ পুরনো কালের এস্টাব্‌লিশ্‌ড্‌ সাহিত্যিক বলে কাপড়-জামাতে পার পেয়ে গেলেন, নইলে স্যুট কিম্বা হাওয়াই সার্ট আর প্যাণ্ট পরতেই হত। না হলে প্রগ্রেসিভ হতেন না।

আমি সেইবারই চায়না থেকে ফিরে এসেছি।

বললাম, না বউদি, আমিও এবার প্রগেসিভ বলে প্রমাণ দিয়ে এসেছি। কোটপ্যাণ্ট, —অবশ্য গলাবন্ধ প্রিন্সকোট—পরে চায়না গিছলাম। এবং ডিনার টেবিলে ওদের সেই অতি প্রাচীন মদ্যও পান করে এসেছি। বউদির শেষকালের কথাগুলি ভারী ভাল লাগছিল। কথাগুলির বিশেষত্ব ছিল এই যে, তাতে উত্তাপ ছিল না। অবজ্ঞা ঘৃণাও ছিল না। ওই ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেও কোন আক্ষেপও ছিল না। একটা দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে এল সূর্যাস্তের সঙ্গে গেল, তার মধ্যে রৌদ্র হল, মেঘ এল, হয়তো বৃষ্টি হল কিম্বা হল না; ফুল ফুটল, সারাদিন একটু একটু করে শুকালো, তারপর ঝরে পড়ে গেল। সূর্যাস্ত হল পাখীরা কলরব করল। শেষ হয়ে গেল। জগতের ইতিহাসে এই একটি দিন, এর সঙ্গে অন্য কোন দিনের মিল নেই, আবার সকল দিনের সঙ্গে এক ও অভিন্ন।

অমোঘ নিয়মে এমনি হয়। তেমনিই হয়েছে বা ঘটেছে তাঁর বেলায়।

আমি অন্তত এই বুঝেছিলাম। তিনিও যেন তাই বলতেই চাচ্ছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন, দেখুন তাঁর জীবনে যা ঘটেছে আমার জীবনে যা ঘটেছে তা আমরা ঘটাইনি, তা আপনি ঘটে গিয়েছে, আমাদের বাধা ও সচেতন চেষ্টা সত্ত্বেও। এ নিয়ে আমরা সুখ-দুঃখ দুই-ই ভোগ করেছি। ফলও খেয়েছি, কাঁটাতে সর্বাঙ্গ ছড়েও গেছে। সাধারণ অবস্থায় দেশে থাকলে হয়তো অনুতাপ দুঃখ অনুভব করতাম বাধ্য হয়ে; সকলে মিলে বাধ্য করত দুঃখ অনুতাপ বোধ করাতে। কিন্তু তার নাগালের বাইরে ছিলাম তখন। এই এতকালই ছিলাম। এ নিয়ে অনুতাপ আমার নেই। তাই ওই জবাব দাখিল করে লড়ব বলে কোমর বেঁধেছিলাম। এবং আমার জিতবার চান্সই বেশী। ওরাও ঘায়েল হয়ে পড়েছে। তবু আর ভাল লাগছে না। ওদের সব দিয়ে দিচ্ছি মানে একটা ট্রাস্ট করে তার ট্রাস্টি করে দিয়েছি, আর ওদের দিক থেকে শর্ত নিয়েছি যে, আমার অন্তে ওরা আমার উত্তরাধিকারী হিসেবে শ্রাদ্ধ করবে। খরচের পরিমাণ দেওয়া আছে। ওঁর নামে একটা বৃত্তি দেবার কথা আছে। বাকীটা ওরা খাবে। একটা বাড়ী-ভাড়ার আয় শুধু নিজের জন্যে রেখেছি, তা থেকে তিনশো টাকা আসবে। তার থেকেই আমার চলে যাবে। সেটা আমি ওই লছমনপ্রসাদকে দিয়ে যাব। ওই লোকটা ছেলে বয়স থেকে এ পর্যন্ত বরাবর আমাকে দিদিজী বলেছে এবং তার মর্যাদা ষোল আনা রেখে এসেছে।

চুপ করলেন মণিবউদি।

আমি নির্বাক হয়ে বসে শুনছিলাম, নির্বাক হয়েই বসে রইলাম। অসংখ্য প্রশ্ন মনের মধ্যে যেন মৌচাক ভাঙার পর উড়ন্ত মৌমাছির মত ঝাঁক-বন্দী হয়ে এদিকে-ওদিকে-সেদিকে মনের আকাশ ছেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল; আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ওই নারীটি। কিন্তু মণি-বউদির উপর আমি তাদের লেলিয়ে দিতে পারি নি। সেটা আমার দুর্বলতা যদি বা হয়, হতেও পারে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, মণি-বউদি তাতে ভীত ছিলেন না; আক্রমণ করলে তা সহ্যও তিনি করতে পারতেন হাসিমুখে।

বউদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার আপত্তি হবে না তো নন্দাই?

ওই নন্দাই সম্বোধনে সঙ্কল্পচ্যুত হলাম। আর থাকতে পারলাম না, অত্যন্ত ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মত বেঁকিয়ে প্রশ্নটা করে বসলাম উত্তরের ছলে, বললাম নন্দাই বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার ননদকে ননদ বলে স্বীকার করে লাভ তো শুধু কটু কথা শোনা।

বউদি বললেন, ওটা আমি অস্বীকার কিছুতেই করতে পারব না ভাই ঠাকুরজামাই। আই লাভ্‌ড্‌ হিম, আই ওয়ান হিম ; আমি ভালবাসার যুদ্ধে মাসীকে হারিয়ে জিতে নিয়েছিলাম। হি ওয়াজ মাই ওন।

হঠাৎ হেসে উঠে বললেন, আপনি পুরাণের খুব ভক্ত। পুরাণের কথাই বলি, কৃষ্ণ কার ? রাধার না রুক্মিণীর। রাধাও বলে আমার। রুক্মিণীও বলে আমার। আমি রাধাই হই, আর রুক্মিণীই হই—তিনি আমার। তাঁর উত্তরাধিকারিণী আমি।

এখানেই শেষ নয়।

আর একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল কাশীতে, দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর। দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে গঙ্গাস্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ১৯৬২ সাল, শীতকাল।

এক নজরে চেনার উপায় ছিল না। কারণ তখন তাঁর এত পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, একই ত্রিভুজকে দুই ভিন্ন স্থানে এঁকে বা রেখে কোনমতেই দুটিকে এক করে মেলানো গেল না।

এ এক উদাসিনী।

চুলগুলি রুখু, এবার তৈলাভাবে রুখু, এবং ববছাঁটা চুলগুলি বড় হয়ে পিঠ পর্যন্ত ঢেকে ছড়িয়ে আছে, বাতাসে দুলছে।

চোখে যেন ছুরির ধার।

সারা সর্বাঙ্গে যেন একটা আশ্চর্য জর্জর ভাব। যার উত্তাপ কেউ কাছে দাঁড়ালেই অনুভব করতে পারে। তিনি বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে বলেন, কি ? কি চাই ? সরে যান দু পা এবং নিষ্ঠুর হয়ে আঘাত করবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান।

আমি হরিশচন্দ্রের ঘাটে একখানা নৌকা ভাড়া করে শীতের অপরাহ্ণে শান্ত গঙ্গা বেয়ে চলেছিলাম মণিকর্ণিকার দিকে। হঠাৎ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এসে মনে হল ঠাণ্ডা যেন বড্ড ঘন হয়ে উঠেছে। নৌকা দশাশ্বমেধেই ভিড়িয়ে দিতে বললাম। ঘাটের কাছে এসেই চোখে পড়ল মণিবউদিকে। এবার সেই পুরানো ঢঙে ঝলমলে ছাঁদে ফিতে-পাড় শাড়ী পরে কাঁধে একটা ঝোলা ঝুলিয়ে উনি গঙ্গার বুকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

এরই মধ্যে কি করে যে চিনে ফেললাম, ইনিই মণি-বউদি, তা বলতে পারিনে।

ঘাটে নেমে এক পা এক পা করে এগিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ঘাটের মাথায় সেই উঁচুতে এসে সামনে দাঁড়ালাম।

উনি চমকে উঠলেন।

নিষ্পলক চোখের স্থির দৃষ্টিতেও তারা চকিতে চমকে উঠল, ঠিক সেই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দূরদিগন্তে খেলে যাওয়া বিদ্যুৎচমকের আভাসের মত। কপালে কুঞ্চন রেখা জেগে উঠছিল।

আমি বললাম, আপনি তো মণি-বউদি!

কপালে কুঞ্চনের রূঢ়তা শিথিল হয়ে গেল! ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। মিলিয়ে গেল ক্রমে।

আমি বললাম, আমি আপনার নন্দাই।

হাসলেন মণি-বউদি।

আশ্চর্যভাবে এতদিন পর সেই দেখনহাসি মেয়েটিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলাম। ভেবে পেলাম না, কোথায় সে এতদিন ঘুমিয়ে ছিল।

কথা তাঁর সঙ্গে অনেক হয়েছিল। সব কথাই পুরনো কথা। নতুন কথার মধ্যে বললেন, ঠাকুরজামাই আর বলব না আপনাকে, তার থেকে দাদা বলব।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মানে?

—মানে? মানে সব গোলমাল হয়ে গেছে দাদা। সব গোলমাল হয়ে গেছে। আজ ভেবে পাচ্ছি না, যাকে পেয়েছিলাম, তাকে চেয়েছিলাম কিনা। এত যে লড়াই করেছিলাম মাসীর সঙ্গে, সে কি ওই মানুষটাকে মাসী চেয়েছিল বলে ওকে কেড়ে নেবার ছুতো করে লড়াই বাধিয়েছিলাম? তাকে যদি না চেয়েছিলাম তো চেয়েছিলাম কাকে?

দাদা—ভিড় করে আসে মানুষের মিছিল।

অকপটে এই গঙ্গার ঘাটে বসে স্বীকার করছি—কাকে চেয়েছিলাম, এই প্রশ্ন যখন নিজেকে নিজে করি, তখন কত মুখ যে ভেসে ওঠে তার আর হিসেব-কিতেব নেই। তার মধ্যে পথিক আছে, ভিক্ষুক আছে, রাজা আছে—

থাক দাদা ওসব কথা। যাকে চাই তাকে পাই না, তাকে জানি না, তাকে চিনি না। যাকে পাই, যে আসে কাছে তাকে চাই না, যদি-বা দায়ে পড়ে তার হাত ধরি তো তার পর থেকেই পালাবার পথ খুঁজি।

নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেহটা যেন নতুন করে নিয়মকানুন করে নবীন হয়ে উঠল। শরীরে ভাল আছি।

কথাটা মিথ্যে নয়।

হেসে বললেন, নিজেকে বিশ্বাস করি নে। মরণের পথ তাকিয়ে আছি। বড় কৃচ্ছ্রসাধন করে কঠিন করে বেঁধে রেখেছি।

* * *

সেই মণি-বউদি মারা গেছেন।

চিঠি এসেছে।

শ্রাদ্ধ করেছে, দলিলের শর্তানুযায়ী অমৃতবাবুর উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমি জানি স্বর্গ থাকলে

মণিমালা পিণ্ডের অপেক্ষা না করেই স্বর্গে গিয়েছে।

আমি নিজের মনে-মনে স্মরণীয় পঞ্চকন্যার নামের সঙ্গে মণিমালার নাম ষষ্ঠ নাম হিসেবে জুড়ে দিয়ে তাঁর তর্পণ করলাম। দু-ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল। মণি-বউদি আমার আদরিণী গরবিনী—তিনি স্মরণীয়া, তিনি বরণীয়া। অন্ততঃ আমার কাছে তিনি স্ফটিকে গড়া নারীমূর্তি, তাঁর গায়ে কালি কাদা কলঙ্ক কোন কিছুর ছিটে লাগে না, দাগ ধরে না। অমলিনা আমার মণি-বউদি।

মধ্যে মধ্যে আর একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকি মারছে।

মণি-বউদি কি আমার ভারতবর্ষ?

কাঁধে ঝোলা নিয়ে দেবস্থান সাধু দৈবজ্ঞ খুঁজেছেন, আবার লিপস্টিকরুজ মেখে আধুনিকা সেজে পার্টি আলো করে বসেছেন। তারপর স্বাধীনা হয়ে সমস্ত অতীত সংস্কারকে বর্জন করে বিদেশের অভ্যর্থনার আসরে সর্বসংস্কারহীনারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন? কিন্তু—? শেষটা যে মেলে না।

গল্প

পৌষ-লক্ষ্মী

১৩৫০ সালের পৌষ মাস। পঞ্চাশ হল শয়ের অর্ধেক। শয়ে শূন্য। শয়ের অর্ধেক পঞ্চাশেও গাঁয়ের অর্ধেক লোক ঝেড়ে মুছে নিয়ে গেছে, বাকী অর্ধেক যারা আছে তারাও আধমরা, হিসাব ঠিক আছে। গাঁয়ের প্রবীণেরা এবং বিচক্ষণেরা পালপাড়ায় কালীঘরের সামনে অশ্বত্থতলায় বসে তামাক খেতে খেতে সেই কথারই আলোচনা করে। এক ছিলিম তামাকেই গোটা মজলিসের এখন পরিতৃপ্তি হয়, কলকে আজকাল আর দুটো লাগে না; যে তামাক এক এক জনে পুরো এক ছিলিম খেয়েও তৃপ্তি পেত না, সেই তামাক দুটান টেনেই লোকে এখন কাশতে শুরু করে, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করে উঠে। এবারের বানের ঠাণ্ডা ক্রমে শ্লেষ্মা হয়ে মানুষের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ বুকে জমে বসেছে গাঁয়ের খিড়কি-ডোবার পচা জলে থক থকে দলাশের মত।

সবচেয়ে বয়স বেশি মুকুন্দ পালের—ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। ভারিক্কি লোক। কালো কষকষে রঙ পালের, এককালে জোয়ানও ছিল খুব ভারি, তখন নাকি মাথায় ছিল বাবরি-চুলের বাহার। এখন পাল বুড়ো হয়েছে, তার ওপর এবারকার ম্যালেরিয়ায় ভুগে বার-কয়েক ধোপার পাটায় আছাড়-খাওয়া পুরানো কাপড়ের মতই এতবড় দেহখানা তার জ্যাল-জ্যাল করছে। মাথার চুলগুলি একেবারে কদমফুলি ছাঁটে ছাঁটা, এখন পেকে সাদা ধপধপ করছে; পাল প্রায়ই এখন মাথায় হাত বুলায়, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুলগুলির কড়া ডগার উজানের টানে হাতের তালুতে বেশ সুড়সুড়ি লাগে।

পাল হুঁকাটা ঘোষের হাতে দিয়ে বলে, একবার যদি কেউ পুরো এক ছিলিম তামাক খেতে পারে ঘোষ—। বলেই সে কাশতে আরম্ভ করে। কেশে, কাশির ধমক সামলে কথাটা শেষ করে—তবে আর বুকে মালিশ লাগে না। বেবাক শ্লেষ্মা, বুঝেছ? আবার এক ধমক কাশি আসে, এবার মোটা এক চাকা শ্লেষ্মাও উঠে যায়, পাল আরাম পায়। ঘোষ তখন কাশতে শুরু করেছে। তারপর আরম্ভ হয় শয়ের অর্ধেক পঞ্চাশের আলোচনা। হিসাব-নিকাশ ঠিক আছে। চিত্রগুপ্তের কলম। ভুল কি হয়?

ঘোষ কয়েকবার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয়। মুনি-ঋষিদেরই মতি-বেভ্রম হয়, তা চিত্রগুপ্ত। হাজার হলেও চিত্রগুপ্ত তো বামুন নয়, কায়স্থ—এবারেই ভুল হয়েছে।

সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কি ভুল হল? এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

নদীর ধার পর্যন্ত খোলা পূর্বদিকের পানে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে ঘোষ বলে, ধান।

পূর্বদিকে নদীর ধার পর্যন্ত গাঁয়ের মাঠ, তিন ভাগে ভাগ করা—ষাঁড়া জোল, মাঝের জোল, বেনো কুল। নামেই তিন ভাগে ভাগ করা, নইলে মাঠ একটাই। গ্রামের কোল থেকে নদীর ধার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্র। গোটা মাঠখানি এবার ধানে থইথই করছে, সোনার বরণ রঙ ধরে এসেছে। ওই ধানই জীবনকাঠি, মরণকাঠি; এবারের ধান ঘরে উঠলে জীবন

থাকবে, নইলে মরণ—অবধারিত মরণ, তাতে আর কোনোও সন্দেহ নাই। ভরসার মধ্যে বাগ্‌দীকাহার-মুচিরা যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি ফিরে আসে। আর যদি আসে দুমকা থেকে সাঁওতালের দল।

গাঁয়ের বাগদী-কাহার মুচি এদের যারা দিনমজুরি খাটে, চাষ করে না, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময় গাঁ ছেড়ে চলে যায়। বিশেষ করে অজন্মা আকাড়া হলে সেবার দল বেঁধে চলে যায়, অজন্মা না হলেও দু ঘর এক ঘর যায়, আবার ফেরে এই ধান কাটার সময়। কেউ কেউ সেই বছরেই ফেরে, কেউ কেউ ফেরে পাঁচ বছর পর, কেউ বা ফেরে এক পুরুষ পর। দল বেঁধে ফেরে এমনই বাহান্ন পউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে। ওরা এমনই ধারা সুখের পায়রা চিরকাল, দুঃখের ঘরে থাকা ওদের স্বভাবের বাইরে। সকল সুখের মূল যখন লক্ষ্মী, তখন এবার ওরা আসবে—এই ভরসা নিয়ে খানিকটা শান্তি পায় পাল মশায়েরা। সকালে বিকালে ঠুকঠুক করে যায় ওদের পরিত্যক্ত পাড়াটার দিকে। পড়ো ভাঙা বাড়িগুলো খোঁজ করে, পাড়ার বাইরে বটবাগানের বটগাছগুলোর তলার দিকে চায়। এখানে খোঁজ করে, নূতন আগন্তুক কেউ এল কি না। এ গ্রাম থেকে পালিয়ে যেমন এখানকার ওরা অন্য গ্রামে যায়, তেমন অন্য গ্রামের তারাও তো এ গ্রামে আসতে পারে। তেমন-যারা আসে, তারা প্রথম বাসা পত্তন করে এই বটবাগানে কোনো গাছের তলায়। কিন্তু কেউ আসে নাই আজও পর্যন্ত। পালমশায়দের উৎকণ্ঠার সীমা নাই। থই-থই-করা মাঠ-ভরা ধান, এ তারা তুলবে কি করে? রাত্রে ঘুম পর্যন্ত হয় না।

তবুও মাঠে ধান কাটা চলছে। রুগ্ন দুর্বল শরীর নিয়েও মানুষ ভোরবেলায় কাঁথা গায়ে দিয়ে কাস্তে হাতে মাঠে যায়। মাথায় গামছা বাঁধে কন্ফটারের মত। নাক দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে, পৌষের ভোরের শীতে হাতের আঙুল বেঁকে যায়, তবুও সেই আড়ষ্ট হাতের মুঠায় কোনোমতে ধানের ঝাড়ের গোড়া চেপে ধরে ডান হাতের কাস্তে টানে।

মুকুন্দ পালের কৃষাণ কাল থেকে জ্বরে পড়েছে। পালকে আজ নিজেকেই আসতে হয়েছে মাঠে। কিন্তু কাস্তে যেন চলছে না। হেঁট হয়ে কাস্তে টানতে কোমরে টান ধরে অসহ্য বেদনায় টনটন করে উঠছে। যেন কোমরের দড়ির মত শিরাগুলো শুকিয়ে কাঠির মত শক্ত হয়ে গেছে; হাড়ের গাঁটে গাঁটে জমে গেছে বালিতে মাটিতে জমাট বাঁধা পাথরের চাঁইয়ের মত। পাল কোমরে হাত দুটি রেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। হেঁট হয়ে থাকা যত কঠিন, হেঁট হয়ে কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়ানও তেমনই কঠিন। শাঁখের করাত, যেতে কাটে, আসতেও কাটে, কোমরের ভিতরে যেন শাঁখের করাত চলছে মনে হচ্ছে।

—হায় ভগবান!—পাল উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজটুকুর দিকে চেয়ে দেখে আপনার মনেই বললে, হায় ভগবান। শুধু আক্ষেপই নয়, নিদারুণ লজ্জায় তার মাথাও হেঁট হয়ে আসছে। আপনার কাছেই মাথা হেঁট হচ্ছে। কতটুকু কেটেছে সে। তালপাতায় বোনা চ্যাটাই, লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় আড়াই হাত, এখানে বলে 'তালাই'; এক তালাই-ভর জমির ধানও কাটা হয় নাই।

হঠাৎ তার চোখ ফেটে জল এল। তার পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় তার সঙ্গীরা তাকে বলত—গাঁদা। যৌবন মুরুব্বিরা তার নাম দিয়েছিল—ভীম। প্রৌঢ়ত্বে লোকে বলত—মোটা মোড়ল, এখনও বলে। মনে পড়ে গেল পুরনো আমলের ধান কাটার কথা। সে সব আজ কাহিনী মনে হচ্ছে। এমন মাঠ থই-থই-করা ধান এবারেই নতুন নয়। কতবার হয়েছে। ভোরের আকাশে শুকতারা তখন জ্বলজ্বল করত আঁধার ঘরের মানিকের মত। উত্তর দিক থেকে সিরসির করে বয়ে যেত হাড়-কনকনানি ঠাণ্ডা বাতাস। গাছপালার পাতা থেকে গাছপালার শুকনো পাতার উপর সত্যি সত্যি টপটপ শব্দে শিশির ঝরত, ঘাসের উপর পা দিলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে যেত। পথের ধুলার উপর পাটালির মত এক পুরু ধুলা শিশিরে ভিজে জমে থাকত, পা দিলে ভেঙে যেত। ধানের মাঠে এলে, শিশিরে-ভেজা নরম ধানের গাছে সে গন্ধ; বেলায় এসে আজ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু সে গন্ধ মনে আছে তার। সেই ভোর থেকে আরম্ভ হত ধান-কাটা।

পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে; এ হাতের গ্রাস, লোকে বলে, এক পো চালের ভাত ওঠে। এক পো কি আর ওঠে? লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠায় সে খপখপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতে কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত; তার এই মুঠার তিন মুঠা ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুন না হোক, দেড়া মোটা হত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়মড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি কমে আসারই কথা। তবুও গত বছর পর্যন্ত সে এক প্রহর বেলা পর্যন্ত আধখানা ক্ষেতের ধানও কেটেছে। কিন্তু এই কটা মাসে এ কি হল তার?

—কি কত্তা, ডাঁরিয়ে রইচ যে? কি হল?

আপনার ভাবনার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল পাল, তার মন উদাস হয়ে সেকালের সেই আমলে চলে গিয়েছিল, মধ্যে মধ্যে এই জমিখানাই যেন দেখাচ্ছিল সমস্তটা কাটা হয়ে গেছে, এ-ধার থেকে ও-ধার পর্যন্ত, আঁটি আঁটি করে সাজানো রয়েছে কাটা ধান, ক্ষেতের লালচে মাটি দেখা যাচ্ছে, লালচে মাটির উপর কাটা ধানের গোড়া জেগে রয়েছে লাল রঙের দাবার ছকের উপর সাদা রঙের ঘুঁটির মত।

পিছন থেকে কে ডেকে কথা বললে। পাল ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিও কমে এসেছে। গেল বছর পর্যন্তও পাল বিনা চশমায় চট-সেলাই-করা সুচে শনের সুতলির দড়ি পরিয়েছে, বস্তার মুখ সেলাই করেছে। কিন্তু এই বছরের এক ধাক্কাতেই বেলা কাবার করে দিলে, চারিদিকে ঝাপ্‌সা। তুলসী তলার পিদিম জ্বালার সময় হয়ে এল। আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পাল লোকটির দিকে তাকিয়ে বললে, কে?

—আমি গো; চিনতে পারছ না, না কি?

পালের এবার খেয়াল হল, ছোকরা-মানুষের গলা; মুহূর্তে সে চিনতে পারল ছোকরাকে।

মন তার বিষিয়ে উঠল।

—নজর গেল তাহলে কত্তা। আমি গো, চিকেষ্ট।

—চেকা ?

—হ্যাঁ গো। বলি ডাঁরিয়ে রইচ যে ?

তুই কোথা যাবি ? মাঠ থেকে পালিয়ে এলি নাকি ? জ্বর এল ?

—জ্বর ?—চিকেষ্ট হি-হি করে হাসতে লাগল।—জ্বর-ফর আমার কাছে ঘেঁষে না। সেই তোমার আশ্বিন মাসে একবার। তার পরে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

পালের বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল, সাপের গজরানির মত, নিশ্বাসের সঙ্গেই সে বললে হুঁ।

—মদ আর মাস ও হল জ্বরের যম। বুয়েচ ?—হি-হি করে আবার হাসতে লাগল চেকা।

—তা যাবি কোথা, যা না কেনে ? ফ্যাকফ্যাক করে হাসতে বুঝি মজা লাগছে আমার ছামনে ডাঁরিয়ে ?

চেকা আবার হাসতে আরম্ভ করে দিলে। বললে, যাচ্ছি তোমার ওই মাঝের জোলে পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চকে—তোমার দরুন গো। এ খান সারা হয়ে গেল।

পাল হঠাৎ হেঁট হয়ে ঘষঘষ শব্দে আবার ধান কাটতে আরম্ভ করে দিলে। চেকার কথার ওই 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘে তোমার দরুন' কথাটা তপ্ত লোহার শলার মত পালের বুকে যেন বিঁধে গিয়েছে। ওই জমিটা পালের কাছ থেকে চেকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কিনেছে এই বৎসরই বর্ষার ঠিক আগে। ধানের দর আঠারো টাকা, চাল তিরিশ, পালকে বাধ্য হয়ে বেচতে হয়েছে। চেকা বোধ হয় খোঁচা মারবার জন্যেই কথাটা বলেছে। খোঁচাটা লেগেছে পালের বুকে।

চেকা তবু গেল না। দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। বললে, সেই সকাল থেকে এই এক তালাই কাটলে না কি ?

পাল এ কথারও কোন উত্তর দিলে না। সে ধান কেটেই চলল। চেকার এ কথার মধ্যেও হুল আছে।

—কত্তা!

পালের কোমর আবার কনকন করে উঠেছে; মনের জ্বালার উপর শরীরের যন্ত্রণায় পাল এবার আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। সে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল দেহের উপর একটা হ্যাঁচকা টান মেরে, মট্ করে শব্দ হল হাড়ে। পাল রাগে অধীর হয়ে বলে উঠল, কেনে রে শালা, কেনে ? কি, বলছিস কি ?

চেকার হাসি বেড়ে গেল, সে চটপট শব্দে বার কয়েক বাই ঠুকে বললে, হবে না কি, এক হাত হবে না কি এই ধানের গদির উপর ?

বলেই সে দাঁড়াল না, নিতান্ত অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে একটা গান ধরে সে চলে গেল। পাল

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দিয়ে এবার তার জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

মুকুন্দ পাল—এককালের ভীম, প্রৌঢ় বয়সের মোটা মোড়ল, তাকে ঠাট্টা করে গেল ওই শ্রীকৃষ্ণ—চেকা। সম্বন্ধে সে মুকুন্দের নাতি, সম্বন্ধটা ঠাট্টারই বটে; কিন্তু এ ঠাট্টা মুকুন্দের পক্ষে মর্মান্তিক।

শ্রীকৃষ্ণ এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী। উঠানে গোলায় গোলায় ধান আছে, ঘরে টাকা আছে। মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই করা খত আছে ওর ঘরে। 'পাঁচ কিত্তে তিন বিঘের চক' বলে সেই কথাটা চেকা ঠাট্টা করে বলে গেল। ওতে পাল ব্যথা পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে; কিন্তু ওর উপর হাত নাই। ও দুঃখ মনে মনেই চেপে রেখেছে মুকুন্দ। কিন্তু ওই যে বাই ঠুকে বলে গেল—হবে নাকি এক হাত? ওর অর্থ হল, মুকুন্দের শরীরের এ অবস্থা দেখে সে তার সঙ্গে একদফা কুস্তি লড়তে চেয়ে গেল।

একালের ছোকরাদের মধ্যে চেকাই হল সকলের চেয়ে বড় জোয়ান। পালের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল। মনে পড়ল, বছর আষ্টেক আগে আমুতির লড়াইয়ের আখড়ায় যখন শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আছাড় দিয়ে আখড়ার মাটির উপর বাই ঠুকে পড়ে ছিল, তখন হাসতে হাসতে মুকুন্দ গিয়ে বলেছিল, কই আয় দেখি, আমার সঙ্গে আয় এক হাত।

অন্য পাঁচজনে, বিশেষ করে যগন্দ ঘোষ, তার হাত ধরে টেনে বলেছিল, ছি ছি ছি! তোমাকে না কি লড়তে হয় ওই বালকের সঙ্গে। ছি!

শঙ্কিত হয়ে বারণ করেছিল সবাই, পালের শরীরের যা ওজন, তাতে সে যদি চেকার উপর কোনোমতে চেপে পড়ে, তাহলেই ছোঁড়াটা ঘায়েল হয়ে যাবে। শঙ্কিত হয় নাই শুধু ছিকেষ্ট, সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, এই, হট যাও সব, লড়ব আমি।—চেকার স্পর্ধা চিরকালের। পাঁয়তারায় ঘুরতে ঘুরতে আবার সে বলেছিল, মোটাকে সাথ আঁটা লড়েগা, হট যাও।—পালের দেহখানা প্রকাণ্ড বলে এবং লোকে তাকে মোটা মোড়ল বলে বলে, সেই দশের সামনেই সে নিজের নামকরণ করেছিল—আঁটা, অর্থাৎ আঁটসাঁট দেহ তরুণ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সে গরম জল হয়ে গিয়েছিল। মুকুন্দ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ধরে গোটা আখড়াটার চারিধার ঘুরে আখড়ার মাটির উপর ফেলে দিয়েছিল—বেশ একটু জোরেই ফেলে দিয়েছিল।

তাই আজ চেকা মোড়ল তাকে ঠাট্টা করে গেল। বাই ঠুকে আস্ফালন করে লড়াই করবার জন্যে প্রায় হাঁক মেরে ডাক দিয়ে গেল।

হায় ভগবান! কি কাল জ্বর তুমি দুনিয়ায় পাঠালে। রক্ত জল করে দিলে, মাংস সব যেন চিবিয়ে লোল করে দিলে, হাড়ে পর্যন্ত ঘুন ধরিয়ে দিলে। চোখের দৃষ্টি গেল। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। দু-পা জোরে হাঁটলে হাঁপাতে হয়। নইলে সে তো বুড়ো নয়। ষাট

বছর বয়স কি এমন বয়স? তার বাপ পঁয়ষট্টি বছর বয়সে পাঁচসেরী কোদাল চালিয়েছে জোয়ান কৃষাণের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে। সে নিজে? নিজেই তো সে এই বর্ষাতেও কোদাল চালিয়েছে, লাঙলের মুঠো ধরেছে। হঠাৎ এ কি হল? হায় ভগবান! বুড়ো করে দিলে?

—কি? চলছে না হাত? দাঁড়িয়ে আছ?

—কে?

—আমি।—সকরুণ কণ্ঠে বললে যগন্দ ঘোষ, আমিও পারলাম না। ফিরে এলাম।

—যগন্দ, এ কি হল ভাই যগন্দ?

যগন্দ বললে, লা এসে ঘাটে নেগেছে। আর দেরি নাই।—যগন্দর গলা কাঁপছে, স্পষ্ট বুঝতে পারলে মুকুন্দ। সঙ্গে সঙ্গে তারও চোয়ালের নীচের সমস্ত মাংসটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

যগন্দ এগিয়ে এসে বললে, তামাক খাও।

আলের উপর দুজনে বসল। মুকুন্দর হাতে হুঁকো ধরাই রইল। সে যেন বড়ই ভাবছে।

যগন্দ তাকে হুঁকোর কথা মনে পড়িয়ে দিল, খাও।

—হুঁ।—হুঁকোয় সে শুধু মুখই দিলে, টানলে না। তারপর হঠাৎ বললে, লায়ে পার হতে তো ভয় নেই যগন্দ, হরি বলে নাপিয়ে লায়ে চড়তে পারতাম, তবে তো! কিন্তু এ কি পাপের ভোগ বল তো? হ্যাঁ হে, তিন-চার মাসের কটা জ্বরে এ কি হল বল তো?

—বুড়ো হয়ে গেলাম ভাই।

মুকুন্দ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, চেকা আমাকে বাই ঠুকে বলে গেল যগন্দ, এক হাত হবে না কি। আমাকে ঠাট্টা করে গেল।

রোদ উঠেছে। শীত কেটে এসেছে। হাত-পা কোমরের আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছে অনেকটা। হঠাৎ মুকুন্দ গায়ের র‍্যাপারখানা খুলে ফেললে।

যগন্দ বললে, করছ কি? ঠাণ্ডা লাগবে।

—উঁহু। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। গা ঘামছে। দেখ তুমি।

যগন্দর কিন্তু ততখানি উৎসাহ হল না। সে বললে, মাঠে বসে আর কি করবে?—চল, বাড়ি যাই।

—তুমি যাও যগন্দ। আমার ভাই, ভুঁইখানা না সারলে চলবে না। কিষেণ ছোঁড়ার জ্বর।

যগন্দ অবাক হয়ে গেল। বললে, সকাল থেকে তো দেখলে, আবারও সাধ হচ্ছে তোমার?

—যাও, যাও হে, তুমি যাও।

মুকুন্দ আবার নেমে পড়ল মাঠে। যগন্দ চলে গেল। রোদের তাপ এসেছে, বেদনা-

ভরা সর্বাঙ্গে যেন মিঠা মিঠা সেক লাগছে। আরাম পাচ্ছে মুকুন্দ। আ-হা-হা, হে দেবতা, তোমার মত এমন মহিমা আর কারও নেই। তোমার রোদে পাঁশুটে ধানগাছে সবুজ রঙ ধরে, তোমার যত রোদ তত জল, তোমার তাপে আড়ষ্ট দেহে জোর ফিরে আসছে, গাঁঠে গাঁঠে বুড়ো বয়সের পুরু চর্বি গলছে। মুকুন্দ হাত দুটো উপরে তুলল, বার-কয়েক ভাঁজল, কব্জি থেকে হাতের মুঠোটা ভাঁজল, বার-কয়েক বসল উঠল। কিন্তু হাঁপ ধরছে। ধরুক। তবু তার মনে হল, সে যেন অনেকখানি ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে—হ্যাঁ, অনেকখানি।

হেঁট হয়ে সে আবার ধানের গোড়া মুঠোয় চেপে ধরলে। কাস্তে চলতে আরম্ভ করল।

—ওরে বাস রে। এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে!—বছর বাইশের একটি মেয়ে, এক হাতে জলখাবার, অন্য হাতে জলের ঘটি নিয়ে এসে দাঁড়াল। মুকুন্দ ধান কেটে চলেছিল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু তাতে ধান কাটার চেয়ে তার দেহখানাই যেন বেশি চলছিল। ভাঙা কল চলে, তাতে যেমন কাজের চেয়ে কলটা ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে বেশি, শব্দ হয় জোরে, তেমনি ধারা ধান কাটার বেগের চেয়ে মুকুন্দের মনের আবেগটা শরীরে প্রকাশ পাচ্ছিল বেশি। সে কিন্তু মুকুন্দ বুঝতে পারছিল না। সে কাজ করেই চলেছিল। হঠাৎ মেয়ের গলায় ওই কথাটা শুনে, সে সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল। সমস্ত মাঠখানায় ঐ নদীর ধার পর্যন্ত তবকে তবকে যেন সে হাসির প্রতিধ্বনি বিছিয়ে গেল। মোটা গলায় সে ছড়া কাটলে—

সিঁদুর-মুখী ধানে ধানে ভরিবে গোলা
আমার সোনামুখীর হবে সোনার কাঠির মালা।

—ওই! তোমার হল কি আজ বুড়ো বয়সে?—মেয়েটি বললে। সে সত্যিই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।

মুকুন্দ চমকে উঠল। মুহূর্তে তার হাসি থেমে গেল। মুখখানা হয়ে গেল পাথরের মত। তার অকস্মাৎ ভুল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল আগে, তখন তার বয়স ত্রিশ। উনত্রিশ বছর বয়সে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মারা যায়। একুশ বছরে গিয়েছিল প্রথম স্ত্রী, পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় জনা—একটি ছ-বছরের মেয়ে রেখে গিয়েছিল; উনত্রিশ বছর বয়সে তৃতীয় জনা। লোকে বলত, মুকুন্দ পাল অজগর পুরুষ; বিয়ে হলেই নির্ঘাত যাবে। মুকুন্দও এটা বিশ্বাস করেছিল। গণৎকারেও তাই বলেছিল, রাক্ষস গণ, পত্নীস্থানে শনি মঙ্গল রাহু; শিবের সাধ্যি নাই তোমার পরিবার রক্ষা করতে। মুকুন্দ নিজের হাতের তালুর কড়ে আঙুলটরে নীচে স্পষ্ট দেখেছে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। তাই সে আর বিয়ে না করে ঘরে এনেছিল পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের বাবুদের বাড়ির একটি বিধবা তরুণী ঝিকে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, জলচল জাতের মেয়ে, তাতে আর ভুল নাই; তবুও অধিকন্তু ন দোষায়—মুকুন্দ তাকে বৈরাগীদের আখড়ায় কণ্ঠি পরিয়ে বৈষ্ণবী করে পেড়ে-শাড়ি, হাতে চুড়ি পরিয়ে ঘরে এনেছিল। ত্রিশ বছর আগে, এমনই করে সে আসত তার জলখাবার নিয়ে। তেরো শ' বিশ সালও ছিল একটা শূন্যের বছর, সেবারও হয়েছিল এমনই বান, এমনই ধান। হয় নি শুধু চালের মন

তিরিশ টাকা, আর হয় নি এমন কাল জ্বর। সেবারও ধান কাটছিল মাঠে। সে এসে বলেছিল ঠিক ওই কথাটি, ঠিক ওই কটি কথা, মুকুন্দ এমনই করে হেসেছিল আর ওই ছড়াটি কেটেছিল। আজও সেই রকম মাঠ ভরা ধান। আজও সে যেন ঠিক তেমনই হুসহুস করে ধান কেটে চলেছে, এমন সময় তেমনই ভাবে এসে দাঁড়িয়ে সেই কথা কয়টি বলায় মুকুন্দের ভুল হয়ে গেছে। বৈষ্ণবীও অনেককাল আগে মরে গেছে। মুকুন্দ বলে, গত হয়েছে।

এ মেয়েটি মুকুন্দের নাতনী—মেয়ের মেয়ে। সম্বন্ধ ঠাট্টার। কিন্তু মুকুন্দ কখনও ঠাট্টা করে না। একটি ছেলে কোলে নিয়ে মেয়েটি পনেরো বছরে বিধবা হয়েছে। মেয়ে বিধবা হয়েছিল ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে। মুকুন্দ জীবনে দুটি শিশুকে কোলে করে মানুষ করেছে, প্রথম তার নিজের মেয়ে, তারপর এই নাতনীকে। নাতনীর ছেলেকে সে কোলে করে না। না, কাজ নাই।

দুই

মুকুন্দ বাড়ি এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু তাতে তার মেজাজ খারাপ হয় নি। শরীর এলে মেরে গিয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো অসুখ বোধ করছে না। কাজ সে অনেকটা করেছে। অনেকটা। সে খুশী হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে সে, সে বুড়ো হয় নাই। আসল দরকার ওষুধ আর খাওয়া-দাওয়ার, আর দরকার কাজের অভ্যাসের।

মেয়ে লক্ষ্মী এসে বাপকে দেখে কিন্তু শিউরে উঠল, বললে, বাবা তোমার কি শরীরের ওপর এতটুকুন মায়া-মমতা নাই? মুখের চেহারা কি হয়েছে দেখ দেখি। সরস্বতী বলছিল—

—কি বলছিল সরস্বতী?

লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী। পাল মশায়ের সেই নাতনীটি। লক্ষ্মী বললে, বলছিল—কত্তাদাদা ধান কাটছে, বাবা রে বাবা, একটা জোয়ানেরও সাধ্যি নাই এমন হাঁই হাঁই করে কাটতে।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। মাঠে আজ যে হাসি হেসেছিল, সে হাসি সে জোয়ান বয়সে হাসত; যে হাসি সে সরস্বতী বিধবা হবার পর আজকের আগে আর হাসে নাই, সেই হাসি। হাসির আওয়াজের ধাক্কায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা কাঁসার বড় থোরাটায় মৃদু প্রতিধ্বনির রেশ বেজে উঠল।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। বাবা হল কি?

—তোর বেটি বলে কি লক্ষ্মী, আমাকে বলে বুড়ো! তাই—। সে আবার হা-হা করে হেসে উঠে বললে, তাই তোর বেটিকে শুনিয়ে দিলাম সেই ছড়াটা, যে ছড়া বলতাম তোর মাকে।

লক্ষ্মী হাসলে।

পাল বললে, জানিস মা, এবার ধান যা হয়েছে। আ-হা-হা। ধান নয় মা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এবার খামারে বোধ হয় ধান বাঁধতে জায়গাই হবে না। তা ছাড়া গরু দুটোর যা হাল হয়ে আছে, তাতে—

পাল অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেলের জন্যে ভাবি না। ও আমার ঠিক আছে।

ও আমার ক্ষ্যাণজন্মা। ভাবনা বাছুরটার জন্যে। হাজার হলেও কাঁচা হাড়।

কেলে, পাল মশায়ের প্রিয়তম হেলে বলদ। একেবারে শৈশব থেকে তাকে পালন করেছে। এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু ভরা বয়সে কেলে ছিল এখানকার বিখ্যাত হেলে। পাল একা নয়, এখানকার সকল চাষীতেই একবাক্যে বলে, কেলে ক্ষণজন্মা গরু। একা কেলের সঙ্গে কাঁধ দিয়ে একে একে চারটা বলদ অকালে ঘায়েল হয়ে গিয়েছে। গতবার আবার একটা বাছুর অর্থাৎ সদ্য জোয়ান বলদ কেনা হয়েছে। কিন্তু আজও সে কেলের ডাইনে বইতে পারে না। এবার দুটা বলদেরই খুঁড়িয়া হয়েছিল গো-মড়কের সময়। দুটাই ভাগ্যক্রমে বেঁচেছে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছে। পাল কেলের জন্য ভাবে না। ভাবনা তার ওই নতুন সদ্য জোয়ান হেলেটার জন্য।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পাল বললে, চেকা আমাকে আজ বাই ঠুকে ঠাট্টা করলে মা।

কেউ উত্তর দিলে না। পাল পিছনে তাকিয়ে দেখলে লক্ষ্মী নাই, সে চলে গিয়েছে।

পাল উঠে গিয়ে দাঁড়াল কেলের কাছে। কেলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পালের দিকে চাইলে, তার গা শুঁকলে, তারপর ঘাড়টা লম্বা টান করে মুখটা এগিয়ে দিলে মুকুন্দের বুকের কাছে। এর অর্থ হল, গলকম্বলে সুড়সুড়ি দিয়ে দাও। পাল হেসে তার গলায় হাত বুলিয়ে পিঠে দুটো চাপড় মেরে বললে, দেখব বেটা এবার, কেমন ক্ষ্যামতা তোমার। হ্যাঁ।

তারপর আবার বললে, দাঁড়া না, তাজা করে দিচ্ছি। রশির মেয়ার ব্যবস্থা করছি আজ থেকে।—রশি হল ধেনো মদের সব চেয়ে কড়া তেজী অংশ। মেয়া হল তারই পচানো জিনিসের ছিবড়ে। ভারি উপকারী আর পোষ্টাই গরুর পক্ষে। চেকা মোড়ল নিজে খায় গৃহজাত অর্থাৎ ঘরে চোলাই-করা মদ। গরুদের খাওয়ায় রশি-মেয়া। একেবারে তাগড়া হয়ে আছে চেকার গরুগুলা; চেকা খায় মদের সঙ্গে মাংস। হাঁস আছে একপাল, হাঁসের বাচ্ছা খায়।

—কি করছ কত্তা?—সরস্বতী দাঁড়াল এসে দাওয়ার উপর।—খেতে দিয়েছি তোমার কেলেকে, উপোস করিয়ে রাখি নাই।

—কি?

—এস, ত্যাল মাখো। চান কর। খেতে-দেতে হবে না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

পাল এসে বসল। তেলের বাটিটা এগিয়ে দিলে নাতনী। পাল বললে, এক কাজ কর দিকিনি। ত্যালটা গরম করে নিয়ে আয় দিকিন।

গরম তেল মালিশ করতে বসে সে আবার ডাকলে, সরস্বতী।

—কি?

—এই পিঠে খানিক ত্যাল মালিশ করে দে তো বুন। খুব করে, আচ্ছা করে। উঁহু, উ তোর হচ্ছে না। আরও জোরে।

—আর আমার জোর নাই বাপু।

পাল হা-হা করে হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা, তবে গোটাকতক কিল মার দিকিনি। যত জোর আছে তোর।—আচ্ছা। আচ্ছা। আচ্ছা।

আমার হাতে লাগছে বাপু, আর আমি পারব না।—সরস্বতী সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

পাল আবার হা-হা করে হেসে উঠল। বলল, আমার কিন্তু তোর নরম হাতের কিল ভারি মিষ্টি লাগছে।

সরস্বতী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কর্তার মুখে এই এই ধারার কথাবার্তা কখনও শোনে নাই। হল কি কর্তার। মাকে বললে সরস্বতী, কত্তার গতিক ভাল নয় মা।

লক্ষ্মী চমকে উঠল। কথাটা তারও মনে হয়েছে, বাপের সেই হাসি শুনে। এ হাসি সে শুনেছে ছেলেবেলায়। বাপকে তখন লোক বলত—ভীম। সন্ধ্যার পর বাইরের দাওয়ায় পাঁচজনের সঙ্গে বসে তার বাবা এমনই ভাবে হাসত; সে তখন ছোট মেয়ে, বাড়ির ভিতরের দাওয়ায় শুয়ে ঘুমাত, বাবার হাসিতে তার ঘুম ভেঙে যেত।

বৈষ্ণবী মা বকত বাবাকে, কি এমন করে হাস, মেয়েটার ঘুম ভেঙে যায়, চমকিয়ে ওঠে।

বাবা আবার হাসত হা-হা করে। কাঁসার বাসনে খনখনে আওয়াজের রেশ বেজে উঠত, দরজায় কি জানালায় হাত দিয়ে থাকলে মনে হত, কি যেন একটা শিউরে উঠছে তার ভিতরে। সে হাসির প্রথম পর্দা ছিঁড়েছিল বৈষ্ণবী মা যাবার পর। তারপর খাদে নেমে ছিল লক্ষ্মী নিজে বিধবা হবার পর, সরস্বতী বিধবা হবার পর সে হাসি আর হাসে নাই তার বাবা। আজ সেই হাসি হাসতে শুনে কথাটা তারও মনে হয়েছে।

সরস্বতী বললে, কত্তা হয়ত আর বাঁচবে না, নয়ত কত্তার মাথা খারাপ হয়েছে। লক্ষ্মী শিউরে উঠে বললে, ও-কথা বলিস না সরস্বতী। তাহলে আমাদের দশা কি হবে, ভাব দেখি।

সরস্বতী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই চলে গেল সেখান থেকে।

লক্ষ্মী চুপ করে বসে ভাবছিল। যতই অশুভ হোক, সরস্বতী কথাটা মিথ্যা বলে নাই। আজ সন্ধ্যেবেলায় বলদ দুটোকে রশি আর মেয়া খাওয়াবার ঝোঁক উঠেছে, নিজে বৈষ্ণব মানুষ, মদকে যার এত ঘেন্না সেই লোক নিজে হাতে ওই সব জিনিস ঘেঁটেছে। বলদকে মেয়া রশি অনেকবারই খাওয়ানো হয়েছে, কিন্তু সেসব করত রাখালে। বাবা নাকে কাপড় দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দূরে। সেই লোক নিজে হাতে এই বুড়ো বয়সে—। চোখে জল এল লক্ষ্মীর। রাখাল নাই, কিন্তু কাহারপাড়ার কাউকে ডাকলেই হত। এ কি মতিভ্রম।

একটু বসে থেকে সে উঠল। উৎকণ্ঠা এবং কৌতূহলও হল বাবা কি করছে দেখবার জন্যে; সে চুপিচুপি বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য হয়ে গেল কোঠার উপরে ধুপধাপ শব্দ শুনে। যেন দুরমুশ দিয়ে কাঠের তক্তার উপর মাটি বিছানো মেঝেটা পিটছে। সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল। তার বাবা কুস্তি-গীরের মত কাপড় সেঁটে রীতিমত বৈঠক দিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। ধীরে ধীরে লক্ষ্মী নেমে এল। হায় রে। এই বয়সে বাবা শেষে পাগল হয়ে গেল।

তিন

শুধু মেয়ে আর নাতনীই নয়, গোটা গাঁয়ের লোকেরই কেমন যেন একটু খটকা লেগেছে। পাগল হল না কি? তার ওই হা-হা করে হাসি শুনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চায়। ভোর থেকে আরম্ভ করে জলখাবার বেলা পর্যন্ত পাল মাঠে ধান কাটে। তাতে অবশ্য কেউ কিছু মনে করে না। পালের কৃষাণটার জ্বরের সঙ্গে বুকের দোষ হয়েছে, আধা-ডাক্তার আধা-কবরেজ ভাগবতচরণ বলেছে, মারে হরি রাখে কে?—লোকটা মরবে। আজও পর্যন্ত বাগ্দী-কাহার যারা বর্ষার সময় চলে গিয়েছে, তারা কেউ ফেরে নাই। দুমকার ওদিক থেকে একটি দল সাঁওতালও আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলে আসে নাই। বর্ধমানে দামোদরের বাঁধ তৈরি হচ্ছে, রেলের সাঁকো তৈরি হচ্ছে, সারি সারি ক্রোশ বরাবর লম্বা এক-একটা সাঁকো; উড়ো জাহাজের আস্তানা তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে-সেখানে—কোনোটা দু ক্রোশ, কোনোটা পাঁচ ক্রোশ লম্বা; লাখে লাখে মজুর খাটছে, টাকাটার কমে মজুরি নাই, পাকা-মেঝের ঘরে দিচ্ছে নাকি থাকতে, ডাক্তার-ওষুধের পয়সা লাগে না, এই ঢাউস বড় বড় মোটরে চড়িয়ে নিয়ে যায়, আবার মোটরে দিয়ে যায়। সাহেবেরা সেখানে সন্ধ্যার পর নাচ গান হল্লা করে। মোটা বকশিশ দেয়। ভালো ভালো বিলাতী মদের বোতল নাকি গড়াগড়ি যাচ্ছে; টিনে-বন্ধ খাবার। এসবেরও প্রসাদ কি আর কিছু কিছু না পায় তারা? সব—সব মজুর গিয়ে সেখানে জুটেছে। কিসের জন্য এখানে আসবে?

নিজের নিজের ধান নিজে না কেটে উপায় কি? কাটেও তো তারা চিরকাল। এবার না হয় রোগ ধরেছে—কাল রোগ। তবু তো ধান তুলতে হবে। মাঠ-ভরা ধান, গোটা বছর রত্নাকর মুনির মত উইকে একপিঠ ভুঁইকে একপিঠ দিয়ে তপস্যার ফসল—লক্ষ্মীর আটনের দেবতা, গোটা বছরের মুখের ভাত, চালের খড়, গরুর আহার—এ তো তুলতেই হবে। ঘরের খামার খাঁ-খাঁ করছে, লক্ষ্মীর আটন খালি পড়ে আছে; গোলার মধ্যে চামচিকেতে বাসা বেঁধেছে, মাকড়সায় জাল বুনেছে; গোলার মধ্যে নিকিয়ে পরিষ্কার করে সব পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। তুলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেও সবাই, কিন্তু পালের ধান কাটা দেখে লোকে অবাক হয়েছে। পাল ধান কাটে আর আপন মনেই বলে, হেঁই-হেঁই-হেঁই। পা ফেলে যেন রোখা মাতালের মত। পাল কিছু দিন আগেও উঠত ধীরে ধীরে, বলত, আর কি সেদিন আছে? তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে মাথা ঘোরে।—বলে হাসত। সেই পালের হঠাৎ যেন নব-যৌবন হয়েছে। এ তো ভালো নয়। এমন করে খাটতে গেলে কোনদিন বুক ধড়ফড় করে মাঠেই মুখ গুঁজে পড়বে, আর উঠবে না, না হয়তো খাটুনির ধমকে পাল্‌টে পড়বে জ্বরে। এর উপর জ্বর হলে মেরে দিয়ে যাবে। নাও যদি মরে, তবুও উঠে আর হেঁটে বেড়াতে দেবে না সহজে।

তার উপর এসব কথা বললে, ওই হাসি।

যোগেন্দ্র বললে, কি, হল কি তোমার, বল দেখি?

পাল সেই হাসি হাসতে আরম্ভ করলে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, 'সন্ধ্যা বেলায় বলব।

—ওরে বাপরে। এত হাসি কিসের গো কত্তা ?

গলার আওয়াজেই চিনতে পেরেছিল পাল চেকা মোড়লকে। পিছন ফিরে দেখলে, চেকা পালই বটে। পাল ভুরু নাচিয়ে মাথা দুলিয়ে বললে, পারিস ? বলি, তুই পারিস ?

—কি ?

—এমনই হাসতে ? মরদ তো বটিস। জোয়ান বয়সও বটে, পয়সাও ঢের আছে। পারিস ?—কয়েক মুহূর্ত সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেকার দিকে চেয়ে থেকে আবার বললে, ফুসফুসি ফেটে যাবে কোলা-ব্যাঙের পেটের মত।—বলেই সে আবার হাসতে আরম্ভ করলে সেই হাসি।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গেল। তার আর কোনো রকম সংশয় রইল না, পালের মাথার সত্যিই গোলমাল হয়েছে। চেকাও প্রথমটা চুপ করে ছিল। একটু পর সে বললে, পালকে কোনো কথা না বলে যোগেন্দ্রকে বললে—ঘোষ-কত্তা, পাল-কত্তার নাকটা দেখেছ ?

যোগেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়েই তার মুখের দিকে চাইলে। পালের ভুরুও কুঁচকে উঠল। চেকা যে এবার বাঁকা বঁড়শির মত কথা বলবে, তাতে তাদের সন্দেহ ছিল না। চেকাকে তারা চেনে। টাকার গরমে মাটিতে ওর পা পড়তে চায় না। ওর কথায় জলের মাছ গায়ের জ্বালায় ডাঙায় মাথা ঠুকে আছাড় খেয়ে পড়ে।

চেকা বললে, দেখ ভালো করে দেখ। হুঁ হুঁ ঠিক।

—কি ?

—বেঁকেছে। কত্তার নাকটা বেঁকে গিয়েছে।

নাক বেঁকে গেলে মানুষের ছ মাসের মধ্যে অবধারিত মৃত্যু। নীল তারা দেখতে পায় না চোখ টিপে, আকাশের অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখতে পায় না। এমনিই নাকি অনেক কিছু হয়। চেকার কথা শুনে যোগেন্দ্র শিউরে উঠল। সে তার ঘোলাটে চোখের নিস্তেজ দৃষ্টি যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ করে চাইলে পালের মুখের দিকে। পালও চমকে উঠল, তার ডান হাতে ছিল কাস্তে, বাঁ হাতটা আপনি যেন উঠে গিয়ে পড়ল নাকের উপর।

চেকা হি-হি করে হেসে উঠল। শুধু হাসি নয়, তার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি। হাসির ধমকে তার মাথাটা মাটিতে ঠেকে গেল প্রথমটা, হাসির ধমকেই আবার যেন সোজা হয়ে উঠে পিছনের দিকে উল্‌টে পড়ে যাবার উপক্রম করলে।

চেকা বললে, ছমাস—আর ছমাস।—বলেই সে চলতে আরম্ভ করলে। কিছু দূরে গিয়েই সে আবার দাঁড়াল, বললে, মরণের ছমাস আগে, বুঝলে কত্তা, মানুষের এমনি নব-যৌবন হয়। বুঝলে ?

পাল আবার উৎকটভাবে হেসে উঠল, নিজের বাই দুটোতে চাপড় মেরে বললে, হবে নাকি ?

চেকা কিন্তু আর দাঁড়াল না। চলে গেল। পাল তার দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, যগন্দ! কেউ সাড়া দিল না। যোগেন্দ্র চলে গিয়েছে।

পাল কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার নাকে হাত দিলে।

—কত্তা, আজ যে ডাঁড়িয়ে রইচ?

সরস্বতী। সরস্বতী এসেছে জলখাবার নিয়ে।

—হুঁ।

—হুঁ কি? শরীর ভালো আছে তো?

—দেখ তো সরস্বতী, নাকটায় কি হল?

—কি হল? কই কিছুই তো হয় নাই। যেমন ছিল তেমনই আছে?

সরস্বতী খুব কাছে এসে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, হ্যাঁ, কই কিছুই তো—। উঃ, কত্তা, কি খেয়েছ তুমি কত্তা? সরস্বতী শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল।

লক্ষ্মী বললে মেয়েকে, চুপ কর, এ কথা কাউকে যেন বলিস না।

পাল কিন্তু নিজেই জানালে যোগেন্দ্রকে। সন্ধ্যাবেলায় তাকে ডাকলে, শোন, এস।

—কোথা?

—এস না আমার সঙ্গে।

গাঁয়ের বাইরে বট-বাগানে একটা গাছতলায় বসল পাল, যোগেন্দ্রকে বললে, বস।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে গিয়েছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করেছিল। মাথা খারাপ লোক, কখন কি করে বসবে হয়ত!

পাল তার গায়ের আলোয়ানের ভিতর থেকে বের করলে একটি বোতল, তার মুখেই পরানো ছিল কাচের ছোট ওষুধ-খাওয়ার গেলাস একটি।

—কি?—যোগেন্দ্রর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

পাল কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে বললে, গৃহজাত। খাও।

—সে কি?

গৃহজাত মানে—লুকিয়ে ঘরে চোলাই করা মদ। সাওড়াপুরের ভল্লা বাগদীরা তৈরী করে নদীর ধারে। এখানকার অনেকে গোপনে কিনে খায়। এ গাঁয়েরও দু-চারজন খায়; চেকা মোড়লই খায়। কিন্তু তা বলে যোগেন্দ্র খাবে কি বলে? পালই বা খায় কি বলে? বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা তাদের, বয়স হয়েছে, যাকে বলে এক পা ডোঙায় এক পা ডাঙায়। আজ পালের এ কি আচরণ?

ততক্ষণে ছোট গেলাসে খানিকটা ঢেলে ঢুক করে ওষুধ খাওয়ার মত খেয়ে ফেলে পাল বললে, জ্বর পালাতে পথ পাবে না, তিন দিনে গায়ে তাগদ পাবে; আমার মতন খাটতে পারবে।

গেলাসটায় যোগেন্দ্রর জন্যই খানিকটা ঢালতে ঢালতে সে বললে, ওই শালা চেকা, চেকা

শালা একদিন আমাকে বলেছিল। বুঝলে, আমার খানিক আশ্চর্যও লাগত, সবাই জ্বরে ওলট-পালট খেলে, ওই শালার একবার কই জ্বর হল না কেন? তা শালাই আমাকে বললে, সেই যে, যেদিন বাই ঠুকে আমাকে ঠাট্টা করেছিল, সেই দিন। বলেছিল—মদ-মাস খাই, জ্বর আমার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা দেখলাম, হ্যাঁ, দব্যিটা উপকারী বটে। তাগদ আমি পেয়েছি। নাও, খাও।

যোগেন্দ্র সভয়ে সরে বসল। বললে, না।

—না লয়, খাও।

—ছি ছি, ছি পাল, ছি। এই বুড়ো বয়সে—

—ধেৎ তেরি!—পাল ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিসের বুড়ো বয়স হে? বুড়ো বয়স কিসের? বুড়ো বয়স! কই ডেকে আন তোমার কে ছোকরা আছে, ডেকে আন আমার কাছে। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্রের জন্যে ঢালা গেলাসটি নিজেই সে খেয়ে নিলে।

—আশি বছর। আশি বছরে তো সোজা হয়ে বেড়াব হে যগন্দ।

যোগেন্দ্র বললে, কিন্তু ধর্ম আছে তো!

—হ্যাঁ, আছে বইকি। আলবত আছে। এ তো ওষুধ। ধম্মেতে ওষুধ খেতে বারণ করে নাকি? ধম্মেতে বলে নাকি, ওষুধ না খেয়ে রোগে ভুগে খকখক করে কেশে কুঁজো হয়ে মর তুমি? যদি বলে তো বলে। ধম্ম আমার ধান তুলে দেবে? ধম্ম!—হঠাৎ সে নিজের হাতখানা শক্ত করে যোগেন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিলে। দেখ, শরীরটা ক'দিনেই কেমন বেঁধেছে দেখ। বুড়ো। বুড়ো বয়স!

যোগেন্দ্র হাতখানা নেড়ে দেখতে বাধ্য হল, কারণ পাল একরকম হাতখানা তার ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে গেল যোগেন্দ্র। সত্যই আর সে রকম তলতলে ঝলঝলে নয় চামড়া। অনেকটা শক্ত হয়েছে। সে স্বীকার করতে বাধ্য হল।

—হুঁ, তা হয়েছে।

পাল আবার খানিকটা গেলাসে ঢেলে বললে, তবে খা, খা রে খা, যৈবন ফিরে আসবে। —বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

যোগেন্দ্র এবার হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু হাসিতে চমকে উঠে বললে, না মাইরি, কি যে হাসছ! এখুনি কে এসে পড়বে! তা হলে আমি খাব না ভাই।—পালের হাসি যেন শাঁখের আওয়াজ। কাছাকাছি শাঁখ বাজলে তার শব্দ যেমন কানের ভিতর থেকে মাথার ভিতরে, বুকের ভিতরে, কাঁধ থেকে হাতের শিরায় ধ্বনির রেশ তুলে টান হয়ে উঠে, পালের হাসির গমকগুলো তেমনি ভাবে যোগেন্দ্রের দেহের মধ্যে সুর তুললে। ভয়ও জাগল, আবার চঞ্চলও হল মন, কত কথা মনে পড়ে গেল। যোগেন্দ্র মুখের কাছে নিয়ে গিয়েও ভাবছিল। এঁ, কি গন্ধ!

—নাক টিপে ধর বাঁ হাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ। বাস, দে ঢেলে মুখে। বাস।—বলেই সে

আবার হেসে উঠল হা-হা করে।

—এই, এই, না এমন করে হাসলে হবে না—না, না।

তবু থামল না পালের হাসি।

কিছুক্ষণ পর যোগেন্দ্রও হাসছিল পালের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়ে। কথাটা অবশ্য হাসির কথা। পাল বলছে, এবার পৌষ-লক্ষ্মীর দিনে ভাসান-গান করতে হবে, আগে যেমন হত। আমাদের যে দল ছিল, সেই দলের ভাসান-গান। সে কালে পাল চন্দ্রচূড় সাজত, আবার পায়ে কালিমাখা ন্যাকড়া জড়িয়ে গোদা মালোও সাজত। পাল এখন সেই দুটোই সাজতে চায়। আর যোগেন্দ্রকে বলছে, তুই বেউলো সাজতিস, তুই বেউলোই সাজবি।

এই বুড়ো বয়স, ভাঙা মুখ, ফোকলা দাঁত, এই চেহারায় বেউলো? যোগেন্দ্র হাসতে আরম্ভ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পাল।

হাসিটা থেমে এল ধীরে ধীরে। দুজনেই চুপ করে বসে রইল, ক্লান্ত হয়েছে দুজনেই; যোগেন্দ্রের বুকে তো ফিক-ব্যথার মত ধরে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই নীরবতার অবসরে তাদের মনের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে পুরানো দিনের কথাগুলি। নিজেদের সেই যৌবন-কালের চেহারা মনে পড়ছে। সেকালের সঙ্গীদের যারা আজ নাই, তাদের মনে পড়েছে। শূর-বীরের মত চেহারা সব, কত হৈ-হৈ সে দিন। ভাবনা-চিন্তা ছিল না।

হবে না কেন? খামারে সব গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা দুধালো গাই, কেঁড়ে ভর্তি দুধ, জালায় জালায় গুড়, পুকুর-ভরা মাছ, পৌষ-লক্ষ্মীতে সে কত সমারোহ,—গামলা-ভর্তি করে সরু-চাকলি, আস্‌কে পিঠে, ক্ষীরের পিঠে, গুড়তিলের পিঠে। কুড়ি গণ্ডায় এক পণ, সেই পণ দরুনে পিঠে খেত এক-একজন। মাঘ মাসে মূলো খেতে নাই, লক্ষ্মীর রাত্রে মূলোমচ্ছি, মূলোতে মাছে অম্বল হত। তারপর পড়তে ভাসানের আসর।

পাল চন্দ্রচূড় সাজত, রঙিন পাটের কাপড় পরে পাটের চাদরখানা পৈতের মত বেঁধে আসরে ঢুকত। আসরে জ্বলত সরকারী চল্লিশ-বাতির আলো! শিব শম্ভো! শিব শম্ভো! শঙ্কর! শঙ্কর! আসরখানা গমগম করে উঠত। উঠবার কথা যে। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ভৈরবমূর্তির মত দশাশই চেহারা, সেই বাঘা গলায় আওয়াজ, লোকের বুকের ভিতর যেন গুরগুর করে উঠত! মেয়েরা বসত এক দিকে, পুরুষেরা বসত তিন দিকে, সব হাঁ করে চেয়ে থাকত চন্দ্রচূড়ের মুখের দিকে। মেয়েদের মাথার ঘোমটা খসে যেত। পুরুষদের হুঁকোর টান বন্ধ হত। ধীরে ধীরে তাজা কলকে নিবে আসত।

যোগেন্দ্রের ছিল ছিপছিপে মিষ্টি চেহারা, চোখ দুটি ছিল ডাগর; সে সাজত বেহুলা। গোঁফ-দাড়ি কোনোকালেই যোগেন্দ্রের বেশি নয়, তাও কামিয়ে পরচুলো পরে স্ত্রীর বিয়ের বেগুনি রঙের পাটের শাড়িখানা পরে আসরে এসে নামত, সঙ্গে সখী থাকত। মেয়েরা পরস্পরের গা টিপে মুচকে হাসত। পুরুষের চোখে পলক পড়ত না। লখীন্দরের দেহ নিয়ে কলার মান্দাসে নদীর জলে ভাসত। বেহুলা বলত শাশুড়ীকে, বাসরে আমার রান্না করা ভাত আছে, সে ভাত আমার মাটিতে পুঁতে রেখো। কাককে ডেকে বলত, কাক, তুমি

আমার বাপের বাড়ি গিয়ে মাকে বল, বেউলা জলে ভেসে যাচ্ছে। গান ধরত, জলে ভেসে যায়রে সোনার কমল!—গোটা আসর হাপুস-নয়নে কাঁদত।

এমন সময় ঠোঁটের কোণে চুন মেখে, গালে কপালে চুনের দাগ এঁকে, পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে, ভুঁড়ি দুলিয়ে খুঁড়িয়ে নেচে আসরে ঢুকত গোদা মালো। পোশাক পালটে পালই সাজত গোদা মালো; দেখে কার সাধ্য যে বলে, এই লোকই সেই পাথরের মত মানুষ চাঁদ সদাগর। পালের ভুঁড়ি নাচানোর কায়দাটি ছিল অদ্ভুত। সত্যই যেন নাচত ভুঁড়িটি; দেখে আসর সুদ্ধ লোক হেসে গড়িয়ে পড়ত। মেয়েরা বাঁকা দৃষ্টি হেনে বলত, মরণ! পৌষ মাস চলে যেত, মাঘ মাসের অন্তত পনরোটা দিন ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই বলত, ওরে গোদা মালো আসছে। তরুণীর দল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ফিকফিক করে হাসত।

সে দিন আর এ দিন! আজকের দিনকালগুলা যেন ভাসান-গান ভাঙার পর শেষ রাত্রের আসর। চল্লিশ-বাতির চিমনিটা কালো হয়ে যেত কালি পড়ে। পৌষের শেষ রাত্রিতে হিম ঝরত চারিদিকে, চট তালাইগুলো ধুলোয় ধুলাকীর্ণ হয়ে বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে থাকত; আসর আগলে তারা জনকয়েক শুধু প্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বেঁকে চুরে শুয়ে থাকত; দু-চারটে কুকুরও এসে গা ঘেঁষে শুত; খাঁ খাঁ করত চারিদিকে। ঠিক তাই। ঠিক তাই। তারাই কজন ভাঙা আসর আগলে বেঁকে চুরে কোনমতে পড়ে আছে। চারদিক খাঁ খাঁ করছে।

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল, বাড়ি চল।

—চল। পালও উঠল।

বাগান থেকে বেরিয়ে এসে কিন্তু দুজনেই দাঁড়িয়ে গেল থমকে। চাঁদের আলোয় আর কুয়াশায় যেন একখানা বকের পাখার মত ধবধবে সাদা মলমলের চাদর দিয়ে ঘুমন্ত মা-বসুমতীকে কে ঢেকে দিয়েছে। মদ অতি সামান্য খেয়েছে তারা। তবু অনভ্যস্ত মস্তিষ্কে তাই চনচন করছে। পাল বললে, চল, মাঠের ধার দিয়ে ঘুরে আসি একটু।

দুজনে এসে দাঁড়াল মাঠের ধারে। দুধ-বরণ জ্যোৎস্নার মধ্যে সোনার বরণ মেয়ে গা এলিয়ে ঘুমুচ্ছে। দুচোখ ভরে দেখেও আশ মেটে না।

পাল বললে, যগন্দ!

—আ-হা-হা পাল, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী শুয়ে আছেন, তুমি দেখ।

—তাই বলছি যগন্দ, এইবার দিন ফিরল, তুমিও দেখ।

যোগেন্দ্র কথাটার ঠিক কি মানে তা বুঝতে পারলে না। পালের মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইল।

পাল বললে, এটা পঞ্চাশ সাল। গেল পঞ্চাশ বছর দুধের কাল গিয়েছে যগন্দ, আসছে পঞ্চাশ বছর, দেখ তুমি, সুখের কাল হবে, দেখ, আমি বললাম। এই ত্রিশ টাকা মণ চাল, এই মড়ক—এই গেল দুর্ভোগের শেষ। এইবার, দেখ তুমি মাঠের দিকে তাকিয়ে, মা-লক্ষ্মী

আবার এলেন।

যোগেন্দ্র অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পাল বললে, দেখ তুমি, আবার আগেকার মত কাল আসবে। বছর বছর জল হবে। মাঠ ভরে ধান হবে। আবার সব তেমনিই হবে। ব'স।

দুজনে বসল সেই শিশিরে ভেজা মাঠের আলের ঘাসের উপর।

পাল বললে, সাধে বলেছিলাম যগন্দ, লক্ষ্মীর রেতে এবারে ভাসানের গান করব। এবার মা-লক্ষ্মী পায়ে হেঁটে এসেছেন। অনেকদিন পরে সত্যি পৌষ-লক্ষ্মী হবে।

—তা বটে।

—আর একটুকুন লেবে নাকি?—পাল আবার বের করলে বোতলটা, আর গেলাসটা মুখে লাগানোই আছে।

—দাও। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—মা-লক্ষ্মী আবার গন্ধ সইতে পারেন না। হাজার হলেও নারায়ণের লক্ষ্মী, বষ্টুমের ঘরের বউ?

—হুঁ।—একটু ভেবে পাল বললে, তা বটে। তা—

যোগেন্দ্র বললে, বুঝে দেখ তুমি।

—ধান কাটা হয়ে যাক, তারপর আর ছোঁব না। বুঝলে? দেখছ তো ধান। এর জোর তো বুঝতে পারছ। নইলে তুলব কি করে? নাও।—নিজে খেয়ে পাল গেলাস বাড়িয়ে দিলে যোগেন্দ্রের দিকে।

—তা বটে।—যোগেন্দ্র হাত বাড়িয়ে নিলে গেলাসটি। জোর অনুভব করছে সে। পাল মিছে বলে নাই, ভোরে একটু খেয়ে মাঠে বের হলে সেও পালের মত ধান কাটতে পারবে। গোটা মাঠখানা ধানে থইথই করছে। এ ধান নইলে তুলবে কি করে?

—আর একটা মনের কথা বলি তোমাকে। এ খেয়ে যোগেন্দ্রের গায়ের জোর আর একটু বেড়েছে মনে হল। সে গলাটা সশব্দে বেশ সবল জোয়ানের মত ঝেড়ে নিয়ে মদের স্বাদভরা থুতু ফেলে বললে, কি?

—ওই চেকা—

যোগেন্দ্র তার মুখের দিকে তাকালে।

—ওই চেকার ধান কেটে ঘরে তোলার আগে আমাকে কেটে ঘরে তুলতে হবে। আমাকে বাই ঠুকে যায় হে। ওঃ।

—তা বটে।

—দাঁড়াও না। সকলেরই সুসময় আসছে এই পঞ্চাশ সাল থেকে। ওর ভিরকুটি, টাকার গরম, ধানের গরম এইবার ভাঙবে। মা এসেছেন, তুমি দেখ যগন্দ। এইবারেই দেখ, দেনা-দুনি শোধ করব আমি। খাজনা-দেনা এক পয়সা বাকি রাখব না। যা থাকবে,

থাকবে তোমার অনেক—বিঘে ভুঁই চার বিশ তো ফলবেই, কি বল ?

—তা খুব।

—তাহলেই, আমি হিসেব করেছি, সব দিয়ে-থুয়ে পৌটি তিনেক থাকবে। তিন ভাগ করব—বুঝলে ? তিনটি গোলা। একটি সরস্বতীর, একটি লক্ষ্মীর, একটি আমার। এই আমার বরাবর চলবে। এখনও বছর বিশেক বাঁচব আমি, খুব বাঁচব। দুটো গোলা নির্দ্দিষ্ট রেখে দেব আমার কম্মের জন্যে। বাকি যা থাকবে, ওরা যা খুশি তাই করবে।

যোগেন্দ্র বললে, ভালো যুক্তি, ভালো যুক্তি। আমাকেও এখনই বন্দোবস্ত করতে হবে।

—করতে হবে নয়, করে ফেলাও।

—কাল ভোরে যখন যাবে মাঠে, ডেক আমাকে। আর বোতলটা বরং নিয়ে এস, এক ঢোক না খেয়ে যেতে পারব না মাঠে।

পাল বললে, আসব।—তারপর হঠাৎ যেন তার কথাটা মনে পড়ল, বললে, হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি।

—কি ?

—এর ওপর দুধ ভালো নয়। দুধ খাও তো বিকেলে খেও। এর পর ভালো হ'ল মাংস। তা ভাই, সে তো উপায় নাই। মাছটা বেশি খেও।

—মাছ ?—যোগেন্দ্র হাসলে।—পাব কোথা ?

—আঃ। জাল-টাল সব গিয়েছে হে। নইলে—। নইলে বাবুদের সায়রপুকুরে সে-কালের ফিস্টির রাত্রের মত জাল ফেলে মাছ ধরা কিছু বিচিত্র ছিল না মুকুন্দের পক্ষে। শরীরে তার যথেষ্ট জোর আছে। ওই চেকার চেয়ে জোরে ঘুরিয়ে জাল সে ফেলতে পারে—একথা সে বাজি রেখে বলতে পারে। বাবুদের পুকুর কেন ? জাল থাকলে আজ চেকার পুকুরেই ফেলত জাল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

যোগেন্দ্র বললে, ভোরে ডেকো যেন।

চার

মাঠ-থইথই-করা ধান মুকুন্দ কেটে চলে জোয়ানের মত। হা-হা করে হাসছে। যোগেন্দ্রও কাটছে। সেও যেন তাকত অনেকটা ফিরে পেয়েছে। অন্য সকলেও কাটছে। মুকুন্দ-যোগেন্দ্রের মৃতসঞ্জীবনীর নেশার জোর তাদের নাই, কিন্তু ধানের নেশা তাদের পেয়েছে।

মাঠে মাঠে থাকবন্দী ধান ছোট ছোট ঘরের মত আকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেন মেলা বসে গেছে বলে মনে হচ্ছে দূর থেকে। গাড়িতে গাড়িতে সেই ধান ক্রমে ঘরে নিয়ে চলেছে সব। মুকুন্দের কেলে সত্যিই সাবাস জোয়ান, মুকুন্দ এবার তার ওই নাম দিয়েছে। সামনে টেনে চলেছে জোয়ান বলদটার ডাইনে থেকে। মুকুন্দ গাড়িতে ধান বোঝাই

করছিল। দুখানা জমির ওপারের খানার উপর দিয়েই পড়েছে জমি বরাবর গাড়ির রাস্তা। একখানা গাড়ি চলেছে, হৈ-হৈ করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোঠাঘরের মত ধান বোঝাই করেছে গাড়িতে। ধুলো উড়ছে। চেকার গাড়ি চলেছে। নইলে এমন গরু আর কার হবে। হ্যাঁ চেকাই বটে। ওই যে গাড়িতে বোঝাই ধানের মাথায় বসে আছে, চালের মটকায় হনুমানের মত।

—হ কত্তা—

মুকুন্দ দাঁতে দাঁত টিপে ধরে তার দিকে চাইলে শুধু।

—হবে নাকি ?—বাই ঠুকছে চেকা, হি-হি করে হাসছে।

পাল একটা মাটির ঢেলা নিয়ে ছুঁড়লে, অবশ্য অন্যদিকে ছুঁড়লে, ছুঁড়ে বলে উঠল, উ-লে-লে-লে।—অর্থাৎ হনুমান তাড়াচ্ছে সে। সঙ্গে সঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। সেই হাসি। তারপর সে দুইহাতের মুঠোতে ধরে টেনে তুলতে লাগল ধানের আঁটি। এবারকার ধানে তার আড়াই মুঠোয় বাঁধা আঁটি। আড়াই হাত তিন হাত লম্বা খড়। ধান তুলছিল আর হাসছিল।

—যাঃ শালা!—পাল হাতের আঁটিগুলো ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। হাঁপ ধরে গেছে হেসে।—শালাঃ। শালা চেকা। শালা আবার লক্ষ্মীতে অন্নপূর্ণা পূজা করবে এবার। হিংসুটে বাৎমাস। রক্তের তেজ, জোয়ানীর দেমাক, আর টাকার গরমে ধরাকে সরার মত দেখছে। এবার লক্ষ্মীপুজোয় বারোয়ারি থেকে ভাসান গান হবে ঠিক হয়েছে। ও অমনিই অন্নপূর্ণা পূজার ধুয়ো তুলেছে। তুলুক। দশের লাঠি একের বোঝা। দশজনের চাঁদায় হবে বারোয়ারি। ওর একার পুজো। দশেও এবার লক্ষ্মীছাড়া নয়। উনো লক্ষ্মী এবার দুনো হয়েছেন। মাঠ ভরা ধানে খামার গোলা ছয়লাপ হয়ে যাবে। দশ টাকা মণ ধানের। পঞ্চাশের পর থেকে মা দুনো হয়েই আসবেন বছর বছর।

'এস পৌষ, বস পৌষ, জন্ম-জন্ম থাক; গেরস্ত ভরিয়ে থাক, দুধে-ভাতে রাখ।' এবার সেই দুধে-ভাতে রাখার পৌষ এসেছে। পঞ্চাশ বছর দুঃখের পর পঞ্চাশ বছর সুখ; এতদিন পৌষ এসে বাউনির বাঁধন মাপে নাই, মাঘ মাস যেতে না যেতে গোলা খালি হয়েছে, খাজনায় মহাজনের পাওনায় সব কর্পূরের মত য়েন উবে গিয়েছে। আসছে বছরের খোরাকির জন্য আবার মহাজন ঠিক করতে হয়েছে। এ গাঁয়ের মহাজন ওই চেকা। ওই ওরই দোরে যেতে হয়েছে মানুষকে। এবার যা নমুনা তাতে ওর দোরে আর যেতে হবে না। বছর বছর যদি এমনই পৌষ আসে, মাঠ-থই-থই-করা ধান, খামার-ভতি গোলা-ভর্তি ঘর-ভতি করা পৌষ, তবে সে পৌষ আর যাবে না। সে জন্ম-জন্মই থাকবে, গেরস্তকে দুধে ভাতেই রাখবে। ছেলে-পুলে খোরা-পাথর ভরে ভাত খাবে। আবার হবে এই জোয়ান। মোল্যানীরাও হবে আবার দলমলে মেয়ে, তাদের এক ফুঁয়ে শাঁখ বেজে উঠবে শিঙের মত, এক দুপুর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে কুটে তুলবে বিশ দরুণে ধান। গোটা বাড়িটা নিত্য নিকিয়ে

তুলবে গোবর আর রাঙা মাটির গোলায়, ঘরে খামারের চতুঃসীমায় কোথাও থাকবে না এতটুকু ঝুল, কি পাতা, কি কুটো, কি ময়লা। পৌষ সংক্রান্তির ভোর রাত্রে তারা যখন প্রদীপ জেলে, ধূপ দিয়ে, রঙ-করা চালগুঁড়োর আলপনা এঁকে, শুদ্ধ কাপড়ে, শুদ্ধ মনে পৌষকে বলবে—পৌষ পৌষ পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় উঠে বস—পৌষ তখন কি যেতে পারবে? পঞ্চাশ সাল, শয়ে শূন্যের অর্ধেক হল পঞ্চাশ—এটা হল সর্বনাশের বছর। হয়েছেও সর্বনাশ, কাল যুদ্ধে নাকি লাখে লাখে মানুষ মরেছে, তিরিশ টাকা মণ চাল, দশ-পনরো টাকা জোড়া কাপড়, নুন নাই, চিনি নাই, ওষুধ নাই, দেশ-ভাসানো বান, রোগ-মড়ক, সর্বনাশের আর বাকি কি? কিন্তু অতি মন্দর পরেই নাকি ভালো আসে, শুকনো গাছে ফুল ফোটার মত এবার সেই আলোর নমুনা দেখা দিয়েছে মাঠ-ভরা ধানে। পালের অকাট্য ধারণা তাই। ভালো বছর এইবার থেকে আরম্ভ হল। নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এই চৈত্রনাগাদ যুদ্ধ মিটে যাবে, রোগ এই বসন্তের বাতাস বইলেই দূর হবে। সুবাতাসের মুখে রোগ কতক্ষণ? সুসময় এলে, দুঃখ অভাব সব পালায়, আলো ফুটলে দুঃস্বপ্নের মত।

পাল আবার তুলতে আরম্ভ করলে ধানের আঁটি। হাঁপটা এইবার গিয়েছে। ধান-পান তুলে সে একেবারে যাবে পারুলের কবরেজের কাছে। চিকিৎসা করাবে। শরীরটাকে তাজা করতে হবে। বয়স অবশ্য হয়েছে, তবে ষাট বছর কি এমন বয়স? তার বাবার জ্যাঠা ষাট বছর বয়সে ফের বিয়ে করেছিল; সেই স্ত্রীর তিন কন্যে হয়। শুধু তাই নয়, সে স্ত্রী যখন মরে, তখনও বুড়ো বেঁচে ছিল, তারপরও সে মাঠে যেত। বাঁচতে তাকে হবে। সমর্থও থাকতে হবে। সরস্বতীর ছেলেটাকে মানুষ না করে সে মরতে পারবে না। না হলে ওই চেকাই সর্বনাশ করে দেবে। সরস্বতীর উপর নজরও যে সে না দিতে পারে, এমনও নয়। হুসহুস করে করে সে ধান তুলতে লাগল।

আবার হৈ-হৈ উঠছে। কার গাড়ি আসছে। কিন্তু গাড়ি কই? কোথায়? তবে? কি হল? কার কি হল? কান খাড়া করে পাল শুনলে, কোন দিক থেকে আসছে হৈ-হৈ শব্দটা? গ্রামের দিক থেকে মনে হচ্ছে। কার কি হল? বুকটা তার ধড়াস করে উঠল। সরস্বতীর ছেলেটা—পাল দ্রুতপদে চলতে আরম্ভ করল।

—কে? কে হে? ওহে!—একটা লোক গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর হাঁটনে চলেছে কোথায়।—কে হে?

—আমি শশী।

—গাঁয়ে গোল কিসের?

—রমন কাকা—

—কি, কি হল?

—রমনকাকা মারা গেল। ধানের পালুই বাঁধতে বাঁধতে, বুকে কি হল বলে, বাস। আমি চললাম কাকার জামাইকে ডাকতে।

রমন পাল মরে গেল। মুকুন্দদের দলের লোক সে। একবয়সী। ভালো লোক—বন্ধু

লোক। ভাসানের দলে সাজত নারদ মুনি। দিন রাত্রি হরি হরি করেই সারা হত রমন। পালের চোখে জল এল রমনকে মনে করে। কিন্তু এইটুকু জোরে হেঁটেই আবার হাঁপ ধরেছে। একটু মৃতসঞ্জীবনী হলে হত। ভালো ওষুধ। বার বার—বার বার মুকুন্দ রমনকে বলেছিল, রমন, ওষুধটা ভালো ওষুধ, খাও। নইলে পারবে না। রমন বলেছিল, ছি! না। নারায়ণ। আমার গোবিন্দ আছেন।—মূর্খ—মূর্খ। গোবিন্দ ওষুধ খেতে বারণ করেন না, আর যদিও করেন, তবে যাও ধর্ম নিয়েই স্বর্গে যাও।

পাল ফিরল মাঠের দিকে। ধান পড়ে আছে, গরু বাঁধা আছে। আজ এ ক্ষেতের ধানটা তুলতেই হবে। শুধু তোলা নয়, আজ কতকটা ধান পিটে, কিছু ধানও বিক্রি করতে হবে। পৌষের আজ হল চব্বিশে। জমিদারের লাটবন্দী যাবে আটাশে। তার আগে খাজনা কিছুটা দিতেই হবে। সে না দেওয়াটা দারুণ অন্যায়। চিরকাল দিয়ে এসেছে। তা ছাড়া লক্ষ্মীর আয়োজন আছে। সরস্বতীর কাপড় ছিঁড়েছে, লক্ষ্মীরও কাপড় চাই, নিজেরও চাই, সরস্বতীর ছেলের একটা দোলাই চাই। পূজা থেকে কাপড় হয় নাই। সে আবার মাঠে এসে ধান বোঝাই করতে লাগল। হুসহুস করে বোঝাই করে চলল ধান। বাপ রে, বাপ রে, ধান আর শেষ হবে না যেন! এ গাড়িতে আর ধরবে না। বোধ হয় এই বেশি হয়ে গেল। বোঝাই ধানের উপরে বাঁশটা দিয়ে শনের রশি টেনে কষে বাঁধতে বাঁধতে একবার ভাবলে পাল। বেশি হয়েছে কিছু। তা হোক। পরক্ষণেই সে হাসল। বেশি? হায় রে কলিকাল। সে আমল হলে—হায়, হায়, হায়। সে কাল কি আর আছে? সে আমলে পালের একবার একটা বলদ হঠাৎ মরে গিয়েছিল, এমনিই ভর্তি ধান তোলার সময়। গরুর জন্য ধান তোলা বন্ধ ছিল না পালের। এক দিকে গরু জুড়ে, আর এক দিকে নিজে দুই হাতের খাঁজে জোয়াল ধরে বুক দিয়ে টেনে তুলেছিল ধান। আর আজ? এ ধান কটা না হলে চলবে না যে, বরং আরও চারটি হলে ভালো হত। খাজনা, লক্ষ্মীর উয়্যুগ, কাপড়। বাঁশটা কষে পাল নিজে গাড়ির মুখটা একবার তুলে দেখলে। হুঁ বেশি হয়েছে।—কি রে কেলে? পারবি না বেটা?

কেলে নিজের নাম বেশ বুঝতে পারে। পালের দিকে চেয়ে সে ফোঁস করে উঠল। পাল হাসলে, হ্যাঁ, পারবি। তোর জন্যে তো ভাবি না রে। ভাবনা—ওই মর্কট জোয়ানটার জন্যে। বেটা আমার জোয়ান! পারে কেবল শিং নাড়াতে। নে, চল দেখি। আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আপন মনেই পাল গরু দুটের সঙ্গে বকতে বকতে গাড়ি জুতলে। ধানের গাদায় লুকানো ছিল সঞ্জীবনী বোতলটা। এক ঢোক খেয়ে, শরীরটায় চাড়া দিয়ে নিজের শক্তিটা অনুভব করে নিয়ে বললে, চল, চল, বেটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

গাড়ির জোয়ালটা গরু দুটোর কাঁধে চেপে বসেছে; কেলের পিঠ ধনুকের মত বেঁকেছে, পিছনের পা দুটোর ঠেলা দিয়ে তীরের মত সোজা করতে চাইছে সে। ঘাড়টা টানের চোটে লম্বা হয়ে উঠেছে। নড়েছে। সাবাস বেটা! আচ্ছা! জোয়ানটাও টানছে।—বলিহারি, বলিহারি রে ব্যাটা! বাপ রে—ধন রে—মানিক রে! হ্যাঁয়—হ্যাঁয়—হ্যাঁয়!

গাড়ি চলেছে—গাড়ির উপর কোঠা ঘরের মত বোঝাই করা ধান দুলছে—মা লক্ষ্মী হেলে দুলে চলেছেন তার ঘরে।

গাড়িটা থেমে গেল, শব্দ হল একটা ধ্যাঁচ করে। একটা আলের কাটে চাকা আটকে গেল। বাঁ দিকে জোয়ান গরুটাকে তাড়া দিয়ে পাল বললে, শালা, ভাত খাবার যম তুমি!—সে কষে দিলে এক পাঁচন-লাঠির বাড়ি। গরুটা টানলে। চাকাটা নড়ল। কিন্তু ওদিকের নড়ল না। কেলে টানছে; মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে তার, কিন্তু চাকা নড়ছে না।

—কেলে, লে বেটা, লে। হ্যাঁয়-হ্যাঁয়। কেলে।

চাকা নড়ছে না। কেলে পারছে না টেনে তুলতে।—কেলে। কেলে। পাল খেয়ে নিলে আর এক ঢোক। শরীরটাকে আর একবার চাড়া দিলে। তারপর চাকার কাঠ দুই হাতে ধরে বুক দিয়ে ঠেলতে আরম্ভ করলে—দাঁতে দাঁতে কষে টিপে। পাকা শাল-খুঁটির মত পালের সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল। উঠেছে, হাঁ, উঠেছে। বহুত আচ্ছা। উঠে গেছে গাড়িখানা। আবার চলছে। পালের বুকে, হাতে, মুখেও লেগেছে চাকার ধুলো। শরীরটা যেন সেকালের শরীরের মত ফুলে উঠেছে। হ্যাঁ, ঠিক হ্যায়। সে জোয়ানই আছে। শুধু হাঁপ ধরেছে। খানিকটা বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করেছে একটু বেশি। হ্যাঁ, একটু বেশি। পাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। গাড়ির উপরে ধানের বোঝাই ঠিক আছে। হেলছে দুলছে। উঃ। বুকটা নিয়ে সোজা হওয়া যাচ্ছে না। এ কি! এ কি হল? আঃ, নাক দিয়ে গড়াচ্ছে গরম? আঃ,।বুকের ভিতরটা! এক হাত বুকে দিয়ে, আর এক হাতে পাল নাকটা মুছলে। এ কি! এ যে রক্ত! এ কি! থরথর করে কেঁপে উঠল পাল। বুকের ভিতর কেমন করছে! চারিদিক কেমন হয়ে আসছে! চাঁদনী রাতের বকের পালকের মত রঙের মলমলে ঢাকা মা-বসুমতী—! এ কি! তার এ কি হল? সরস্বতী, তার ছেলে, লক্ষ্মী, মাঠ-ভরা ধান, এ ফেলে—। সে দুই হাতে আঁকড়ে ধরলে তার গাড়িতে বোঝাই ধানের আঁটির ডগা। আঁটির ডগায় ফলন্ত ধান। জোরে, সজোরে চেপে ধরলে। নইলে পড়ে যাবে যে। গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠা-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। বারকতক পা দুটো ছুঁড়লে—নাকটা মুখটা ঘষলে ক্ষেতের ধুলার উপর, এক মুখ ধুলা কামড়ে ধরলে বাঁচবার ব্যগ্রতায়। রক্তে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে গেল। ধান-ভরা মুঠা-বাঁধা হাত দুখানা প্রসারিত করে দিয়ে সমস্ত আক্ষেপ তার স্তব্ধ হয়ে গেল পরমুহূর্তে।

সংক্রান্তির শেষরাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পূজার ছড়া বললে। শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসে ছিল ঘরে চুপ করে। রমন মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—সে হড়াম করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

ভূতপুরাণ

প্রিয়বর শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বঙ্গ সাহিত্যের খ্যাতনামা য-ম দত্ত—

প্রীতিভাজনেষু।

কিছু দিন থেকেই যেন কিসের একটা ইশারাগোছের পাচ্ছি। মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে বের হয় না, "রেডিয়ো তরঙ্গের বিশেষ একটি স্পন্দনে যেন কোন এক অজানা দেশের সংকেত পাওয়া যাইতেছে। একটা কেমন শব্দ উঠিতেছে। ইহার অর্থ কি তাহা বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত না হইলেও ইহা গ্রহান্তর হইতে কোন বুদ্ধিমান প্রাণীদের দ্বারা প্রেরিত তাহাতে তাঁহারা সন্দেহ করেন না।" ইশারাটা ওই ধরনের।

গা-টা ম্যাজ ম্যাজ করে, বুকটা ঢিবঢিব করে, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে, বুড়ো বয়সে যেমন হয় তেমনি, তবে তার থেকেও অতিরিক্ত বা বেশী কিছু আছে। কানের কাছে ফিস্ করে শব্দ হয়, বুকের পাঁজরায় কে যেন আঙুল ঠেকায়, মাথার চুলগুলো উঠে গিয়ে যে ক'টা অবশিষ্ট আছে তাই ধ'রে কে যেন টান দেয়। মধ্যে মধ্যে কানের ভেতর পালকজাতীয় একটা কিছুর স্পর্শ বুলিয়ে সুড়সুড়ি দেয়।

মধ্যে মধ্যে টুপটাপ শব্দ হয়; মনে হয় কেউ যেন কোন অন্তরাল থেকে ছোট ছোট ঢিলা কুড়িয়ে ছুঁড়ছে।

নানা রকম সন্দেহ হয়। বাড়ির পাশেই একেবারে জানালার সামনে একটা বেল গাছ লাগিয়েছি; লোকজনে মনে করে বেলপাতা এবং পাকাবেলের জন্য লাগিয়েছি ওটা; কিন্তু তা নয়, ওটা লাগিয়েছি মরবার পর যদি ছেলেরা নাতিরা শ্রাদ্ধ ক'রে ঘরের ভেতর থেকে তাড়িয়েই দেয় তবে ওই গাছটার ডালে দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসবার মত ব্যবস্থা ক'রে বাসা বেঁধে নেব। ওই গাছটার দিকে তাকিয়েই থাকি, তাকিয়েই থাকি, দেখি কোন ভূতটুত আমার আগেই এসে জবর দখল নিয়ে বসল কিনা। পাছে তেমনটা হয় তার জন্য মা চণ্ডীর নাম নিয়ে গণ্ডি দিয়ে ঘিরে রাখি, বাবা ভূতভাবন ভোলামহেশ্বর শিবের নাম উচ্চারণ করে হাঁক দিই—বম্, শঙ্কর ভোলামহেশ্বর।

এমত সময় একদিন, সময়টা পূজার আগে; ১৯৬৭ সালের আগষ্ট মাস, ১৩৭৪ সন শ্রাবণ মাস। পূজা সংখ্যার লেখার তাগিদ মাথায় নিয়ে ভেবে সারা হচ্ছি লিখব কি? এমত সময় একদিন, যম দত্ত মহোদয় এসে হাজির হলেন—বলি, বাড়ি রয়েছ নাকি—?

চমকে উঠলাম—উৎসাহিত হলাম—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললাম—আরে, এস এস—এস! দত্ত এস।

দত্তের পরিচয় কিছু দেওয়ার প্রয়োজন এখানে। দত্ত—যম দত্ত অর্থাৎ যতীন্দ্রমোহন দত্ত একজন এম-এ, বি-এল; সারা জীবন ওকালতি করেছেন, কিন্তু সেটাই তাঁর কোনমতেই সত্যকারের পরিচয় নয়। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, অঙ্ক ক'ষে-ক'ষে দশ মুণ্ড কুড়ি হাত নিয়ে রাবণ শুতো কি ক'রে—চিৎ থেকে পাশ ফিরত কি ক'রে, লম্বায় তার মাপ থেকে দশ মুণ্ড বিশ হাত সমেত চওড়ায় মাপ কত ফুট কত ইঞ্চি বেশী—তা' বের করেছেন, মহিষাসুরের শিং দুটো সোজা ছিল না বাঁকা ছিল এবং মাপে কত ছিল তা' বের করেছেন; তার সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর লোকসংখ্যা, ট্রয় যুদ্ধে কতলোক মরেছে তাও বের ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন। ইয়োরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর সংখ্যাতত্ত্বের উপর লিখিত প্রবন্ধ বের হয় এবং

বিলক্ষণ সম্মান-দক্ষিণা পান। সামান্য রাগ হলেই তিনি প্রতিপক্ষকে বলে দেন—"তুমি কচু জান।" এবং তা তিনি প্রমাণিত করে দেন।

ইনিই হলেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত—সংক্ষেপে যম দত্ত। আমাকে তিনি 'ম প ব' বলেন। অর্থাৎ 'মড়ুই পোড়া বামুন'। আরও বলেন—'রা লে'। অর্থাৎ 'রাবিশ লেখক'।

যম দত্ত বললেন—প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছি রাবিশ লেখক।

চমকিত হলাম।—প্রত্যাদেশ! কার!

হ্যাঁ। প্রত্যাদেশ। গতকাল কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে ভূত-লগ্নে গঙ্গার ঘাটে গিছলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—গঙ্গার ঘাটে জপ সেরে উঠেই দেখি একটি বিল্ববৃক্ষতলে একটি ছায়া-মূর্তি দাঁড়িয়ে। সাধু সন্ন্যাসী, তাও একেবারে সে কালের সাধু সন্ন্যাসী। ইয়া জটাজুট—ইয়া দাড়িগোঁফ, পরনে কৌপীন, সর্বাঙ্গ ভস্ম লেপন করা; হাতে চিমটা, পায়ে খড়ম, গলায় ইয়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক—আর শিঙার মত কণ্ঠস্বর।

ছায়ার মধ্যে অকস্মাৎ যেন আবির্ভূত হলেন তিনি এবং শিঙার মত কণ্ঠে বললেন—বেটা!

আমার প্লীহা—মানে পিলে কোন কালে নেই; কিন্তু ওই কণ্ঠস্বর শুনে পিলেটা আমার পাথরে ঠোক্কর খাওয়া কপালের মত মুহূর্তে ফুলে উঠল এবং ব্যথা করতে লাগল। কোন ক্রমে কেঁদে ককিয়ে সভয়ে বললাম—বাবা!

বাবা বললেন—ডরো মৎ। তারপর বললেন—ও-হো, তুমি বঙ্গনন্দন! মনে ছিল না। ভয় করো না বৎস। আমি ভূতপতি;—

ভয়ে পিলেটা আবার চমকে উঠে আরও খানিকটা ফুলে উঠল; বললাম—ভূ-ত-পতি। শুধু ভূতে রক্ষা নাই—ভূতের রাজা—ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। দাঁতেদাঁতে খটোখটো শব্দ হ'তে লাগল। আমার অবস্থা দেখে ভূতপতি সেই সাধু বললেন—তুমি মূর্খ। বুঝলে না আমি হলাম ভূতেদের পতি, রাজা; অর্থাৎ নন্দী, ভূতভাবন ভবানীপতি শিব ঠাকুরের বডিগার্ড সিপাহ্‌সালার এবং একান্ত সচিব। যিনি দিনে সের-সের সিদ্ধি খান, ভরিভরি গাঁজা খান, বন্দুকের গুলির মত আপিং খান এবং ভূতেদের ধেই ধেই ক'রে নাচান।

আমি মূর্চ্ছা যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা ফুঁ দিয়ে দিলেন একটা। বললেন—ফুস ধা! যা রে ভয় উড়ে যা।

বিস্ময়ের কথা তোমাকে কি বলব ভাই, সঙ্গে সঙ্গে ভয় আমার উড়ে গেল! তখন ভূতপতি নন্দী বললেন—দেখ তোমার এক বন্ধু আছে 'কিষ্ণ বন্ন বাম্‌ভন' তুমি বল 'মপব', তার কাছে আমার এক প্রত্যাদেশ নিয়ে যেতে হবে।

আমি বললাম—প্রভু সে কেলে বামুন আপনার কোন্ কর্ম করবে?

নন্দী বললেন—বৎস, এ কর্ম উচ্চ অঙ্কের কর্ম নয়, বিজ্ঞানেরও নয়; এ কর্ম যারা ছড়া পাঁচালী কিম্বা নবেল টবেল লেখে তাদের কর্ম। একখানা বই লিখতে হবে।

আমি বললাম—সে কি বই লিখবে প্রভু? সে তো রালে—মানে রাবিশ লেখক।

নন্দী বললেন—সেই জন্যই ভূতপুরাণ তাকে দিয়ে লেখানো হবে—এই আমাদের বঙ্গদেশ

ভূত সম্মেলনে স্থির হয়েছে। বলেই প্রভু স্লোগান দিয়ে উঠলেন—বম্ মহাদেব টন গণেশ ভেজো সত্তু নূন সমেত। হরহর বোম। অতঃপর মিলিয়ে গেলেন।

যম দত্ত বললেন—আমি হতবাক হতভম্ব হয়ে গেলাম। এই নন্দী বলে কি? ভূতের আবার পুরাণ? রামায়ণ মহাভারত ভাগবত মৎস্যপুরাণ কূর্মপুরাণ চণ্ডী দেবীভাগবত পুরাণ শুনেছি। খানকয়েক পড়েছিও। কিন্তু ভূতপুরাণ? ওরে ভাই, প্রভু অন্তর্যামী, তিনি বলে উঠলেন—অবধান অবধান। শ্রবণ কর। হে যম দত্ত, শ্রবণ কর।

আমি হাত জোড় করলাম, বললাম—বলুন প্রভু।

নন্দী বললেন—দেখ এই ভারত-জগতে বেদ চার, তার সঙ্গে আছে বেদান্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি; তৎপর আছে পুরাণ। তুমি ঠিকই মনে মনে স্মরণ করেছ যে সবই ভগবান এবং দেবতাকে নিয়ে। ভূতকে নিয়ে কি পুরাণ হয়? এমনই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু বল তো দত্তপুঙ্গব, সংসারে কাল কয় প্রকার?

বললাম—তিন প্রকার—ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ।

নন্দী বললেন—সাধু—সাধু। ভূত হল আদি, ভূতেরাই হল প্রথম। তার আগে কি আছে বলতো? কিছুই নাই। শূন্য। ফক্কা। জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, ভূতও নাই ভগবানও নাই, সূর্যও নাই চন্দ্রও নাই। নাই নাই নাই, কিছুই নাই। হুঁ-হুঁ। ঠিক বলেছি কিনা, বল? প্রথমেই কিছু না থেকে হল কাল, কালের মধ্যে ভূত কাল হল প্রথম অর্থাৎ আদি। বুঝেচ? তারপর স্থান স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। তখন এলেন তোমার তো ভগবান, ভগবানের ছানাপোনা দেবতা উপদেবতা প্রাণীকুল, মনুষ্যগণ দৈত্যগণ অসুরগণ ইত্যাদি। এই ভগবানের এবং দেবতাদের সঙ্গে দৈত্য অসুরদের যুদ্ধ হয়েছে অনেক। এবং নানা প্রকার কৌশলে এই ভগবান ও ভগবানের বাচ্চারা মনুষ্যকুলের মধ্যে ভেলকি দেখিয়ে নিজেদের মহিমা প্রচার করিয়ে গ্যাঁট হয়ে স্বর্গলোকে বসে মানুষদের পূজো নিচ্ছে, ভোগ খাচ্ছে আর যার যা খুশি করছে। ইন্দ্র নাচ গান শুনছে, বিষ্ণু সমুদ্রের উপর সাপের বিছানা পেতে ঘুমুচ্ছে। শিব সিদ্ধি ভাঙ খেয়ে বোম বোম করে নাচছে। এদের নিয়েই এরা মানুষদের দিয়ে পুরাণ লিখিয়েছে। তাই চার বেদ আঠারো পুরাণের মধ্যে কোথাও ভূতেদের কথা নেই। থাকবার মধ্যে আছে যে ভূতেদের রাজা নন্দী শিবের পেয়াদা। আর যমের সেপাই।

বৎস, শাস্ত্রে বলে পুরাণ অষ্টাদশ অর্থাৎ আঠারো। কিন্তু না। পুরাণ আঠারো নয়, পুরাণ উনিশ। প্রথম পুরাণই হল ভূতপুরাণ। সেই ভূতপুরাণ রচনা করবার জন্য তোমার বন্ধু ওই কিম্ভূত বন্য বাম্‌ভনকেই আমরা পছন্দ করেছি। পুরাণ রচনায় ব্রাহ্মণদের হাতযশ আছে। বেমালুম মিথ্যে কথা সত্যি বলে চালাতে পারে, সুযোগমত দেবতাদের দোহাই দিতে পারে।

অতঃপর যম দত্ত বললে—বুঝেচ না হে কিম্ভূত বন্য বাম্‌ভন, সেই কৌপীন পরিহিত ছাইভস্ম লেপিত অঙ্গ, সেই জটাজুটধারী গঞ্জিকাগন্ধ-নিষিক্ত অঙ্গ ভূতরাজ, শিবের সিপাহ্‌সালার নন্দী মহাশয়ের গায়ের গন্ধে আবার বমি আসতে লাগল। কিন্তু তা বলতে সাহস করলাম না।

বললাম, হে মহাভাগ! আপনার এই মহাতেজ এবং এই ভীষণ নিশ্বাস আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি দয়া ক'রে আসুন। আমি তাকে গিয়ে আপনার প্রত্যাদেশ জানিয়ে আসব।

নন্দী বললেন—তোমার মঙ্গল হোক।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—(এখানে আমি অর্থে লেখক) আপিং সেদিন কতটা খেয়েছিলে?

যম দত্ত বললে—তা ধরেছ ঠিক, সে বেশ একটু বেশীই হয়েছিল। একবার যে আপিং খেয়েছি সেটা যেন মনেই ছিল না। তাই ফের একবার খেয়ে ঝোঁকটা একটু সর-পড়া দুধের মত ঘনই হয়েছিল। সেই আপিংয়ের ঝোঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়েই এই বড় ড্রেনটার ধারে এসে ভেবেছিলাম—ওটা গঙ্গা আর ওই নাম-না জানা গাছটাকে মনে হয়েছিল বেল গাছ। আর কোথাকার কে সাধু এসে এই সব গাঁজা ছেড়ে গেছে।

যম দত্ত বললে—তা যাক। বুঝেচ, কথাগুলোর মধ্যে একটা সার কথা আছে।

বললাম—সেটা কি?

যম দত্ত বললে—সেটা হল এই একটা প্রশ্ন। ভূত আগে না ভগবান আগে? বলতেই হবে ভূত আগে। কারণ ভূতের আগে আর কিছুই থাকতে পারে না। সে ভূতের বাবাও না। সুতরাং ভগবান দেবতা দৈত্য অসুর রাক্ষস মানুষ প্রভৃতির আগে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে শুধু ভূতেরাই ছিল। এই ভূতদের না হারিয়ে কোন মতেই বর্তমান আসতে পারে নি। বর্তমান নিয়ে এসেছে ভগবান। অতএব—

প্রশ্ন করলাম—কি অতএব—

যম দত্ত বললে—মূর্খ কোথাকার। অতএব একটা অতি প্রাচীন অধ্যায় যা সম্পূর্ণরূপে ভূত অধ্যায় তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং রয়েছে এই সমস্ত কিছুর মধ্যে।

যম দত্ত বলেই গেল,—সারা সকাল আমি ভেবেছি। খুব সায়েন্টিফিক মন নিয়ে ভেবেছি। ভেবে দেখে তবে আমি এখানে এসেছি। এখন আমার আপিংয়ের নেশা নেই। সুতরাং তোমাকে এখন আমি যে পরামর্শ দেব তা আলট্রা মডার্ন।

জিজ্ঞাসা করলাম—সেটা কি রকম?

যম দত্ত বললে—পুরোপুরি যাকে বলে গবেষণা, রিসার্চ কর্ম, তাই। দাঁড়াও আর একবার স্মরণ করে নি।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বাটি দুই-তিন চা, একবাটি কফি, খানচারেক গরম সিঙাড়া তার সঙ্গে সকালের বরাদ্দ আপিংয়ের গুলিটা খেয়ে বললে—দেখ, এ এক যুগান্তকারী গবেষণার দরকার। বলতে গেলে—ধর্ম এবং বিজ্ঞান—ইহকাল এবং পরকাল—জন্ম এবং জন্মান্তর—অদৃষ্টবাদ এবং নাস্তিক্যবাদ—স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম এবং কম্যুনিজম, এক কথায় আলো অন্ধকার, দিন রাত্রি, সমস্ত কিছুর দ্বন্দ্বের বা বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাবে এই গবেষণায়।

কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে নাকের ছিদ্রে গজানো লোম টানতে টানতে বললে,—দেখ—বলতে

বলাতেই ফ্যাচ্চো শব্দে একটা হাঁচি। তারপর একটা দুটো তিনটে। অবশেষে নাক ঝেড়ে নিয়ে বললে—নাকের রোঁয়া টানলে চট্ ক'রে হাঁচি হয়। এরপর বললে—দেখ এই কর্মটা যদি তুমি করতে পার হে, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যত সব রাবিশ নভেল আর গল্প লিখে কেন পৃথিবীর জঞ্জাল বাড়াচ্ছ বল তো? কাগজ কালি পরিশ্রম নষ্ট, পড়তে মানুষের সময় নষ্ট, পড়ে মানুষের মেজাজ নষ্ট। কষ্টের কথা নাই বললাম। ওর তো আর অবধি নাই। ওসব ছেড়ে দিয়ে এই গবেষণাটা কর। বয়স হয়েছে পরকালের কাজ তো কিছু হল না—তা এটা যদি কর তাহলে বাল্মীকির মরা মরা মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম করা হয়ে যাবে।

কথাটা মনে লাগল। উৎকৃষ্ট একটা বিষয় বলে মনে হল। এবং যম দত্তের কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাতে আর সন্দেহ রইল না। ভূততত্ত্ব বা ভূতবাদ ও তার সঙ্গে ভূতলোক—

ভূত থাকলে মৃত্যুর মধ্যে জন্মান্তর, নাস্তিক্যবাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদ, ইহকালের মধ্যেই পরকাল, বিজ্ঞানের মধ্যেই ধর্ম—এক কথায় নাথিংয়ের মধ্যে এভরিথিং, ভূত থেকে ভগবান—সব প্রমাণ হয়ে যাবে। জন্মান্তর নেবার আগে কর্মফল ভোগ, মানে স্বর্গ নরকে বাস আছে। তার সঙ্গে অদৃষ্ট আছে, কোষ্ঠী আছে; ওরই মধ্যে অদৃষ্ট-না-মানা আছে। তা হলেই হল এই যে—কিন্তু রিসার্চ হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যম দত্ত বার বার ঘাড় নেড়ে শক্ত হয়ে বললে—একেবারে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে সাদা চোখে যা দেখবে তাই। এর বাইরের কিচ্ছুটির স্থান নেই ওর মধ্যে। একেবারে স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর দাঁড়াতে হবে। সোজাসুজি অঙ্কের মত কাণ্ড।

তা তো হবে। কিন্তু তার পথ কি?

* * * *

পথ দত্তই বাতলে দিলেন। ভেবেচিন্তে বললেন—দেখ ভূতেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যা শুনি, তাতে মানুষ ভাল নয়। শুনি, মানুষ মরলে প্রেত হয়। প্রেতেরা ভূতলোকে এসে সেখানকার সিটিজেনশিপ নিয়ে বাস করে। তখন তারা মানুষদের রাজ্যে আসে—ঘোরে ফেরে, গাছে কিংবা ঘরে বাসা গাড়ে। সুযোগ পেলে মানুষের সামনেও এসে দাঁড়ায়। দেখা যায়—কারুর দাঁতগুলো মূলোর মত, কানগুলো কুলোর মত, রঙ পোড়া কাঠের মত কালো, চোখ দুটো জ্বলজ্বলে আগুনের ভাঁটার মত। মানুষের পিছু থেকে বা আশপাশ থেকে বলে—তোঁর ঘাঁড় ভেঁঙে রক্ত খাঁব। কেউ বা ঘরের চালের সাঙার ওপর বসে গোদ হয়ে ফোলা পায়ের মত পা-খানা নামিয়ে দেয় ঘুমন্ত মানুষের বুকের উপর। কিন্তু সহজে মারতে পারে না। মারতে গেলে ভগবানের স্যাংশন চাই। মানুষের রাজ্যে ফিরে আসতে ভয়ানক ইচ্ছে। কিন্তু মানুষেরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে বাস করতে চায় না, এইজন্যে ওদের ভীষণ রাগ মানুষদের ওপর। ভূতেরা বিচ্ছিরি রকমের বোকা এইজন্যে মানুষেরা তাদের ঠকিয়ে বন্দী করে গোলামির খত লিখে নেয় এবং যা খুশি করিয়ে নেয়। সেই এক নাপিতকে

একভূত পথে একলা পেয়ে তার ঘাড় ভাঙবে বলে পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ফিচেল নাপিত চট করে তার কামাবার সরঞ্জাম থেকে আয়না বের করে ভূতের সামনে ধরে বলেছিল —আগে আমার এই চাকর ভূতের সঙ্গে লড়াই কর তারপর আরও আটানব্বুইটা ভূত আছে তাদের সঙ্গে লড়াই কর, তবে আমার সঙ্গে হবে। নিরেনব্বুইটা ভূত আমি বন্দী করেছি। আর একটা চাই—তা' হলেই একশোটা হবে। তখন এই একশোটা ভূতকে আমি রামচন্দ্রের কাছে বলি দিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের মত ভূতসিদ্ধ হব। তখন আমি ভগবানকে তাড়িয়ে নিজে ভগবান হয়ে বসব। বোকা ভূতটা আয়নায় নিজের ছবি দেখে ভাবলে সত্যিই লোকটা ভাঁড়ের মধ্যে নিরানব্বুইটা ভূত বন্দী করে রেখেছে। আর ভয়ে—

* * *

ভয়ে ভূতটা নাপিতের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিল, দোঁহাই আঁপনার পরামাণিক মঁশায়, দোঁহাই আঁপনার বাঁপ দাঁদার, আঁমাকে ওঁই ঝোলার মধ্যে ভঁরবেন না। তাঁ হঁলে দঁম বন্ধ হঁয়ে মরে যাঁব। আমি আপনার চাঁকর হয়ে থাকব, আপনি যাঁ বঁলবেন তাঁই করব।

নাপিত বলেছিল, দেখিস্? দিব্যি গাল্, প্রতিজ্ঞা কর্ যে কখনও কথার খেলাপ করবি না।

ভূত তিন সত্যি করেছিল—করব না করব না করব না।

কি করবি না?

কথার খেলাপ।

তা হলে ফের তিন সত্যি কর যে আমি যা হুকুম করব, তাই করব তাই করব তাই করব।

নির্বোধ ভূতটা তাই করেছিল। বলেছিল—করব করব করব।

অতঃপর মানুষের প্যাঁচে পড়ে ভূতের প্রাণান্ত। প্রাণটা গেল না শুধু ভূতটা প্রাণী নয় ব'লে। নাপিত বলে—যা বেটা আমার মাটির বাড়ির পাশে পড়ো জায়গাটায় রাত্রির মধ্যে পাকা বাড়ি তুলে দে।

ভূত লেগে গেল। ভিত খোঁড়া, ইট চুন সুরকি আনা, কাঠ কাটরা আনা, লোহা আনা, গাঁথনী গাঁথা, পলেস্তারা করা; কাজ তো কম নয়। কিন্তু যতই বেশী হোক করতেই হবে, নইলে নাপিতের সেই ঝোলাটা আছে। সেই ভূতটাকে মনে পড়ছে, ঠিক তারই মত। সুতরাং একরাত্রে বাড়ি বানিয়ে ভোরবেলা নাপিতকে ডাকে—মঁনিব গো মঁনিব—

কে রে?

আমি হুঁজুর, আপনার চাঁকর ভূত।

কি বলিস এই ভোর বেলা?

বাড়ি শেষ হঁয়েছে মঁনিব; রাঁত শেঁষ হচ্ছে আমি মিলিয়ে যাব। তুমি বাড়ি দেখে নাও।

বাড়ি দেখে নাপিত খুব খুশি। খুশি হয়ে বললে—তা হলে এই দিনের বেলা চলে যা

জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে সব থেকে ভাল একটা সেগুন আর একটা মেহগনি গাছ কেটে চিরে তক্তা করে ফেল। তারপর সন্ধ্যে বেলা থেকে ফার্নিচার তৈরি করে বাড়ি সাজিয়ে দিবি।

ভূত বললে—আমি খাব কি ?

নাপিত বললে—বনে বাদুড় আছে, চামচিকে আছে, ফড়িং আছে, ধরে খাস।

কি করবে ভূত ? উপায় নাই। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; তিন সত্য করেছে। তার উপর নাপ্‌তের ঝোলাকে ভূতের বড় ভয়। তবু বড় রাগ হল। হাজার হলেও সে ভূত। ভগবানদের চেয়েও পুরনো তাদের সভ্যতা। মানুষ তার এমনি নাজেহাল করবে ?

নাপিত কিন্তু মহাধূর্ত। সে ঠিক বুঝে নিলে—ভূতটা যখন হুকুম তালিম করতে ইতস্তত করছে তখন মতলব খারাপ। বেটা যদি তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তবেই তো হয়েছে। এক্ষুণি তালগোল পাকিয়ে মাংসের ডেলা বানিয়ে ফেলবে। সে গম্ভীরভাবে বললে—একটা কাঠের বাড়ি হবে। সেটাই তুই আগে বানা। একশোটা কাঠের কয়েদ ঘর। লোহার শিক দিয়ে কাঠ দিয়ে বানাতে হবে। ভূতগুলোকে বন্দী ক'রে রাখতে হবে। বুঝলি ? বলে কষে এক ধমক দিলে নাপিত।

ভূত ভয় পেয়ে গেল নিদারুণ। এবং তৎক্ষণাৎ ছুটল ব্রহ্মদেশ, সেগুন কাঠের জন্য। এবং রাতারাতি কর্ম হাসিল ক'রে সকালে বললে,—মঁনিব গো মঁনিব, কর্ম হাঁসিল। এবার আমি খালাস।

খালাস ? ওরে ভূত। তোকে তাহলে সর্বাগ্রে বন্দী করব বন্দীশালায়। বলবামাত্র ভূত ভয়ে দিল দৌড়। এবং এরই মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি গজাল মাথায় যে নাপিতকে সাজা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের ভিতর গোটানো লম্বা লেজটা বের ক'রে নাপিতের গলায় জড়িয়ে দিলে। মতলব—টানতে টানতে নিয়ে যাবে, মেরে ফেলবে। নাপিত কিন্তু তার থেকেও চালাক—তার ক্ষুরটা তার সঙ্গেই ছিল। সে ক্ষুরটা খুলে এক টানে কচ্‌ করে কেটে নিল ভূতটার লেজটা। ভূতটা পালাল চীৎকার করতে করতে। এবং গিয়ে উঠল ওই অঞ্চলের ব্রহ্মদৈত্য ভূতের কাছে। বললে—দেখুন, মানুষের হাতে আমার দুর্দশা দেখুন। এর প্রতিকার করুন। না হলে ভূতেদের মানমর্যাদা গেল।

ব্রহ্মদৈত্য ক্রুদ্ধ হয়ে পাঁচশো ভূত পাঠালেন। যাও গিয়ে নাপিতের ঘাড় ভেঙে দিয়ে এস।

সেদিন রাত্রে সন্ধ্যের পরই নাপিতের গা ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। আশে পাশে যেন কারা খোনা খোনা আওয়াজে ফিস্‌-ফিস্‌ করছে। বাড়ির চারি দিকে, গায়ের চারি পাশে, গাছে গাছে কারা যেন সর্‌সর্‌ খস্‌খস্‌ শব্দ ক'রে নড়ছে চড়ছে। আর যেন কেমন ভূত-ভূত গন্ধ উঠছে।

নাপিত পাঁজি দেখলে। হুঁ—। আজ অমাবস্যা মঙ্গলবার, ভূতলগ্নও আছে আজ। সঙ্গে সঙ্গে সে তার ক্ষুরটা নিয়ে তার বাড়ির উঠানে যে লম্বা তাল গাছটা ছিল সেই গাছটায় উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পর ভূত-লগ্ন হতেই ভূতেরা হুম্‌হাম্‌ করে নাপিতের উঠানে খুঁজতে এসে লাফিয়ে

পড়ে ভূত নৃত্য জুড়ে দিলে। তারপর খুঁজতে লাগল নাপিতকে। শেষে অনেক খুঁজে যখন দেখলে—নাপিত তাল গাছের মাথায় বসে আছে, তখন তারা নাপিতকে ধরবার মতলবে এ ওর পিঠে চড়তে শুরু করলে। সব থেকে নিচে বসল সেই লেজকাটা ভূতটা। তার উপর তার খুড়তুত ভাই তার উপরে জাঠতুত ভাই তার উপরে কামার ভূত তার উপরে ছুতোর ভূত তার উপরে এ ভূত তার উপরে ও ভূত এমনি ক'রে ক'রে তাল গাছটার মাথা ছুঁইছুঁই করে ভূতের তৈরী আর একটা গাছই যেন তারা তৈরি ক'রে ফেললে। এবং খোনা আওয়াজে হাসতে লাগল হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ। এঁই বাঁর পেঁয়েছি পেঁয়েছি।

নাপিত সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠেছিল—পেয়েছিস? ধর বাগিয়ে বেটাকে। চেপে ধর। যেন না পালায়!

ভূতেরা থ' মেরে গেল!

নাপিত কি বলছে? কাকে চেপে ধরতে বলছে?

নাপিত বিক্রমভরে বললে—স-ব বেটাকে ছেড়ে দিয়ে বেঁড়ে বেটাকে ধর। চেপে ধর। জোরসে চেপে ধর।

সঙ্গে সঙ্গে সবার নিচে উপুড় হয়ে বসা সেই বেঁড়ে ভূতটা কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে সকলকে ফেলে দিয়ে দে-দৌড়। আর সঙ্গে সঙ্গে ভূতগুলো হুড়বুড় করে এর ঘাড়ে ওর বুকে ওর পিঠে ঠোকা-ঠুকি করতে করতে মাটিতে আছড়ে পড়ে হাত-পা ভেঙে দারুণ আর্তনাদ শুরু করে দিল।

যম দত্ত বললে—তোমার কাছে লুকোব না ব্রাদার, এই রিসার্চটা এক কালে আমিই আরম্ভ করেছিলাম। আমার বুড়ো ঠাকুরদাদা মাঝে মধ্যে দেখা দিতেন। মানে গণ্ডাকতক টাকা তাঁর কোথায় পোঁতা ছিল। সেইটে কেউ তুলে নিলে কিনা দেখতে আসতেন। তিনিই আমাকে বলেছিলেন—তাইতো নাতি, যে-সব কথা তুমি জানতে চাও সেতো সব হারিয়ে গেছে। যারা জানত তারা ভূতজন্ম থেকে অন্য জন্মে চলে গেছে। তবে যে ভূতটা প্রথম মানুষের কাছে ধরা পড়ে লেজ কাটিয়ে বহু ভূতকে জখম করে মানুষের কাছে ধরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল সে ভূতটা আছে। তাকে ব্রহ্মদৈত্য শাপ দিয়েছিল—তুই ভূতজন্মে অমর হ'। সেই লেজকাটা অমর বেঁড়ে ভূতটা আজও আছে। তুমি এই বেঁড়ে ভূতটাকেই খুঁজে বের কর।

যম দত্ত বললে—আমি ঠাকুরদাকে বলেছিলাম—ঠিকানাটা জানেন তার? তা ঠাকুরদা বললেন—আমার তো ভাই তোমার মত রিসার্চের শখ ছিল না। আমি ওই শ'কয়েক টাকার মায়াতেই মজে আছি। কখনও কখনও তাকে আকাশ পথে যেতে দেখেছি—ঠিক কালো বড় চামচিকের মত সাঁ করে উড়ে চলে যায়। অন্য ভূতেরা চেঁচায়, বেঁড়ে যাচ্ছে বেঁড়ে যাচ্ছে। ভূতটা চটে। শুনেছি অমর হয়ে ভূতটা গম্ভীর হয়েছে। নাপিতের হাতে নাজেহাল হয়ে, ভূতেদের কাছে শাপগ্রস্ত হয়ে, ভূতটা পণ্ডিত হতে চেয়েছিল। ভূতেদের—সপ্ততীর্থের টোলে শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হয়েছিল—সাহেবদের ইউনিভারসিটিতে এম. এস-সি. পাস

করেছিল এবং 'ভূতেদের মুক্তির পথ' বলে মস্ত একখানা বই লিখেছে। সম্ভবতঃ সে এখন ভূতাত্ত্বিক পরমাণু শক্তির যানে ঘোস্ট এটমিক এনার্জির বলে নরক থেকে স্বর্গ, রসাতল থেকে বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত স্পেসে ঘোঁস্ট স্পেস-সিপ পাঠাচ্ছে। তার সন্ধান পেলেই বাস—কার্যসিদ্ধি। তুমি সব খবর পেয়ে যাবে। আর ভূতে মানুষে মিলে একেবারে দেবদানবদের দফারফা করে দেওয়া যাবে। এ একেবারে জ—লে—র মত পরিষ্কা—র। বুঝলে তো!

ঘাড় নাড়লাম। —হ্যাঁ বুঝেছি।

যম দত্ত বললে—দেখ এই পর্যন্ত লিখে আমি শুনিয়েছিলাম একটা সাহিত্য সভায়। কিন্তু সাহিত্যিকরা বললে—বাজে। আমি রাগ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন নন্দী মহারাজ যখন বললে—আর আমার নামও যখন তোমার এই লেখার মধ্যে থাকবে তখন আরম্ভ কর। শুভস্য শীঘ্রম্। আমি পাঁজি দেখে এসেছি। পাঁজিতে রয়েছে—কাল হল ভাদ্রমাস তর্পণের কৃষ্ণপক্ষ, তিথিতে ত্রয়োদশী, পরদিন চতুর্দশী, তারপর দিন অমাবস্যা, একেবারে যাকে বলে ভৌতিক ব্যাপারে মাহেন্দ্রযোগ অমৃতযোগ কম্বাইণ্ড্ টুগেদার। ভূতদের মধ্যে মহাভূত তাল-বেতালের নাম নিয়ে লেগে যাও।

* * * *

শুধু তাল-বেতাল নয়, তার সঙ্গে বেড়ে ভূত মহাশয়ের নাম স্মরণ করে পরের দিনই রওনা হয়ে যাব স্থির করলাম ভোরবেলা। হাওড়ায় ধরব ৭টা ৩৫ মিনিটে আমাদের লুপ লাইনের ট্রেন। উদ্দেশ্য লাভপুরে এসে আমাদের বাড়ির গলিপথটার ঠিক উত্তর দিকে এককালের 'রামাই ভূত' মহাশয়াশ্রিত ভটচার্য বাড়িতে এসে রামাই ভূতের সন্ধান করা।

লাভপুর। বীরভূম জেলার লাভপুর। আমার বাড়ি সেখানে। লাভপুরে চারখানা দুর্গা পূজো হয়, বারোখানা কালী পূজো হয়। শিব আছেন কয়েক গণ্ডা। এ ছাড়া বুড়ো শিব আছেন। এদের সঙ্গে অনেক ভূতের আসা-যাওয়া। তবে তারা আসে আবার চলে যায় দেব-দেবীদের সঙ্গে। এ ছাড়াও অন্য ভূত, যারা এখানে বিশেষ পরিচিত, তারাও কম নয়, সংখ্যায় তারাও অনেক। এদের মধ্যে লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ে বট গাছটায় যে পেত্নীটা থাকত তার নাম তো সেই ছেলে বয়স থেকে শুনে আসছি। সে বটের ডালে দাঁড়িয়ে ডালটা দুলিয়ে দোল খেতো। চট্টরাজদের বাড়িতে একটা ভূত ছিল সেটার ছিল সমস্ত রাত্রি বাড়ির ঘুমন্ত লোকগুলির পায়ে বগলে সুড়সুড়ি কাতুকুতু দিয়ে জাগিয়ে দেওয়া। প্রথম প্রথম মানুষেরা চমকে উঠে কে কে বলে জেগে উঠলেই সে খিল্ খিল্ শব্দে খোনা হাসি হেসে আরও সুড়সুড়ি দিত। শেষ পর্যন্ত লোকে ভয় না করে গায়ে পায়ে হাত ঠেকলেই হাত-পা ছুঁড়ে ভূতটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিত। তখন সে আবার অন্য পথ ধরে জ্বালাতন করত, বাবলার কাঁটা ভেঙে এনে ফুটিয়ে দিয়ে জ্বালাতন করত। বৈরিগীতলায় বষ্টুম ভূত ছিল। এখানে বৈরিগীদের একটা

খুব ভাল আখড়া ছিল। সেখানে উৎকৃষ্ট বেল গাছ ছিল। লোকে বলত বাদশাহী বেল। এই বেলের লোভে অনেক বষ্টুম ভূত আসত। সকলকে তাড়িয়ে এখানে পাকাপোক্ত মোহন্ত ভূত হয়েছিল সে এক বোষ্টম পণ্ডিত ভূত। তিলক ফোঁটাকাটা মোটা চৈতনওয়ালা মহাপণ্ডিত। শুনেছি তাঁর মত বৈষ্ণবশাস্ত্রে সাহিত্যে পণ্ডিত দেশে দু-চারটের বেশি ছিল না। ক র গ চ শব্দগুলো শুনলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। ক-য়ে কৃষ্ণ র-য়ে রাধা গ-য়ে গৌরাঙ্গ গোবিন্দ চ-য়ে চৈতন্য। মৃত্যুর পর রথ এসেছিল তাঁকে নিতে, কিন্তু তিনি যান নি। বলেছিলেন,—ওহে সারথি, তুমি বাপু রথ নিয়ে ফিরে যাও। আমার কিছু কাজ বাকী আছে, মানে গোটা কতক মামলা চলছে আদালতে। সে কটা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যেতে আমি পারব না। রথ ফিরে গিয়েছিল। বৈষ্ণবপণ্ডিত জীবনকালে শুধু বৈষ্ণবশাস্ত্র নিয়েই কারবার করেন নি—তাঁর আইনজ্ঞান মামলাজ্ঞান ছিল টনটনে। এ চাকলায় ফৌজদারী দেওয়ানী যে মামলাই হোক পণ্ডিত মোহন্ত তার একপক্ষের তদ্বিরে থাকতেনই। বৈষ্ণবশাস্ত্র নিয়ে কথা না বললে তাঁর বুক ধড়ফড় করত, মাথা ধরত। আর মামলা নিয়ে কোন দিন যদি আলাপ আলোচনা না হত তা হলে তাঁর পেট কামড়াত এবং যা খেতেন তার একটি দানাও হজম হত না। সুতরাং মৃত্যুর সময় তাঁর হাতে চার-চারটে মামলা, এ খুব বেশী ব্যাপার নয়। বৈষ্ণবপণ্ডিত ভূত হয়ে দীর্ঘকাল থেকেছিলেন; থাকতেন ওই যে বেল বন, ওই বেল বনের মধ্যে একটা বকুল গাছে। বেল গাছের কাঁটা ফুটত বলে গাছে থাকতেন না। প্রায় রোজই যাতায়াত করতেন সিউড়ি-রামপুরহাট। আদালতের সামনে একটা খোলা জায়গা সর্বত্র আছে এবং সেখানে বট গাছ আছে। সেই বট গাছে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন; কেউ যদি আইনের পরামর্শ চাইত তা হলে তিনি কূট পরামর্শ দিতেন; ফি সামান্যই, সামান্য বাতাসা-টাতাসা দিলেই হত; প্রতি বৎসর তাঁর মৃত্যুদিনে রথ আসত কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েই বলতেন—আসছে বছর এস। তাঁকে তাড়িয়েছিল গঙ্গাতীরের ভূতের দল এসে।

একবার শুনেছি গঙ্গাতীর থেকে এক ঝুড়ি বা চুপড়ি বোঝাই হয়ে ভূত এসেছিল আমাদের গ্রামে। ব্যাপারটা হল এই: আমাদের এখানে 'বৈরাগী আখড়া' বলে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের সেবা ছিল। আর ছিল গোবিন্দ সেবা। এঁদের চারিপাশে ছিল ঝুড়িখানেক শালগ্রামশিলা। মানেটা সেকালে সহজ ছিল, একালে ঠিক সহজ নয়। সেকালে ব্রাহ্মণদের বহু জনের বাড়িতে শালগ্রাম নারায়ণ সেবা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে লোকেরা দেখলে এই গোল নুড়িগুলো 'কুছ কাম্‌কা নেহি'; কেবল পূজো ভোগের ঝঞ্ঝাট বাড়ায়; শালগ্রাম নিয়ে আর ব্যবসা চলে না; লোকে সত্যনারায়ণ করায় না, যাগযজ্ঞি করায় না, তখন তারা লুকিয়ে শালগ্রাম-শিলাগুলি এনে এই আখড়ায় নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। আখড়া থেকে নিয়ম ছিল যে শালগ্রামশিলা পেলে ওই শালগ্রামশিলার সারিতে বসিয়ে রাখবে, দিনান্তে ছিটিয়ে দেবে কুশের ডগায় গঙ্গাজল, তুলসীর পাতা আর আতপের কণা। আখড়ায় এ জন্য জমি ছিল। এই বৈষ্ণব পণ্ডিতের পরামর্শে সেবায়েৎ একদিন শিলাগুলি ঝুড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে। বাস্ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু অদৃষ্টের বিপাক, সেইখানে ছিল একটা বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ। সেই বৃক্ষের ডালে ঝুলত অনেক বাদুড়। চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচাতো আর উড়ত। এদের মধ্যে ছিল অনেক চামচিকে। এরা কিন্তু আসলে বাদুড় চামচিকে নয়, এরা আসলে হল গঙ্গাতীরে মরতে এসে যারা গঙ্গা পায় নি তাদেরই অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা, ভূত হয়ে ঝুলছে ডালে ডালে। শালগ্রামশিলা ফেলে দিতে ঝুড়িটা যেই না খালি হল—অমনি ঝুপ ঝুপ করে একঝুড়ি বোঝাই হবার মত চামচিকে খসে পড়ল। মানে একঝুড়ি ভূত।

সেই একঝুড়ি বোঝাই ভূত ওই বৈরাগীর মাথায় চেপে এল আমাদের লাভপুর। এবং বৈরাগী আখড়ায় পৌঁছুবামাত্র ফর্‌ফর্‌ শব্দে উড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলে বকুল গাছে। বকুল গাছের ডালে বেশ শয্যা রচনা করে ওই পণ্ডিতজী তখন ওই নাকহীন মুখের নাসিকাগহ্বরে বাতাস টেনে নাক ডাকাচ্ছিলেন। এবং স্বপ্ন দেখছিলেন যে শালগ্রামশিলাগুলো গেল, ঝঞ্ঝাট কমল, ওই অনাথ শালগ্রাম সেবার জন্যে যে জমিটা ছিল সেটার আয় থেকে এবার জুৎসই করে মালপো খাওয়া যাবে।

গোবিন্দ হে! কোথায় মালপো! কোথায় সুখ! দু-চারশো চামচিকে পণ্ডিতকে চিঁচি শব্দ করে নখ দাঁত দিয়ে আক্রমণ করলে।

পণ্ডিত সেই যে সেদিন পালাল আর ফেরে নি। এ চামচিকে আকারের ভূতগুলো একবার ঝড়ে ওই বকুল গাছের ডাল ভেঙে পড়ায় চাপা পড়ে চেপটে লেপটে ফুস—ধা হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও অনেক ভূত আছে।

সে সব এখন থাক। এখন আমি যম দত্তর ছকে দেওয়া লাইনে গবেষণা করব। সকলেই জানেন রিসার্চ ওয়ার্কের নিয়মই তাই, একজনের অধীনে থেকে তাঁরই পরামর্শ এবং নির্দেশমত রিসার্চ করতে হয়। আমার গবেষণা হল যম দত্ত মহাশয়ের অধীনে। তাঁর নির্দেশ হল রামাই ভূতের সূত্র ধরে কাজ আরম্ভ কর।

রামাই ভূতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সে আজকের কথা নয়—আমার ঠাকুরদাদারা তখন ছেলেপুলে মানুষ। সে ধরুন গিয়ে একশো চল্লিশ বছর আগের কথা। সে সময় রামাই ভটচাজ ছিলেন একেবারে ভরাভর্তি জোয়ান; ভটচাজ বাড়ির এই জোয়ান ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল 'নিশি'তে। নিশিও একরকম ভূত। তারা রাত্রে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় চেনা মানুষের গলায় ঘুমন্ত মানুষের নাম ধরে ডাকে। ঘুমন্ত মানুষ ঘুম ভেঙে উঠে বেরিয়ে এসে দেখতে পায় একটু দূরে তার একজন চেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর সে চলতে থাকে, এ লোকটিও চলে। অনেক দূর এসে কোন খালে বা বিলে ডুবে কিংবা শক্ত মাটিতে কি পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ে মরে এবং ভূত হয়। রামাইয়ের নিশি ভয়ানক নিশি, সে থাকত গোয়াল ঘরে। রামাই তার ডাকে বেরিয়ে এসে গোয়াল ঘরে ঢুকে গোরুর দড়ি গোয়ালের সাঙায় বেঁধে তাইতে গলায় ফাঁস পরে মরেছিল। অতঃপর রামাই আমাদের অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভূত হল। এবং নিজের বাড়িতেই তার বাসা গাড়লে। উঠানে একটি নিম গাছ ছিল সেই গাছ হল তার

বৈঠকখানা, বাড়ির বড় ঘরের চালের সাঙায় হল তার শোয়ার ঘর। ভূত হয়েও সে বাড়িরই একজন হয়ে রইল। রামাইকে নাকি দিনে রাত্রে যখন তখন দেখা যেত। শুনেছি আমার ঠাকুরদাদারাও তাঁকে দেখেছেন। তাঁরা বলতেন, রামাইদাদা, আমাদের ভয় দেখিয়ো না। রামাই বলত,—নাঁ-নাঁ চঁলে যা। নির্ভয়ে চঁলে যা! আমার দিকে তাকাস না। আমি কাজ করছি। রাত্রে সে গোরুদের খেতে দিত। ঘরদোর ঝাঁট দিত। বাড়ির দোরে একটা কলকে ফুলের গাছ ছিল সেটায় চড়ে টাটকা কলকে ফুল তুলে চুষে চুষে মধু খেত। বড় যে নিমগাছটা ছিল উঠোনে, সেই গাছটার নিচের একটা ডালে দাঁড়িয়ে সেই ডগার একটা ডাল ধরে হেঁইয়ো মারি হেঁইয়ো মারি বলে দোল খেত।

বড়দাদা নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর কোলে তখন খোকা হয়েছে! বাড়িতে মেয়েছেলে বলতে নবকৃষ্ণের স্ত্রী মানদা আর বিধবা বোন চণ্ডীদাসী; একজন রান্না করত অন্যজন ঘরে শালগ্রাম সেবার কাজ থেকে অন্য সব পাটকাম করত। ছেলেটি ঘরে কি দাওয়ায় বিছানায় শুয়ে ঘুমুতো; হঠাৎ ঘুম তার ভাঙত, হয় তো গায়ে দুধের বা তেলের গন্ধ পেয়ে খুদে পিঁপড়ে এসে কামড়াতো, নয় তো ছোট মাদুর বা বিছানায় উঠে-থাকা কোন কাঠির খোঁচা লাগত, নয়তো দেয়ালা করার মধ্যে স্বপ্নে ভয় পেয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠত। মায়ের আসতে দেরি লাগত কারণ ভটচাজ বাড়িতে লোকের কাজ থেকে দেবতার কাজ বেশি। তারপর গোরুবাছুর আছে। মায়ের ছুটে আসা সম্ভবপর হত না। তখন রামাই নিম গাছের ডাল বা ঘরের সাঙা বা কলকে ফুলের গাছ বা গোয়াল ঘর যেখানেই থাকত সেখান থেকে দুই হাত ল—ম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে (সাঁতারুরা যেমন ভাবে ডাইভ করে তেমনি ভাবে আর কি!) সাঁ করে এসে হাজির হত ছেলেটির কাছে এবং উপরের সাঙায় বসে লম্বা হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে তুলে নিতো! বাচ্চা কচি ছেলে তার ভূতের ভয় ছিল না। ভূত আর মানুষে ঠিক তফাত করতে পারত না—সে কোল পেয়ে চুপ করত। রামাই তাকে দোলা দিতে দিতে আদর করে ফিসফিস খোনা আওয়াজে বলত আঁ হা রেঁ জিঁভে আমার জল সরছে, কঁচি-কঁচি মাংস তাঁজা-তাঁজা রক্ত, ইচ্ছে কঁরে ঘাড় মটকে চুষে খেঁয়ে নি। কিন্তু দাঁদার ছেঁলে বংশধর, পিণ্ডি দিবি আমাকে, তোঁর ঘাড় কিঁ কঁরে ভাঙি।

ছেলেটা এর মানে বুঝত না ফিকফিক করে হাসত।

বউদি এসে দেখত বিছানায় ছেলে নেই—ছেলে সাঙার কাছে শূন্যে দোল খাচ্ছে। রামাইকে সে দেখতে পেতো না। অনুমানে বুঝত রামাই দোলাচ্ছে। তখন বলত ঠাকুরপো খোকাকে নামিয়ে দাও ভাই। ওর খিদে পেয়েছে দুধ খাওয়ার।

রামাই সুড়সুড় করে নামিয়ে দিত ছেলেটিকে।

রামাই একটি শর্ত করিয়ে নিয়েছিল বউদিকে। শর্ত করিয়ে নিয়েছিল এই ছেলে যেন বড় হয়ে কখনও গয়া না যায়।

বউদি জিজ্ঞেস করেছিল—কেন ঠাকুরপো?

খোনা আওয়াজে রামাই বলেছিল—ন্যাকা আমার। জাঁনো না বুঝি?

কি জানি না ?

জানো না গয়ায় পিণ্ডি দিলে ভূতজন্ম থেকে মুক্তি হয় ?

তা তো ভাল গো !

ভালো ? তাহলে তো মানুষের মরণও ভালো। মুক্তি হয়। দোঁব নাকি তোমার ঘাড়টা ভেঙে ?

ভয় পেয়ে বউদি বলত—দোহাই ভাই, তোমার পায়ে পড়ি।

পায়ে পড়ি। কেন—মানুষজন্মে কত হাঙ্গামা বল তো ? খাওয়া-দাওয়া, বিষয় সম্পত্তি করা, চাষবাস, পুজো-আর্চা, ঝগড়াঝাঁটি—

না ভাই। তবু মনুষ্যজন্ম সুখের—

রামাই ধমক দিয়ে উঠত—চুঁ—প—বলছি ! ভূঁতজন্ম আঁরও সখের ! স্বঁগ্‌গেও এত সুঁখ নাই। হুঁ—হুঁ !

বলেই না কি রামপ্রসাদী সুরে গান ধরে দিত—

মন, তুমি আঁসল খঁবর জাঁনো না—
ভূঁতজন্ম সুঁখ-জন্ম, বিনি আঁবাদে ফলে সোনা।
গাছের ডালে ঘরের কোণে
শ্মশানে মশানে বনে
বাসা বাঁধো রান্না রাঁধো
শুধু লঙ্কাতে সম্বরা দিয়ো না,
যেথায় খুশি সেথায় যেয়ো,
শুধু অযোধ্যার ধারে যেয়ো না।

গানটাই শোনা যেত, রামাইকে দেখা যেতো না, দেখা যেতো ভটচাজ বাড়ি থেকে খাড়া পশ্চিম দিকে প্রায় শ' পাঁচেক হাত দূরে শা পুকুরের পাড়ের উপর যে শ-খানেক হাত উঁচু শিমুল গাছটা আছে, সেই গাছটার মগডালটা বিনা বাতাসে একেবারে ভেঙে পড়বার মত ঝাপটা খেলে কিছুর। সেকালের লোকে এর মানে বুঝত। তারা বলত—রাম রাম রাম রাম। কেবল রামাইয়ের বউদি জানত এ হল রামাই। মনের আনন্দে এখান থেকে এক-লাফে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গাছটার উপর। গাছটা হল গ্রামটার মধ্যে ভূতদের একটা পার্ক বা বেড়াবার হাওয়া খাবার জায়গা।

বউদির সঙ্গে বনত রামাইয়ের কিন্তু বোনের সঙ্গে বনত না। বোন চণ্ডীদাসী বালবিধবা। ভূতকে সে অপবিত্র ভাবত—ঘেন্না করত, বলত—মহাপাপী ছিলি ছোড়দা তুই। রাত্রে বিছানায় শুয়ে চণ্ডীদাসীর কথা বলবার অবকাশ হত। চণ্ডী থাকত মেঝেতে শুয়ে, রামাই থাকত সাঙায়—অবশ্য তাকে দেখা যেত না।

রামাই ধমক দিত—চুঁ—প।

কেন ? চুপ করব কেন ? পাপ না করলে ভূত হলি কেন তুই ?

সে গলায় দঁড়ি দেওয়ার জন্যে।

তাই বা দিলি কেন ?

নিঁশি ভূঁতে দেওয়ালে যে।

তুই দিলি কেন ?

বললে যে খুঁব মজা হবে।

মজা হবে। দেখছিস মজা ?

দেখছি না ? তুঁই দেখছিস না ?

কি দেখব ? দেখবার কি আছে ?

তঁবে দেঁখ।

কি ?

দেঁখ না ওঁপরের দিকে চেঁয়ে।

চণ্ডীদাসী দেখত—সাঙার উপর থেকে থামের মত একখানা পা আস্তে আস্তে নেমে আসছে তার বুক বরাবর। কিন্তু চণ্ডীদাসী ভয় পায় না, সে দিব্যি সেই থামের মত পা-খানাকে বলে—নাম্ নাম্—নাম্ দেখি। এই পা।

পা কিন্তু নামতে পারে না। থেমে যায়।

সাঙার উপর থেকে কথা ভেসে আসত—ওরে চণ্ডী ওরে মুণ্ডী তোঁর মত বঁদমাশ আমি দেঁখিনি। মঁনে মঁনে সেই দাঁশরথ রাঁজার বেঁটার নাম কঁরছিস।

পা-খানাকে সে জোরে দোলাতে থাকত। সে দোলায়মান পা-খানার এক লাথি খেলে চণ্ডীদাসী যে চেপ্‌টে যাবে এতে কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়।

বউদি বলত—ও চণ্ডী ক্ষমা চা ভাই। ও চণ্ডী।

কাকে বলছ ? চণ্ডী সেই কথা শুনবার মেয়ে। সে কি করত, এই মস্ত হাঁ করে দাঁত মেলে বিছানায় উঠে বসত এবং বলত কামড়াব তোর পায়ে।

আঁ—।

পা-খানা সড়াৎ করে গুটিয়ে যেতো ফুটো হয়ে যাওয়া লম্বা বেলুনের মত। চণ্ডীদাসী খিলখিল করে হাসত। তবে মধ্যে মধ্যে অতর্কিতে ছরছর শব্দে বালি ছিটিয়ে দিয়ে কিংবা কখনও পিঠের ওপর গুম্ করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে অথবা চণ্ডীর মাথায় গোবরের তাল ফেলে দিয়ে তাকে জব্দ করত রামাই।

রামাই ভয় করত আর খাতির করত দাদাকে। দাদা যজমান, বাড়ি যেতো চাল কলা মিষ্টি মণ্ডা ফলমূল বেঁধে নিয়ে ; পিছন পিছন রামাই পাহারা দিয়ে নিয়ে আসত বাড়ি। তবে দাদার সামনে কখনও যেতো না। দাদা তাকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াবার সময় বাখারি দিয়ে পিটত। এবং বরাবর পিছন থেকে হঠাৎ কান চেপে ধরত। ওই ভয়ে সামনে আসত না। রামাই।

দাদা একলা মানুষ, চাষের সময় বলত—রামাই, মাঠের খোঁজ একটু রাখিস। একলা

মানুষ। এবার টানের বছর, দেখিস যেন চুরি করে জল কেটে না নেয়।

রামাই সারারাত্রি জমির চারিধারে ঘুরে বেড়াতো। একবার চাষী সদ্‌গোপদের ভীমের মত জোয়ান বহুবল্লভ, ভটচাজদের জমির জল চুরি করে কেটে নিতে এসে দেখেছিল—সেখানে একটা আচমকা তাল গাছ দাঁড়িয়ে। আচমকা মানে অচেনা, অর্থাৎ তাল গাছ সেখানে ছিল না; আচমকা অচেনা তাল গাছটাকে দেখে বহুবল্লভ থমকে দাঁড়িয়েছিল। এ তাল গাছ এল কোত্থেকে?

তাল গাছটাই উত্তর দিয়েছিল—আঁয় নে, জল কাঁট।

বহুবল্লভ সাহসী এবং বলবান। সে বলেছিল—কে রে তুই?

আমি রামাই।

এবার বহুবল্লভ চোঁ-চা দৌড় দিয়েছিল। রামাই তার বাড়ি পর্যন্ত ধঁর ধঁর ধঁর বলে ছুটে এসেছিল পিছন পিছন।

লোকে বলে রামাই নয়। এটা ছিল ওর ওই দাদা নবকৃষ্ণের কাজ। রামাই ভূত হয়েছে এই কথা রটনা যখন হল তখন সে মধ্যে মধ্যে তেলকালি মেখে ভূত সেজে এইভাবে মাঠে নিজের জল রক্ষাও করত আবার পরের জল চুরি করেও নিত।

তা বলুক লোকে। সে লোকেরা নিন্দুক লোক। নাস্তিক লোক। ও কাজ রামাইয়ের। রামাই ছিল অসাধারণ ভূত। বাড়ির হিতৈষী ভূত। তার প্রমাণ আছে। রামাই একবার বউদি আর বোন চণ্ডীদাসীর অনুরোধে রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে একঝুড়ি মালপো একঝুড়ি মেঠাই একঝুড়ি রাধাপ্রসন্ন কৃষ্ণপ্রসন্ন মিষ্টি এনে খাইয়েছিল। ব্যাপারটা বলতে হয় নইলে পরিষ্কার হবে না। সে বছর রাসের দিন দুই ননদ ভাজে গল্প করছিল কান্দীর রাজবাড়ির রাসের খাওয়ার সমারোহের।

কান্দী রাজবাড়িতে রাধাবল্লভ ঠাকুরের নিত্যভোগেই এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একান্ন পদের ব্যবস্থা; সেই অবস্থার উপর বিশেষ ব্যবস্থা রাসযাত্রা পর্বে। দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ব্যাপার। খেতে বসে পদের পর পদ খেতে লোকের পেট ভরে উঠে এমন চড় চড় করে যে, হেউ ঢেউ শব্দে চারিদিক ভরে যায়। দু-দশজন ত্রাহিত্রাহি, ত্রাহি মাম্ পুণ্ডরীকাক্ষ বলে গড়াগড়ি খায়।

বউটির বাপের বাড়ি কান্দীর কাছে, সেই গল্প বলছিল। বলছিল এমন মালপো মনোহরা আর রাধাপ্রসন্ন কৃষ্ণপ্রসন্ন মেঠাই আর কোথাও হয় না ভাই ঠাকুরঝি। প্রতিবার বাবা রাসের সময় কান্দীর রাজবাড়ি থেকে ছাঁদাতে নিয়ে আসত।

চণ্ডীদাসী বলেছিল,—আমি ভাই কখনও খাই নি।

বউ বলেছিল,—আমি খেয়েছি, কিন্তু আরও খেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কে খাওয়াবে বল? তোমাকে কি বলব, মনে পড়ে নোলা সপ্‌সপ্ করছে।

ঘরে সাঙার উপরে চালের নীচে এক টুকরো খোনা হাসি বেজে উঠেছিল—হিঁ—হিঁ হিঁ।

চণ্ডী বলেছিল—এই। কি হাসছিস তুই ছোড়দা। ভারী তো ভূত হয়েছিস। শুধু ঝুঁটি ধরে টানতেই পারিস। কই খাওয়া না দেখি। মনোহরা মালপো ফেষ্টফসন্ন-টসন্ন না কি বলছে বউ, সেই মিষ্টি।

কেষ্ট কি প্রসন্ন নাম করতে পেতো না চণ্ডী; কেষ্টদাসী নাম ছিল চণ্ডীর শাশুড়ীর আর প্রসন্নকুমার নাম ছিল স্বামীর। তাই বলেছিল ফেষ্টফসন্ন। যাক সে কথা। এখন যা হয়েছিল তাই বলি। ঘরের ভিতরে যেন একটা দমকা বাতাস উঠল এবং ঘরের দরজা দড়াম শব্দে ঠেলে খুলে বেরিয়ে গেল; হাওয়াটা পাকাতে পাকাতে নিম গাছটার গোড়ায় গিয়ে গাছটার কাণ্ডটাকে ঘিরে পাক দিয়ে ডালপালায় ঝড়ের মত ঝটপটানি জাগিয়ে একেবারে গোড়া থেকে সেই মগডালে উঠে সেখান থেকে মাথার উপরে আকাশ কাঁপিয়ে (আজকাল-কার জেট প্লেনের মত) একটা গোঙানী শব্দ তুলে ঝপাং শব্দে গিয়ে পড়ল শিমুল গাছের মগডালে—সেখান থেকে আর একটা শব্দ।

চণ্ডীদাসী বলেছিল—কারণ। রকম দেখ। ভূতের কি সবই বিটকেল, যাচ্ছে তারই বিটকেলেমি দেখ তো।

এ বিটকেলেমি তো যেমন তেমন। এরপর যে বিটকেলেমি করলে রামাই তা শুনেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। আধঘণ্টা হবে, তারপরই চালের উপর সে যেন চার চারটে বীর হনুমানের সমান ওজন নিয়ে দমাস শব্দে লাফ খেয়ে পড়ল। পড়ল পড়ল একেবারে আচমকা পড়ল। চণ্ডীদাসীদের গল্প তখন সদ্য শেষ হয়েছে। চুপ করেছে। এই শব্দে দুজনেই চমকে উঠে—বু বু বু বু শব্দে কেঁদে উঠেছিল।

চালের উপর তখন মচ্‌মচ্‌ শব্দ উঠতে শুরু করেছে। চাল যেন ভেঙে পড়বে। তারপরই তাদের চোখে পড়ল চাল থেকে ঠিক মধ্যি উঠোনে এসে নামছে একটি গোদা পা, তা পা-খানা প্রায় নিম গাছের ডালের মত বা তাল গাছের মত তো হবেই। তার পরই আর একটা পা, ক্রমে দুটো পায়ের উপর গোটা একটা মূর্তি। মূর্তিটা একেবারে মিশকালো। তবে গায়ে তার অসংখ্য জোনাকি পোকা লেগে রয়েছে এবং শরীরের রেখায় রেখায় লেগে দিপ্‌-দিপ্‌ করছে। পূর্ণিমার রাত্রি—জ্যোৎস্নায় সব ফট্‌ফট্‌ করছে—তারই মধ্যে জোনাকি পোকা-খচিত ওই অপূর্ব কালো মূর্তিটা উঠোনে দাঁড়াল; তার মাথার উপর ঝুড়ির গন্ধমাদন—চার চারটে ঝুড়ি থাকবন্দী সাজানো। আর তার থেকে কি সুবাসই না উঠছে। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। মূর্তিটা ক্রমে খাটিয়ে গুটিয়ে মানুষের মত হল এবং চারটে ঝুড়ি মাথায় বয়ে ঘরে এসে ঢুকে নামিয়ে দিলে—নে—খা। একেবারে টাটকা। উনোন থেকে নেমেছে আর তুলে এনেছি। খা। বলেই চণ্ডীদাসীর ঝুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে দুম্‌ শব্দে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে লাফ মেরে ঘরের সাঙার উপর পা ঝুলিয়ে বসে খোনা গলায় গান ধরে দিয়েছিল।

মা গো আঁমায় বাঁচিয়ে রাঁখো।
এই ভূঁতজন্মে মা—জঁন্মে জঁন্মে চিঁ-রো জন্ম বাঁচিয়ে রাঁখো
ইন্দ্র-চন্দ্র-দেবতা দেখে মানুষ দেখলাম লাঁখো লাঁখো—

সব ফেলে মা ভূতভাবনের বুকেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকো—
মা গো আমায় বাঁচিয়ে রাখো—এই ভূতজন্মে।
ভূতের কত সুখ বলো মা—দুখ নাইকো তিন সীমানায়
অমাবস্যার ভূতের নাচন—নাচছি দেখো মা আজকে রাস পূর্ণিমায়,
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং—নাচ—ছি দেখো পূর্ণিমায়।

সে গান সে দিন সকলে শুনেছিল এ গ্রামের। এমন খোনা মিষ্টি গলা আর কেউ কখনও শোনে নি। শুনেছিল আর দেখেছিল নিম গাছটার ডালে পাতায় জোনাকি পোকাগুলো ছুটে গিয়ে নিভে যাচ্ছে। তার মানে রামাই জোনাকি পোকাগুলো ধরে ধরে খাচ্ছিল।

চণ্ডীদাসী জিজ্ঞাসা করেছিল, ও-গুলো খাচ্ছিস কেন? মা গোঃ!

রামাই বলেছিল, জোনাকি পোকা ভূতের জিভে ভারী মিষ্টি আর জোনাকি পোকা খেলে ভূতের রং ফরসা হয়।

চণ্ডীদাসী বলেছিল, তার চেয়ে জোনাকি পোকা দিয়ে গয়না করে পরিস সেই তো ভালো!

রামাই বলেছিল, তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরে পেতনী হবি? আমি তোকে জোনাকি পোকার গয়না গড়িয়ে দেব।

* * *

রামাইয়ের নামে একটা অপবাদ ছিল। লোকে বলত রামাই তাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে অবস্থাপন্ন কালীবাবুর বাড়ির দরজায় রোজ ময়লা লেপে দিত। রামাইয়ের সঙ্গে কালীবাবুর ঝগড়া ছিল। রামাই বলত—না। ধেৎ! ওই আমার কাজ হয়? আমি বামুনের ছেলে—আমারই ব্রহ্মদৈত্যি হবার কথা, তা সংস্কৃত পড়ি নি শাস্ত্রকাজ করি নি—সন্ধ্যে আহ্নিক করি নি বলে ভূত হয়েছি। ও কাজ ভূতে করে না। বিশেষ করে বামুন ভূতে। ও হল পেরেতের কাজ। এক বেটা পেরেত থাকে কালীবাবুর পায়খানায়। সেই বেটা ময়লা মাখায় কালীবাবুর দরজায়। কালীবাবুর শিউলি গাছে আছেন ব্রহ্মচারী, পেরেতটা তারই চাকর।

* * *

অতঃপর লাভপুরে পৌছানো।

হাওড়া স্টেশন হতে ১১১ মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন। জংসন স্টেশন। সেখান থেকে ৮ মাইল দূরে লাভপুর। সকালে সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে ১১।।টায় আমদপুর, সেখানে নেমে ছোট লাইনের ট্রেনে লাভপুর। ভোরবেলা যখন হাওড়া রওনা হব তখন আমার শোবার ঘরের জানালার ধারের সেই বেল গাছটার ডালগুলো খুব দুলতে লাগল। ট্যাক্সিতে চড়ছি ঠিক সেই সময়ে মনে হল যেন কেউ শিঙে বাজিয়ে দিল—ভোঁপো ভোঁপো ভোঁপো শব্দে। শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে গাছটার দিকে তাকালাম। কেউ যেন মনে হল বললে, কিছু ভয় নাই, চলে যাও। আমি সব খবর পাঠিয়ে দিয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে?

কেউ যেন বললে—আমি এই বেল গাছে আছি। এই গাছের ডালের উপর তোমার জন্যে আস্তানা তৈরি করাচ্ছি। ভূতপুরাণ যদি উদ্ধার করতে পার তবে এই বেল গাছে তোমার স্কাইস্ক্রেপার তৈরি হয়ে যাবে।

যথাসময়ে লাভপুর পৌঁছুলাম। নতুন কালের লাভপুর। আসছি প্রায় দু' যুগ পর। মানে চব্বিশ বছর। অবশ্য দুদিন-চারদিনের জন্যে বা একদিন-আধদিনের জন্যে মধ্যে মধ্যে যা এসেছি সেগুলো ধরছি না। কারণ এসেছি কোন কাজে, সে কাজ সেরেই চলে গেছি। কারুর কোন খোঁজ করি নি। বাড়িতে মা ছিলেন, তাঁকে প্রণাম করেছি কথা বলেছি। বাড়ির দেবতারা আছেন ; তাঁদের ঘরের সামনে গিয়ে এক প্রণামে প্রণাম সেরে চলে এসেছি। কোন কথাই বলি নি। এমন কি—রক্ষা কর কি রাজা কর কি লটারীর টাকা পাইয়ে দাও তাও বলবার কথা মনে হয় নি। দেবতারা তো বোবাই, তাঁরা কথা তো বলেনই না। মানুষদের খোঁজও করি নি। ভূতদের খোঁজ তো দূরের কথা। বাড়ির পাশেই কালীবাবুর বাড়ি। বাড়িটাতে এখন লোক নেই, বন্ধ থাকে দরজা। ওদিকে তাকাই নি। তাকাবার কথা মনে হয় নি। কোন গন্ধও পাই নি। কেউ ঢেলাও ছোঁড়ে নি। সুতরাং ওদের কথা, মানে ভূতেদের কথা, মনেই হয় নি।

এবার প্রথমেই রামাইএর খোঁজে ভটচাজ বাড়ির দিকে তাকালাম। বড় নিম গাছটা, যেটা সেই প্রাচীন কালের, সেটা নেই দেখলাম। কালীবাবুর বাড়ির বন্ধ দরজায় কোন প্রকার ময়লা মাটির চিহ্ন নাই ; খুব টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়েও কোন গন্ধ পেলাম না। কালীবাবুর বাড়ির যে শিউলি গাছটায় ন্যাড়া ব্রহ্মচারী থাকত সে গাছটাও মরে গেছে। ওদের বাড়ির পাইখানাটা যেটার মধ্যে ওই পেরেতটা থাকত সে পাইখানাটা ভেঙে একেবারে ঢিবি হয়ে গেছে। আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

কি বিপদ।

তা হলে এরা গেল কোথায় ?

তিন

সন্ধ্যাবেলা মনে হল নিজের ফাঁদে নিজে পড়েছি, নিজের বিপদ নিজে ডেকেছি। এ প্রায় তেপান্তরের মাঠে প'ড়ে পথ হারানোর মত ব্যাপার। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। ভূতের 'ভ' পর্যন্ত উপে গিয়েছে। কোথাও কোন হদিস পাওয়া যায় না। বড় বড় গাছগুলো, রামাইয়ের নিম গাছ, শাহ পুকুরের শিমুল গাছ, বাঁধির বট গাছ, লালুকচাঁদার বট গাছ, বৈরাগীতলার বকুল গাছ, শ্যামাপদ ময়রার ভাঙা দালানবাড়ি, পাথুরেপুকুরের ভাঙা ঘাট, জেলেপাড়ার ছাঁচতলা, সদগোপদের ঢেঁকিশাল, মকবর ঢিবির কবরের পর পাশে জন্মানো ঝোপঝাড়গুলো, মৌলকিনীর তাল গাছগুলো, বাঁশঝাড়তলা এ-সবের প্রায় কোনটাই আর নেই। কাটা পড়েছে, ভেঙে পড়েছে অথবা আপনা-আপনি মরে গেছে। নিম গাছে রামাই থাকত।

শিমুল গাছ ছিল সকল ভূতের বারোয়ারীতলা, লালুকচাঁদার বট গাছে থাকত ফনা পেতনী, বৈরাগীতলার বকুল গাছে থাকত তেলক-কাটা বোষ্টম পণ্ডিত ভূত। জেলেপাড়ার জেলেদের বাড়িগুলোর ছাঁচতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত এক বিধবা পেতনী। যে কেউ জেলেদের বাড়ি থেকে মাছ কিনে নিয়ে যেত তারই পিছন পিছন সে চলত আর বলত, এঁক টুক্‌রো মাঁছ দেঁ রে। এঁই এঁতটুকু এঁক টুকরো।

বলতে ভুলেছি, জেলেপাড়ার মাঝখানে ছিল কৈবর্তপুকুর। এই পুকুরে রাত্রে চবাং চবাং শব্দ তুলে দশ-পনেরটা শাঁকচুন্নী মাছ ধরে ফিরত। মাথায় দড়ি দিয়ে খাড়ুই বেঁধে, গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরে, চাবি জাল অর্থাৎ বাঁশের গোল ফ্রেমেগাঁথা জাল নিয়ে চাপা দিয়ে দিয়ে মাছ ধরত। কখনো সকলে মিলে গান করত খোনা সুরে, কখনো কথাবার্তা বলত, কখনও ঝগড়া করত। গান করলে মনে হত শীতের দিনে কুকুরের বাচ্চা কাঁদছে। কথা-বার্তা বললে মনে হত এক ঝাঁক শালিকপাখি মিলে কিচিরমিচির করছে। ঝগড়া করলে মনে হত পাঁচ-সাতটা বেড়াল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে এঁ্যাও—এঁ্যা—ও করছে। তারপর সে এক ছেঁড়াছিঁড়ি ব্যাপার। খঁও-খঁও-খঁও-খঁও ব্যাপার। আর বেশী আনন্দে গান গাইলে মনে হত গ্রীষ্মকালের রাত্রে খানদশেক গোরুর গাড়ি চলেছে, তাদের তেল শুকিয়ে যাওয়া চাকায় কঁ্যা-কঁ্যা-কঁ্যা-কাঁচোর-কঁ্যাচ-কঁ্যাচোর কঁ্যাচ শব্দ উঠছে।

ওই যে পেতনীটা, যেটা নাকি জীবনকালে বিধবা হয়ে চুরি করে মাছ খেয়ে পেতনী হয়েছিল, যেটা জেলেদের ছাঁচতলায় থাকত, সেটা ওই শাঁকচুন্নীদের অপেক্ষায় পুকুরপাড়ে বসে থাকত আর শাঁকচুন্নীদের তোষামোদ করত। বলত, আঁহা বোঁন কিঁ সুঁন্দর তোঁমাদের গলা! শাঁকচুন্নীরা বলত, মঁর-মঁর-মঁর মাঁছখাগী বিধবা, লুঁভিষ্টি, পাঁপিষ্টি! তোঁর মঁতলব সঁব বুঁঝি।

সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল শুরু হত দুই পক্ষে। একপক্ষে এই বিধবা পেতনী একা, অন্যদিকে দশ বারোটা শাঁকচুন্নী।

কোন দিন শাঁকচুন্নীরা সকলে মিলে ওই পেতনীকে চুলের মুঠোয় ধরে যে যেমন পারত সে তেমনি মার দিত। আর পেতনীটা চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে তারস্বরে চীৎকার করত। মনে হত কোনো বনবেড়ালে কোন প্যাঁচা বা বাদুড় ধরেছে, আর সেটা চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে চ্যাঁচাচ্ছে, বাঁবারে মাঁরে মঁলামরে বাঁচারে বাঁচারে!

কখনো কখনো নাকি এ-ঝগড়া এ-লড়াই দু-তিনদিন ধরে চলত। দিনের বেলা শাঁক-চুন্নীরা সব কাক হয়ে যেত আর এই মাছলোভী বিধবা পেত্নীটা হত একটা বেড়াল। বেড়ালটা লুকিয়ে থাকত এই পুকুরপাড়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে, তার সঙ্গে যোগ দিত লালুকচাঁদার বট গাছের ফণা পেতনী; বট গাছটার চারিপাশে কাকেরা উড়ত; পেতনী ফণা একটা গোখরো সাপ। আরও যোগ দিত শ্যামাপদ ময়রার ভাঙা দালানের চিলেকোঠার পেতনীটা। এই পেতনীটা একটা কোন ইতর পেতনী ছিল, ওই কালীবাবুর পায়খানার প্রেতটার মত রীতকরণ ছিল তার। সারা বাড়িময় ময়লা নিয়ে যেন চালুনীর উপর বড় বড় বড়ি বসিয়ে যেত। সব থেকে

বেশি উপদ্রব করত উনোনশালে রান্নার উপর; রান্নার হাঁড়িতে কড়াইয়ে ফুটন্ত ভাত তরকারীর উপর ময়লা ফেলে দিত।

পুলিস পাহারা রেখেও কোন প্রতিকার হয় নি। পুলিস কি পাহারা বসালে পেতনী তখন শ্যামাপদ ময়রার পাগলী মেয়েটার মাথায় ভর করত। সে সর্বাঙ্গে ময়লা মেখে দুই হাতে ময়লা নিয়ে পাহারাওলা বা পুলিসকে বলত, আতর মাখবে? আতর? একশো টাকা ভরি। শাঁকচুন্নী পেতনীর লড়াইয়ে সেও এসে যোগ দিত। লোকে বলে মেয়েটা ময়লা মেখে একটা ঝাঁটা নিয়ে ওই কাকগুলোকে তাড়াত আর বলত ধাঁ-ধাঁ-ধাঁ-ধাঁ। আশ্চর্যের কথা, কথা তার খোনা হয়ে যেত।

আর আসত আলেয়া পেতনী। আলেয়া কথাটা শুদ্ধ কথা, ভাল কথা, কলকাতার লোকের কথা, শুনলেই মনে হয় খুব সুন্দরী পেতনী। বেশ সুন্দর করে কবিতা বলে, গান করে। কিন্তু তা নয়। আমাদের দেশে ওদের বলে পেত্যা পেতনী। ওরা রাস্তায় প্রান্তরে আলোর মত দপদপ্ করে জ্বলে উঠে নিভে গিয়ে, আবার জ্বলে, আবার নিভে নিভে, ছুটে-ছুটে বেড়ায়। এরা হল গায়ে আগুন লাগিয়ে বা কোনক্রমে আগুনে পুড়ে মরা মেয়ে ভূত। এদের গায়ের রঙ ফ্যাকফ্যাকে লালচে শাদা। চুল নেই ভুরু নেই। শুধু চোখ দুটো ওই লালচে শাদা রঙের মধ্যে জুগ্‌জুগ্ করে। চোখোচোখি হলেই এর উপর সাদা দাঁত মেলে হাসে। সে-দেখলে যেমনই সাহসী লোক হোক মূর্ছা যায়।

এই সব রাজ্যের ভূতের কথা মনে করছিলাম।

রামাই ভূতেদের বাড়িটার একটা অংশ এখন আমাদের, বাড়িটার সেই অংশের উঠানেই সেই নিম গাছটা যেটা রামাই অধ্যুষিত বৃহৎ মহাভৌতিক নিম্ববৃক্ষ। আমি সেই গাছটার দিকে তাকিয়ে এই সব কথা ভাবছিলাম। মধ্যে মধ্যে বলছিলাম মনে মনে, রামাই প্রভু, রামাই মহারাজ, যদি ভূত হয়ে বেঁচে থাক, তবে সাড়া দাও। তোমার কীর্তির কথা আমাকে বল, আমি তোমাকে অমর করে দেব। হে রামাই মহারাজ, হে ভূতপ্রবর, হে মহাভাগ।

* * * *

এ সব হল অনেক কালের কথা।

এতকালে এরা হয় তো মরে গিয়ে থাকবে।

কথাটা মনে হতেই মনই বললে, কি বলছ? মানুষ মরে মরে ভূত হয়। ভূত আবার মরে না কি?

মরে বই কি। না হ'লে যায় কোথায়?

মরেই বা যাবে কোথায়?

ভাবনা হল—তাইত। মরেই বা যায় কোথায়?

তা হলে?

রামাই-টামাই সব মিথ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা কি সাড়া উঠল। নিম গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে যেন

ফিস্‌ফাস্‌ উঠল। মনে হল বলছে যেন—সর্বনাশ। সর্বনাশ। বলতে নেই বলতে নেই। শালপুকুরের তাল গাছগুলোর মাথায় তালপাতাগুলো খড়মড় খড়মড় শব্দ করে দুলে উঠল, বললে, খবরদার খবরদার। আঁতুর গড়ের পাড়ের উপর তিনটে ন্যাওড়া গাছের মধ্য থেকে কারা যেন বললে, রঁক্কে কঁর মাঁ, রঁক্কে কর।

হ্যাঁ। রক্কে করই বটে। রামাইকে নয় চোখে দেখি নি আমি। কিন্তু পাগলা রাখ-হরির মা, মুখুজ্জে গিন্নীঠাকরুন ভূতকে তো আমি দেখেছি। দেখেছি মানে তাঁর ভূত-জীবনের কাজকর্ম কীর্তিকলাপ আমি দেখেছি।

বাপ্‌! গোটা পাড়াময় ইটপাটকেল, কাঁকর ঢেলা, এ মুঠো-মুঠো বর্ষণ হতে দেখেছি। আরে মশায়, আমার বাড়িতে উঠোনে চালে ছাদে একেবারে যেন ঝাঁকেঝাঁকে বর্ষণ হত।

আশ্চর্য ব্যাপার!

জীবনকালে—কি ভাল মানুষই না ছিলেন মুখুজ্জেগিন্নী। আমার তখন ছেলেমানুষ বয়সের কাল। যেমন সুন্দর ছিলেন দেখতে তেমনি মিষ্টিমধুর ছিলেন ব্যবহারে। সোনার মত ছিল গায়ের রঙ, তেমনি মুখ চোখ, সেই সঙ্গে তেমনি মিষ্টি ছিল কথাবার্তা। কোমল ছিল হৃদয়। মুখুজ্জেগিন্নীর গানের গলাও ছিল খুব মিষ্টি। গান গাইতেন খুব ভাল। সে-কালের গান সব। আবার নাতি নাতনীর বাসর ঘরে নাচতেনও তিনি। আমি দেখেছি নাচ। আশ্চর্য ব্যাপার, এই মানুষ মরে ভূত হলেন।

স্বামী পুত্র নাতি নাতনী রেখে মারা গেলেন। শ্রাদ্ধটাদ্ধ হয়ে গেল। এর পরই দেখা গেল যে সন্ধ্যের পর থেকেই তাঁদের বাড়ির পাশের যে গলিটা সদর রাস্তা থেকে আমাদের ভিতর-বাড়ি পর্যন্ত এসেছে, এই গলি পথে কেউ গেলেই তার মাথায় যেন কে গাঁট্টা মেরে দেয়।

যেমন তেমন গাঁট্টা নয়, গাঁট্টায় মাথার সে জায়গাটা ফুলে ওঠে। প্রথম-প্রথম লোকে কে? কে? কেরে? বলে চেঁচামেচি করত। তারপর ভয় খেতে শুরু করল। মাস-খানেক পর থেকে গলিতে লোকেদের মাথায় বালি কাঁকর বৃষ্টি হতে আরম্ভ হল। তারপর আরম্ভ হল পড়শীদের ঘরে কাঁকর ঢেলা ঘুটিং বৃষ্টি। ওই গলিটার দুই পাশে যাদের বাড়ি যাদের সঙ্গে ওই ঠাকরুনটির খুব ভাবসাব ছিল, ভালবাসা ছিল, তাদের বাড়িতে উঠানে চালে, যেন শূন্যলোক থেকে কেউ মুঠোমুঠো ধুলো বালি ছিটুতে আরম্ভ করলে। কেউ বলত মানুষ তো হতে পারে না। আকাশলোক থেকে কেউ—। মানুষের ওপরওয়ালা কেউ। ভাবতে গেলেই ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়। আর সে ঢেলা বৃষ্টির ধরন-ধারণই আলাদা। আশপাশের বাড়িতে ঢেলা বালি ধুলো মুঠোমুঠো কাঁকর যেন বৃষ্টি হতে লাগল। কেবল ওই ঠাকরুনের নিজের বাড়িটি ছাড়া। ওদের বাড়িতে কোন ঢেলা বালি পড়ত না। এ ছাড়া এধনই এ বাড়ি তারপরেই পাশের বাড়িতে তারপরই তার পাশের বাড়িতে। দশভূজ বললে যদি বা বেশি হয়, চতুর্ভুজা অনায়াসে বলা যায়। চারটে হাত না হলে এইভাবে ধুলা বালি বর্ষণ হয়

না এবং শুধু ধুলা বালি নয়—ইটের টুকরো ইটের আধলা এমন কি গোটা খান-ইট পর্যন্ত পড়তে লাগল।

পাড়ার লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—কে ফেলছে ঢেলা? ভূতটা হল কে? সম্প্রতি এই ঠাকরুনটি মারা গেছেন, আর কেউ যায় নি। আর সব বাড়িতে ঢেলা পড়ে, ওদের বাড়িতে পড়ে না কেন? কিন্তু তাঁর মত মানুষ কেন ভূত হবেন? এমন ভাল মানুষ। সকলের বাড়িতে ঢেলা পড়ে তাঁর বাড়িতে পড়ে না। তাঁর বড় পুত্রবধূ একদিন রাত্রে খেয়ে উঠে আঁচাতে আঁচাতে বললেন, ভূত হয়েছো তো পরের বাড়ি ঢেলা মার কেন? লোকে নিন্দে করে গাল দেয়। তার থেকে নিজের বাড়িতে ফেল। জানান দাও। তা হলে ছেলেরা পিণ্ডি দেবে গতি করবে।

সঙ্গে সঙ্গে দমাস করে সামনেই পড়ল খানইট।

তারপরই খোনা স্বরে না কি বললে, পিণ্ডি দিলে যে দেবে তার ঘাড় মটকাবো। তারপরই দেখা গেল দুটো তাল গাছের মত লম্বা পা, একটা নিজেদের বাড়ির চালের উপর রেখে অন্যটা বাড়িয়ে দিয়েছে লালুকচাঁদা পুকুরের পাড়ে বট গাছের দিকে। লালুকচাঁদা পুকুরটা মজা পুকুর, ওখানে শব সৎকার হয় না, মুখাগ্নি হয়। ওই বট গাছটা নাকি মর্ত্যলোক আর ভূতলোকের মধ্যে প্রথম হল্টিং স্টেশন। কিংবা খেয়া ঘাট।

লোকে বলে এই ঠাকরুনটি ভূত হয়েছিলেন সন্তানের মমতায়। তাঁর বড় ছেলে তাঁর ভারী প্রিয় ছিল এবং সে ছিল যেমন রোজগেরে তেমনি মাতাল। যেখানে সেখানে মদ খেয়ে পড়ে থাকত। মা ভাত কোলে করে বসে থাকতেন, দিনেও থাকতেন রাত্রেও থাকতেন। তারপর দিনের বেলা গ্রীষ্মকালে বেলা দুটো আড়াইটার রোদ্দুরের মধ্যে গামছা মাথায় ছেলের খোঁজে বের হতেন। রাত্রেও রাত্রি দেড়টা-দুটো মানতেন না, লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়তেন। তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর ছেলের বয়স পঞ্চাশ, তাঁর নিজের বয়স ছিল পঁয়ষট্টি। এই ছেলেকে রেখে মরে তাঁর স্বস্তি হয় নি। কাজেই মরে তিনি ভূত হয়েছিলেন। ভূত হয়ে পাড়ার একটা গাছে বাসা নিয়েছিলেন। লোকজনদের বাড়িতে ঢেলা মেরে জ্বালাতন করতেন, গভীর রাত্রে তাল গাছের মত লম্বা লম্বা দুখানা পা দুটো ঘরের চালের উপর রেখে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখে খুঁজতেন মাতাল ছেলে কোথায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। আর ডাকতেন, ওঁরে রাঁখু, ওঁ বাঁবা রাঁখু। বাঁড়ি আয় বাঁবা বাঁড়ি আঁয়।

তাঁর সেই মাতাল ছেলে বলত, হ্যাঁ রাত্রে কোথাও বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে মা আমার গায়ে হাত বুলিয়ে চেতন করিয়ে হাত ধরে নিয়ে আসে। যেদিন কিছুতে উঠতে না-পারি সেদিন এই তাল গাছের মত লম্বা হয়ে এই বড় দুখানা হাত বের করে আমাকে ছোট ছেলের মত পাঁজাকোলে করে বাড়ি এনে শোবার ঘরে দরজায় ফেলে দেয় দুম করে। কোন কোন দিন দু-তিনটে ভুতুড়ে কিল্ বসিয়ে দেয় গুম্‌গুম্ শব্দে। সে কিল এমন কিল যে তার ব্যথায় পরের দিন আর উঠতে পারি না।

এই মমতাময়ী মা-ভূতটি এক পাষণ্ড ছেলে-ভূতকে উদ্ধার করেছিলেন। সে গল্পটা বলি।

একদিন নাকি তাঁর এই ছেলেটি গ্রামের পূর্বদিকে মাঘী পূর্ণিমার মেলা থেকে অনেক খাবার-টাবার লুচি মিষ্টি সিঙ্গাড়া কচুরি কিনে নিয়ে, তার মানে ওই ভূতঠাকরুনের মাতাল ছেলে রাখহরির ভয়ডর তো এমনিতেই ছিল না, তার উপর মদ খেয়ে মাতাল অবস্থাতে সর্বদাই বুঝতে পারতেন যে তাঁর মা-ভূত তাঁর সঙ্গে আছেন, সুতরাং শীতের দিন রাত্রি একটা-দেড়টার সময় এই খাবারের চ্যাঙারিটা নিয়ে, আপন মনেই বলতে বলতে আসছেন :

গড ইজ্ গুড, মাদার ইজ আরও গুড, মাদার ভূত ইজ তার চেয়েও গুড, মানে বেটার বেস্ট।

এখন আমাদের পাড়া আসবার একটা শর্টকাট্ রাস্তা ছিল। সেটা ভাগাড়ের পাশ দিয়ে চাঁড়াল পাড়ার খানিকটা মাড়িয়ে, একটা বড় অশত্থ গাছতলায় এসে পড়েছিল সদর রাস্তায়। সেখান থেকে একটু আগেই আমাদের এই বাড়ির গলি। এখন এই যে অশত্থ গাছটা—এই গাছটায় এক পাষণ্ড ছেলে-ভূত থাকত। লোকটা ভূত হয়েছিল জীবনকালে মাকে খেতে দিত না বলে। অবিশ্যি গরীবগুর্বো লোক বটে—আর কাজও ছোট কাজ করত বটে। রোজগার সামান্যই ছিল। কিন্তু বুড়ি মাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলেছিল, যা তুই ভিক্ষে করে খেগে যা।

মা না-খেয়েই মরেছিল। কিন্তু ভূত হয় নি। ছেলে এই পাপে ভূত হল। হয়ে এই অশত্থ গাছে থাকল। ওর সাজা হল—ভূত রাজ্যে কোথাও ওর কাজকর্ম জুটবে না এবং কেউ ওকে খেতে দেবে না। অগত্যা লোকটা শুধু ভূত হল না—চোর ভূত হল। কাজ হল, ওই গাছ-তলা দিয়ে যারা খাবার নিয়ে যায় তাদের খাবার কেড়ে নেওয়া, চুরি করে নেওয়া। সেই কারণে এই গাছতলা দিয়ে কেউ যেত না। সেই মাকে-খেতে-না-দেওয়া ছেলে-ভূতটা গাছটার একটা কোটরে উপোস করে প'ড়ে প'ড়ে চিঁচিঁ করত। ওই পাখিতে বা কুকুরে বা বেড়ালে কোন খাদ্য মুখে করে আনলে তাই কেড়ে খেয়ে কোন মতে ভূত জন্মে বেঁচে ছিল।

কেউ না-জেনে গাছতলা দিয়ে খাবার নিয়ে গেলে ভূতটা তার পিছু নিত তারপর ভয় দেখিয়ে খাবার কেড়ে নিত। পাঁচি ঠাকরুন বলে একটি মেয়ে ছিলেন, তিনি ভাত রান্না করতেন পরের বাড়ি ; রাত্রিতে মনিববাড়ি রান্না সেরে দিয়ে বাড়ি আসতেন কিছু খাবার-টাবার নিয়ে। কিন্তু অন্য পথে যেতেন এই ভূতটার ভয়ে। যেদিন তাড়াতাড়ির জন্য এই পথে যেতেন সে দিন ভূতটার সঙ্গে লড়তে হত। ভূতটা প্রায়ই জিতত। সে কেড়ে নিত খাবার। পাঁচি ঠাকরুন গাল দিতে দিতে বাড়ি যেতেন। কোন দিন খানিকটা খাবার রাস্তায় ফেলে দিয়ে বলতেন, ওই নে আর পাবি নে।

এখন যেদিনের কথা বলছিলাম, সেদিন ওই মা-ভূতের মাতাল মানুষ-ছেলে রাখুবাবু খাবারের চাঙারি নিয়ে ওই পথ ধরেই বাড়ি আসছিল। ওই গাছটার কাছে আসবামাত্র ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠতে লাগল। ভূতটা ওই চ্যাঙারিভর্তি সুখাদ্যগুলির গন্ধ শুঁকছিল।

রাখুবাবু হেঁকে উঠেছিল—কোন হ্যায় ?

ভূত বলেছিল, হঁম হ্যাঁয় রে। হঁম ভূত—হ্যাঁয়। কিঁসের গন্ধ উঠছে ? কিঁ খাঁবার

নিঁয়ে যাঁচ্ছিস ?—রাঁখ খাঁবার ! এঁ গাঁছতঁলা হঁল আঁমার জঁমিদারি। রাঁখ খাঁবার।

রাখহরি হেঁকেছিলেন, খবরদার। মাকে বলে দেব বলছি !

ভূতটা সঙ্গে সঙ্গে এক ধাক্কা মেরে রাখহরিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসে বলেছিল, এঁইবার।

তার সঙ্গে খোনা খোনা আওয়াজে ভূতুড়ে হাসি—হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ। হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

রাখহরি চীৎকার করে উঠেছিল—ও-মা-গো, মারলে গো, ও-মা—।

মা তখন আমাদের গলিতে গাছের ডালে বসে রাখহরির জন্যে ছড়া কাটছিল—

আয় রে রাখু ঘর আয়—
বাড়া ভাত তোর জুড়িয়ে যায়।

এরই মধ্যে তাঁর কানে এসে ঢুকল রাখহরির ডাক। সঙ্গে সঙ্গে 'কেঁ-রেঁ, কেঁরেঁ আমার রাঁখুকে মারে' বলে একগাছা ঝাঁটা নিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ওই অশথ গাছের গোড়ায়, যেখানে মাকে-খেতে-না-দেওয়া ভূতটা রাখহরিকে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে দুপাটি মূলোর মত দাঁত মেলে ইঁ ইঁ—শব্দ করে ভয় দেখাচ্ছিল—এবং কামড়াবার যোগাড় করছিল।

মা-ভূত সেখানে ঝপ করে লাফ দিয়ে নেমেই ওই মাকে-খেতে-না-দেওয়া ভূতটাকে ঝাঁটা দিয়ে দে মার ! মার তো মার, উথালি পাতালি মার !

আশ্চর্য কাণ্ড ঘটেছিল নাকি !

ঝাঁটার বাড়ি খেতে খেতে ওই পাপিষ্ঠ, মাকে-খেতে-না-দেওয়া ভূতটা ফুটবলের ব্লাডারের মত চুপ্‌সে গিয়েছিল। এবং একটি আত্মা তার থেকে বেরিয়ে হাত জোড় করে বলেছিল, মাকে খেতে না দিয়ে যে পাপ করেছিলাম, সে পাপ আমার, তোমার মত মা যে ছেলের জন্যে ভূত হয়ে রয়েছে এবং ছেলেকে আগলাচ্ছে, তার হাতের ঝাঁটা খেয়ে আমার পাপমোক্ষণ হয়ে গেল। আমি আজ ভূতজন্ম থেকে খালাস পেলাম। বলেই সে একটা জোনাকি পোকার মত দীপ্যমান হয়ে চলে গেল।

এরপর রাখহরি মারা গেল।

রাখহরি মারা যাবার দিন খুব ঝড় হয়েছিল। লোকে বলে ওই মা-ভূত সেদিন ছেলেকেও ভূত করে নিয়ে চলে গিয়েছিল, ভূতেদের কোন রাজ্যে, সেখানে রাখহরি কণ্ট্রাক্টারী কাজ পেয়েছিল। তদবধি মা-ভূতেরও কোন পাত্তা নেই।

তা হলে ?

কোথায় পাব ভূতের পাত্তা ? কি করে আরম্ভ করব আমার গবেষণা ?

হঠাৎ মনে হল মকবর ঢিবিতে গেলে তো হয় !

চার

শ্যামাপদ মোদকের বাড়ির ওধারেই মকবর ঢিবি; এস্থানটি একদা মামদোভূতের জন্ত বিখ্যাত ছিল। হিন্দুপাড়ার পর একটা রাস্তা; রাস্তার ওপারে মস্ত একটা প্রান্তর; তারপর মুসলমানপাড়া। ওই প্রান্তরে একটা ঢিবি, তার উপর একটা আম গাছ, সেই আম গাছ-তলায় একটি ফকিরের সমাধি এবং এই সমাধিকে ঘিরে অসংখ্য সমাধি। এই হল মকবর ঢিবি। মকবর ঢিবি মুসলমানদের বহুকালের কবরস্থান; সেই কোন কালে রুমের বাদশা হারুন-অল-রশিদের সময় এক ফকির এসে এখানে পাড়ার পত্তন করেছিলেন। তাঁর দরগাকে ঘিরে কত হাজার কবর যে হয়েছে আজ পর্যন্ত তার হিসেব কে বলবে? কিন্তু এককালে সকলেই বলত অমাবস্যা, চতুর্দশী, বিশেষ শুক্রবারে মামদোভূতেরা উঠে চেল্লাচিল্লি করত। চেল্লাচিল্লি চরমে উঠলে হজরত সাহেব আসতেন। এই মেহেদি রঙানো দাড়ি গোঁফ নখ, এই আলখাল্লা, এই পাগড়ি, পায়ে নাগরা—এসেই বলতেন, যাও সব কবরে ঢুকে যাও। অমনি সব কবরে ঢুকে যেতো। হজরত সাহেব কদমা খেতে ভালবাসতেন। লোকে তাঁকে কদমার শিরনি দিত। কদমার শিরনি দিলে কোন মামদো তার কোন অনিষ্ট করত না। হজরত সাহেবের নামই হয়ে গিছল কদমা সাহেব। কদমা সাহেব নাকি খুব বড়দরের উলেমা ছিলেন। জীবিতকালে গোটা কোরান শরিফ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর আমলে তিনি সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দুদের পূজা-টুজার সময় কদমা সাহেব চেকলুঙি আর মোট তাঁতের কাপড়ের হাফ পাঞ্জাবি পরে মাথায় টুপি লাগিয়ে ডান হাতে তাঁর সিদ্ধছড়ি (বাঁশের লাঠি) নিয়ে বাঁ হাতে তাঁর হুঁকোটি ধ'রে টানতে টানতে এসে হাজির হতেন, হাঁকতেন, কাকা রইছেন নাকি? অথবা, বাপজান কোথায় গেল্যা গ?

ধুমধাম পড়ে যেত—আন আন মিঠাই আন। কদমা আন—ফলফুলুরি কি আছে, আন। হজরত সায়েব এসেছেন। তামাক সাজ তামাক সাজ। ওই যে কাষ্টগড়ার তামাক—ওইটে সেজে খান।

উঁ-হু। কদমা সাহেব বলতেন—কাষ্টগড়া-ফড়া নয় বাপু; গাঁয়ের মনিষ্যি, চাষাভূষার ঘরের ছাওয়াল, ও তামাক গলায় সুড়সুড়ি দিবে হে। দা-কাটা আন। হ্যাঁ। খ্যাক কর্যা গলায় লাগবে। সরদ্ উঠে যাবে। আর তোমাদের পণ্ডিত জনে ডাক।

পণ্ডিত বিশেষ করে ওই যে বৈষ্ণব পণ্ডিত, ওর সঙ্গে ছিল যত ভাব তত ঝগড়া। দেখা হলেই আরম্ভ করতেন, মুছ হে বৈরিগী পণ্ডিত ফোঁটা তিলক মুছ।

পণ্ডিত বলত, কেন? তুমি যে নিজে ঠ্যাঁটা হে।

মুছবে এই জন্যে হে, যে তুমি ঠ্যাঁটা তুমি চোরা। একদিকে ফোঁটা কাটো মালা জপ কর আর অন্যদিকে যত সব মামলার তদ্বির কর। তুমি যার পূজা কর হে, সে ছোকরাটি যে মস্ত ঠ্যাঁটা হে। তোমাদের কিষ্ট। ওই কুরুপাণ্ডবে লড়াই বাধাইয়া বাস, শ্যাষ করে দিল সব। আবার বিন্দা-বনে রাধা কন্যেটির সঙ্গে মহব্বতি করে পালায়ে এসে রাজা হইল, বিয়া করব

ষোল হাজার। ক্যানে হে? এমন জালিয়াতি বুদ্ধি ধরে ক্যানে হে! রাধাবেটীটি, আহা বলে পদ্মের মধ্যে জন্ম হইছিল। আর তেমনি রূপ। আহা তারে কি কষ্টটাই না দিল। তেমনি কি যশোদা মায়েরে দুঃখ দিল ছাওয়ালটা! পাষাণ হে পাষাণ!

কীর্তন গান শুনতে আসতেন। আসরে বসতেন না। একটু দূরে আড়াল দিয়ে বসে শুনতেন। যেন অন্য মোল্লারা কেউ কিছু বলতে না-পারে। আর কাঁদতেন।

এই হজরতকে এইখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। হজরত সাহেব কদমা ভোগ পেতেন, আগরবাতি জেলে দিত লোকে। বাতি দিত তার সঙ্গে। হজরত সাহেব পরম আনন্দে এখানে বাস করতেন। এখানে মামদোভূত, সে তো কম ছিল না, হাজার দরুনে ছিল। তার কারণ মামদোদের সব সেই শেষ বিচারের দিনের অপেক্ষায় মামদো হয়ে থাকতে হয়। এই হাজার হাজার ভূতের হজরত হয়ে বাস করতেন। লম্বা সাদা দাড়ি গোঁফ, সাদা এই পুরু বাবরি চুল; এক হাতে হুঁকো অন্য হাতে লাঠি, পায়ে খড়ম পরে গোটা গ্রাম ঘুরতেন। হিন্দু মুসলমান দুই পাড়াই ঘুরতেন। বাইরে থেকে কোন বদমাশ ভূত চোর ভূত কি ঠ্যাটা ভূত যদি গ্রামে ঢুকত তাহলে তাঁর সেপাইদের হুকুম দিতেন, ধর বেঁটাকে ধরে বেঁটাকে পিটে চামচিকে ক'রে ছেড়ে দে। মামদোরা নবাগত ভূতকে ধরে মাটিতে ফেলে কিল মেরে (ভূতদের বায়বীয়দেহ) সব বাতাস বের করে চ্যাপটা করে চামচিকে বানিয়ে ছেড়ে দিত। চামচিকেটা বনেবাদাড়ে ঘরের কোণে ফুর ফুর করে উড়ে বেড়াত আর এঁটো কাঁটা খেত।

মধ্যে মধ্যে, বিশেষ করে (সেকালে অবশ্য) হিন্দুদের পর্বের সময় পুজোর শেষে কদমা সাহেব এসে ঢুকতেন হিন্দু পাড়ায়। ডাঁক হে তোঁমাদের সেই ঠ্যাঁটা বৈরাগী পণ্ডিতকে ডাঁক হে। জবাব দিক তো দেখি দুর্গা মাইয়াটার মত এমন সোনার প্রতিমে কন্যাটারে—শিঁবের মঁত বুড়া ভাঁওড়ের সাঁতে সাঁদী দিল কাঁান? যত সব মামদোভূত সেদিন সিদ্ধির নেশা করে গান ধরত—'কি ঠাউর দেখলাম চাচা'।

শোনা যায় প্রতিমা বিসর্জনের পর কেঁদে সারা হতেন কদমা সাহেব এবং গাল পাড়তেন বৈরিগী পণ্ডিতকে। বলতেন, তোরা করেছিস ইসব। তোরা পেঁতে দিয়েছিস। মধ্যে মধ্যে তর্ক বাধত, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়াটা বেশি তেজী না দুলদুল ঘোড়াটা বেশি তেজী তাই নিয়ে। এ সব তকরার সেকালে অনেক লোকে কানে শুনেছে। চোখে কিছু যেত না কিন্তু মকবর ঢিবির আশে-পাশে দাঁড়ালে শোনা যেত—কদমা সাহেব বলছেন—ওঁরে কুঁচক্রী বোঁরেগী পঁণ্ডিত! ব্যাটা তোঁর নিকুচি কঁরব আঁজ! তোঁর ওই কদুর বোঁটার মত চৈঁতনাটা টেঁগ্যা ছিঁড়ে লিঁব আঁজ!

মকবর ঢিবিতে মাঝে মাঝে অন্য মামদোদের সাড়া মিলত। ইশাক্ শেখের ফুফুতে আর মায়ে কাজিয়া লাগত। ওদের দুজনকে পাশাপাশি এবং খুব কাছাকাছি কবর দেওয়া হয়েছিল। এ দিকে পাশ ফিরতে এর হাতখানা ওর গায়ে লাগত ও দিকে পাশ ফিরলে ওর হাতখানা এর ঠিক মাথায় এসে লাগত। এর অর্থাৎ চাচী আয়েষার চুল ছিল এক মাথা আর খুব লম্বা, খুব বাহারের খোঁপা বাঁধত সে; ওর অর্থাৎ ফুফীর চুল ছিল না একদম। পাড়ার

লোকে তাকে নেড়ী দেলেরা বলে ডাকত। কেউ কেউ বলত নাকু নেড়ী। মানে নাকটা ছিল খুব বড়। পরস্পরের গায়ে হাত ঠেকলেই ঝগড়া শুরু হত। ও অর্থাৎ আয়েষা ধরত নাকু নেড়ীর নাকে আর নাকু নেড়ী দুই হাতে মুঠো বেঁধে ধরত আয়েষার চুল। কবর থেকে বেরিয়ে পড়ত বিকট শব্দ করে।

এঁা—ও।

অঁ—ও।

এঁ্যা—ও অঁও।

তারপর, খঁ খঁ খঁ খঁ খঁ।

দুটো মিশ কালো কিছু, দুটো কালো বেড়ালের মত ছেঁড়া-ছিঁড়ি কামড়া-কামড়ি করত। কদমা সাহেবের মৌজ ভেঙে যেত। কদমা সাহেব আপিং খেতেন। সেই আপিংয়ের মৌজ ছুটে গেলেই রাগে ক্ষ্যাপা হয়ে যেতেন। কদমা সাহেব হাতের ডাণ্ডাটা মাটির ওপর ঠুকে ইশাকের চাচাকে ডাকতেন, ধরে আন দুটাকে।

দুটো মেয়েই এরপর মাথার উপর বোরখা চাপিয়ে সামনে আসত। এবং বোরখার মধ্য থেকে এক হাত জিভ কেটে হাত জোড় করে এসে দাঁড়াত আর কাঁদত। এ কেঁদে বলত, আমার সব চুল ছিঁড়ে নিলে। ও বলত, আমার নাক কামড়ে কি করেছে দেখেন হজরত।

মকবর ঢিবির চারিপাশে ক'টা তাল গাছ আছে। ওই তাল গাছে তাড়ি দেয় হাজামদের তিনু হাজাম। তিনু হাজামের বাবা-দাদাও গাছগুলোয় তাড়ি দিত। তাড়ির সময় সন্ধ্যে-বেলা হলেই তাড়ির হাঁড়ির মুখে ফেনা জমে উঠলেই যত মামদো—কবর থেকে বেরিয়ে তাড়ি খেয়ে সন্ধ্যের সময় ঢেল ডিগ্ ডিগ্, মানে হাডু ডুডু, খেলত। কখনও আলকাটার কাপের গান জুড়ত। চেল্লাচিল্লির শেষ থাকত না। হজরত সাহেব হুঁকাটা হাতে এসে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বলতেন, চুঁপ বিধরমী সব, চুপ।

এখন শুনলাম, গোটা মকবর ঢিবিতে কদমা সাহেবের কোন সন্ধান মেলে না। তার সঙ্গে সঙ্গে মামদোদেরও পাত্তা নেই।

গেল কোথায়? গুজব শুনলাম, দেশভাগ হওয়ার সময় তারা সব পূর্বপাকিস্তানে চলে গেছে। কদমা সাহেবও গেছেন। তবে, পূর্বপাকিস্তানে যান নি। কেউ বলে, তিনি মক্কাশরিফ গেছেন; কেউ বলে, না, তিনি এখানকার বড় মসজিদের সামনের উঠানটার এক কোণে কবর খুঁড়ে নিয়ে সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। কোন সাড়া কাউকে দেন না।

শুনলাম, মামদোদের জায়গায় নাকি গোটা পূর্বপাকিস্তান থেকে লাখে লাখে রেফুজী ভূত এসেছে। তারা এ-অঞ্চলে বড় কেউ আসেনি। চব্বিশপরগনা নদীয়া মুরশিদাবাদ এবং উত্তর-বঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলির গাছ-গাছড়ার মাথায় ডালেডালে তারা আশ্রয় নিয়েছে।

একজন ওঝার কাছে শুনলাম তাদের ভয়ানক বিক্রম। তারা সীমান্ত অঞ্চলের বনবাদাড় তাল গাছের মাথা, বট গাছের ডাল, বেল শ্যাওড়া শিমুল গাছগুলোর ডালপালা চমৎকারভাবে

কাটাই-ছাঁটাই করে একেবারে ভূতের হাট বসিয়ে দিয়েছে।

* * *

যাক গে। শোনা কথাতে আমার দরকার নেই। সবাই বলে এমন সব কথা যা শুনে মনে হবে লোকটার কথা তার নিজের কথা, নিজের চোখে দেখেছে এসব। কিন্তু জেরা করলেই বলে, আমি শুনেছি।

কাজেই আমি নিজে রিসার্চে রত হলাম। চার রাত্রি পরপর জেগে রইলাম। ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। ভাগ্যক্রমে অমাবস্যার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছিলাম। একাদশী ছিল সেদিন। পাঁজিতে সেদিন ছিল রাত্রি দশটার পর মৃতে ত্রিপাদ দোষ অর্থাৎ পুস্করা প্রাপ্তি। পরদিন সন্ধ্যা থেকেই অগ্নিকোণে ছিল যোগিনী তার সঙ্গে কালরাত্রি ঘাতচন্দ্র, মৃতে দ্বিপাদ দোষ। তারপর দিন ছিল চতুর্দশীতে ভূত-লগ্ন। তারপর দিন তো সাক্ষাৎ অমাবস্যা। এই অমাবস্যায় ভূতদের সেনাবিভাগ থেকে মানুষদের উপর কার্ফু জারি করা হয়ে থাকে। এ দিন রাত্রে ভূতেরা হুমহাম করতে করতে বের হয়। ভয় পেয়ে কেউ গাছে উঠলে পিছন থেকে খোনা সুরে কে যেন হেসে ওঠে—হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ। তখন মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে যায়, 'ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে; ভূতেরা পেলে হাতের কাছে।' এরপর মুট করে ঘাড়টি ভেঙে চোঁ করে রক্ত খেয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। এ কয়েকটা রাত্রিই আমি জেগেই রইলাম।

প্রথম রাত্রি রামাইদের সেই বিখ্যাত নিম গাছটার বাচ্চা নিম গাছের ঠিক সামনে।

দ্বিতীয় রাত্রি গেলাম শাহীপুকুরের পাড়ে যেখানে সেই বিরাট শিমুল গাছটি ছিল। যে গাছের কোটরে কোটরে থাকত চারটে পেতনী, গাছটার গোড়ায় থাকত গোটা কয়েক গোদানা। চারটে মূল ডালে থাকত আটটা গোলাম ভূত। আর যার মাথাটা ছিল এ অঞ্চলের ভূতদের টাউন হল; সেই শিমুল গাছের তলায় কাটালাম। গাছটার তলায় গোটা গ্রামের অশৌচের হাঁড়ি ফেলা হত। ভূতেদের সে এক বিরাট জমায়েৎ হওয়ার স্থান। এ গাছটাও নেই। তবু জায়গাটা আছে। আশেপাশে মানে শাহীপুকুরের চারিপাশে আরও তিনটে পুকুর আছে—বারিপুকুর, কালী সাগর, কাশীর পুকুর। সেখানেও অনেক গাছ আছে। ভূতেদের পক্ষে বেশ মনোরম থাকবার জায়গা। কাশীর পুকুরে কয়েকটা ভূত ছিল আর পেতনী ছিল, তারা বাঁশঝাড়ে থাকত। লোকজন গেলেই বাঁশেদের সঙ্গে নিজে বাঁশ হয়ে দিব্যি মরা বাঁশের মত রাস্তায় পড়ে থাকত। লোকে যেই সেটাকে পার হতে যেত অমনি বাঁশটা উঠে যেতো তড়াক করে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা হুই আকাশে উঠে গিয়ে ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে মরত। এখানে আমি ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম সারাটা রাত। খুট শব্দ হলেই কান খাড়া করেছি, টর্চ ফেলেছি, আর টর্চ না ফেলেও দেখেছি।

তৃতীয় হল লালুকচাঁদার বটগাছ।

ফনা পেতনী একটা ডালে দাঁড়িয়ে আর একটা দুই হাতে ধরে:

হেঁইয়ো হেঁইয়ো হেঁইয়ো। মরি মরি মরি।

দোঁলন খেঁয়ে আঁশ মেঁটেনা।

আঁশ মেটেনা গোঁ-ও-ও।—বট বৃক্ষে চড়ি। মরি মরি মরি।

ফনা পেতনী নাচত চমৎকার, গাইতও চমৎকার; মধ্যে মধ্যে নাকি ভূতেদের জলসায় ও নাচগান করত। এই ফনা পেতনীর আস্তানা লালুকচাঁদার পাড়ের বটবৃক্ষতলায় একরাত্রি কাটালাম, কিন্তু তাই-ই বা কোথায় কি?

এই বট গাছটাও এখন নাই, গ্রাম বেড়েছে, পুকুরটার চার পাড়ের উপর বসতি হয়েছে। আজকাল মুখাগ্নিও এখানে হয় না, গঙ্গা নিয়ে যাবার জন্যে এখানে মড়া গাছের ডালে বেঁধেও রাখে না। এখানে এখন ডোমরা বাস করছে। এখানকার ডোমরা বিখ্যাত চোরও বটে। আমি অনেক গল্প লিখেছি ওদের নিয়ে। ডোমদের জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে তোরা কোনও খবর রাখিস ফনা পেতনীর? তোরা তো রাতও জাগিস। বলতো খবর।

ওদের মধ্যে প্রধান এখন সর্‌লার মা। আশির উপর বয়স। সে বললে, সে সব কোথায় পাবা বাবা? খবর কে দেবে? সারা রাত্তিরের মধ্যেও এত কালে কোন ভূত পেতনীর সাড়া পাই না। তবে হ্যাঁ। সে কালে ছিল; তা শুনেছি। তুমি বাবা বরং লাঘাটা নদীর বিরিজের হোথা গিয়ে দেখ; শড়কের ওপর সে-কালে আলেয়া ভূত, নাম তার 'রসি-পেত্যা', সারা অঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে বেড়াতো। ওই গোগার বড়তলার বায়েন পাড়া থেকে ছুটতে ছুটতে যেত নদীর ধার পর্যন্ত। তারপরে নদী পার হতে না পেরে নদীর ধারে ধারে জ্বলে মলাম বলে চেঁচাতো। এই গায়ের চামড়া—ওটা রাঙা সাদা মেশানো গায়ের রঙ, সর্বাঙ্গের কোথাও চুলের 'চেহ্ন' নাই। তার কথা তো মনে আছে। নদীর ধারে রেলের পুলের গোড়ায় গিয়ে দেখতে পার। তার ওদিকেই গাঁয়ের শ্মশান, শুধু এ গাঁয়ের কেন দশখানা গাঁয়ের। ওখানে দেখতে পার।

রসি পেত্যা, রাসমনি বায়েন কন্যে, গায়ের কাপড়ে আগুন লেগে পুড়ে মরে পেত্যা হয়েছিল। পেত্যা মানে আলেয়া। বায়েন পাড়া থেকে রসি পেত্যা জ্বলতে জ্বলতে নিভতে নিভতে যেত নদীর ধার পর্যন্ত। নদীর ধারে ধারে পেত্যাদের অর্থাৎ আলেয়াদের রাত দুপুরের মজলিস বসত। মানুষদের যেমন দুপুরবেলা মেয়েদের মজলিস বসে, গল্পগুজব পরনিন্দা তাস খেলা কড়ি খেলা চলে; তাই হত ওদের রাত দুপুরের মজলিসে। পেত্যাও এখানে কম ছিল না। এগাঁ ওগাঁ সেগাঁ মানে চারপাশের দশবারো খানা গ্রাম থেকে জন দশেক পেত্যা আসত। এদের সবই হল মেয়ে। ওই চামড়া-ওঠা 'ফ্যাকফেকে' অর্থাৎ 'দগ্‌দগে' লাল সাদা সে এক বীভৎস গায়ের রঙ, রাত্রির অন্ধকারে ওই রঙের সর্বাঙ্গ থেকে দপ্‌দপ্‌ করে আগুন বের হয়। ওরা নদীর ধারের একটা পতিত জায়গায় জবজবে জলার মধ্যে ওদের আসর ফেলতো। গায়ের জ্বালায় ওরা জবজবে জলায় গড়াগড়ি খেতো।

* * *

সেখানেও রাত্রি কাটালাম। এখন সেখানেও আর তেমন ঠাঁইটি নাই। বসতও অনেক হয়েছে। পুলের মাথায় ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। বেশ খানিকটা রাত্রি পর্যন্ত সাঁওতাল বসতিতে মাদল বাজে গান বাজনা হয়। ছোটখাটো একটা কারখানা মতও হয়েছে।

ভোরবেলা না-হতে সেখানেও ভোঁ বাজে। রাত্রি দুপুরে, অমাবস্যার ঘুরঘুটি অন্ধকারে সেখানে জেগে বসে থাকলাম। কিন্তু কোথায় কি? কতকগুলো জোনাকিপোকা দিপ দিপ্ করে জ্বলা ছাড়া আর কোন হদিস পেলাম না। গোটা দুই-তিন জোনাকিপোকা ঝটকা দিয়ে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে দলে দিলাম। দেখলাম পোকাটা পোকাই বটে, ভূতটুত নয়। ফসফরাসের একটা করে লম্বা দাগ কিছুক্ষণ মাটির উপর কালির আঁচড়ের মত জেগে রইল। তারপর উপে গেল।

তা হলে?

এরা গেল কোথায়?

না, সবই মিথ্যে?

পাঁচ

অমাবস্যার পরদিন; সে প্রায় হতাশ হয়ে ভাবছি। হাতে যম দত্তর ছকে দেওয়া একখানা ফর্ম। দত্তের নির্দেশ—বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুসন্ধান চালাতে হবে। দত্তের ছকে দেওয়া ফর্মের দিকে তাকিয়ে দেখছি, এক নম্বর প্রশ্ন হল :—ভূতের নাম। এবং মনুষ্যজীবনে যে নাম, ভূত-জীবনেও সেই একই নাম কিনা! ভূত কি রকম ভূত? অর্থাৎ ভূতের পেটের জন্মানো ভূত কিনা? না, মানুষ মরে ভূত হয়ে সরাসরি ভূতলোকে ঝপাং করে পড়তে পড়তে কোন গাছের ডাল ধরে ডালে চড়েছে কি না?

বর্তমানে বাসস্থান কোথায়? মানুষের এই বসতির মধ্যে আসার কারণটি কি? বাসস্থানটির অল্প বর্ণনা। কোন পতিত বাড়ি বা কোন গাছ বা কোন জলা বা কোন শ্মশান—যাই হোক তার বিবরণ। তারপর হল ভূতটি দেখতে কেমন? পা কটি? হাত কটি? দাঁতগুলি কেমন? পায়ের পাতা সোজা পড়ে, না উল্টো পড়ে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে আছে—দেবী যখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তখন তাঁর সৈন্যবাহিনীতে অনেক ভূত ছিল। তাদের কারুর ছিল একটা পা, কারুর তিনটি পা বা আরও বেশি। কারুর একটা হাত, কারুর দুটো, কারুর চারটে-পাঁচটা, নখগুলো নরুনের মত। কারুর তিনটে চোখ, কারুর বা একটা, কপালের ঠিক মাঝখানে। গল্পে আছে, দাঁত হয় মূলোর মতন কান হয় কুলোর মতন। হাতি ঘোড়া উট চিবিয়ে খায় সে দাঁতে। আর ধিন তাক তাক করে নাচে।

ভারতচন্দ্র দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায় লিখেছেন—

"চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী।
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে।
চলে শাঁকিনী পেত্নিনী মুক্ত কেশে।"

দক্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে তারা যা করেছিল সে তো ভয়ংকর কাণ্ড।

"মার মার ঘের ঘার হান-হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ—আশপাশ কাঁপিছে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম থুম থাম—ভীমশব্দ ভাসিছে।"

এ তো না হয় যুদ্ধের ব্যাপার। বিয়ের ব্যাপারেও তারা—"ঝুপ ঝুপ ঝাপ দুপ দুপ দাপ—লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে।" "করতালি দিয়া বেড়ায় নাচিয়া—হাসে হি-হি হি-হি হি-হি।"

সব একেবারে ফক্কিবাজি, ফাঁকি হয়ে গেল। আরব্য উপন্যাসে আছে দস্যুদের গুহায় কতকালের সঞ্চয় করা ধন ঘড়ায় ঘড়ায় সিন্দুকে সিন্দুকে মজুত ছিল। ভূতের কথা ভূতেদের ব্যাপারও ঠিক যেন তাই। মানুষের মনের গুহায় নতুন নতুন ভূতের কথা মজুত হত। সেই রাজত্বে কোথা থেকে এল হাল-আমলের কোন এক কাঠুরে আলিবাবা; এসে চিচিংফাঁক মন্ত্রটি শিখে নিয়ে বাস্ ছালায় ছালায় বয়ে বয়ে নিয়ে সব ফাঁক করে দিলে। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলাম না।

ভূত মিথ্যে হয়ে গেল, এ কি কম দুঃখের কথা? হায় হায় হায়!

যে বাড়িটায় বসেছিলাম সেই বাড়িটার পূর্বদিকে একটা বড় পুকুর; পুকুরটার ওপারে লেখাপড়া না-জানা খেটে-খাওয়া মানুষদের পাড়া; আগের কালে সে সব পাড়ায় ডাল পড়লে ঢেঁকি হতো, পাতা পড়লে কুলো হতো; মানুষদের বিশেষ করে প্রবীণা বুড়ীদের অহরহ মন যেন কাঁদি-কাঁদি করত; ছুতোয় নাতায় তারা কাঁদতে বসত। বেশ সুর করে উঁচু গলায় ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতো। কত কাল আগে মরা বাপ বা ভাই বা যে হোক কাউকে স্মরণ করে কাঁদত, ওরে বাবারে, কি দাদারে, কি ভাইরে, কোথা গেলি রে! একবার আয় এসে আমার দশা দেখে যা রে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠানের কি রাস্তার ধারে গাছটার ডালপালা দুলে উঠত। বুড়ীও কান্না থামাতো, কারণ বুঝতে পারত, দাদা ভূত কি বাবা ভূত এসেছে। এবং বসে ডাল দুলিয়ে সাড়া দিচ্ছে।

আজও যেন কেউ কাঁদছে। সম্ভবতঃ মরা বাপ-দাদাদের জন্যে কাঁদছে না। কাঁদছে ওই সব ভূতদের জন্যে।

ওরে ভূতেরা রে, ভাইরে বাবারে মারে, তোরাও শেষে মরে গেলি রে। জন্ম ম'ল জন্মান্তর ম'ল এপার ম'ল ওপার ম'ল। সোনার ভূতরাজ্যি এমনিই করে ছারখার খান খান করে দিলে রে। আঃ হায় হায় হায়। সোনার রাজ্য বরবাদ হয়ে গেল। পরলোকের পথে যেখানে পথটা দুমুখো হয়ে দুদিকে চলে গেছে, একদিকে স্বর্গ একদিকে নরক—সেই-খানে দাঁড়িয়ে আর কোন দিকে কিছু নেই। অথচ এই পথটাই ছিল হেড আপিস, রাজধানী বলতে পার। এখান থেকে ভূতেরা ফিরত এই মর্ত্যের দিকে, সেই চেনা মর্ত্য। যেখানে অসংখ্য গাছ, বেশ ভাল ভাল গাছ, পুরনো পুরনো বাড়ি, নানান জলা, নানান শ্মশান।

হেড আপিস সমেত সেই রাজ্যটাই একেবারে নো পাত্তা। সন্ধান নেই হদিস নেই। এখন তা হলে মানুষদের কি হবে ?

মরার পর তারা স্বর্গেও যাবে না নরকেও যাবে না ভূতও হবে না ; ফুটবলের ব্লাডার ফুটো হয়ে ফুস করে খানিকটা বাতাস বেরিয়ে যাবার মত, কিম্বা বেলুন ফেটে বাতাসের মত প্রাণবায়ুটা বেরিয়ে যাবে। হৃদপিণ্ড মানে হার্টটি ধুক্ ধুক্ করতে করতে ঠুক্ করে থেমে যাবে ?

হে ভগবান।

এ হল কি বল তো ? ভূতহীন সংসারে মানুষ বাঁচবে কি করে ? ভগবানহীন সংসারে মানুষ জয়ধ্বজা উড়িয়ে ফেরে কিন্তু ভূতহীন সংসারে মানুষ জয়ধ্বজাটা ওড়াবে কার কাছে ? মানুষ মরেই বা হবে কি ? কোথায় যাবে ? হায় হায় হায় হায়। দুপুরবেলা আর ঢেলা পড়বে না, তিনসন্ধ্যাবেলা গা ছমছম করবে না, রাত্রিকালে খোনা সুরে কেউ গান গাইবে না। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে না। অন্ধকার রাত্রে ছায়ামূর্তিরা দলবেঁধে বা একাএকা লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ভ্রমণ করবে না। তা হলে সংসারেই বা থাকল কি, জীবনেরই বা ভবিষ্যৎ কি ?

সামনে সেই রামাই ভূতের সুখের 'বালাখানা' অর্থাৎ বসত। সেই প্রকাণ্ড নিম গাছটার ছানা নিম গাছটা সন্ সন্ শব্দ করে বাতাসের দোলায় দুলতে দুলতে কিছু বলছিল। মধ্যে মধ্যে নিমের ফল খসে খসে পড়ছিল টুপ্ টুপ্ করে।

ঠিক এমনি সময়ে টেলিগ্রাম। বলে বাড়ি ঢুকল আমাদের পোস্টাপিসের টেলিগ্রাফ্-পিওন।

টেলিগ্রাম ? কে টেলিগ্রাম করলে ? বিরক্ত করে দেবে এরা। কি অন্যায়ই করেছি এই সাহিত্যিক হয়ে। নবেল নাটক গল্প ছড়াপাঁচালী লিখে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষেরা প্রায় ক্ষেপে উঠেছে সভা মজলিস জলসা নাট্যাভিনয় নৃত্যনাট্য নিয়ে। দাপাদাপির বিরাম নেই। কলকাতার রবীন্দ্র সদন থেকে শুরু করে লাভপুর যে লাভপুর—তার আশপাশের গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত। গ্রামের লোকেরাও দুটো-তিনটে করে সভা করে চলেছে। এতে প্রয়োজন সভাপতিত্ব করবার জন্য এক-একজন নিরীহ সাহিত্যিকের। যাদের পয়সা কড়ি দিতে হবে না, জল খেতে দিলেও হবে, না-দিলেও হবে এবং দিলেও তিনি খাবেন না। যাবার সময় হেঁটে বাড়ি যাবেন। নেবেন একটি ফুলের মালা আর দেবেন একটি বক্তৃতা। আর বসে থাকবেন সারাক্ষণ সেই আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। বলতে ভুলেছি এখানে আসা অবধি এদের আর হামলার শেষ নেই। সকালে দুদল আসে তো বিকেলে চার দল আসে, যেতেই হবে, আমাদের ওখানে যেতেই হবে। এদের বহু কষ্টে ঠেকান যায় নানান অজুহাত দেখিয়ে। আবার বাইরে থেকে টেলিগ্রাম আসে। অমুক কনফারেন্সে এই তারিখ থেকে এই তারিখ পর্যন্ত আমরা সভাপতি হিসেবে পেতে চাই।

কেউ লেখেন, উদ্বোধন করতে হবে। কেউ লেখেন, প্রধান অতিথি হতে হবে। এর

মধ্যে দুখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। আসতেই হবে। এক-খানা টেলিগ্রাম এসেছে ভূমিকম্পের যে বিধান আছে তা তুলে দেবার জন্যে আমরা মিছিল করব। অবিলম্বে চলে আসুন।

তেমনিতর এটাও একটা-কিছু ভেবে টেলিগ্রামটা খুলে একটু চঞ্চল হলাম। যম দত্ত টেলিগ্রাম করেছে।

"নিখিল জগৎ পণ্ডিত সভা 'ভূত নাই' বা 'ভূত থাকতে পারে না'—প্রস্তাব পাশ করাবার জন্য বিরাট কনফারেন্স করছে। ইতিমধ্যেই চারিদিকে পোস্টার পড়েছে। ভূত নাই, ভূত নাই, ভূত নাই। ভূত ছিল না, ভূত নাই, ভূত থাকবে না এই নিয়ে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা প্রবন্ধ লিখেছেন। ভূতকে এই সময়ে প্রমাণ না করলে সর্বনাশ হবে। সুতরাং প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ করে ফেল। পার তো একটা ট্রেন-বোঝাই ভূত সঙ্গে নিয়েই চলে এস। খরচের জন্য ভেবো না। ভূতভক্ত মানব মহাসভা সকল খরচ দিতে প্রস্তুত।"—জে এম ডাট।

* * *

এখন ঠ্যালা বোঝ। বরাতটা একবার শোন। "ট্রেন রিজার্ভ করে এক ট্রেন-বোঝাই ভূত নিয়ে এস।"

খরচের জন্য ভাবনা নাই, সে সমস্তই দেবে 'ভূতভক্ত মানব মহাসভা।' 'ভূতভক্ত মানব মহাসভা'র কথা অবশ্য জানি। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের শাখাপ্রশাখা আছে। সকল জাতের লোকই এর সভ্য। শুধু বিজ্ঞানবাদী দেশগুলো আর সমাজতন্ত্রী দেশগুলোতে প্রকাশ্য কোন শাখা সমিতি নেই কিন্তু গোপনে গোপনে এই ভক্তি পোষণ করে। আগে এদের প্রবল প্রতাপ একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। কিন্তু এখন তো এদের প্রায় শেষ দশা বললেই চলে। কারণ বিজ্ঞান আর সমাজতন্ত্রবাদ সব দেশেই ধ্বজা উড়িয়ে ভূত নেহি হ্যায়, ভূতলোক মুর্দাবাদ, পেতনীরা সব বরবাদ যাক—বলে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং ট্রেন-বোঝাই করে ভূত আনাবার মত উৎসাহ উদ্যোগ টাকা জোটালে আসবে কোত্থেকে।

এক ট্রেন-বোঝাই ভূত। একবার আস্পর্ধাটা বোঝ।

একটা ভূতের নাগাল পেলাম না এই ক'দিনে আর এক ট্রেন-বোঝাই ভূতের বরাত বায়নাক্কা।

দুপুরবেলা খবরের কাগজ আসে। এক চোখে ছানি পড়া গোপেশ্বর দাস কাগজ দিয়ে গেল, কাগজেও দেখলাম মোটামোটা হরফে হেড লাইন দিয়েছে, সারা বিশ্ব সর্বনাস্তি মহা-বিজ্ঞানবাদী সভার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। দ্বিতীয় লাইনে—ভূতনাস্তি প্রস্তাব প্রণয়ন প্রস্তুত। তৃতীয় লাইনে লিখেছে—এই প্রস্তাব পাশ হওয়া মাত্র ভূতদের সর্বনাশ। প্রস্তাবে লেখা হয়েছে—প্রস্তাব পাশ হইলে সাধারণ মানুষেরা ঐ প্রস্তাব বলে ভূতদের পিটাইয়া মারিয়া ফেলিতে পারিবে। জলে চুবাইয়া মারিতেও পারিবে। অথবা দেখা যাইবে তাহারা হাওয়া হইয়া গিয়াছে।

কাগজটার একটা পৃষ্ঠা জুড়ে সংবাদটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। আর একেবারে একটা

ওঁচা পৃষ্ঠায় থিয়েটার বিজ্ঞাপনের পাশে আধকলমে, এই এদের উলটো, ভূতভক্ত-মানব মহাসভার উদ্যোগের কথা ছাপা হয়েছে। তাও একটি এমন বিশেষণ জুড়ে দিয়েছে যে তাতেই মহাসভার সকল উদ্যম খতম হয়ে গেছে।

লিখেছে, 'হাস্যকর উদ্যম'।

তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, "তবে ট্রেন-বোঝাই করিয়া ভূত প্রতিনিধি আসিবে শুনিয়া মহানগরের বিদগ্ধ নাগরিকেরা উৎসুক হইয়া আছেন। লোকে বলিতেছে, যে দিন ডেলিগেট আসিবে সেদিন হাওড়া শেয়ালদা দমদম এরোড্রোম হইতে পথগুলির দুইধারের বাড়ির বারান্দা ছাদ আলসে ইতিমধ্যেই ভাড়া হইয়া যাইতেছে।"

আর এক প্যারাগ্রাফের পর যা পড়লাম সে পড়ে চক্ষু চড়ক গাছ।

"তিন-তিনটি সিনেমা কোম্পানী ইতিমধ্যেই এই ভূত মহাসম্মেলনের সংবাদে উৎসাহিত হইয়া তিনটি ছবির মহরৎ করিয়া ফেলিয়াছে। বেলগাছিয়া ব্রিজের মোড়ে, হাওড়া ব্রিজের মোড়ে, বি. টি. রোডের মোড়ে, শিয়ালদহ স্টেশনে, হাওড়া স্টেশনে সিনেমা কোম্পানীগুলি ভূত ডেলিগেটদের ট্রেন হইতে অবতরণ এবং শহরের রাস্তা ধরিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যাওয়ার দৃশ্যগুলির ছবি তুলিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই দেশান্তরে এই ছবির অংশগুলি দেখাইবার কণ্ট্রাক্ট করিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শুনিতেছি, কোন এক স্থান হইতে একখানা ভূত-বোঝাই স্পেশাল ট্রেন আসিতেছে। কেহ বলিতেছে, অমুকচন্দ্র তমুক ট্রেন-বোঝাই ভূত আনিবার কণ্ট্রাক্ট লইয়াছেন। কেহ বলিতেছে কণ্ট্রাক্ট নয়, লোকটার আর কাজ মিলিতেছে না; কেহ মুখে নামও লইতেছে না বলিয়া এখন ভূতদের লইয়া কোনও একটা পার্টি খুলিবার চেষ্টায় আছে।

পড়ে শুনে আমার আপাদ-মস্তক যেন জ্বলে গেল।

ইচ্ছে হল এক ট্রেন ভূত পেলে, কোন স্টেজ ভাড়া নিয়ে ভূতনৃত্যটা দেখিয়ে দিতাম।

ক্রমে ক্রমে রাগটা এসে যেন নিজের উপর পড়ল। তারপর গিয়ে পড়ল যম দত্তের উপর। তারপর গিয়ে পড়ল পৃথিবীতে যারাই ভূত বিশ্বাস করে তাদের উপর। তার চেয়েও বেশি রাগ হল ওই ভূতদের অলীক অস্তিত্বের উপর। মনের ওই মিথ্যা বিশ্বাসটার উপর, ইচ্ছে হল শব্দ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জানিয়ে থুথু ফেলে বলি, থু-থু-থু। নিজের কুসংস্কারের উপর থু; মিথ্যে ভয়ের উপর থু। ভূতের কল্পনার উপর থু। থু-থু-থু-থু।

চোখ বুজে চেয়ারে বসে থু-থু শব্দে থুথু ফেলতেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু কারুর গলা ঝাড়ার শব্দে থমকে গেলাম, এবং একটু চমকে উঠে চোখ খুলে দেখলাম—কে একজন ভদ্রলোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কখন এসে দাঁড়িয়েছেন তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু অপ্রস্তুত হলাম। অপ্রস্তুত থেকেও অবাক—মানে, বিস্মিত হলাম বেশি। আস্ত একটা জ্যান্ত মানুষ ফটক ঠেলে শান-বাঁধানো উঠোন মাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন অথচ কিছু টের পাই নি। আমি খানিকটা বেকুফের মত হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক একগাল হেসে অনেক আপ্যায়িত করে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, ঠিক

সময়ে এসেছি। নমস্কার স্যার।

নমস্কার। প্রতিনমস্কার করে একটু অপ্রস্তুত হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম দিব্যি ছিমছাম পোশাক, দস্তুরমতো পুরনো-কালের ধরনধারণের মানুষ। মাঝখানে চেরা সিঁথি, তেল চুকচুকে চুল, পাকানো গোঁফ, গায় পাঞ্জাবি, হাতে আংটি পায়ে পাম্প্ত। শৌখিন এবং সেকালের বাবু-কালচারের আসামী। লম্বা কোঁচাটা ধুলোয় লুটোচ্ছে। কাঁধে একখানা পাটকরা চাদর।

আমার বিস্মিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ওঃ, অনেক ভাগ্যি আমার যে, আপনাকে ঠিক পাকড়াও করতে পেরেছি। আমাদের গিন্নীমায়ের হুকুম ছিল, যেখানে থাকবেন সেখানে গিয়ে ধরতে হবে আপনাকে।

গিন্নীমা? কে গিন্নীমা?

আজ্ঞে, ভুবন মহলের নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন?

ভুবন মহল? সে কোথায়—

এই দেখুন। ভুবন মহল জগৎপুর জীবনগড় এ সবের নাম শোনেন নি? আপনার মত ব্যক্তি—

একটু চমকে গেলাম; নামগুলো খুবই চেনা। কিন্তু।

লোকটি বললে, ভুবনমহলকে ত্রিভুবনপুরও বলে। তিন-তিনটে বিরাট লাট নিয়ে তিন ভুবনপুর। ওপর ভুবনপুর মাঝের ভুবনপুর নিচের ভুবনপুর; এদেরই ছিট জমি নিয়ে হল আমাদের বাজে ভুবনপুর। ওপর মধ্যে নিচ তিন নাম হয়ে গিয়েছে, এখন বাজে। আর কোন্ বিশেষণ আছে বলুন। ছিট ভুবনপুরও হতে পারে। কেউ কেউ ছিট ভুবনপুরও বলে। ওই বাজে শিবপুরের মতন। তবে মাহাত্ম্য খুব। গুপ্ত কাশী, গুপ্ত বৃন্দাবন, যেমন নব বৃন্দাবনও বাজে হয়েছে আজকাল; তা আমাদের ভুবনপুরকে মাহাত্মিতে অনায়াসে নব কৈলেশ কি গুপ্ত কৈলেশ বলতে পারা যায়। বুঝেচেন না। সেই কোন বাদশাহী না আরও আগের সেই হিন্দু রাজা মান্ধাতার আমল থেকে নাকি এ ছিট ভুবনপুর কাশীর বাবা বিশ্বনাথের নামে দেবোত্তর চাকরান হয়ে আছে। বাবার নামে দেবোত্তর—ট্রাষ্টি হলেন অন্নপূর্ণা ঠাকরুন। এ মহল থেকে বাবা বিশ্বনাথের চ্যালা-চামুণ্ডা চাকরবাকরদের খোরপোশ হয়। গিন্নীমা হলেন গিয়ে এই বাজে ভুবনপুরের পত্তনিদার। শিব হলেন মালিক, অন্নপূর্ণা মা ট্রাষ্টি, তাঁর অধীনে গিন্নীমা গয়েশ্বরী চৌধুরানী হর্তাকর্তা বিধাতা বাজে ভুবনপুরের।

সেই নতুন মহল, ছিটমহল বাজে ভুবনপুরস্থ পত্তনিদারনী মহামান্যা গিন্নীঠাকুরানী প্রবল-প্রতাপান্বিতা গয়েশ্বরী চৌধুরানী আমাকে আপনার সমীপে প্রেরণ করেছেন। নির্দেশ, আপনাকে একবার যেতে হবে বাজে ভুবনপুরে অবিলম্বে। সুতরাং—। লোকটি হাসলেন কিন্তু শব্দ করলেন না—শুধু দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। সেটা অবশ্যই আমাকে কৃতার্থ করবার জন্য তা বুঝতে আমার বাকী রইল না।

পরিশেষে বললেন, আমি হলাম মহামান্যা গয়েশ্বরী দেবীর এজেণ্টো। মানে টুর করে

বেড়াই। মামলা মকদ্দমা করি। আপনাদের মত ব্যক্তির কাছে যাই। পোশাক দেখেই বুঝতে পারছেন।

লোকটার রং যেমন কালো, দাঁতগুলো তেমনি সাদা। বিশ্রী লাগে। তার সঙ্গে এই ধরনের কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে একটা বেশ পাড়াগেঁয়ে বা সেকালের সেই হুজুরী-হুজুরী হুমকি ফুটে উঠল।

বাজে ভুবনপুরের পত্তনিদারনী মহামান্যা গিন্নীঠাকুরানী মহামহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী—, শুধু গয়েশ্বরী ঠাকুরানী নয় মহামহিমার্ণবা। রাবিশ! যেন সেই বাদশাহী নবাবী আমলের খেতাবসুদ্ধ দু'গজি লম্বা একখানি নাম। হিন্দু আমলের মহারাজাদের—পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অশ্বমেধপরাক্রম, কৃপণদীন অনাথ-আতুরজন প্রতিপালক সমুদ্রগুপ্ত বা আবুল মুজফ্‌ফর মহীউদ্দীন মুহম্মদ ঔরংজীব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ গাজী! বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। কোম্পানীর আমলে আবার চামচিকে পক্ষীদের অর্থাৎ জমিদারদের খেতাব তার থেকেও বড়, মহামহিমমহিমার্ণব বহুজ-প্রতিপালক অশেষগুণান্বিত দোর্দণ্ডপ্রতাপ—ইত্যাদি ইত্যাদি—সে এ পৃষ্ঠার প্রথম ছত্র থেকে ও-পৃষ্ঠার অন্ততঃ মাঝামাঝি। উচ্চারণ করতে গেলে অন্ততঃ দুটো দম তো নিতেই হত। যদিই বা তিনটে না হয়।

একালে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের মত কালের যখন নতুন নাড়াবুনেরা পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ হয়ে কীর্তুনে বনে বিখ্যাত হচ্ছে এবং মনের খেদে সে কালের রায়বাহাদুর রায়সাহেব বা লেটার প্যাডে ছাপানো নামের আগের খেতাবগুলো কেটে দিয়ে মুখ রক্ষা করছে তখন এই লোকটা এমনই নির্লজ্জভাবে বলছে ছিটমহল বাজে ভুবনপুরস্থ পত্তনিদারনি মহামান্যা গিন্নী ঠাকুরানী প্রবলপ্রতাপান্বিতা শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী! এবং ওই কালো চেহারায় সাদা দাঁত মেলে হাসছে দেখ দিকি? যাত্রাদলের ক্লাউন বলে মনে হল। বিরক্তির আর সীমা রইল না আমার।

আমি তার দিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। কারণ কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি, সঙ্গে সঙ্গে রাগও হচ্ছে। কিন্তু তা প্রকাশ করতেও পারছি না চক্ষুলজ্জায়। সেই কারণে অন্যদিকে তাকিয়ে তাকে বললাম, মাফ করবেন, আমার সময়ও নেই এবং সম্ভবপরও নয়।

লোকটি হাঁ-হাঁ করে উঠল, আরে মশাই, আরে মশাই—বলতে নেই, বলতে নেই। গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ।

লোকটার কথার ধরনধারণ যেমন বিশ্রী তেমনি যেন উদ্ধত। জমিদারি উঠে গেছে, কিন্তু জমিদারী চণ্ড কেতা মরেও মরে নি। মরে ভূত হয়ে বেঁচে আছে। খুব খারাপ লাগল আমার। মেজাজ চটে গেল। নিজেকে সামলাতে না পেরে রুক্ষভাবেই বলে ফেললাম, গয়েশ্বরী ঠাকুরুনের নেমন্তন্ন! গয়েশ্বরী ঠাকুরুনের নেমন্তন্ন! কিন্তু নেমন্তন্নটা কিসের? পিণ্ডি খাবার না ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের—

কথার মাঝখানেই লোকটা অসভ্যের মত অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল—হা-হা-হা-হা-হা-হা-

হা—। হি-হি-হি-হি। খি-খি-খি-খি—

হা-হা, হি-হি, খি-খি শব্দে তৈরী সে-হাসি গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর খেতাবসুদ্ধ নামের চেয়েও লম্বায় আধহাত বেশি তো হবেই। হাতখানেক হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু তাই নয়, সে হাসি বিকট, উৎকট এবং অসভ্য। শরীরে রোমাঞ্চ হয়। পিলে চমকায়।

বললাম, থামুন মশায়, এমন করে হাসবেন না।

হাসি খানিকটা কমিয়ে সে বললে, হাসি কি সাধে মশায়! হাসছি আপনার কথা শুনে। আশ্চর্য মশায়, আশ্চর্য। আপনি যেন সর্বজ্ঞ। কথাটা যা বলেছেন না, সে একেবারে মোক্ষম। একেবারে কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি গেলেন। প্রায় নির্ভুল। নেমন্তন্নটা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন—খোদ গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর বাপের শ্রাদ্ধের সভায় আপনার নেমন্তন্ন। তবে পিণ্ডি বাপকে দেবেন। আপনাকে খাওয়াবেন না।

থমকে গেলাম চমকেও উঠলাম। গয়েশ্বরী ঠাকুরানী কে তাই জানি নে, তা তাঁর বাপের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ? কেন? বললাম, তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই। এবং তাঁর বাপ এমন একটা কোন মহাত্মা নন বা বিখ্যাত নন যে তাঁর গুণগান করতে যেতে হবে আমাকে। আর আমি বামুনের ছেলে হলেও বামুনপণ্ডিতি করি না। পুরোহিতের কাজও করি না। সুতরাং গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমি পারছি না, মাফ করবেন আমাকে।

ভদ্রলোক বললেন, বলতে নেই বলতে নেই এমন কথা বলতে নেই। বাপ্ রে, গয়েশ্বরী ঠাকুরানীকে এমনি কথা বলতে আছে?

এবার আর রাগ বাগ মানলে না। লাগাম ছিঁড়ে সামনের দুটো পা-তুলে দাঁড়ানো ঘোড়ার মত একেবারে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে। বলে উঠলাম, শাট্ আপ। গয়েশ্বরী গয়েশ্বরী গয়েশ্বরী, কে আপনার গয়েশ্বরী?

কে আপনার গয়েশ্বরী? বলে উঠল লোকটা। তা হলে বলি শুনুন, বলে লোকটা এবার একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তর্জনী হেলিয়ে চোখ বড় বড় করে বললে, শুনুন স্যর, গয়েশ্বরী কেউ-কেটা নন। মহিমার্ণবা মহিলা। বিরাট ব্যক্তির কন্যা। একমাত্র কন্যা। বিরাট ব্যক্তিটি হলেন একজন মস্তবড় মহান্ত। বিরাট দেবোত্তর সম্পত্তি পত্তনি নিয়ে মহান্তগিরি ছেড়ে বিয়ে-সাদি করে সংসারী হয়েছিলেন। নিজে বড় একটা বের-টের হতেন না। মানে লজ্জা পেতেন। মহান্তগিরি ছেড়ে বিয়ে করেছিলেন কিনা! লোকে ঠাট্টা করত। আর প্রবল প্রতাপ ছিল। সেই তিনি এবার দেহ রেখেছেন। তাঁরই শ্রাদ্ধ করবেন গয়েশ্বরী। খুব গুণবতী মহিলা। এককালে রূপবতীও ছিলেন। তবে বয়স হয়েছে এখন। হলে কি হবে? এই বয়সে প্রাইভেটে বার তিনেক এম-এ পাস করেছেন। আলট্রা মডার্ন মহিলা। অবশ্য একটু গোপন কথা আছে। স্বামীর বাড়ি যান না। ভয়ানক মত-বিরোধ। স্বামী হলেন রাজা লোক। কিন্তু তিনি রাজ্যের অধিকার ছেড়ে দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন। মন্ত্রী হিসেবেই তিনি শাসন করেন। তিনি রাজ্য থেকে পুজো-পার্বণ সব

উঠিয়ে দিয়েছেন। ধর্মকর্ম সব বরবাদ করে দিয়েছেন। ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর পীরোত্তর গড়োত্তর সম্পত্তি সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন। এই নিয়ে বুয়েছেন ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। স্বামী বলছে—এমন প্রতিক্রিয়াশীলা ব্যাকডেটেড স্ত্রী আমার চলবে না। স্ত্রী বলছে, তুমি যাবে কোথায়! সাত পাক ঘুরে বিয়ে করেছি তোমাকে, চোদ্দ পাকেও তা খুলবে না।

এই ব্যাপার। হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছে। এখন বাপের মৃত্যুতে হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ করবেন। তাছাড়া তো মশায় দেশের আইন হল পিণ্ডি দিয়ে তবে ধনসম্পত্তি পেতে হয়। "পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ।" আপনাকে নেমন্তন্ন সেই জন্যে। আপনি তো ভূতযোনি, প্রেতযোনি, পরলোক স্বর্গ নরক সম্পর্কে রিসার্চ করেছেন এবং আপনার একেবারে স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, এসব হল বোগাস, সব রাবিশ, বাজে কথা। সেই আপনিই সাক্ষী থাকবেন যে গয়েশ্বরী দেবী আলট্রা মডার্ন হয়েও বাপকে পিণ্ড দিয়েছেন। বুঝলেন না, তা হলে আর বাপের সম্পত্তি পেতে ঠাকরুনের কোন কষ্টই হবে না। এই আর কি! আর হাজার হলেও গয়েশ্বরী ঠাকরুনের বাবা, তাঁর সম্বন্ধে দু-চারটে ভাল কথা বলবেন আর কি।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আপনি দয়া করে আসুন। আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমি অক্ষম।

লোকটার সঙ্গে চোখ জুড়তেও ভাল লাগছিল না, আমি মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালাম। তাকালাম গ্রামের পূর্বদিকের আকাশের দিকে। আকাশে আকাশ-ভরা নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। ক'দিন আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে। শূন্যলোকে এতটুকু মালিন্য নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হলেও নক্ষত্রের আলোয় একটা আলোর আভাস ভেসে রয়েছে আকাশের কোল থেকে মাটির বুক পর্যন্ত। গ্রামের গাছগুলোর মাথা আকাশের পটভূমিতে ঘনকালো-মাথা জটেবুড়োর মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে—অনেকগুলো জটেবুড়ো যেন মাটির উপরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জটাভরা মাথা নিয়ে কোন একটা জটলা পাকিয়ে তুলতে চাচ্ছে। অল্প অল্প বাতাসের আন্দোলনে তাল গাছের পাতার আন্দোলন ও শব্দের মধ্যে যেন ওরা মাথা নেড়ে নেড়ে ফিসফিস করে মন্ত্রণা করছে বলে মনে হল।

সমস্ত দেহ মন যেন কেমন শিরশির করতে লাগল। কেমন যেন একটা কেমন-কেমন গন্ধ, কেমন যেন মধ্যে মধ্যে খুব হিমেল একটা বাতাসের ঝলক, কেমন যেন। কি ব্যাপার ভাল করে যাচাই করবার জন্য একবার চারিপাশ দেখে নিতে চাইলাম। দেখলাম, সেই লোকটা বসে বসে তাল গাছের পাতাগুলোর দুলুনির সঙ্গে বেশ মিল রেখে মাথা দোলাচ্ছে।

আমি চটে গিয়ে বললাম, ও কি হচ্ছে? মাথা দোলাচ্ছেন কেন?

লোকটা—খুঁ-খুঁ-খুঁ-খুঁ করে হেসে উঠল।

অত্যন্ত বিশ্রী হাসিটা। বললাম, হাসছেন কেন?

সে বললে, ভয় লাগছে নাকি? তাঁ-হুঁলে—

আমি রাগে অধীর হয়ে উঠলাম, ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটাকে ঘাড় ধরে বের করে দি। কিন্তু

ভদ্রতায় বাধছিল। তাই রাগটা প্রকাশ করবার জন্য চিৎকার করে ডাকলাম—রা-ম! রা-ম! ইচ্ছে, রাম এলেই বলব, যা এঁকে বাইরের ফটকটা খুলে দে। কিন্তু তা আর করতে হল না। লোকটাই খুব ভয় পেয়ে বললে, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি। সে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। কয়েক পা, কি কয়েক গজ দূরে গিয়েই ফটকের উপরের বড় বোগেনভেলিয়া গাছটার ছায়ায় তলায় যেন হারিয়ে গেল।

লোকটার ভয় দেখে কৌতুকে খানিকটা না-হেসে আমি পারলাম না। এই সব বড়লোক জমিদার, রাজাদের টাউট-ফাউটগুলো এমন ভীতু হয়, বিশেষ করে শক্ত লোকেদের কাছে, যে এদের তুলনা একমাত্র শেয়ালের সঙ্গে। ঠিক শেয়াল। যত ভীতু তত চতুর।

আমি চোখ বন্ধ করে ওই লোকটার কথাই ভাবতে লাগলাম।

সামনের টেবিলে একটা ঠুক করে শব্দ হল এবং রাম বললে, চা।

ফিরে তাকালাম। চায়ের কাপটা রাম নামিয়ে দিয়েছে এবং অন্য একটা কাপ হাতে নিয়ে চারিদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজে, তাকে না পেয়ে আমাকে বললে, সি লোকটি?

বললাম, লোকটি নেই। বলবার সময় মনে মনে একটু আপসোসও হল। শুধু ভয়েই পালায় নি, লোকটি সম্ভবতঃ একটু রাগ করেও এমন ভাবে চলে গেল। নমস্কার করতেও ভুলে গেল। বড়লোকদের কর্মচারীদের রীতি-চরিত্র এমনই বটে।

বললাম, তাহলে চলে গিয়ে থাকবে। তা যাক্ গে, নে। ওরা এমনি বটে। এখন জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে রাখ। কালই কলকাতা ফিরব।

রাম বিস্মিত হল একটু। সে বললে, কাল-অ ফিরিবে? বলেছিলে না, অনেক-অ দিন-অ থাকিবে।

বললাম, থেকে কি করব? যার জন্যে এসেছিলাম তাই হল না তো মিছিমিছি বসে থাকব কেন?

রাম করুণ কণ্ঠে বললে, ভূত-অ পাইলে না? আসিথিলি তো ভূত-অ খুঁজিতে?

হ্যাঁ। তা দেখলাম ভূত নাই।

রাম প্রায় কেঁদে ফেললে.আমার কথা শুনে। বললে, ভূত-অ নাই?

না।

রাম এবার কেঁদেই ফেললে সত্যিসত্যি। ফোঁসফোঁস শব্দ করে চোখ নাক মুছতে লাগল। আমি বললাম তার জন্যে কাঁদছিস কেন? ভূত নেই তার জন্যে কান্নার কি আছে?

রাম এবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললে, তা হলি মরি কি হইব? কোথা যিব? হে জগবন্ধু!

এবার চমকে উঠলাম। রাম যে কথাটা বলেছে সে তো সোজা কথা নয়; কথাটা শুনতে সোজা সহজ কিন্তু আসলে তো তা নয়। হে ভগবান্! ভূত যদি নাই তবে মরণের পর মানুষদের হবেই বা কি এবং তারা যাবেই বা কোথায়?

রাম বললে, কিন্তু ভূত তো ছিল।

হ্যাঁ। তা ছিল।

ভূতের ঢেলা খেয়েছি, ভূতের কীর্তির কথা শুনেছি। সুতরাং কি করে বলব ভূত ছিল না।

ভূত ছিল তো কি হইল? কোথা গেল? মরি গেল?

হ্যাঁ তাই। আগে ছিল যখন এখন নেই যখন, তখন মরেছে বই কি?

হঠাৎ রাম প্রশ্ন করে বসল—মানুষ মরিলে তো ভূত হইছিল?

হ্যাঁ।

ভূত মরিলে কি হইল?

কথাটা গুরুতর। অতি গুরুতর প্রশ্ন।

মানুষ মরে ভূত হয়। তাহলে ভূত মরে কি হয়? রাম আবার প্রশ্ন করলে, ভূত-অ আগে না মানুষ-অ আগে।

কি? ভূত আগে না মানুষ আগে?

প্রশ্ন আরও গুরুতর হয়ে গেল।

মানুষ মরে ভূত হত। ভূত ছিল। এখন ভূতেরা নেই সুতরাং ধরে নেওয়া গেল ভূতেরা মরেছে। তা মরল মরল বেশ করল কিন্তু মরে গেল কোথায়? মানুষ মরে ভূত হয়, ভূত মরে কি হয়? এবং ভূত আগে না মানুষ আগে?

গত কাল আগে, না আজ আগে? গত কালগুলো ভূত। আজ হল মানুষ। আগামী কাল কালকের মানুষ। আগামী কালকের মানুষের কাছে আজকের মানুষেরা ভূত হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে গত পরশুর ভূতগুলোর হল কি? হিসেব মত তো ভূত প্রতিদিনই সংখ্যায় বেড়ে যাওয়ার কথা। কারণ প্রতিদিনই লোক মরছে অজস্র। এবং প্রতিদিনের আজ অর্থাৎ বর্তমানকাল বিগত হয়ে গতকাল অর্থাৎ ভূতকাল হয়ে যাচ্ছে।

সব যেন জড়িয়ে পাকিয়ে একাকার হয়ে গেল। ভূতগুলো যাচ্ছে কোথায়? মাথা ঘুরতে লাগল।

এরপর আর সব কথা ভাল করে মনে পড়ছে না। এইটুকু মনে আছে; আমি সারারাত প্রায় দিশে হারিয়ে নানান রকম বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম এবং আমার রাম সারারাত ফোঁসফোঁস করে কাঁদলে।

সেই কান্নায় বিরক্ত হয়ে আমি তাকে গালাগালি করলাম এবং ভূতদের গালাগালি করলাম। সকালে উঠেই চা কাপটিতে পর্যন্ত মুখ না দিয়েই ফাইল টেনে নতুন গবেষণা ফেঁদে বসলাম—ভূত মুর্দাবাদ।

ভূত মিথ্যা; ভূত ছিল না; ভূত নাই; ভূত হইবে না; বিলকুল ঝুট হ্যায়; মুর্দাবাদ ভূত মুর্দাবাদ।

ছয়

দেখতে দেখতে আসর জমে গেল।

টেলিগ্রাম আসতে লাগল। কি কাণ্ড, একি করতে যাচ্ছ তুমি ?

কেউ বললে, খবরদার খবরদার, ভূতের মার ভীষণ মার !

যম দত্ত টেলিগ্রাম করলে, তোমার কপালে অনেক দুঃখ। এক কিলেতেই পগার পার।

আমি কিন্তু কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করলাম না। আমার নতুন সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

ভূত মিথ্যা; ভূত ছিল না; ভূত নাই; ভূত হইবে না। বিলকুল ঝুট হ্যায়, ভূত মুর্দাবাদ।

রাম এসে দাঁড়াল সামনে। সারারাত্রি ভূতেদের জন্য কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো ফুলো-ফুলো হয়ে উঠেছে। বললাম কি রে ?

সে বললে, আজ-অ যাইবে তো ?

নিশ্চয়।

রাম বললে, রাত্তিরি হইবে তো হাবড়া পঁহুছিতে। গাড়ি লাগি টেলিফোন করি দিত্তি হবে তো। আর-অ।

জিজ্ঞাসা করলাম—আর কি ?

বক্তৃতা করিবে ত-অ।

নিশ্চয়।

তা'লি সিটাও লিখ-অ।

রামকে এইজন্যেই ভালবাসি। তার ব্যবস্থা নিখুঁত। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি নিয়ে প্রাণান্ত হয়; সে কথা ভোলেনি সে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে কলকাতার বাড়িতে চিঠি দেওয়া থাকে, সেই অনুসারে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে; ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের মধ্যেই গাড়ি পাই। কোন ঝামেলা থাকে না। এবার যাওয়াটা হচ্ছে হঠাৎ। সেই কারণে রামের হুঁশিয়ারী।

আমাদের ওখানে টেলিফোন হয়েছে নতুন। পোস্টাপিসের পাবলিক কল অফিসে টেলিফোন করতে পাঠালাম ভাইকে। ভাই ফিরে এসে বললে টেলিফোন হল না, সম্ভবতঃ কলকাতার বাড়ির লাইন খারাপ। কোন মতেই সাড়া মিলল না।

অগত্যা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম করলাম রাত্রে হাওড়া পৌঁছুব, গাড়ির ব্যবস্থা কর। টেলিগ্রামখানা দিতে গিয়ে মাথার মধ্যে পোকা নড়ে উঠল; আর একটা কাগজ টেনে নিয়ে আরও একটা টেলিগ্রাম লিখে বসলাম। যম দত্তকে টেলিগ্রাম করলাম।

রীচিং টু নাইট। অ্যারেঞ্জ ভেরী বিগ মিটিং। শ্যাল প্রুভ নো একজিস্টেন্স অব ঘোস্টস। নো ঘোস্ট নো ঘোস্ট নো ঘোস্ট! অল্ ঘোস্টস মুর্দাবাদ।

মনে মনে ভারী তৃপ্তি পেলাম। মনে হল বিজয়া দশমীর দিন রামলীলা ময়দানে বারুদ এবং খড়ে ন্যাকড়ায় এবং কাগজে রঙে তৈরী মিথ্যে রাবণের বিরাট ভয়ংকর মূর্তিটা যেমন রাম-বেশী কোন ছোকরার আগুন জ্বালানো তীরে বিদ্ধ হয়ে দাউদাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবেই আমার বক্তৃতার আগুনজ্বলা তীরের ঘায়ে এতকালের মিথ্যে ভয় ও সংস্কারের বারুদ ও দাহ্য-পদার্থে তৈরী ভূতটা দাউদাউ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

পুড়ছে আর আর্তনাদ করছে, বাঁবারে মাঁরে, গেঁলাম রে। মঁলাম রে। পুঁড়ে ছাঁই হলাম রে। রাঁজা পরীক্ষিৎ নাগযজ্ঞ কঁরেছিল আঁর এঁ করলে ভূঁতযঁজ্ঞ রে। নাগেদের আঁস্তিক মুনি ভাঁগনে ছিল, ভূতেদের কেঁউ নাঁই রে।

দাউদাউ করে জ্বলছে ভূতেরা আর ছাই হয়ে যাচ্ছে। অথচ এতটুকু দুর্গন্ধ উঠছে না। কারণ ভূতেদের দেহে তো মাংস নেই হাড় নেই চর্বি নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু ছায়া। ছায়া পুড়ে ছাই। তার আর গন্ধ কিসের।

আর রামের মত লক্ষ লক্ষ রাম কেঁদে সারা হচ্ছে। ফোঁসফোঁস করে কাঁদছে। হায় মরে কোথায় যাব আমরা।

রামেদের কাতর ক্রন্দনে, নিদারুণ হতাশায়, অসহায় দীর্ঘশ্বাসে সারা আকাশ যেন ম্লান হয়ে গেল। তাদের সঙ্গে আমারও যেন কান্না পেতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সজাগ হলাম সতর্ক হলাম। চোখের জল মুছলাম। এবং মনে মনে বললাম, ভূত মিথ্যে ভূত বোগাস ভূত বাজে—ভূত নেই, ছিল না হবে না। ভূত মুর্দাবাদ। ভগবান মুর্দাবাদ। দেবতা মুর্দাবাদ। ইন্দ্র মুর্দাবাদ। ব্রহ্মা মুর্দাবাদ।

কিন্তু।

আমার মনের মধ্যেই হঠাৎ একটা কিন্তু এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি?

কিন্তুটার শেষেই প্রশ্নটা এসে দাঁড়াল, কিন্তু যম?

উত্তরটা আটকে গেল। যম?

হাঁ। যম মুর্দাবাদ?

না, যম সত্যি। কারণ আজই ওপাড়ার গাঁজাখোর গবা বৈরাগী মরেছে, শিবে বাউরী মরেছে পাশের গাঁয়ে, ক্ষান্ত বুড়ী মরেছে এবং আমার কাছে খবর আসেনি আমি জানি না এমন লোক মরেছে। দৈনিক কত লোক গড়ে মরে তা পরিসংখ্যানে পাওয়া যাবে এটা স্বীকৃত সত্য।

ভূত মিথ্যে ভূত নেই। ভূত মুর্দাবাদ! কিন্তু যম সত্যি। যমকে জিন্দাবাদ বলি বা নাই বলি, যম ছিল যম আছে যম থাকবে।

তা হলে?

কি?

যম থাকলে যমপুরী?

তাই তো।

যমপুরীতে কারা থাকে ?

তাই তো।

আবার সব গোলমাল বেধে গেল। যমপুরী থাকলেই স্বর্গপুরী আসবে। শিবলোক ব্রহ্মলোক বিষ্ণুলোক ইন্দ্রলোক।—কি মুস্কিল।

কিন্তু তবুও আমি শেষ পর্যন্ত জয়ী হলাম। মনে-মনে মনকে বেঁধে বললাম, ভূত মুর্দাবাদ।

* * *

বিকেল বেলা ট্রেন। স্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ডাইনে বাঁয়ে পিছনে গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন। হঠাৎ চলে যাচ্ছি শুনে তাঁরা বেলা চারটে থেকেই এসে জিজ্ঞেস করছেন, কি ব্যাপার স্যর ? এখানে থাকব বলে এলেন, আর বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ চলে যাচ্ছেন ? কি দোষ হোল আমাদের ?

বললাম, একটু রসিকতা করেই বললাম, কি করব ? গ্রামে একটা ভূতও বেঁচে নেই সব মরে বসে আছে। আজকের দিনের কেউই মরে ভূত হচ্ছে না যখন, তখন কি করে থাকব বলুন ? কি হবে থেকে ?

তারা মাথা চুলকে বললে, আমরা যে স্যর বেঁচেই ভূত হয়ে আছি, তা মরে আর ভূত হই কি করে। আর তার দরকারই বা কি বলুন। আমাদের দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন না।

বললাম, তা কি করে হবে বলুন ? আপনার ছায়া পড়েছে মাটিতে ওই দেখুন—ভূতের তো ছায়া পড়ে না। তারপর আপনি ইচ্ছে করলেই তাল গাছের মত লম্বা হতে পারেন না। বাঁশের মত লম্বা হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে লেবু পেড়ে এনে অতিথি সৎকার করতে পারেন না। আপনার কুলোর মত কান নেই মূলোর মতন দাঁত নেই ;

একজন অধ্যাপক বললেন, এ সমস্ত কথা কি আপনি সিরিয়াসলি বলছেন স্যর ?

নি শ্চ য়। ভ য়া ন ক। সিরিয়াসলি ভী—ষ—ণ সিরিয়াসলি। এই দেখুন কলকাতায় টেলিগ্রাম করেছি—মনুমেন্টের তলায় মিটিং হবে, তাতে আমি ঘোষণা করব, প্রমাণ করে ঘোষণা করব—মানে, ডেমনেস্ট্রেট করে ঘোষণা করব, ভূত নাই ভূত নাই ভূত নাই। ভূত বাজে। ভূত মিথ্যে। ভূতেরা সব মরে গিয়েছে

কি করে প্রমাণ করবেন ?

যে ভাবে ভূতেরা প্রমাণ দিয়েছে। ভূতদের ডেকে সাড়া পাইনি, খুঁজে দেখা পাইনি, ভূতুড়ে বাড়ির অন্ধকার কোণে কোণে লাঠি ঘুরিয়েছি, কারুর গায়ে লেগেছে মনে হয়নি। গাছতলা দিয়ে যেতে কোন ভয় পাইনি, আবার কি প্রমাণ ? এই তো এই যেখানে স্টেশন হয়েছে, এই প্ল্যাটফর্ম, ওই যে প্ল্যাটফর্মের ধারে বট গাছটা এখনও রয়েছে, এই জায়গাটার নামই হল মড়া টাঙাবার ডাঙ্গা। এই সব বট গাছের ডালে আগে মড়া বেঁধে রাখা হত আমরা বলতাম গাছিয়ে রাখা। ডাঙ্গাটায় রাত্তির কালে ভূতেরা চেল ডিগডিগ খেলত।

শুনতাম নাকি অম্বুবাচীর সময় দিনে ওপাড়ায় হত মানুষের মুনিষে মুনিষে কুস্তি, রাত্রে এখানে হত ভূত-মুনিষে মুনিষে কুস্তি। কই? কোথায়? আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

কথাটা শেষ করতে পেলাম না, ভিড় ঠেলে একজন এগিয়ে এসে বত্রিশটি দন্ত বিকাশ করে এই এত বড় একখানি হাসি হেসে বললেন, নমস্কার স্যর! এই ট্রেনেই চলেছেন তাহ'লে?

যত বিরক্তি বোধ করলাম তত বিস্মিত হলাম; কারণ লোকটি আর কেউ নয়—কালকের সন্ধ্যের সেই মহামহিমার্ণবা গয়েশ্বরী গিন্নীঠাকুরানীর দেওয়ান বা দূতটি। কাল যেমন অকস্মাৎ কখন অদৃশ্য হওয়ার মত চলে গিয়েছিল আজও তেমনি হঠাৎ যেন আকাশ থেকে ঝড়ে পড়ল বা মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল বর্ষার কোন এক ভোরবেলায় রাত্রে-মাটি-ফুঁড়ে-ওঠা ওলের বা কচুর ডাঁটির মত। ভুরু দুটি আপনি কুঁচকে উঠল আমার। আমি বললাম, কাল থেকে ছিলেন কোথায়, এঁ্যা?

লোকটি বললে, কাল চলে গিছলাম আজ আবার এসেছি। আপনার কাছে এসেছি। আপনাকে যেতেই হবে। না গেলে চলবে না।

চলবে না—মানে?

মানে যেতেই হবে স্যর।

যেতেই হবে। কথাবার্তায় তো দেখছি নবাবী বাদশাহী মেজাজ। যেতেই হবে।

আজ্ঞে না। একেবারে অতি বিনীত অনুরোধ। হাত জোড় করে অনুরোধ। বলে আবার সে দাঁত মেলে দিল। তবে হ্যাঁ, না গেলে আপনার ভাল হবে না—বুয়েচেন না।

কি মন্দ হবে? কি করবেন আপনারা?

ঘেরাও করব।

ঘেরাও?

হ্যাঁ, ঘেরাও করে আপনাকে আমরা নিয়ে যাব। আমরা পারি সব স্যর। বলিনি এতক্ষণ। এখন বলছি—পারি আমরা সব। বলে, সে লোকটা কৌতুকবশে একেবারে হা-হা শব্দে হেসে যেন ফেটে পড়ল।

আমিও রাগে ফেটে পড়লাম—শাট আপ বলছি, শাট আপ।

লোকটা আরও জোরে হাসতে লাগল। আমি এবং আমার সঙ্গের বিশিষ্ট গ্রামবাসীরাও সকলে অবাক হয়ে গেলেন। লোকটা কি?

একজন বলেই বসলেন—কোথাকার অসভ্য হে তুমি?

লোকটা হাসির ডিগ্রী আরও চড়িয়ে দিলে। হাসতে হাসতে সে বললে, চলুন না স্যর মা গয়েশ্বরী চৌধুরানীর বাপের শ্রাদ্ধে, সেখানে পণ্ডিতেরা আসবে—বাঘা বাঘা ব্রহ্মদত্যির মত পণ্ডিত। তারা প্রমাণ করে দেবে। চলুন না।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছিল। চারিপাশে লোক জমছিল। এবং অধিকাংশ লোকই ওই লোকটার উপর চটছিল।

আমাদের গ্রামের ছেলেছোকরারা জমে গিয়ে তারা চটে উঠল। ভয়ানক চটে উঠল।

এবং সাড়া উঠে গেল যে লাগাও চাঁটি। চাঁদা করে মারো চাঁটি। জন দুই-তিনের হাতও উঠল। আমি তো দস্তরমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কারণ ছেলেগুলি আজকালকার ছেলে, এদের হাত উঠলে সেকালের রানা মহারানাদের উদ্যত হাতের মত কারুর মাথা না নিয়ে নামে না। কিন্তু লোকটা অদ্ভুত। চট করে বসে পড়েই হোক আর ঠেলাঠেলি করেই হোক, কোন এক বিচিত্র উপায়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ে ছুটে চলে গেল—স্টেশন প্ল্যাটফর্মের গায়ে যে প্রকাণ্ড বট গাছটা আছে সেই গাছটার দিকে। এবং গাছটার আড়ালে যেন লুকিয়ে পড়ল।

ছেলেগুলি ছুটে গেল তাড়া করে কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রায় ট্রেনখানা প্ল্যাটফর্মে ইন করলে যার জন্য আমিই বললাম, থাক থাক, যেতে দাও যেতে দাও। ট্রেন এসে গেছে আর হাঙ্গামা কোরো না।

* * *

ট্রেনটা এক্সপ্রেস ট্রেন। আমাদের স্টেশন ছেড়ে কাটোয়া পর্যন্ত আর কোথাও দাঁড়াবে না। কাটোয়াতে নেমে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন। সেই ট্রেনে কলকাতা। ট্রেনখানা চলেছিল ফুল স্পীডে। আর গাড়িখানা সেই স্পীডের জন্য খুব জোরে-জোরে দুলছিল। এত জোর দুলুনী যে দোলার চোটে বারবার খোলা জুতো জোড়াটার একপাটি ঐ-দিকে একপাটি ও-দিকে যেন রাগারাগি করে কামরার বাইরে চলে যেতে চাচ্ছিল। এবং আমার মাথাটা ক্রমাগত কামরার দেওয়ালে ঠকোঠকো ঠক্, ঠকোঠকো ঠক্ শব্দে যেন তবলায় ঠেকা দিচ্ছিল। ট্রেনের চাকায় এবং লাইনে আশ্চর্য এক যন্ত্রসংগীত বাজছিল। ঘটা ঘং ঘটা ঘং ঘটাঘং ঘং ঘট ঘং ঘটাঘং ঘটাঘং ঘং। শুধু ধরা যাচ্ছিল না—রাগ বা রাগিণী যাই হোক, সেটা কি ?

আমি ওই যন্ত্রসংগীতের ঘটাঘণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে গুনগুন করছিলাম ভূতো তাং ভূতোতাং ভূতোতাং তাং। মিথ্যাং মিথ্যাং মিথ্যাং থাং।

ভাবছিলাম একটা পুরো গান যদি বানিয়ে নিতে পারি তাহলে আগামী কালকের বা আগামী পরশুর মিটিংএ সেটাকে উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গাইয়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম কলিটা এসেও গেল।

মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা—বিলকুল মিথ্যা—। আ—
ভূত-প্রেত ব্রহ্ম-দৈত্যি একদম মিথ্যা—। আ——।
গাঞ্জা—গাঞ্জা—যোল আনা গাঞ্জা—।
কষিবারে পাঞ্জা—। বাড়ালাম হস্তং।
ভূত হও প্রেত হও চলে আও—কস্তং—।
বাড়ায়েছি হস্তং—

ঘটা ঘং ঘটা ঘং ঘটা ঘটা ঘং ঘং। ট্রেনটার চাকার শব্দ চমৎকার ভাবে হস্তং এবং কস্তং-এর সঙ্গে মিলে গেল। আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম সেই অন্ধকার হয়ে আসা সন্ধ্যার সময়, যাকে আগের কালে আমার পিসীমা বলতেন 'তিনি সন্ধ্যাবেলা'। ঐ সময়টা না-দিন না-রাত্রি। অন্ধকারের মধ্যে দিনটা ডুবে যাবার ঠিক মুখটা। হয় কিনারা নয় সিংহদ্বার।

দিন হারায় অন্ধকারে, তার মানে দিন মরে। আগের কালে বলত দিন মরে রাত হয় যেমন মানুষ মরে ভূত হয়। রাত কালটা ভূতের কাল। ভূতেদের যত চোরফুটি এই রাত্রির অন্ধকারে।

পিসীমা বলতেন, সন্ধ্যে হল সুয্যি ডুবল; পাখিরা কলকল কলকল করে ডেকে বাড়ি ফিরল। ওদিকে বেল গাছের ডালের উপর ঘুমন্ত ব্রহ্মদত্যির ঘুম ভাঙল; ন্যাড়া-মাথা ব্রহ্মদত্যি উঠে বসে হাই তুলে মুখের কাছে তুড়ি দিয়ে আওড়াতে লাগল, পুণ্যশ্লোক নাগাবাবা পুণ্যশ্লোক জটাধারী, পুণ্যশ্লোক নন্দীভৃঙ্গী ভূতপ্রেতের অধিপতি।

ওদিক গ্রামের বৈরিগীপাড়ার ধারে বৈরাগীবাবাজীদের সমাধি থানে সেই প্রকাণ্ড বড় নিম গাছটার ডালে বৈরাগীবাবাজী ভূতও তখন উঠে বসেছে এবং মাথার মাঝখানে সেই লাউয়ের বোঁটার মত মোটা টিকিগোছটার গিঁঠ খুলতে খুলতে আওড়াচ্ছে—

"অনন্ত ভূতের লীলা অনন্ত মহিমা
ত্রিসংসারে কেহ তার দিতে নারে সীমা;
সংসারে আঁতুড় হতে শ্মশান পর্যন্ত
ভূতের ভূতুড়ে কাণ্ড রূপও অনন্ত,
আঁতুড়ে পাঁচুয়া রূপে করে অধিষ্ঠান—
তার সঙ্গে পেত্নী লয় পোয়াতীর প্রাণ,
শ্মশানে পিশাচরূপে করয়ে ভ্রমণ,
বৈরাগীর সমাধিথানে গোসাঁই সুজন;
কবর আস্তানে হে মামদো জবরদস্ত
বিক্রমে রাজত্ব কর ফেলিয়া বেহস্ত;
কেরেস্তানী গোরস্তানে ফাদার ভূতের রাজ্য।
সকল স্মরণ করি শুরু রাতের কার্য।"

এইখানে হাতজোড় করে নমস্কার করত, তারপর ছড়ার সুর পাল্টে নতুনসুরে ছড়া ধরত—

"ঘোস্ট যত টোস্ট খায় তার সাথে চাহে চাঁহা—
মামদোরা নাস্তা করে, কোর্মা গোস্ত খেয়ে—আহা।
বৈরাগীবাবাজী সবে মালপো লাগি হল সারা—
জমিদার ভূতের বাড়ি হরি বলে গিয়ে দাঁড়া।
যা দেয় মন তাই ভালোরে, ভিক্ষের চাল
আবার কাঁড়া আকাঁড়া।"

সে কাল এক আশ্চর্যকাল। মহাঅরণ্যে যেমন পাতা পড়লে কুলো হয়, ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, তেমনি সে-কালে রাজা-প্রজা নায়েব গমস্তা দারোয়ান হাতি ঘোড়া কুকুর বেড়াল দাস দাসী গেরস্ত ফকীর বাউল বৈরাগী সকলকেই মরে ভূতে হতে হত।

আমার পিসীমা বলতেন, হ'ত নয়, এখনও হ'তে হয় এবং চিরকাল হ'তে হবে। বলতেন, রাজা জমিদার ধনী ভূতেদের বাস ছিল বিরাট বিরাট ভাঙা বাড়িতে; সেখানে সন্ধ্যের মুখে ভূতেদের রাজ্যের কাজ শুরু হতেই শোরগোল উঠত, লোক-লশকরেরা সারাদিন ঘুমিয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করে কাজ শুরু করে দিত। দরওয়াজার মুখে অদৃশ্য ফটক খোলার শব্দ উঠত; সিপাহী দারোয়ানরা নালমারা জুতো পরে মাঠের মধ্যে শব্দ তুলত। ঘোড়াশালে ঘোড়াভূত ডেকে উঠত, হাতিশালে হাতিভূত, উটশালে উটেরা; ওদিকে গাছে যত পাখিভূতেরা কলকল করে ডাকতে থাকত। কা—কা—কা—। কুহু—কুহু—কুহু—কিচির কিচির কিচির; মুরগীরা সকালে যেমন কোঁকর কোঁ কোঁ শব্দে ডাকে, সন্ধ্যের মুখে ভূতমুরগীগুলোও কোঁকর কোঁ কোঁ শব্দে ডাকে—তবে এদের কোঁকর কোঁ-এ দুটো ক'রে চন্দ্রবিন্দু যোগ হয়েছে; সারাদিন বাছুর-ভূতগুলো আটক থেকে সন্ধ্যের সাড়া পেয়ে ক্ষিদের চোটে ডেকে ওঠে—হাম বাঁ। বাঁ্যা—বাঁ্যা।

গাইভূতগুলোর মোড় টাটিয়ে উঠেছে তখন দুধের চাপে। কাতর হয়ে তারাও ডাকে হাম্বা। হাম্বা শব্দ শুনে দেওয়ানজী ভূত ডাকেন, ওঁরে বেঁটা রাঁখালে ভূত। গাঁই দুঁইয়ে ফেঁল, গাই দুঁইয়ে ফেঁল। শুনছিস না অন্দরের তাঁগিদ।

অন্দরে তখন খোকাভূতেরা কাঁদতে শুরু করেছে। ক্ষিদে পেয়েছে, দুধ চাই।

পদী ঝিভূত্‌নী খোনা গলায় ঝঙ্কার তুলে বলে উঠত—মঁরণ। আঁকেল-খেঁগো দেঁওয়ান কোঁথাকার। ছোটবাবু চাঁহা চাঁহা করছে, বঁড় কর্তা আঁফিং খাঁবে সে কঁথা এঁকবাঁর বলে না গো। বঁড় গিন্নী উঁঠে চাঁ না পেঁলে মাথা খাঁবে।

শুধু তাই নয়। বর্ণনা, পিসীমা দিতেন, নিখুঁত বর্ণনা। বলতেন, কাকভূত কোকিল-ভূতের কলকল থামতেই ছেলেভূতেরা পড়তে বসে কলকল রব তুলত। একসঙ্গে সুর করে পড়ত—

"সাঁরাদিন ঘুঁমাইয়া সাঁঝ বেঁলা উঁঠে
ভূঁতেদের পুঁত মোঁরা মঁন দিঁনু পাঁঠে;
ভূঁতেদের কাঁজ শুন ভূঁত পুঁত সঁব
সাঁরারাঁত ভূত নেত্য ভূত উঁপদ্‌রব।
দুপদাপ ঢেলা ফেল ঝর ঝর ধুলা
ধেই ধেই ধেই নাচনে দোলারে গাছগুলো।
গাছতলা দিয়ে যখন মানুষেরা যাবে
পা-খানি বাড়ায়ে তার মাথায় ঠেকাবে,
খোনাসুরে কথা বলে খিল খিল হেসে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বাছা টেনে ধর কেশে।
মুলো মুলো দাঁতে দাঁত কড়মড় ঘষি
তাইরে নারে না গান ধর সোনা কষি।"

পিসীমা বেশ সুর করে পড়তে পারতেন। ভারী ভাল লাগত আমার। পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল থেকেও ভাল লাগত।

ভূতেদের পাঠ্যপুস্তকের কবিতাটি পর্যন্ত পিসীমা সেকালে বাপ-পিতামহের কানে শুনে শিখেছিলেন। তাই বা কেন, হয় তো নিজেই কানে শুনে শিখেছিলেন। পিসীমা আফিং খেতেন, মোটা এক ডেলা আফিং। সন্ধ্যে আটটার পরই চা সহযোগে আফিং খেয়ে ঢুলতে বসতেন—তখন ওই আধো-তন্দ্রা আধো-জাগরণের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের কথা শুনতে পেতেন না। পৃথিবীর মানুষরা যা শুনতে পেতো না সেইসব কথা শুনতে পেতেন।

পেতেন, এই কথা বলতেন তিনি। তিনি কেন, সেকালে সকল লোকই বলতেন। বলতেন কেন, সত্যই শুনতেন, শুনতে পেতেন। শুধু আমাদের দেশে কেন সকল দেশের মানুষরাই শুনতেন এবং দেখতে পেতেন। কিন্তু—

আমার অন্তর তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের মেহের আলির মত চিৎকার করে উঠল, সব ঝুট হ্যায়। ও ভূতগুলোর কাউকে যদি এখন সামনে পেতাম তাহলে নাকের কাছে ঘুঁষি ঝেড়ে দিয়ে বলে উঠতাম—তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকিতে সারা ট্রেনখানা ঝনঝন ঝরঝর ঝরঝর ধরনের একটা প্রচণ্ড শব্দ তুলে যেন উল্‌টে যাচ্ছে বলে মনে হল। চমকে উঠতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। তার আগেই যেন কি হয়ে গেল। সম্ভবত অজ্ঞান হয়ে গেলাম। বা যাচ্ছিলাম। কিন্তু গেলাম না। অর্থাৎ অজ্ঞান হলাম না। আঘাত পাবার আগেই যেন একজন কেউ আমাকে জানালা দিয়ে বার করে নিয়ে এল।

আশ্চর্যের কথা এ-হল সেই লোকটি, সেই অবাঞ্ছিত কালকের এবং আজকের লোকটা। বাজে বা ছিট-ভুবনপুরের গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর সেই প্রগল্‌ভ দূতটি আমাকে রক্ষা করলে। ট্রেনখানা যখন হুড়মুড় ঘটমট ঝনঝন বা ঝরঝর করে উলটে পড়তে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সেই লোকটা লাফিয়ে আমার কামরাখানার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে সেই দাঁত বের করেই বললে; বেরিয়ে আসুন স্যার জানালা দিয়ে। বেরিয়ে আসুন। নইলে গেলেন। মাথাটা গলিয়ে দিন জানালার বাইরে।

তাই দিলাম। লোকটা আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে তার সেই বিচিত্র লম্বা হাতখানার উপর শুইয়ে দিব্যি বের করে এনে লাইনের পাশে একটা গাছের ধারে দাঁড় করিয়ে দিলে।

মাথাটা যেন ঝিমঝিম বা টিমটিম বা টনটন কি কনকন এমনি একটা কিছু করছিল। লোকটি হেসে বললে, ও ভালো হয়ে গেছে। দেখুন না, ভালো হয়নি?

সত্যিই ক্রমশঃ ভালো বোধ করছিলাম। বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু হল কি? ঘটল-টা কি?

লোকটি বললে, দেখুন না। আপনার কামরাটারই চাকা লাইন থেকে সরে গেছে। খুব ভাগ্যি একদম উলটে যায়নি।

আকাশে চাঁদ ছিল শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী সপ্তমীর চাঁদ। হালকা জ্যোৎস্নার মধ্যে খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। দেখলাম, ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে গেছে মাঠের মধ্যে। ইঞ্জিনটা

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোঁ শোঁ শব্দে ডাক ছাড়ছে, লোকজন সব গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দেখছে কি হয়েছে। আমার কামরাখানা ছিল ফার্স্ট ক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস কম্বাইণ্ড বগি। আমিই একলা যাত্রী ছিলাম তাতে। এই গাড়িখানার চাকা লাইনচ্যুত হয়ে ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে গেছে। ট্রেনের লোকেরা আমার কামরাখানার কাছেই ভিড় জমিয়েছে। শুধু প্যাসেঞ্জাররাই নয়। হঠাৎ চোখে পড়ল, লাইনের ওপারে মাঠের মধ্যে যেন কালো কালো ছায়ার মত অসংখ্য লোক। অসংখ্য লোক।

জিজ্ঞাসা করলাম—ওরা কারা?

লোকটি বললে, মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকুরানীর পাইক বরকন্দাজ এবং লেঠেল পালোয়ানের দল।

তার মানে?

লোকটি বললে, ওই দেখুন।

কি?

এই এদিকে, মানে পিছনে তাকান। হ্যাঁ। দেখছেন?

দেখছি। কিন্তু কি ব্যাপার? আলো, লোক।

হ্যাঁ। সব গয়েশ্বরী দেবীর লোক। আপনাকে নিতে এসেছে। আপনার কামরাটাকে তারাই মানে ওই লাইনের ওপাশের ওরাই দলবল নিয়ে জুটে ঠেলে ডিরেল্‌ড করে দিয়েছে। আপনি তো ভালোয় ভালোয় গেলেন না। এখন ওই সব লোকজন আসছে আপনাকে রিসেপশন দিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। বলেছিলাম তো—আপনাকে স্যার যেতেই হবে। দেখুন না ফার্স্টকেলাসের চাকার তলাতে ওরা দাঁত বের করে হাসছে। জন দু-তিন অবশ্য একটু জখম হয়েছে।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম দূরের আলোর শোভাযাত্রার দিকে। কি আলো? ঠিক তো হেজাক পেট্রোম্যাক্স অর্থাৎ কেরোসিন গ্যাসের আলো নয়। কেরোসিনে ভিজানো পলতের মুখে জ্বলা শিখা অথবা মশালের আলোয় যে ধরনের লালচে আলো জ্বলে মাথার উপরে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে, তা তো নয়। এমন আলো তো কখনও দেখিনি।

আলোগুলি কাছে এলে দেখলাম, সত্যই আলোগুলি বিচিত্র। একেবারে নতুন ব্যাপার। ব্যাপারটা বিজ্ঞানের জগতেও একরকম অভিনব। একটা লম্বা ডাণ্ডির ডগায় জোনাকি পোকার বড় বড় তাল যেন জমিয়ে রাখা হয়েছে, সে পঞ্চাশ ষাট হাজার না, লাখ লাখ, না সে যে কত, তা বলা খুব শক্ত। তবে হেজাক পেট্রোম্যাক্সের মতই উজ্জ্বল। অহরহ দীপ্‌ দীপ্‌ করছে। জোনাকিগুলো জ্বলে আর নেভে; সে হিসেবে মধ্যে মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখে বুঝলাম, জোনাকিগুলোর অর্ধেকগুলো নিভছে এবং জ্বলন্তগুলো যখন নিভছে তখন নিভন্ত জোনাকিগুলো জ্বলে-উঠে আলোর মাপটা ঠিক বজায় রেখে যাচ্ছে। নিচের ডাণ্ডাগুলি ভারী সুদৃশ্য; একেবারে ধবধবে সাদা; কোন কিছু হাড় থেকে তৈরী মনে হল।

মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না।

তেল লাগে না, পলতে লাগে না; এক লাখ কি পঞ্চাশ হাজার জোনাকি পোকা জমিয়ে খাসা আলো জেলেছে। আর আলোও হয়েছে বাহারের। সাবাস্ দিয়ে উঠলাম মনে মনে ঠিক সেই সময়টিতেই ঠক্ করে এমন একটা শব্দ উঠল যে চমকে উঠে ঘুরে তাকালাম। ইনভ্যালিড চেয়ার বা স্ট্রেচারের মত একখানা সেডান চেয়ার নামালে তারা ঘাড় থেকে। এবং মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী ঠাকরুনের সেই দূতপ্রবর সেই রকম দন্ত প্রকাশ করে বললে, চড়ে বসুন।

চড়ে বসব? কেন?

যেতে হবে না? গাড়ি ডিরেল করে আপনাকে নামিয়েছে। এরপরও আপনাকে ছেড়ে দেবে ভাবছেন? উঠুন উঠুন। বসুন চেয়ারে।

সেই জোনাকি-জমানো মশালের আলোয় এবং আকাশের জ্যোৎস্নার আলোয় লোকটার দাঁতগুলোকে আশ্চর্যরকম সাদা দেখাচ্ছিল এবং গায়ের মুখের রঙ ভীষণ রকম কালো দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কালো রঙ-মাখানো কাগজে কেউ যেন সাদা কালি বা রং দিয়ে এমন হিজিবিজি কেটেছে যা দেখে সমস্ত শরীর কেমন যেন শিরশির করে।

ওদিকে তখন ট্রেনের প্যাসেঞ্জার এবং গার্ড ড্রাইভারেরা মিলে নানান জটলা শুরু করেছে, কি করবে এখন তারা? এই মাঠের মধ্যে এই রাত্রিকালে তারা আতান্তরে পড়েছে; কি করবে? কোথায় যাবে? যদি কোথাও না গিয়ে এইখানেই ট্রেনের কামরাতেই থাকে তাহলে কি খাবার মিলবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। হাজার রকম প্রশ্ন নিয়ে বেশ জোরালো তর্ক উঠেছে। তারই মধ্যে কানে এল, যেন ঐকতানে প্রশ্ন করছে, এই ভদ্রলোক? এই ভদ্রলোকের কি হবে? উনি কি এই মাঠের মধ্যে বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন?

কে যেন উত্তর দিলে—কপাল মশাই, কপাল! করবেন কি? আপনারই বা কি দোষ, অন্যেরই বা কি দোষ? এত লম্বা গাড়িখানার মধ্যে উনি একা ওই গাড়িতে চেপেছিলেন আর ওই গাড়িখানাই ডিরেল্‌ড্ হয়েছে। উনি জখম অজ্ঞান। আর আমাদের কর্মভোগ।

কথাগুলি আমার কি রকম যেন মনে হল। কারণ আমি একখানা বগিতে একা ছিলাম। ফার্স্টক্লাস-সেকেণ্ড ক্লাস বগিতে ছিলাম। আর সেই বগিখানাই তো উলটেছে। তাহলে? অজ্ঞানটা কে হল? আমি গয়েশ্বরী দেবীর সেই প্রগল্‌ভ দূতটিকে বললাম, কি হল মশাই? ওরা কার কথা বলছে? কে অজ্ঞান হয়ে গেছে? আমি ছাড়া আর কে একখানা বগিতে একা ছিল? দেখতে হবে যে! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

লোকটা বিচিত্র হেসে বললে, সে আর আপনাকে বুঝতেও হবে না দেখতেও হবে না। আর যা ভিড় করে ঘিরে রেখেছে, দেখছেন না! ও দেখা কি সহজ? তার চেয়ে আপনি ওই চেয়ারে উঠে বসুন।

উঠে বসব? কোথায়? কিসে? কেন?

বসবেন, ওই যে পালকি পাঠিয়েছেন আমাদের গিন্নীঠাকরুন ওই পালকিতে।

না মশায়, এই যুগে মানুষের কাঁধে চড়ে আর যেতে পারব না।

সে বললে, মহাশয়—এ আপনাদের গণতন্ত্র-চালিত এলাকা নহে। কাহারও দাবী এখানে চলে না। ভূতভাবন ভূতনাথের প্রতিনিধি ধর্মরাজ এখানকার ডিক্টেটর—তাঁর অধীনে এ অঞ্চল অর্থাৎ এই ছিট-ভুবনপুর গয়েশ্বরীর হুকুমে চালিত। এখানকার এই নিয়ম। এখানে মানুষের কাঁধেই যেতে হবে। বৈতরণী নদীর পলিমাটি, এখানে ঘোড়া চলে না, গাধা চলে না, এমন কি গোরু যে গোরুর ক্ষুর চেরা, সে গোরু পর্যন্ত চলে না। মোটর ফোটরের ফটর ফটরও এখানে চলে না। তা ছাড়া যস্মিন দেশে যদাচার। উঠুন।

ভারী খারাপ লাগছিল আমার। খানিকটা বেকায়দায় পড়েছি বলে কি লোকটা এই-ভাবে আমি হেন মানুষটার সঙ্গে এইভাবে কথা কইবে? আমি বিরক্ত হয়েই ডাকলাম, ও-রে-অ-অ-রা-মরে।

কেমন যেন মনে হল যে, ঠিক ডাকা হচ্ছে না। অ রাম রে—অরা-মরে অরা মরে হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

ওদিকে ট্রেনের পাশের জনতা প্রায় কলরব করে উঠল, কি বলছে। কি বলছে। ঠোঁট নড়ছে! ওই দেখ।—ওরা সকলেই প্যাসেঞ্জার।

এদিকে সেই উদ্ধত বেয়াদব গ্রাম্য অতি-সেকেলে লোকটি অর্থাৎ সেই মহিমার্ণবা শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরানী নাম্নী ছিট ভুবনপুরের পত্তনীদারনি প্রেরিত সেই গোমস্তা বা নায়েব বা সরকার বা উকিল জাতীয় সেই লোকটি বলে উঠল, ওরে, সিধা আঙুলে ঘি ওঠে না রে! কিন্তু তুই বেটারা কি করছিস? এঁ্যা? দেরি হচ্ছে না?

সেই পঙ্গপাল বা ডেয়ো পিঁপড়ের দঙ্গলের মত সেই কালো কালো মূর্তির দঙ্গল থেকে একজন কে বললে, কি করব বলেন। হুকুম করেন।

কি হুকুম করব? যা নিয়ম তাই করবি।

যা নিয়ম?

আলবৎ।

বাস, পরমুহূর্তেই আচমকা সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিগুলির মধ্য থেকে, বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা দেখতে চার-চারজন লোক একসঙ্গে প্রায় ঝম্প প্রদান করে বেরিয়ে এসে আমায় মদগুর মৎস্য অর্থাৎ কিনা মাগুর মাছের মত খপ খপ করে চেপে ধরে এক মুহূর্তে কাবু করে ওদের সেই বিচিত্র পালকিখানার উপরে বসিয়ে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই গয়েশ্বরী-প্রতিভূ বলে উঠল, সাবাস্। উঠাও আব।

মুহূর্তে সেই বিচিত্র পাল্‌কিখানা প্রায় আটজন বেহারার কাঁধের উপর উঠিয়ে নিলে। আমি হাত-পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ করার পর্যন্ত সময় পেলাম না। এবং সঙ্গে সঙ্গে কে একজন খুব কড়াগলায় মিলিটারী হুকুমের মতই হুকুম দিলে, আব চলো।

গয়েশ্বরী দেবীর সেই দূতটি হি-হি করে হেসে ভেড়া-ছাগলের মত গলায় বোধ করি আমাকে ঠাট্টা করেই গেয়ে উঠল, চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠরিয়া বহুতদূর যানা হৈ। দ্বিতীয়

লাইন লোকটা গাইলে, না গাইলে না, তা বুঝতে পারলাম না। তার কারণ সেই ডেয়ো পিঁপড়ের দঙ্গলের মত গয়েশ্বরী দেবীর পাঠানো কালো কালো সেই চ্যালা-চামুণ্ডার দল হালকালের নিয়ম বা ফ্যাসন অনুযায়ী ধ্বনি বা আওয়াজ দিয়ে উঠল—

গয়েশ্বরী দেবী কি—! —জয়!
ভূতেশ্বর জিউ কি! —জয়!
ছিট ভুবনপুর! —জিন্দাবাদ!

সে আকাশস্পর্শকরা ধ্বনি প্রতিধ্বনি। আকাশে বাতাসে ধ্বনিতরঙ্গ যেন অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারের মত বিশ হাত উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দূরে দেখা যাচ্ছিল সেই রেল-লাইনটা; সেই অচল ট্রেনখানা; সেই লাইনের ধারে অন্য প্যাসেঞ্জারদের জটলা। তাদের জটলার কোলাহল কলরব এবং এঞ্জিনখানার স্টিমের শব্দ উঠেছিল। এই এদের সেই বিরাট ধ্বনিতরঙ্গ গিয়ে বিশ হাত উঁচু ঢেউয়ের মত সব কিছুকে যেন ভাসিয়ে বা ডুবিয়ে দিলে। আর আমি কিছু দেখতে পেলাম না বা শুনতেও পেলাম না। এদিকে তখন স্লোগানের পর স্লোগান উঠছে। তখন স্লোগান উঠছিল—

মধুর বদলে গুড়—।
চলবে না।
দুধ কমালে—
চলবে না।
বীচে কলা—
ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হ'ল না।

কপাল কুঁচকে প্রশ্ন জানিয়ে তাকালাম সেই গমস্তাবাবুর বা দেওয়ানবাবুর দিকে। সে আমার চোখের দৃষ্টি দেখে হেসে বললে, আজকাল পিণ্ডিতে আর মধু দিচ্ছে না পৃথিবীতে, কলা দিচ্ছে বীচে কলা আর পরিমাণেও কম দিচ্ছে তাই ওরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। আজ আবার তো গয়েশ্বরী ঠাকরুনের বাবার ছেরাদ্দ!

কিন্তু সে শোনার জন্যে আমার আর এতটুকু কৌতূহল রইল না। কারণ তখন সে এক বিচিত্র দৃশ্য সম্মুখে। যত দূর অনুমান সম্ভব সেই আশ্চর্য অজ্ঞাত বাজেভুবনপুরে, সেই অনুমানে মনে হল, সামনের দিকটা দক্ষিণ দিক—সে দক্ষিণ দিকে ঘন কালো অন্ধকার স্তূপের মত একটা কিছুর দিকে চলেছে সে এক বিরাট মিছিল।

একবারে সামনে সারি সারি আলো নিয়ে যেন মশালচীর দল চলেছে। তাদের মশাল-গুলোও সেই মশালের মত বিচিত্র, দপদপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে এবং নিভে নিভে যাচ্ছে।

তার পিছনে একদল চলছে সেই জোনাকি পোকার পিণ্ডের মশাল নিয়ে। এগুলো দিপদিপ করছে বটে কিন্তু একেবারে নিভে যাচ্ছে না। কারণ এ নিভছে ও জ্বলছে। ও জ্বলছে এ নিভছে। তাতে মোটমাট আলোর পরিমাণ ঠিক এবং স্থির আছে। তাদের সেই আলোতেই একসময় মনে হল, সামনের নিভন্ত জ্বলন্ত আলোকধারী যারা তারা

সকলেই মেয়েছেলে।

আরও মেয়ের দল রয়েছে, তারা জোনাকি মশালধারীদের ঠিক পিছনে রয়েছে। তাদের দেখে কিন্তু আমার শরীর শিউরে উঠল। ও বাপ। এরা কারা।

ঢলকো-করে সর্বাঙ্গ ঢেকে কাপড়পরা একদল লোক, বোধ হল তারা সকলেই মেয়ে। তাদের পিছনেই ছিল জোনাকি পোকায় তৈরী সেই আশ্চর্য মশাল, তার আলোয় তাদের স্পষ্ট দেখেছিলাম। যা দেখলাম, তাতে আশ্চর্য হলাম এই কারণে যে, তাদের সেই নিভন্ত-জলন্ত মশালগুলো তারা হাতে ধরে নেই; আলোগুলো যেন তারা মাথায় করে নিয়ে চলেছে। ভারী বিচিত্র মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আপাদমস্তক ওয়াড়পরা একদল চলন্ত পাশবালিশ।

তাদের দলের পরেই তো বলেছি জোনাকি-মশালধারীর দল। তাদেরও দেখে খুব বিচিত্র মনে হচ্ছিল, কারণ লোকগুলোর গায়ের রং অত্যন্ত বিশ্রী রকমের সাদা বা লাল্‌চে, দেখে যেন শরীর শিউরে ওঠে। গা গুলিয়ে যায়। ভয় করে। লক্ষ্য করলাম এদের কাপড়গুলো সব কালো। মেয়েপুরুষ দুই রয়েছে।

তাদের পিছনে যারা, তারা পোড়া বাঁশের মত লম্বা এবং কালো। ও—মা। এযে সব মেয়েছেলে! এই লম্বা। আর আশ্চর্য কালো। তেমনি সরু শীর্ণ চেহারা। পরনের কাপড়েরও কি তেমনি বাহার। হাঁটুর বেশি ঢাকেনি। মনে হল ইচ্ছে করেই খাটো করে পরেছে। উপরের শরীরটাকে কিন্তু আচ্ছা টাইট করে ঘিরে কোমরে ফেরতা বন্ধনে বেঁধেছে। বাঁ কাঁখে একটা চ্যাঙারি বা ডালা বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ধরে রেখেছে। ডান হাতটা ওদের চলনের সঙ্গে বেশ তালে তালে দুলছে। মধ্যে মধ্যে ফিরে তাকাচ্ছিল তারা। সঙ্গে সঙ্গে ফিক ফিক করে হাসছিল। ভারী বাহার খুলেছিল তাতে। সেই আশ্চর্য কালো কালো মুখে, সাদা সাদা চোখ এবং ঝকঝকে দু-দুপাটি দাঁত ঝকমক ঝকমক করছিল। মনে হচ্ছিল কোন আলকাতরা মাখানো দেওয়ালে সাদা চুন ছিটিয়ে দিচ্ছে কেউ।

এই মেয়েরা মধ্যে মধ্যে ডানহাত দিয়ে বাঁ-কাঁখের ডালাটা থেকে মুঠো ভরে সাদা (খুব বেশি সাদা নয়) কিছু নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। মনে হল শুকনো ফুলের পাপড়ি টাপড়ি হবে।

তারপরই ছায়ামূর্তির-মত-মানুষের সমুদ্র বললে বেশি বলা হবে না। ছায়ামূর্তির মানুষ মানুষ আর মানুষ। ও। সে যে কত তার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। আর কত রকমের কত চেহারার কত পোশাকের। বেঁটে লম্বা মোটা সরু, চুলভরা মাথা, টাকভরা মাথা, দাড়ি-গোঁফ ঢাকা মুখ, শুধু গোঁফওলা মুখ, দাড়ি-গোঁফ চাঁচা অর্থাৎ কামানো মুখ, সে যে কত রকমের সে কি বলব। আমি এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সবই প্রায় ভুলে যাচ্ছিলাম। মোটমাট বেশ লাগছিল। এ রকম প্রসেসন করে কোন কাজে কেউ তো আমাকে নিয়ে যাবে না। সুতরাং বেশ লাগবে না তো কি।

ছায়ামূর্তির মত মানুষদের মিছিলের সেই বারোভাজা বা পাঁচমিশেলী চানাচুরের মত অংশটার পর যে অংশটা সেই অংশটার দিকে তাকালাম। এরা কারা?

ছোট ছোট নানান চেহারা এবং নানান পোশাক-পরা দল।

ভালোভাবে বেশ ঠাওর করে দেখবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তখন আকাশের চাঁদ ডুবে গেছে; অন্ধকার ঘন হয়েছে; ওদের হাতের জোনাকিমশালের আলোতেও সে অন্ধকার ফিকে করতে পারছিল না। বেশ ঠাওর করে দেখলে তবে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কে যেন বজ্রগম্ভীর তবে কিছুটা অনুনাসিক কণ্ঠে হেঁকে উঠল—হু—কুম—দার। হল্ট্।

সম্মুখে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ফটক। বিরাট বা বিশালকায়—ইয়া পঞ্চাশ-পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাতি, পঞ্চান্ন-ষাট ইঞ্চি ভুঁড়ি, বিশ-বাইশ ইঞ্চি গর্দান আর এই মালসার মত মাথা ছ'ফুট লম্বা সশস্ত্র প্রহরীরা সে-ফটক রক্ষা করছে। তারাই কেউ এমন পিলে-চমকানো হাঁক মেরেছে! তাদের মুখের উপর প্রখম মাথায় আলোবহনকারীদের আলো পড়ছিল; সেই আলোয় দেখলাম, ইয়া গোঁফ এই গালপাট্টা, চোখ দুটো যেন আগুনের ভাঁটা, জ্বলজ্বল করছে,

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড জোরালো গলায় কে হাঁক দিয়ে উঠল।

—হল্ট—হু কম দার—। রোখো কোন আতা হ্যায়। মনে হল যেন বাজ ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মিছিল। চমকে উঠে থেমে গেল। আমিও চমকে উঠলাম।

উত্তর দিলে গয়েশ্বরীর সেই দূত। সে বলে উঠল, গিন্নী-ঠাকরুনের বাবার ছান্দে বক্তৃতা করবার গুণীজন। মর্ত্যভূমসে আয়া। ফিন ঘুম যায়েগা। ছোড়ো, ফটক ছোড়ো।

ই সব লোক কৌন—কাহে চিল্লাতা?

তুম কচু পোড়া খাও। যম রাজার রসকস-হীন গুণ্ডাভূতের দল তো। আরে বাবা—এ সব হল দেখাবার জন্যে জলুস। সেই ফাঁকে বেটারা মনের সাধে চেঁচিয়ে নিচ্ছে।

এবার উত্তর হল, বরঞ্চ হুকুম হল বলাই ভাল, হুকুম হল, বহুত আচ্ছা! আস্তে আস্তে চিল্লাও, হুড়মুড় করকে মৎ যাও, জলদি জলদি যাও। লিকিন বোল্ বোলকে যাও কোন কোন যাতা হ্যায়। পাসপোর্ট নিকালো, চলো চলো চলো। বলো কৌন যাতা?

খোনা মেয়েলী গলায় আওয়াজ হল—

আমরা যাচ্ছি 'পেত্তারা' মানে আলেয়ারা। সাদা রঙ আমাদের।

আচ্ছা। আচ্ছা। মাইয়ালোক সব। ঠিক হ্যায়। উসকে বাদ? কোন যাতা।

আমরা জোনাকি মশালচী। ছিঁচকেপোড়া পেরেত।

হাঁ হাঁ। তুম লোক ভি আগুনে পুড়েমরা প্রেত। সব সাদা তো?

হাঁ।

চলে যাও। উসকে বাদ?

আমরা গো।

কারা তোমরা, বাতাও।

মরণ। মিন্‌সেদের ঢঙ দেখ। চেহারা দেখে চিনতে পারে না। পোড়া বাঁশের মত লম্বা, খাটো করে কাপড় পরেছি, কাঁখালে ডালা রয়েছে, মুঠো মুঠো মাছের আঁশ ছিটুচ্ছি—আমরা কারা জিজ্ঞেস করছে? পুকুরে পুকুরে শামুকগুগলি তুলি। বারোমাস তিরিশ দিন

দেখছে তবু বলবে কারা তোমরা বাতাও।

আরে এতনা বাত মাৎ বোলনা। বলো কোন লোক তুমলোক।

শাঁমুক তুলি—শাঁখচুন্নি—

ঠিক হ্যায়, ভিতর যাও। আর কোন লোক? আলেয়া পেত্‌তা; ছিঁচকেপোড়া; শাঁকচুন্নী। আউর কোন?

একসঙ্গে কারা বলে উঠল, অহম আবাং বয়ম্।

সসম্ভ্রমে এবার দ্বারপালেরা বললে, আরে বাপরে। বরম-দেও লোক। —গোড় লাগি মহারাজ।

জিতা রহো। চিরং জীব। ভূত হয়ে চিরকাল বেঁচে থাক।

ওঁরা চলে গেলেন। খটাস খটাস শব্দে খড়ম বেজে চলে গেল। এর পর?—এর পরই দ্বারপালেরা এ্যাটেনশন হয়ে খড়াস শব্দ তুলে স্যালিউট করে হেঁকে উঠল—জিন্দাবাদ।

যে নামে জিন্দাবাদ দিলে, তা মনে মনেও উচ্চারণ করতে পারলাম না। নিদারুণ ভয় হল। তিনি কিন্তু সেই মুহূর্তে ফটকের ওপাশ থেকে বেশ অভিজাত ভৌতিক অর্থাৎ খোনা গলায় আমাকেই সম্ভাষণ করলেন, সুস্বাগতম্—হেঁ যঁম দত্ত-বন্ধু অঁমরতাঁ প্রঁত্যাশী-মঁহাশয়; সুস্বাগতম্—এই ভূত প্রেত পিশাচাদিদিগের আশ্রয়ভূমি, এই বৈতরণী নদীতটস্থিত খেয়াঘাট-কেন্দ্রিক বন্দর নগরে ও তৎসংলগ্ন চরভূমিতে। মহাশয় আপনি আমাদিগের সম্পর্কে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের কাহারও সন্ধান আজ মর্ত্য-ভুবনপুরের কুত্রাপি প্রাপ্ত হন নাই। যাহার ফলে আপনি আমাদিগের সম্পর্কে এই নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আমরা মিথ্যা, আমরা ঝাড়েবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছি অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছি; এমন কি আমরা চিরকালই মিথ্যা অলীক, কোন কালেই আমাদের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া ধারণা হইতেছে। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া আপনি মায়াবাদ-তুল্য কোন নবীন 'বাদ' সৃষ্টির কথাও চিন্তা করিতেছেন। এ সকল সংবাদই আমাদের এই ছিট ভুবনপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা আমাদিগকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান কাল ও মনুষ্যকুল এই দুই পক্ষ এক গোপন চুক্তিবদ্ধ হইয়া ভূতকাল ভূতলোক ও ভূতজাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যাহার লক্ষ্যই হইল ভূতজাতিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতে যেমন কতিপয় ডিক্‌টেটর এবং দল একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল, চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক। তাহারা উহা যথাসাধ্য গোপনে করিয়াছিল কিন্তু সমগ্র মনুষ্যকুল আজ দল বাঁধিয়া জোট পাকাইয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযান শুরু করিয়াছে। আজ আপনি আপনাদিগের অর্থাৎ বর্তমান মনুষ্যকুলের দোষত্রুটি দেখিলেন না; কোন ব্যাপক অনুসন্ধান করিলেন না; একেবারে নিজের খামখেয়াল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করিলেন, ভূত ছিল না ভূত নাই ভূত মিথ্যা। মহাশয় নিতান্তই বুদ্ধিতে গর্দভ তাহা বলিব না, বলিতেছি, এযুগের সংস্পর্শদোষে বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। তাহার সঙ্গে নিরতিশয় প্রশংসা-লোভে প্রায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। টেলিগ্রাম করিয়া

কলিকাতায় মিটিং ডাকিতে বলিয়াছেন। মতলব সেখানে ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আপনি দাঁড়াইয়া বুক বাজাইয়া চিৎকার করিবেন, ভূত নাই ভূত মিথ্যা।

আপনার চেলারা হাঁকিবে—ভূত
লোকেরা বলিবে—মুর্দাবাদ। বিলকুল ঝুট।
আপনি বলিবেন—মানুষ
তাহারা বলিবে—জিন্দাবাদ। সত্‌হায়।

কিন্তু মহাশয়, তাহা এত সহজ নহে। এত সোজাও নহে। শুধু ভূতেরা মরিবে আর মানুষেরা বাঁচিবে তাহা হইতে পারে না। আমরা তাহা সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া ফেলিয়াছিলাম। মনুষ্যলোকে ধ্বনি-তরঙ্গবাহিত শব্দবাক্য রেডিও নামক যন্ত্র দ্বারা ধরিতে হয়; ভূতলোকে তাহার প্রয়োজন হয় না। ভূতেরা সব আপনা-আপনিই জানিতে পারে। তাহারা আপনার এই সিদ্ধান্ত ও ভূত-বিরোধী অভিযান-পরিকল্পনা আপনা আপনি জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে, আমাদের ছেলেপুলেদের দল তো বেশ চটিয়াছে। কিন্তু ভূত ভুবনপুর ও মর্ত্যভুবনপুর এখন বর্তমানকাল ও ভূতকালের বিবাদবশতঃ বৈদেশিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং হালফিলের কয়েকটা বৈজ্ঞানিক খনি আবিষ্কারের দৌলতে রাতারাতি-ধনী মর্ত্যভুবনপুর একেবারে সর্পের পঞ্চপদ নিরীক্ষণ করিয়া নিজেকে অজেয় মনে করিয়াছে ও উভয় ভুবনপুরের সীমান্ত-বরাবর অত্যন্ত কড়া পাহারা বসাইয়াছে। ভূত ভুবনপুরের কোন লোককে ধরিতে পারিলেই বোতলে পুরিয়া মুখে ছিপি আঁটিয়া আলমারি কেল্লায় বন্দী করিয়া রাখিতেছে। অন্যথায় সংবাদ পাইবামাত্র তাহারা ভূত ভুবনপুরের তিন্তিড়িবৃক্ষ বা শাল্মলী বৃক্ষ বা শিংশপা বৃক্ষ বা অশ্বত্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শীর্ষদেশ হইতে এক ঝম্পে বা লম্ফে তদীয় গ্রামের বৃক্ষশীর্ষে ঝড় তুলিয়া নামিত। এবং সেখান হইতে সড়াক করিয়া মাটিতে নামিয়া ভবদীয় গৃহকে ঘেরাও করিয়া নৃত্য করিত ও উপদ্রব করিত। গাছপালা নাড়া দিত, ধুলা ছিটাইত, ঢেলা মারিত, কেহ কেহ দুঃসাহসী হয় তো আপনার চুল ধরিয়া টানিত, কেহ বা আপনার সম্মুখে দাঁত বাহির করিয়া আপনাকে মুখ ভেঙাইত। হয় তো কেহ কেহ চাঁটিও মারিতে পারিত। হঠাৎ পা ধরিয়া টানিয়া উলটাইয়া ফেলিয়া দিলেও কিছু বলিবার ছিল না। ইহা ছাড়া খোনা গলায় চিৎকার করিয়া রাত্রির আকাশ জুড়িয়া হিজিবিজি কাটিয়া বিশ্রী করিয়া দিত।

শুধু পাসপোর্টের অনিয়মের জন্য তাহা হয় নাই। ভূতদিগকে কোনক্রমেই পাসপোর্ট দিতে মর্ত্যভুবনপুরের বর্তমান পরলোক-অবিশ্বাসী, ধর্মে আস্থাহীন বুদ্ধিনৈতিক ও বিদ্যানৈতিক কর্ণধারগণ একেবারেই নারাজ। ভূতদিগের দিক হইতেই তাহাদের বিপদাশঙ্কা। ভূতেরা একবার প্রবেশাধিকার পাইলে, তাহাদের আশঙ্কা, মর্ত্যভুবনপুরে তাহাদের পার্টি-রাজত্বের দফা খতম হইয়া যাইবে। তাহারা একটা আশ্চর্য পদ্ধতি ও একটা আশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছে যাহার বলে তাহারা ভূতদের ধরিয়া বোতলে পুরিয়া এক ফোঁটা ওষুধ প্রয়োগ করিলেই ভূতেরা গ্যাস হইয়া যায় এবং অসীম শূন্যের গ্যাসস্তরের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আমরাও অনেক কিছু পারি, আজ আপনাকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি আপনাকে

ঘিরিয়া আমরা ধেই ধেই করিয়া নাচিতে পারি; আপনাকে নাচাইতে পারি। ভয় দেখাইতেও পারি।

মহাশয়, আপনি এখন অশরীরী সত্তায় আমাদের সঙ্গে এখানে রহিয়াছেন। আপনার সংজ্ঞাহীন দেহ রেললাইনের ধারে গাছতলায় নিথরভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা এখানে আপনাকে ভয় দেখাইলে যন্ত্রণা দিলে আপনার দেহখানা সেখানে গোঁ গোঁ করিবে হাত পা ছুঁড়িবে তাহা এখনি দেখাইতে পারি। দেখাইতে পারি কেন, এখনই দেখাইয়া দিতেছি। আর আপনি যদি মরিয়া যান তাহা হইলে আপনাকে আমরা এখনই বৈতরণীঘাটে পাঠাইয়া দিব, আপনি সেখানকার কোন বৃক্ষরূপী হোটেলে থাকিবেন। আপনার জন্য সীট বা বার্থ ইত্যাদির ব্যবস্থা হইলে স্টীমারে চড়িয়া বা নৌকায় চড়িয়া ওপারে যাইবেন। সে হইলে আপনাকে আমরা সহজে ছাড়িব না। হয় আপনাকে ওই মর্ত্যভুবনপুরে ফিরিয়া পাঠাইয়া দিব আপনি ওই বিজ্ঞানী-নামক চরম অজ্ঞানীদের হাতে পড়িয়া ওই ঔষধের ফোঁটার গুণে গ্যাস হইয়া ফুস্ শব্দ করিয়া মিলাইয়া যাইবেন। অনন্তকাল ইথারের মধ্যে বন্দী হইয়া থাকিবেন। নয় তো আমরাই আপনাকে ধরিব এবং ভূতলোকে ভূত-অস্তিত্বে অবিশ্বাসের অপরাধে সিকিউরিটি অ্যাক্টে আটক করিয়া ব্রেন ওয়াশ করিতে থাকিব। এবম্প্রকার ঔদ্ধত্য আর আমরা কোনপ্রকারেই বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহি। ভূতগণ—

উত্তরে, সে বোধ হয় কয়েক হাজার তরুণ ভূত, খোনা গলায় সাড়া দিয়ে উঠল।

হুঁ। হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

সে যেন শীতের গভীর দ্বিপ্রহর রাত্রিতে একসঙ্গে কয়েক হাজার কুকুর কি শিয়ালের ছানা একসঙ্গে কুঁই কুঁই করে উঠল।

সে খোনা কুঁই কুঁই শব্দের প্রতিধ্বনিতে আমারও যেন দারুণ ভয়ে কান্না পেয়ে গেল। ভাবলাম হাত জোড় করে আমিও খোনা আওয়াজে বলে উঠি, মাঁপ কঁরুন ভূঁত প্রঁভুরা আঁমাকে মাঁপ করুন। আঁমার দোঁষ হঁয়েছে। কেঁ বঁললে আঁমি ভূঁতে অঁবিশ্বাস কঁরি? ওঁটা কেঁবল লোঁক দেঁখানো। আঁমার মঁস্তিষ্কের মধ্যে অঁশরীরী হঁয়ে তুঁমি লুঁকিয়ে আঁছ। আমার খাতার পাতায় আঁকা ছঁবির মঁধ্যে আঁছ। ঘঁরের অঁন্ধকার কোঁণে ও মঁনের মধ্যে তুঁমি নঁড়ে ওঁঠো।

বলতে চাইলাম কিন্তু বলতে পারলাম না। ভয়ে কোন আওয়াজ আমার গলা থেকে বের হল না। শুধু হাজার হাজার তরুণ ভূতেদের খোনা আওয়াজের চন্দ্রবিন্দুগুলো খোল করতাল বাজিয়ে আস্ফালন করতে লাগল।

আমি দৃষ্টি যথাসাধ্য বিস্ফারিত করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম, সেই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মত অন্ধকারের মধ্যে নিকষকালো লম্বা লম্বা কাঠির মত এক ধরনের প্রাণী নিশ্চয়। কাঠির মত হাত কাঠির মত পা, একটু মোটা কাঠির মত বুক পেট, একটা আলুর মত মুণ্ড তাতে দুটো ব্যাঙের মত ড্যাবডেবে চোখ আর শোলার তৈরী মুলোর মত দাঁত। সব যেন কিলবিল করছে চারিদিকে।

হঠাৎ এরই মাঝখানে কোন একজন ভারিক্কি মহিলার বাজখাঁই কণ্ঠধ্বনি সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠল—চুঁ—প্—।

হ্যাঁ। সে এক চুপের মত চুপ বটে। চএ হ্রস্ব উকার দিয়ে চু নয়—দীর্ঘ উকার দিয়ে চূ, তাও একটা দীর্ঘ উকার না, অন্ততঃ তিন তিনটে দীর্ঘ উ লাগিয়ে কোন লাউডস্পীকার মুখে লাগিয়ে হাঁক হেঁকেছেন হাঁকদায়িনী বা হাঁকিনী।

আচ্ছা জবরদস্ত হাঁক। সে যেন কানের কাছে সাইরেন বেজে গেল। এবার আমি ভয় পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের মত খোনা আওয়াজের 'চু—প' শব্দটা কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ ভূতের খোনা-আওয়াজের বিশাল স্তূপটা বা পাহাড়টা একেবারে 'চিচিং ফাঁকের' মত মন্ত্রবলে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এবং নিশ্চুপ নিস্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। আমি দেখলাম কাঠিজুড়ে গড়া ভূতগুলো ক্রমশঃ যেন বড় এবং মোটা হয়ে উঠছে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাদের মুখ চোখের মাধুরী দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

আবার সেই জাঁদরেল নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল। খাঁম বলছি বজ্জাত ব্যাটারা। হাঁরামজাদা উল্লুকরা। খাঁম বলছি খাঁম। থেমে আগেই গিয়েছিল সকলে, এখন সেই অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম ছায়াছায়া মূর্তিধারী ভূতেদের ভূত-জনতা দুপাশে ফাঁক হয়ে গেল এবং তার মধ্য দিয়ে জোনাকিপোকার পিদিম হাতে একজন সম্ভবতঃ ঝিয়ের পিছনে এক বিপুলা মহিলা। এই মোটা এই মাথা, সে মাথার চুলগুলো প্রায় সব উঠেই গিয়েছে, যে কটা আছে সে কটা লম্বায় আধহাত আর গুণতিতে একশো গাছাও হবে না। মনে হল নিরেনব্বুই গাছা, তাতে একটা গিঁঠ বাঁধা। গলায় পাটী হার, হাতে তাগা, হাত দুটো এই মোটা, হাতের বাঈ দুটোতে মাংস থলথল করছে। গালেও তাই, দাঁত ভেঙে পড়েছে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, দুহাতে দুই হাঁটুর কাছ বরাবর কাপড় সামলে ধরে থপাস থপাস করে হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে এসে হাজির হলেন এবং দাঁড়ালেন আমার সামনে। পানজরদা খাওয়া দুপাটি তরমুজের বিচির মত দাঁত মেলে বললেন, এস এস। এ বেটারা বাবা সব ছুঁচোর দল গো। হাল আমলের লোক। মানীর মান জানে না। তারপরে? রাস্তাতে কোন কষ্টটষ্ট হয়নি তো? সব ভূতের দল তো? জান বাবা ভূত হলেই কেমন একটা হালকা পলকা ফাজিল-ফাজিল চেহারা হয় মনের। হায় হায় বাবা তোমাকে একথা তো বলতে পারছি না যে, বাবা তুমি এবার ভূত হয়েছ, এবার তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে। তুমি এখনও মরনি। অজ্ঞান হয়ে আছ। সেটা আমাদের চক্রান্তেই বটে। তা তার জন্তে দায় তোমার। বুঝেছ। তুমি তোমার গাঁ থেকে টেলিগিরাপ করলে, মিটিং ডাক ভূত নাই ভূত মিথ্যে পেমান করে দেব। তারের 'টরে টক্কা' আমাদের এরা আজকাল ধরছে বাবা। ধরা আপনি পড়ে। আগে গেরাহ্যি করতাম না এখন গেরাহ্যি না করে উপায় নাই। মর্ত্য-ভুবনপুর আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বিলকুল তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা করি কি? দেশ ভাগ করে বৈতরণীর ঘাটের কাছে এই খানিকটা দেশ দিয়েছে তাতেই আমরা গাদাগাদি করে বাস করছি। এখন দাঁড়াও বাবা দুটো পান খেয়ে নি। ওলো

দামিনী। গেলি কোথায়? হারামজাদী পেত্নী কোথাকার। দে পান দোক্তা দে।

দামিনী পেত্নী ঝি সঙ্গে সঙ্গে পানের বাটা খুলে ধরলে এবং কৃতকৃতার্থ হয়েছে এই ধরনের আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে দুটো সাংঘাতিক দাঁত বের করে আমার দিকে তাকালে।

ঠাকরুণটি দুটো পান একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে বাঁ হাতে দামিনীর গালে একটা ঠোনা মেরে দিয়ে বললে, মরণ, হারামজাদীর নোলা দেখ। জ্যান্ত মানুষের গন্ধ পেলে হয়। জিভ লকলক করে। ওই বাঁকা দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়ে। জানো বাবা হারামজাদী রক্তচোষা বাদুড় হয়ে রাত্রে সে কালে মনিষ্যি-রাজ্যে ঘুরত। ওই দাঁত দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের রক্ত চুষে খেতো। বেটীর পাখা কেটে দিয়ে তবে শায়েস্তা করেছি, বেটী বদমাসের একশেষ। একে নিয়ে পেরেত লোকের পেরেত রোমাঞ্চ কাগজে একটা যা গপ্প নিকেছে না একজন নিকিয়ে-ভূত, সে পড়ে দেখলে বুঝতে দামিনী কি চীজ্।

দামিনী মাথায় এই এতখানি ঘোমটা টেনে দিয়ে বললে, হেই মা গো! এই সব নজ্জার কথা নাকি ভিনদেশী লোকের কাছে বলতে হয় গিন্নীমা। কি নজ্জা। কি নজ্জা।

গিন্নীমা, সেই বিপুলকায়া সেই মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী তখন একচামচ জরদা মুখে পুরে দামিনীর মাথার চুল ধরে টান মেরে বললে, চোঁপ হারামজাঁদী চোঁপ।

ঠিক এই সময় একজন ভীমকান্তি দিব্য চমৎকার মিলিটারী মিলিটারী পোশাক-পরা লোক এসে দাঁড়াল—তার এক হাতে একটা লম্বা দড়ি অন্য হাতে একটা গদা। এবং এক নতুন রকম মিলিটারী স্যালুট করে বললে, মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী দেবী।—তার ইয়া গোঁফ, ইয়া গাল-পাট্টা দেখে ভয় হল আমার।

গয়েশ্বরী দেবী মুখ বেঁকিয়ে পচ করে একমুখ পানের পিচ ফেলে বললেন, কি বাওয়া জোমডুট। কি বলসো মানিক?

লোকটি বললে, মর্ত্যভুবনপুরে এ লোকটির সংজ্ঞাহীন দেহে ইনজেকসন দিচ্ছে সেবা-শুশ্রূষা করছে, তার ফলে একে ফিরে যেতে হবে সেখানে। অতএব একে নিয়ে আর কি কাজ আছে তা শেষ করে নিতে বলছি। আর বেশিক্ষণ ওকে রাখার আদেশ মিলবে না।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা! তাহলে এই ভূতগুলোকে একটু ধমকে টমকে দাও। তা নইলে তো ওরা ছাড়বে না। বেশ বুঝতে পারছি ওরা একটা হাঙ্গামা বাধাবার তালে আছে বাবুটির সঙ্গে। দেখ না কেমন করে ভিড় করেছে দেখ না।

যমরাজকে ১৪৪ ধারাকে হুকুমতসে স—ব-হ—ট যাও—স—ব হট যাও, বলে হাঁক মেরে পাহারাওয়ালা হাতের দণ্ডটা ঘুরিয়ে দিয়ে কটমট করে সকলের দিকে তাকালে। নাকটা ফুলে উঠল তার। গোঁফ দুটো নড়তে লাগল দাঁড়িপাল্লার দাঁড়ির মত।

ভূতগুলো, হ্যাঁ গয়েশ্বরী দেবী আমাকে বলেছিলেন, তারা বিদ্রোহী এবং মনুষ্যগণের উপর ক্রুদ্ধ ভূত। গয়েশ্বরী দেবীর উপরও ক্রুদ্ধ বটে তারা।

এবার আমার অবাক হবার পালা। অন্ততঃ তাই মনে হল আমার। কারণ যা ঘটল তা অভাবনীয়। এই সব বিদ্রোহী লম্ফ ঝম্ফ এবং মুষ্টি-ছোঁড়া ভূতের দল এক মুহূর্তে ছুটতে

লাগল। মানে পালাতে লাগল। মনে হল গড়ের মাঠে ফুটবলের ম্যাচের আসরে সেপাইরা করেছে দর্শকদের তাড়া আর তারা পালাচ্ছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা, তারা শুধু বিদ্রোহী নয়, তারা ভূত বিদ্রোহী, তারা ওই একটা পাহারাওয়ালার ভয়ে এমনি করে পালিয়ে গেল। ভূতের এত ভয়। ও কে?—ভূতেরা এত ভয় করে।

দুই হাতে দুই হাঁটুর পাশের কাপড় মুঠোয় ধরে একটু তুলে অনেক কষ্টে পা তুলে থপ করে ফেলে বললেন সেই মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী দেবী; বললেন, ওরা হল যমদূত বাবা। ওই ওরা আছে বলেই এখানে কাজটাজগুলি বিলিব্যবস্থামত এখনও চলছে। না হলে এত দিনে লণ্ডভণ্ড করে দিত। এই ভূতেরাই দিত, কিছু মনে করো না বাবা, এ সবই তো তোমাদের কাজ বাবা। মানুষেরাই তো এর জন্ত কোমর বেঁধেছে। কিছু কি রাখত। ভগবানকে তো মানুষেরাই উড়িয়ে দিয়েছে। ভয়কে মেরেছে। পারেনি কেবল মরণের মালিক যমকে। ওকে তো মারতে পারেনি। ছিষ্টিকে তো এখনও ওই একজনাই রেখেছে। ভাগ্যে মানুষ মরে। আর যমদূতেরা ভূতকে ছুঁলেই ভূতগুলো হয় খরগোশ ছাগল, আর যমদূতে হয়ে যায় বাঘ।

আমি যমদূতটার দিকে তাকালাম। ওঃ লোকটা কি ভয়ানক রকমের ভয়ানক। বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠল। মনে মনে আমি যেন খরগোশ হয়ে যাচ্ছিলাম ভয়ে। ইচ্ছে হচ্ছিল, তিড়িং করে একটা লাফ মেরে পালিয়ে যাই। কিন্তু তাও সাহস হল না।

গয়েশ্বরী বললেন, এস বাবা এস। তোমার আর বেশি টাইম নাই। তোমাকে এর মধ্যে যতটা পারি দেখিয়ে দি। এস।

* * *

গয়েশ্বরী দেবীর পিতৃশ্রাদ্ধের আসরে গেলাম। দেখলাম গান হচ্ছে। গণ্ডছন্দের গান।

"ওগো গয়েশ্বরী দেবী গো, ভূত-ভুবনপুরের পত্তনীদারনী গো, তোমার পুণ্যবান পিতা প্রেত-শিলার জবরদখলকার অপঘাতে মরা গুণ্ডা প্রেতদলের ডিক্‌টেটর মরিলেন গো—। শত শত বৎসর প্রেতনৃত্য, মহা দৌরাত্ম্য চালাইয়া অবশেষে মরিলেন গো। অশরীর প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়া তোমার মহাপুণ্যবান এবং মহাবিক্রমশালী গুণ্ডা পিতা পুণ্যসলিলা বৈতরণীর জলে স্নান করিয়া সর্বাঙ্গে জয় জয় জয় হোসেন, জয় শাহ, জয় জয় জয় জিন জয় তুষ, ইত্যাদি নাম অঙ্গে লিখিয়া ও মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে ওই তিনি মর্ত্যভুবনপুরের দিকে চলিয়াছেন গো। ওই তাঁহার জন্ত বিধাতার দূত আসিল গো। কিন্তু পুণ্যবাণ তোমার পিতা বিধাতার দূতের সঙ্গে কথা কহিলেন না। তিনি স্বর্গে যাইবেন না। তিনি মর্ত্যে যাইবেন। মর্ত্যের তুল্য ধাম নাই। এবং সৃষ্টিতে মনুষ্যলোকের রাজাদের প্রেসিডেন্টদের বা নেতাদের তুল্য নাম নাই। হরিনাম, দশরথ রাজার বেটার নাম, ওসব নাম যে পুণ্যফল দেয় তাহা সব ভুয়া, তাহাতে পোকা ধরিয়াছে। তাহা অপেক্ষা মর্ত্য-ধামের মাকাল ফলের অনেক উৎকৃষ্টতর স্বাদ এবং অনেক রকম ভিটামিন সমৃদ্ধ। মর্ত্যধামে তিনি চলিলেন। তাহাতে ভূত প্রেতদের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের অধিকার পুনঃ-

প্রতিষ্ঠিত হইবে। ওই শুন শুন মর্ত্যধামে টিন বাজিতেছে, ক্যানেস্তারা বাজিতেছে, ওই দেখ মর্ত্যধামে তাঁহাকে আবাহনের জন্য হই-হুল্লোড় ধ্বনিত হইতেছে।"

কয়েকজন লম্বা ধরনের ভূত ঘটির মধ্যে লোহার একটা চাবি বা ডাণ্ডি বাজিয়ে ওই কথা-গুলো একসঙ্গে সুর মিলিয়ে গানের সুরে বলে যাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম এরা এখানকার ঘটি বাজিয়ে তন্তীরাম বামুনের দল! ওইভাবে মৃত ভূতের পারলৌকিক সদ্‌গতির কথা বর্ণনা করছে কেবল মাত্র পাওনাগণ্ডা আদায়ের জন্য। ঠিক মর্ত্যভুবনপুরেও এমনই করে তন্তীরাম বামুনেরা। টাকা দিলে ওরা মৃতজনকে ইন্দ্রলোকে পাঠায়, ব্রহ্মলোকে বিষ্ণুলোকে শিবলোকে কৈলাসে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দেয়। আর না পেলে নরকে পাঠায়। গালাগাল করে। ওই টাকা ওই টাকা বলে চিৎকারও করে। সবই হয়ত বাজে কিন্তু একটা খটকা লাগল। বলছে "মরিয়া তিনি সুখের মর্ত্যধামে যাইতেছেন। তিনি আম খাইবেন জাম খাইবেন শশা খাইবেন ভাত খাইবেন ডাল খাইবেন কাটলেট খাইবেন চপ খাইবেন মামলেট খাইবেন। আরও কত কি খাইবেন। তিনি চোঙা প্যান্ট পরিবেন ভূত প্রেত আঁকা জামা পরিবেন, সিগারেট খাইবেন, বিড়ি খাইবেন ধেই ধেই করিয়া নাচিবেন, ট্রাম পোড়াইবেন, বাস পোড়াইবেন, হিপি হইবেন, হাংরি হইবেন, অ্যাংরি হইবেন আরও কত কি হইবেন।"

এ সব কেন বলছে?

মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল, কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। বারবার নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর মানে কি? গয়েশ্বরী দেবীর বাবা মরলেন। তারই বা মানে কি? গয়েশ্বরী দেবীর বাবা আগে মানুষ ছিলেন। মানুষ হয়ে জন্মালে মানুষকে মরতে হয়, মানুষ অমর নয়। মরে মানুষ ক'দিনের জন্যে প্রেত থাকে—তারপর শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই সে চলে যায় যেখানে যাবার। স্বর্গের এ-লোক ও-লোক সে-লোক—সে গোলোক থেকে শিবলোক পর্যন্ত অনেক লোক আছে। এর উলটো দিকে আছে নরক ভূতলোক প্রেতলোক শাঁকচুন্নী লোক—নানান লোক। সেই ভূতলোক ছড়ানো ছিল মানুষের সংসারে, সমাজের বসতির চারি দিকে। পিণ্ডি দিলে ক্রিয়াকর্ম করলে তা থেকে মুক্তি পেত। পাপ খণ্ডন হয়ে চলে যেত স্বর্গে। এখন এসব কি বলছে এরা? কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

গয়েশ্বরী দেবীর বাবা ভূত। গয়েশ্বরীও ভূত বা প্রেতিনী। বুঝতে পারি। বাবাও ভূত হয়েছিল মেয়েও ভূত হয়েছিল। কিন্তু গয়েশ্বরীর বাবা মরল এ কি কথা।

ভূত মুক্তি পায়, তা বুঝি। কিন্তু ভূত মরবে কেন? যদি মরলই তবে মর্ত্যলোকে জন্মাতে চলল কেন? এবং মরল যদি তবে মরল কিসে? ভূত কি বুড়ো হয়? না ভূতের রোগ-টোগও হয়?

ভূতও মরে বাবা। ভূতও মরে। ভূতের বয়স হয় তবে বুড়ো হয় না। তবে তারা ইচ্ছে করলে ছোকরাও সাজতে পারে আবার বুড়োও সাজতে পারে। স্বপ্ন দেখে মানুষ, শোন নি? আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই গয়েশ্বরী নিজে থেকেই বললেন, বুড়ীর বুড়ো মরলে পর স্বপ্ন দেখে বুড়ো সেই অল্পবয়সী ছোকরা সেজে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

তবে ইদানীং বাবা ভূতদের ডিস্‌পেপসিয়া হচ্ছে। সেও ওই তোমাদের জন্যে। পিণ্ডি দিচ্ছ, তার মধ্যে ভেজাল চালাচ্ছ দেদার। আর রেশনের আতপ। মধু দিচ্ছে না, তার বদলে গুড় দিচ্ছে। তাতেও ভেজাল। ভূতদেরও দোষ আছে বাবা। আজ বছর কতক থেকে এই তোমাদের দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে এরা বড্ড বেশি মাছ খাচ্ছে বাবা। দেখছ না তোমাদের নদীতে মাছের অভাব। গোয়ালন্দে মাছগুলো পচছে আর সেই মাছ এরা আনছে। ওই যে শাঁকচুন্নীগুলোকে দেখলে, ওরাই ধরে আনছে। আনছে আর চড়া দরে বেচছে। তবে ভূতেরা রোগে ভোগে, রোগে মরে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা হলে ভূত মরে বললেন যে?

হ্যাঁ বাবা মরে। ভূত বুড়ো হয়েও মরে না রোগেও মরে না। ভূতেরা মরে অপঘাতে বাবা অপঘাতে। আর সে অপঘাত ঘটায় মানুষে।

মানুষে? ভূতেই তো মানুষকে মারে শুনেছি। ঘাড়ে চাপে। ঘাড় মটকায়।

সে সব আগের কালের কথা বাবা। এখনকার কথা নয়। এখন তোমরা বাবা খুব চেঁচাতে শিখেছ। তিল হলে চেঁচিয়ে তাকে তাল করে তোল। তাই মানুষের কথাই শোনা যায়, ভূতের কথা শোন না, শুনতেও পাও না। ভূতেরা অনেক ভাল লোক বাবা। আর বেশ একটু বোকা। বুঝেছ। মানুষ যখন মরে তখন বুদ্ধিটুকু আনতে পারে না। তাই ভূতেরা বোকা হয়। ভূত কি রকম অপঘাতে মরে জান? মানুষেরা গাছ কাটে। কাটা গাছ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ভূতটি কিংবা ভূতগুলি চাপা পড়ে মরে। ঘরের সাঙায় বা ঘরের কোণে ভূত থাকে, ঘরটি ভাঙলেই ভূতটি ঘর চাপা পড়ে মরে। শুধু ঘর ভাঙা কেন বাবা, ঘরের কোণের অন্ধকারে থাকে ভূত, বেশ থাকে, একলা ঘর হলে নাচে হাসে দোল খায়। আবার একলা দোকলা মানুষকে পেলে বলে, মানে বল্‌তো বাবা, আগে, এখন আর বলে না, বলত তোঁর ঘাঁড় ভাঙব। কিংবা অন্য কিছু বলে ভয় দেখাত। তা সেই ঘরে দেওয়াল কেটে জানালা বসালেই আলো এল, বাতাস এল আর সঙ্গে সঙ্গে ভূতকে পালাতে হল। বাবা, কুনো ভূতনী নাম তার কুনী, অন্ধকার ঘরের কোণে থাকে, বুনো-ভূত বুনী-ভূতনী বনে থাকে। ঘর ভাঙলে কি জানালা বসিয়ে আলো ঢোকালেই কুনী ভূত পেত্‌নীকে পালাতে হয়। অনেক সময় বাবা ওই জানলা কাটার সময় গাঁইতি শাবলের খোঁচা খেয়ে কুনীরা মরে। ঠিক তেমনি বাবা বন কাটলে বুনো ভূতনী বুনো পেত্‌নী কাটারি দায়ের কোপ খেয়ে কাটা পড়ে, নয় তো, ডাল চাপা পড়ে মরে, নয় তো বন ছেড়ে পালায়। তা ছাড়া ভূতেরা সূর্য্যির আলো কি আগুনের আলো সইতে পারে না। তাপ লাগলে আলো লাগলে ভূতের ছায়া-শরীর গলে যায়। আমাদের বড় মজার শরীর বাবা। কাঁটার উপর বসতে পারি কিন্তু আলো সইতে পারি না। সেইজন্যে দিনের বেলায় আমরা ঘুমুই। রাত্রে আমাদের মাতন। সেইজন্যে আমাদের এই জোনাকি পোকা জমিয়ে মশালের ব্যবস্থা। ওরাই আমাদের মশালচী। আগুনও আমরা জানি না।

আমি অবাক হয়ে গয়েশ্বরীর কথা শুনলাম।

গয়েশ্বরী হঠাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বড় সুখের বিধিব্যবস্থা ছিল বাবা। মানুষ মরত, মরে প্রেত হয়ে এই ভূতেশ্বর ভোলানাথের খাসমহলে আসত, দিনকতক থাকত; তারপর পিণ্ডিটিণ্ডি খেয়ে বৈতরণী পার হয়ে চলে যেত। স্বর্গে নরকে। যেখানে হোক। নরকে গেলে, নরক ভোগ শেষ করে স্বর্গে যেত। এখন সব উলটে গেল। তোমরা বললে, আমরা একজাত হই। ভূত আলাদা, মানুষ আলাদা। দেশ ভাগ করাল। শুধু তাই নয় ভূত-দের তোমরা মর্ত্যভুবনপুর থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ। মেরে ফেলছ। মানুষে মানুষ খুন করলে তোমরা ফাঁসি দাও কিন্তু ভূত মারলে বাহবা দাও। গ্রাহ্যই কর না। এ গাছে ভূত আছে, কাট এই গাছটা। এ বাড়িতে ভূত আছে, ভেঙে দাও ওটা, ভেঙে নতুন বাড়ি কর। এখানে কবরখানা, হোক গে। ওরই ওপর বানাও বাড়ি। তা ছাড়া তোমরা আকাশে প্লেন ওড়াচ্ছ। ভূতেদের আকাশপথে আনাগোনা, তারা অন্ধকার আকাশে দল বেঁধে বেড়াতে বের হয়। দেশ-দেশান্তরে যায় আকাশপথে। সেই আকাশে তোমাদের প্লেন উড়ছে। প্লেনের ধাক্কায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ ভূত মরছে। বাবা ছিষ্টির আদিকাল থেকে কত মানুষ মরেছে ভাব। যত মরেছে তার লাখে একজন দেবতা হয়েছে বাকীরা সব ভূত হয়েছে। তাহলে পৃথিবীময় ছড়িয়ে কত ছিল হিসেব করে দেখ। মানুষ ভূত, জন্তু ভূত, পাখি ভূত, পোকামাকড় ভূত, ভূতের কি সংখ্যা ছিল বাবা। পিলপিল করত গিজগিজ করত। ওই যে দেখছ বাবা, একটা চাপ বেঁধে রয়েছে পিঁপড়ে পোকার মত দেখছ না?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। ওই তো বিজবিজ করছে, নড়ছে, চাপ বেঁধে রয়েছে।

হ্যাঁ। ওই সব হল জন্তু ভূত। ওর মধ্যে বাঘ মরে বাঘভূত হয়েছে, সিংহভূত হয়েছে, করিমভূত হয়েছে, ওরা সব হিংস্র জন্তু ভূত। ওদের সব খোঁয়াড়ে আটক করা আছে। আঃ! কি ভাল ব্যবস্থা যে ছিল, কি বলব বাবা!

আমি হেঁট হয়ে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে দেখলাম, তাই বটে, বাঘ ভালুক সিংহ কুম্ভীর গণ্ডারগুলো সব ছোট্ট পিঁপড়ের মত চেহারা নিয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে গাঁক-গাঁক গর্জন করছে। দেখলাম দুটো পিঁপড়ের আকারের বাঘে লড়াই শুরু করেছে। গোটা চারেক ভালুক, তারাও ডেয়ো পিঁপড়ের মত। তারা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো উপরের দিকে তুলে চেঁচাচ্ছে।

গয়েশ্বরী বললেন, ওই শোন ভালুকরা বলছে, হে ভগবান আর আমরা হিংসা করব না। আমরা পোষ মেনে নেচে নেচে মানুষকে খুশি করব, আমাদের মুক্তি দাও।

একটা সিংহ চেঁচাচ্ছে। তারও আকার একটা লাল কাঠপিঁপড়ের মত। গয়েশ্বরী বললেন, ও বলছে আমি মকদ্দমা করব। আমি মা দুর্গার বাহনের জ্ঞাতি। আমাকে স্বর্গে পাঠানো হোক। অন্ততঃ স্পেশ্যাল ডায়েট দেওয়া হোক।

দুটো গণ্ডারে খাঁড়ায় খাঁড়া আটকে ঠেলাঠেলি করছিল। তারা এই বড় জোর দুটো বাচ্চা শুয়রে পোকার মত আকারের। বুনো শুণ্ডা হাতিগুলোকে মনে হচ্ছিল বড়—মানে জোয়ান শুয়রে পোকার মত।

গয়েশ্বরী আর একটু দূরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালেন, ওই দেখ। সেখানে দেখলাম গোরু মহিষ উট ঘোড়া হাতি রয়েছে। তাদের আকারও ছোট ছোট। গয়েশ্বরী বললেন, ওই হল গো দানালোক, ওইটে হল অশ্ব প্রেতলোক, ওইটে হল উট ভূতলোক আর ওইটে হল গজ ভূতলোক—মানে হাতিছানা লোক। আর ও-ই-টে কুকুর প্রেতলোক।

একটু হেসে বললেন, বাবা তুমি যে কটা কুকুর পুষেছিলে তারা মরে ওখানেই রয়েছে। বেটী বলে তোমার সেই অ্যালসেসিয়ানটা সেটাও ওখানে আছে।

বললাম, একবার দেখাবেন তাকে।

গয়েশ্বরী বললেন, তুমি তো এখনও মরনি বাবা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ লাইনের ধারে গাছতলায়। সেই ফাঁকে তোমায় এনে সব দেখাচ্ছি, বোঝাচ্ছি।

ঠিক এই সময় কোথায় ঘণ্টা পড়ল যেন কোন রাজবাড়ির দেউড়ীর ঘণ্টা বাজল, ঢং-ঢং-ঢং। মানে তিনটে। এবং সঙ্গে সঙ্গে খোনা খোনা আওয়াজে শেয়ালভূতেরা ডাকতে লাগল হুঁকি হুঁয়া হুঁকি হুঁয়া—হুঁয়া হুঁয়া হুঁয়া—। পেঁচারা ডেকে গেল। সেও খোনা আওয়াজ। কে যেন নকীবের মত হাঁকলে, সাবধান রাত পোয়াচ্ছে। ভূতেরা সব সাবধান। যে যার বাড়ি ফের। বাড়ি ফের। সেও খোনা আওয়াজ। আকাশে চাঁদ ছিল না কিন্তু আওয়াজের কোরাসের মধ্যে মনে হল বিন্দু বিন্দু চন্দ্র—অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর সরষে-বাটা মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন, খোনা গলায় পুরবী রাগিণীতে গাইতে লাগল, "রাতি গেল, গেল রাতি ওগো তোমার পথ চেয়ে—"

বুঝলাম ভূতের রাজ্যে রাতের পালাই মানুষের দিনের পালার মত, তাই বেলা গেল, গেল বেলার বদলে—রাতি গেল, গেল রাতি করে নিয়েছে। ভূতটা গায় ভাল। গলা ভাল। কেবল খোনাটে একটু বেশি এই যা।

শুনে মন আমার উদাস হয়ে গেল। কিন্তু গয়েশ্বরী ঠাকরুন খোনা আওয়াজে হায়-হায় করে উঠলেন।—হাঁয়-হাঁয়-হাঁয়। এখন আমি কি করি?

আমি বললাম, কেন?

গয়েশ্বরী বলে উঠলেন,—ওঁরে, বাঁবারে। তিন পঁহর পার হঁয়ে গেল। এঁখনও কঁথা বলা হঁল না। কি কঁরব রেঁ।

সেই দামিনী ঝি-ভূত এবার বলে উঠল, পান দোক্তা খাঁবে আর যঁত বাঁজে গপ্প কঁরবে। সোঁজাসুঁজি বঁল না বাঁপু যে, সাঁরা ভূতভুবনপুর খেঁপে রয়েছে, তারা বলতে চায়, আমাদের দাবি মানতে হবে। তা না যত সব ইয়ে। বাঁবা বাঁবা বাঁবা। এঁত বাঁবা বাঁবা কিঁসের গোঁ? ·অঁঃ—

খাঁম বঁলছি হারামজাদী! এঁ্যাঃ। এ যেন মর্ত্যভুবনপুর পেঁয়েছিস। হুঁ। কাঁউকে মানব না কিছু মানব না।

দামিনী মুখটা ফিরিয়ে জিভ কেটে ভেংচি কেটে দিলে গয়েশ্বরীর উদ্দেশে। সেটা আমি দেখতে পেলাম কিন্তু গয়েশ্বরী তা দেখতে পেলেন না। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন,

শোঁন বাঁবা। হ্যাঁ যা বলছিলাম। দামিনী মিঁছে বলে নি। আঁমাদের ভূঁতেরা বাঁবা মানুষদের উপর মর্ত্যভুঁবনপুরের উঁপর চঁটে গেঁছে। মঁস্ত মঁস্ত মিটিং হঁচ্ছে। তা অন্যায় তো বলতে পাঁরি না। তোমরা আমাদের ভূতদের মেরে মেরে প্রায় নিব্বংশ করতে চলেছ। প্লেনের ধাক্কায় ভূতেরা মরছে আকাশপথে চলবার সময়। ভূতদের বাবা চেহারা আছে দেহ নাই। ভূতেরা ইচ্ছেমত বড় হয়, ইচ্ছেমত ছোট হয়। তোমরা আমাদের সঙ্গে ভেয় হলে। ছোট দেশে এত ভূত। ওদিকে তোমরা সাহসী হলে, ভয় ভুললে। কি করি, ভূতরা আকারে ছোট হতে লাগল। মানুষে ভয় পেলে ভূতেরা বড় হয়। তাল গাছের মত বাঁশ গাছের মত। আবার সাহস করে লাঠি ঝাঁটা নিয়ে এলে এই এতটুকু, ওই জন্তু-জানোয়ার যেমন পিঁপড়ের মত হয়েছে তেমনি হয়ে যায়। তা নইলে উপায় কি বল? মানুষ মরে ভূত হয়। আজ পর্যন্ত পিথিমীতে সেই আদ্যিকাল থেকে যত মানুষ জন্মেছে তারা সবাই মরেছে। ভূতও হয়েছে। ভূত হলে এত ভূত কোথায় ধরবে বল। তাই দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে ভূতরা। তবে ইচ্ছে করলে, আর মানুষের যখন বুক ঢিপ ঢিপ করে তখন তারা বড় হয়ে যায়। এরা সেই ছোট চেহারা নিয়ে চামচিকের মত বাদুড়ের মত আকাশে যখন ওড়ে, তখন প্লেনের ধোঁয়ায় ওরা উড়ে যায়। পাখায় কেটে যায়। তার উপর অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন-বোমা ফাটাচ্ছ তোমরা। তাতে মানুষের নিরাপত্তা দেখ। ভূতদের দেখ না। ভূতরা তায় আঁচে পুড়ে ঝাঁজরা হয়ে গেল। ছাই হয়ে গেল। এঁই-সব কাঁরণে বাঁবা ভূতেরা খেপেছে। তারা রব তুলেছে। তাই তোমাকে শোনাতে এনেছি এখানে। তারা রব তুলেছে —শোঁধ চাঁই। শোঁধ চাঁই। মাঁনুষের অঁত্যাচারের শোঁধ চাঁই। অঁপমানের শোঁধ চাঁই। ওই ভূত-পুরীতে চীৎকার উঠছে—শুনতে পাচ্ছ?

সত্যিই একটা চীৎকার উঠেছিল। কোটি কোটি চন্দ্রবিন্দু যেন কোরাসে চেঁচাচ্ছে। কান পাতলাম। শব্দ উঠছে—চাঁই-চাঁই-চাঁই।

দামিনী বললে, এঁকটি ভূঁতের প্রাণের জন্যে দঁশটি মাঁনুষের জান চাঁই। হুঁ—হুঁ। চাঁই-চাঁই-চাঁই। একটি ভূতের প্রাণের জন্যে দশটি মানুষের জান চাই। অপমানের শোধ চাই।

আমি বললাম, অপমানটা কিসের? ভূতেরা মরছে মানুষের হাতে তা বুঝলাম। কিন্তু মান অপমান এল কোত্থেকে?

কোত্থেকে? হঠাৎ দামিনী রেগে উঠে বললে, কোত্থেকে? ওরে ও বাম্না। মানুষরা ভূত মানছে না কেন? ভূতকে ভয় করছে না কেন? এঁ্যা? দেখ্ না এবার কি করি? ভূতের জয়ধ্বনি দিইয়ে তবে ছাড়ব।

আমার বেশ মজা লাগছিল। আমি বললাম, তা ভূতেরা পারবে না। কখনও না।

পাঁরবে। পাঁরবে। নিশ্চয় পাঁরবে। একটি ভূঁত মরলে দশটি মানুষ মঁরবে। বলে দামিনী দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। সে এমন দাঁত কিড়মিড় যে আমি আচমকা যেন খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম।

গয়েশ্বরী বললেন, চমকাচ্ছ তুমি? এঁ্যা চমকাচ্ছ? তা হলে শোন। শৃঙ্খ শৃঙ্খ।

ভূঁতেরা রেঁগেছে। তাঁরা উঠে পড়ে লেঁগেছে এবার। মাঁনুষের সব চেষ্টা ভূঁতেরা ব্যর্থ কঁরে দেঁবে। ভূঁতেরা এঁবার কোঁমর বেঁধেছে।

বলতে বলতে গয়েশ্বরী খানিকটা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

নিজের আঁচলখানা টেনে কোমরে জড়িয়ে গাছকোমর বেঁধে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। হাতের নখ দিয়ে দামিনীর পিঠে খামচি কেটে দিলেন। দাঁতে দাঁতে ঘষে কড়মড় শব্দ করলেন।

এবার আমার সত্যিসত্যিই ভয় হল। নার্ভাস হয়ে গেলাম। যদি দামিনী তার ওই বাঁকা খাদন্ত দিয়ে কামড়ে দেয়। কি গয়েশ্বরী যদি হঠাৎ ক্ষুধার্ত হয়ে ওঠে, ওই মোটা কোলা হাতখানা বাড়িয়ে আমাকে টেনে—

চমকে উঠলাম। ভিতরটা গুরগুর করে উঠল। মনে পড়ল কে একজন ভূতের ভয়ে গাছে উঠে আরও ভয় পেয়েছিল। কারণ গাছের ভূতটা খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল, কি মজা এঁকেবারে হাঁতের কাঁছে পেলাম।

"ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে—ভূত বলে আমি পেলাম কাছে।"

আমারও তাই হল নাকি?

সত্যিই তাই হল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে গয়েশ্বরী দেবী বিকট খিলখিল শব্দে হাসতে লাগলেন।

হিঁ-হিঁ-হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ। হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ·····।

আমার খাঁচাছাড়া আত্মাপুরুষের সেই অদৃশ্য দেহের অত্যন্ত মিহি রোমগুলি খুব চমৎকার ভয়ে একেবারে পেরেকের মত খাড়া হয়ে উঠল। তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, একি একি, আপনি এমন করে হাসছেন কেন?

গয়েশ্বরী দেবী শুনে থামবেন কোথায়, তিনি আরও জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, বেশ বিনয় করেই বললাম, হাসবেন না। আমার ভয় করছে।

কঁরছে। কঁরছে। তাঁই তোঁ কঁরবে। তাঁ হলে এঁইবার দেঁখ। ওঁরে ভূতের বিক্রমটা দেঁখ্। দেঁখ এঁবার কঁত বঁড় কঁত চঁমৎকার ভঁয়ানক ইঁই দেঁখ্। নাঁস্তিক পাঁষণ্ড মাঁনুষ কোঁথাকার।

গয়েশ্বরী দেবী সঙ্গে সঙ্গে ফুলতে লাগলেন। বাড়তে লাগলেন। লম্বা হতে আরম্ভ করলেন।

ফুটবলের ব্লাডারকে যেমন ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায়, বেলুনকে যেমন ফোলানো যায় তেমনি ভাবে ফুলতে লাগলেন। মাথাটা বাড়তে লাগল। হাত-পাগুলি লম্বা পাকা বাঁশের মত লম্বা হতে লাগল।

শুধু তাঁরই নয়, তাঁর সঙ্গে দামিনীরও।

তার দাঁত দুটো মুলোর মত লম্বা হয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সেই দাঁত দুটি মেলে সে তার সেই বাঁশের মত লম্বা পায়ে নটরাজের নৃত্যভঙ্গিতে এক পা তুলে, এবং হাত দুখানা

দুপাশে বেশ মুদ্রাভঙ্গিতে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, গান ধর।

সভয়ে বললাম, কোন গান?

সে বললে, প্রলয় নাচন।

বললাম, জানি না।

সে বললে, তবে ছি ছি এত্তা জঞ্জাল ধর।

বললাম, তাও জানি না। আমি গানই জানি না।

এর পর কি হত তা জানি না। রক্ষা করলেন গয়েশ্বরী ঠাকরুন। হাজার হলেও তিনি অরিজিনাল ভূত—মানে শিবের ভূতের বংশের কন্যে। জমিদারনী না হোন পত্তনীদারনী। তিনি কি অতিথির ক্ষতি করেন। তিনি ক'যে এক ধমক দিলেন দামিনীকে। চুপ রহে হারামজাদী। হট যাও। মরণ, লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধুসনি। নাচবি। সরে যা বলছি। নাচবি কি? মর্তে আমাদের বদনাম হবে। নাচবি কি?

যত বলছিলেন গয়েশ্বরী তত বাড়ছিলেন। ফুলছিলেন। তিনি ধাক্কা দিয়ে দামিনীকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, শোন বাপু আমি যা বলি তাই শোন। শুনে গিঁয়ে মানুষদের বলবে। শোন, মানুষ যেমন মানুষকে ভালোবেসে এক সঙ্গে মিলে বাস করে, ভালো না বাসলে যেমন মানুষে মানুষে ঝগড়া হয়, তেমনি ভূতে মানুষে এক সঙ্গে বাস করে পরস্পরকে ভয় করে। মানুষ ভূতকে রাতে ভয় করে। ভূত মানুষকে দিনে ভয় করে। সম্পর্ক ভয়ের। ভঁয় কঁরে বলেই মানুষ চায় ভূত থাকুক। অন্ধকারে থাকুক লুকিয়ে থাকুক। ছেলেরা যখন দুধ খাবে না তখন ডাকলে সাড়া দেবার জন্য থাকুক। একলা ঘরে শুয়ে মনে মনে কথা বলবার জন্যে ঘরে থাকুক। ভূত দিনে মানুষকে ভয় করে রাত্রে তাদের ভালবাসে। ভূতেরা আজও মানুষকে ভয় করে, ভালবাসে। কিন্তু মানুষেরা ভূতকে ভালও বাসে না ভয়ও করে না। লাখে লাখে তাদের খুন করছে। মারছে। তারই শোধ নেবার জন্যে ভূতেরা কোমর বেঁধেছে। প্রতিজ্ঞা করে তারা প্রতিদিন হাজারে হাজারে লাখে লাখে মরছে। ইচ্ছে করে মরছে। জাপানী-দের মত হারিকিরি করছে। কেন? জানিস?

সভয়ে বললাম, কেন?

উত্তরে হাসতে লাগলেন গয়েশ্বরী—হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ—

সেই খিলখিল খোনা ভূতুড়ে হাসি।

আমি বললাম, বলতে গিয়ে তোতলা হয়ে গেলাম। তোতলামি করে কোন রকমে বললাম, ন-ন-না। না—ঐ এ—এমন করে হাসছেন কৃ—কৃ কেন?

কেন হাঁসছি? হাঁসছি কেন?

হ্যাঁ।

কেন, তা বুঝতে পারছিস না। আজও বুঝতে পারিসনি?

না।

তবে শ্রবণ কঁর।

বলুন।

গায়েশ্বরী দেবী অকস্মাৎ আসন করে বসে আচমন করে বললেন, এবং সাধুভাষায় বললেন, নম ভূতেশ্বর, নম ভূতেশ্বর, নম ভূতেশ্বর। অতঃপর ওরে অর্বাচীন তবে শ্রবণ কর। মানুষ মরিয়া যেমন ভূত হয়, ভূত মরিয়াও তেমনি মানুষ হয়। ভাবিয়া দেখ, গত যুদ্ধে, যুদ্ধের সময় মহামারীতে কত লোক মরিয়াছিল। সকল দেশে মানুষের অভাব ঘটিয়াছিল। আর আজ এই কুড়ি বাইশ বৎসরের মধ্যে কি হইয়াছে দেখ। দেখ মানুষ বাড়িয়াছে না কমিয়াছে? বাড়িয়াছে তো তাহারা আসিল কোথা হইতে? তোরা ভূতকে মারিয়াছিস, ভগবানকে মারিয়াছিস তাহার সঙ্গে দেবতাকেও মারিয়াছিস, একটি দেবতা ছাড়া। ব্রহ্মাকেও মারিয়াছিস বিষ্ণুকেও মারিয়াছিস, পারিসনি শুধু শিবকে। ব্রহ্মা যদি মরিল তবে এত লোক আসিল কোথা হইতে? কে তৈয়ারী করিল?

হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ।

আবার হাসি। একে সাধুভাষায় গম্ভীর গম্ভীর কথা এবং খোনা আওয়াজ তার সঙ্গে এই হাসি। ওঃ।

আবার আমি বললাম, আবার হাসছেন? দয়া করে যা বলছেন তাই বলে শেষ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে গায়েশ্বরী মাথায় হাত দুই লম্বা হলেন এবং প্রস্থেও খানিকটা ফুলে উঠলেন। এবং আরও জোরে হাসতে লাগলেন।

হিঁ—হিঁ—হিঁ। এঁখনই শেষ করতে হবে? ওরে মূর্খ! এঁখনও বুঁঝিলি না? ব্রহ্মাকে মারিয়াছিস, প্রাণী সৃষ্টি করিবার সৃষ্টিকর্তা নাই। তবুও সৃষ্টি হইতেছে কি করিয়া? ওরে ওই ভূতগুলো গিয়া মানুষ হইয়া জন্মিতেছে। ওই একালের চোঙা প্যাণ্ট কাকের বাসার মত চুল ওই কিম্ভূতকিমাকার জামাপরা ওই লিকলিকে চেহারা আজব আবির্ভাব দেখিয়া বুঝচিস না! সব ভূত হারিকিরি করিয়া মানুষদের উপর শোধ নিবার জন্য ফিরিয়া গিয়া মানুষ হইয়া জন্মিতেছে এবং বিশ্বব্যাপী ভূতের উপদ্রব শুরু করিয়াছে। মানুষেরা বিজ্ঞান বুদ্ধিতে ভূত নাশ করিয়াছে, ভূতের ভয় ঘুচাইয়াছে, এ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারী করিয়াছে, এখন ভূতেরা মানুষ হইয়া জন্মিয়া ওইসকল বোমা লইয়া প্লেন লইয়া যুদ্ধ বাধাইয়া মানুষদের শেষ করিয়া ছাড়িবে। আমার বাবা সেই লড়াই বাধাইবার একজন মাতব্বর হইবার জন্য ভূত-দেহ ত্যাগ করিয়া মর্ত্যলোকে জন্মিতে চলিলেন। যুদ্ধ বাধিবে এবং তখন এ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমার সব মানুষ মরিয়া যাইবে। মানুষ মরিলে ভূত হয়। সুতরাং সব বিলকুল বেবাক আপাদমস্তক আবালবৃদ্ধবনিতা.কাক কোকিল চিন শকুন পোকামাকড় জীবজন্তু গোরু ভেড়া বাঘ ভালুক মানুষ বনমানুষ সব মরিয়া গিয়া ভূত হইয়া এই অসুন্দর মানুষের পৃথিবীকে সুন্দর ভূতের পৃথিবীতে পরিণত করিবে।

মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। যেন নয়, সত্যিসত্যিই ঘুরতে লাগল।

সমস্ত ভূতভুবনপুরটাই যেন পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে লাগল। গয়েশ্বরী দেবীর সেই পাঁচশো লোকের পোলাও রান্না করার ডেকচিটার মত ফুলে বেড়ে ওঠা মাথাটা কখনও যেন লম্বা হয়ে

প্রকাণ্ড খোলের মত হয়ে যেতে লাগল আবার পরক্ষণেই গুটিয়ে কুঁকড়ে খাটিয়ে যেতে লাগল। তার সেই বিরাট বেলুনের মত দেহটাকে দিয়ে কোন বেলুনওয়ালা যেন মুচড়ে দুমড়ে নানান রকমের চেহারা দিতে লাগল। ওরা কারা যেন দল বেঁধে কোরাসে গান ধরেছিল—

মরবে না মরবে না ভূত কখনও মরবে না। আশ্চর্য ওদের সুর। সে খোনা আওয়াজে আকাশছোঁয়া চিৎকারে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কাঁপিয়ে দিলে তারা। এবং তার বিচিত্র তালে যেন সকলেরই পা নাচতে চাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, মনে হল কেন, মনে পড়ছে, প্রাণপণে আত্ম-সংবরণ করে ঘুরে যাওয়া মাথাকে সোজা করে দেখলাম কেউ যেন ধেই ধেই করে বিস্ময়কর নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। এই মোটা এই লম্বা। এই মাথা এই পেট কিন্তু হাত এবং পাগুলি বাঁশের মত সরু আর বিস্ময়কররূপে লম্বা। সেই সরু শক্ত পায়ে সে ঝমোঝমো করে নাচ এবং সরু লম্বা হাতে আশ্চর্য আশ্চর্য মুদ্রা।

সে আর কেউ নয়। আমাদের মহিমার্ণবা গয়েশ্বরী।

ভূত কখন হারবে না। মানুষেরা পারবে না।
ধারবে না ধার ধারবে না, কিছু কারুর।
বাঘ ভাল্লুক হাতি ঘোড়া
ছাগল ভেড়া মহিষ গোরুর।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ সেই ভূতভুবনপুরের ভোরবেলাকার ঘষা-কাচের মত আকাশে যেন ঝড় তুলে সোঁ সোঁ শব্দে একটা কোন যান এসে পাক খেতে খেতে নেমে পড়ল। দেখলাম সেটা একটা শিমুল গাছের ডাল। সেটার উপর ঘোড়ায় চাপার ভঙ্গিতে চেপে অতি সুন্দর ভৌতিক গড়নের এক পুরুষ। দেখতে পাঁজির সংক্রান্তি-মহাপুরুষের মত। কান সিঁটকে লম্বা, চোখ দুটি ব্যাঙের মত, মাথার চুল নেই। কাঠির মত বাঁ হাতে একটা খেলো হুঁকো ধরে মাঝে মাঝে টান দিতে দিতে ডালটা থেকে টপ্ করে প্রায় লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তারপর বকের মত পা ফেলে এগিয়ে এসে বললে, জয় হোক মা গয়েশ্বরীর। আমি এসেছি।

গয়েশ্বরী বললেন, যাক। ভালই। ভালই হয়েছে। এই দেখ সেই লাভপুরের সেই ছোকরা। কোমর বেঁধে লেগেছে ভূত নেই, ভূত থাকা উচিত নয় প্রমাণ করতে।

লোকটা আমার কাছে এসে নাক মুখ খিঁচিয়ে বললে, কার ছেলে র‍্যা তুই লাভপুরের?

আমি ক্রুদ্ধ হয়েই বললাম, কেন? আমি হরিদাসবাবুর ছেলে।

হরিদাসবাবু? সে কার ছেলে র‍্যা?

আমি বললাম, অভদ্র লোক কোথাকার—

সে বললে, ফাজিল ফকর লিটল বয়, কোন্ কুছকে কামকা নয়, জানে না কারে কি কইতে হয়। বল তোর ঠাকুরদার নাম। নইলে তাল গাছের মত লম্বা হয়ে যাব।

ভয় পেলাম। বললাম ঠাকুরদার নাম। দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ—দলুবাবুর নাতি তুই? এত পেকেছিস? "গন্ধে তিন ভুবন ময়-ময়!"

কিন্তু আপনি কে ?

লোকটি গান ধরে দিলে :

মন তুমি আসল খবর জানো না।
ভূত জন্ম সুখ জন্ম—বিনি আবাদে ফলে সোনা।

তালের মাথায় আমার তালুতে একটা চাঁটি মেরে বললে, বল তো আমি কে ?

আমার মনে পড়ে গেল, বললাম, রামাই।

রামাই বললে, ঠিক ধরেছিস।

আমি বললাম, কিন্তু আপনাকে খুঁজে পেলাম না কেন ?

রামাই বললে, গ্রাম লাভপুরের নিম গাছ কাটা পড়ল, শিমুল গাছ কাটা পড়ল, লোকেরা মেলেচ্ছ পড়া পড়লে, কি করব—রেফুজী হয়ে লাভপুরের ছিটমহল মানে লাভপুরের ভূতের গল্পের গাছের ডালে বাসা নিয়েছি। কিন্তু এ কি মতিচ্ছন্ন তোমার। ভূত নাই নাই করে নাচছ কেন ? ভূত আছে। থাকবে। ভূত মরবে না।

মারিলে মরিলে ভূত হবে মানুষের পুত—

তখন তাড়ালেও যাবে না তারা। তাদের প্রলয় নৃত্যে ত্রিভুবন কম্পিত হবে। বলে তিনি নিজেই নাচতে শুরু করে দিলেন।

আশ্চর্য নাচ, ভীষণ ভালো নাচ, ভয়ংকর চমৎকার নাচ।

এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। শুনলাম, রা—ম কালীবাবু। রামবাবু। রামবাবু।

আমার নাম। হ্যাঁ আমার নামই তো রামকালী। রাম-কালী।

বাস্। মুহূর্তে কি হয়ে গেল। সব যেন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেল। গয়েশ্বরী দেবীর সেই বিরাট পেট এবং মাথা যেন ফুটে যাওয়া বেলুনের মত মুহূর্তে গুটিয়ে এইটুকু একটুখানি রবারের মত হয়ে গেল। সেই বাঁশের মত লম্বা হাত-পাগুলি শুকুতে লাগল খাটো হতে লাগল ; ক্রমে বাঁশ থেকে শুকিয়ে কঞ্চির মত, তারপর কঞ্চি থেকে শুকিয়ে কাঠির মত হয়ে গেল। লম্বাতেও গুটিয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর যেন মুড়মুড় করে গুঁড়ো হয়ে হাওয়ায় মিশে গেল। ভূতভুবনপুরের সেই জোনাকি আলোয় আলোকিত সুন্দর অন্ধকার, তাও মিলিয়ে গিয়ে খানিকটা দিনের আলো আলো হয়ে এল।

রামকালীবাবু।

বুঝলাম, আমাকেই কেউ ডাকছেন। আগেই বলা উচিত ছিল আমার, বলতে ভুলে গেছি রামকালী শর্মা আমার নাম।

চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম, অনেক লোক জমে আছে। আমার মাথার কাছে বসে একজন ডাক্তার আমাকে দেখছেন। ইনজেকশন দিয়েছেন। সিরিঞ্জ ধুচ্ছেন। পাশে বসে একজন রেলের কর্মচারী আমাকে ডাকছেন, রামকালীবাবু।

চোখ মেলতেই তাঁরা সকলে বললেন, জ্ঞান হয়েছে জ্ঞান হয়েছে।

আমি উঠে বসতে গেলাম। কিন্তু তাঁরা উঠে বসতে দিলেন না। ধরাধরি করে ট্রেনের কামরায় তুলে বেঞ্চের উপর শুইয়ে দিলেন। আমার অনুচর রাম মহারানা সেও পাশে বসল। চোখ মুছতে মুছতে বললে, আমারও বড়ো ভয়ও লাগিয়িলি। সারা রাতও জ্ঞানও হইল না।

* * *

ট্রেন ডিরেল্‌ড হয়েছিল। আমার মাথায় ধাক্কা লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এ একেবারে বাস্তব সত্য। কিন্তু—

কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় এসব কি হল ?

জানি না। কি হল বা হয়েছিল জানি না। বলতেও পারব না। অজ্ঞান অবস্থায় এমন স্বপ্ন কেউ কি দেখে ?

দেখে। নইলে আমি দেখলাম কেন ?

আমি দেখলাম যা তা আহত অসুস্থ মস্তিষ্কের স্বপ্ন হলেও সত্য। আজেবাজে স্বপ্নের মত মিথ্যেও নয়। মিথ্যে নয় এই কারণে বলছি যে এর পরও আমি গয়েশ্বরী দেবীকে স্বপ্নে দেখলাম। ঠিক দিন তিনেক পর, সেদিন ঘুমটি সবে এসেছে আর কে যেন বললে, ঘুঁমুলে নাঁকি ?

কে ?

আঁমি গঁয়েশ্বরী ঠাঁকরুন।

কি ?

দেখ সেদিন ওরা তোমার নাম ধরে ডাকলে, দশরথ রাজার বেটার নাম তার সঙ্গে আবার খেপা মায়ের নাম জোড়া। ও নাম হতেই আমরা ফুস্‌ধা হয়ে গেলাম। বেলুনে পিন ফুটিয়ে দিলে। কথাগুলো সব বলা হল না।

আর কি বলবে ? বলবার কি আছে ?

আছে বাছা আছে। রাগ করছ কেন ? রাগ করলে আমরা বাগ পাইনে। বুঝেছ ভয় না পেলে ভূতের সঙ্গে প্রেম হয় না। মানুষ ভূতকে ভয় করে ভূতও মানুষকে ভয় করে। সেইখানেই ভূতে মানুষে অজ্ঞাত প্রেম। সেই কারণেই মানুষ মরে ভূত হয় এবং ভূতেরা মরেও মানুষ হয়। শ্রবণ কর ভূতপুরাণের কথা। সেই আদ্যিকাল। জল নাই স্থল নাই শুধু বাতাস। মানুষ নাই ভূত নাই দেবতা নাই স্বর্গ নাই মর্ত্য নাই। সেই কাল। সেই আদ্যিকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজনে বসে আছে কাজ নেই কর্ম নেই কি করে। কেউ পুজো করে না। কেউ লড়াই করে না। নিষ্কর্মার জীবন। দিনরাত্রিও নাই। কাল কাটে না। তখন তিনজনে বললে, এস ভাই খেলা করি।

কি খেলা ?

না, এস একজন আমরা গড়ি ; একজন সেইটেকে সাজাও ; একজন সেটাকে ভাঙ।

বেশ বলেছ।

ব্রহ্মা প্রথমে গড়লেন দিন। বিষ্ণু সূর্যকে পুব থেকে পশ্চিমে পৌঁছে দিলেন। শিব তাকে হাতে ধরে টেনে ডুবিয়ে দিলেন। ব্রহ্মা তাকে ধরে নিয়ে আবার উঠিয়ে দিলেন। আবার বিষ্ণু তাকে পশ্চিমে হাজির করলেন। শিব সূর্যকে ডুবিয়ে দিলেন। এরপর ব্রহ্মা একটা রাজ্য গড়লেন। কি রাজ্য না স্বর্গ। তারপর সে রাজ্যে থাকবে কে? তখন দেবতা গড়তে লাগলেন। বিষ্ণু তাদের পালন করতে লাগলেন। মানে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। এরপর সমুদ্র মন্থন করে সুধা তুলে দেবতারা অমর হলেন। শিব তখন বলে উঠলেন, দেবতারা অমর হল এখন আমি তাহলে ভাঙব কি, মারব কাকে? বলে রাগ করে তিনি ভূত তৈরী করলেন। শিব বলবান বটেন কিন্তু কারিগর ভালো নন। বুঝেছ। সেই কারণে ভূতেদের চেহারা ভাল নয়। তবে তারা যেমন ইচ্ছে তেমনি রূপ ধরতে পারে। এই তো ঝগড়া বাধে বাধে হল। তখন একটা সন্ধি হল। ব্রহ্মা তৈরি করলেন মর্ত্যভুবন। এবং সেখানে তৈরি করে দিলেন মানুষ। শিব ভূতগুলোকে পাঠালেন ব্রহ্মার কাছে, ব্রহ্মা তাদের মানুষ করে মর্তধামে পাঠালেন।

আমি বললাম, তোমার মাথা। তুমি এক তাল বায়ু আমার মাথার মধ্যে এসে জমা হয়েছ। ভাগো বলছি, ভাগো। জানো আমার নাম—রা—ম কালী শর্মা—

বাস। ম্যাজিকের মত কাণ্ড। গয়েশ্বরী মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু একটা কথা কানে এল, আচ্ছা আমার বাবা তোমার বাড়িতে এসে জন্মাবেন। এবং প্রমাণ করে দেবেন যে যেসব ভূতকে তোমরা বিজ্ঞান-বুদ্ধিতে বধ করছ তারা সবাই এসে তোমাদের মধ্যে জন্মাচ্ছে। মানুষ মরে ভূত হোক আর না হোক ভূত মরে মানুষ হচ্ছে। এবং প্রমাণ করছে—

মরবে না মরবে না—ভূত কখনও মরবে না।
মানুষেরা পারবে না—ভূত কখনও হারবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে সমস্ত ব্যাপারটা লিখে রাখাই স্থির করলাম। সত্য না হওয়াই উচিত।

তবে—

মিথ্যে না-ও হতে পারে।

সত্য মিথ্যা বিচারের যত কিছু ভার;
আমার নহেক তাহা, পাঠক তোমার।
ভূতপুরাণের কথা কহিলেন ভূতে
শুনিলেন পাঠকেরা মিলি পৌত্রপুতে।
ভূতপুরাণের কথা অমৃত সমান
রামকালী শর্মা কহে শুনে পুণ্যবান॥